প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল

(For Higher Secondary Course)

অনিল মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম অনুমোদিত সংস্করণ
অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭

মুদ্রাকর :
শ্রীরণজিৎ কুমার দত্ত
নবশক্তি প্রেস
১২৩, আচার্য জগদীশ বসু রোড
কলিকাতা-১৪

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্যসূচী অনুসারে লিখিত প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল প্রকাশিত হইল।

এই গ্রন্থে বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণতা ও সঙ্গতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পাঠ্য-তালিকার বহির্ভূত দুই-একটি বিষয়বস্তুরও অবতারণা করা হইয়াছে এবং সংযোজিত অতিরিক্ত অংশসমূহ সূচীপত্রে তারকা-চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমার সহকর্মী সুধী শিক্ষকবৃন্দ আমার সহিত সম্ভবতঃ একমত হইবেন যে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীগণকে অযথা তথ্যভারাক্রান্ত না করিয়াও এই বিষয়সমূহ পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা যায় এবং ইহাতে অর্থনৈতিক ভূগোলের বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণতা ও সঙ্গতি বজায় থাকে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে যাহাদের জন্য এই পুস্তকটি প্রকাশিত হইল তাহাদের উপকারে আসিলেই আমার শ্রম সার্থক বলিয়া মনে করিব।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় — অনিল মুখোপাধ্যায়

Syllabus for Higher Secondary Examination

Map-work : Candidates may be required to draw outline maps of (a) the World and (b) India and locate therein climatic regions, production centres, trade routes and trade centres.

CLASSES IX & X

1. (A) Man and his Environment.

   Principal factors of environment :—

   (a) Physical : geographical location, mountains, rivers, coast line, climate, soil, animals, vegetation, minerals, etc.

   (b) Non-physical : population, political & social organisation, etc. Adaptation of man to his environment ; effects of environment on the economic life of man. Examples from Indian conditions.

   (B) The importance of Economic Geography.

2. Climatic regions of the World—Polar, Temperate (cool and warm), Tropical and Equatorial—their influence on vegetation, animal life, distribution of population, transport, economic development, etc. Natural divisions of India.

3. Principal resources of the world and their utilisation (To be studied with special reference to the Indian conditions).

   (A) Agriculture and Rural Industries :

   Agriculture—its main features : intensive and extensive cultivation ; types of farming ; importance of soil and irrigation. Principal agricultural products— (i) Food crops : Rice, Wheat, Tea, Coffee, Sugar-cane and Sugar-beet ; (ii) Commercial crops : Cotton, Jute, Hemp, Silk, Rubber and Oilseeds. Their uses and principal growing areas, important markets.

   (B) Forests :

   (a) Different classes of forests—Distribution of forest areas—products of the forests—other advantages.

   (b) Indian forests and their utilisation.

   (C) Pastoral industries :

   Livestock—its importance—food, transport and power, raw materials, clothing. Principal products and their uses. Production of raw wool, hides and skins, frozen meat.

4. Minerals and Power resources :

   (a) Mining : its features. Principal minerals and their uses.

      (i) Metals : Iron, Copper, Lead, Tin, Aluminium.

      (ii) Non-metallic : Coal, Petroleum, Salt, Mica, Building materials. Principal fields of the World and their reserves, important mining industries.

   (b) Principal minerals in India and their problems. Multi-purpose schemes in India in relation to power and irrigation.

5. Transport, trade routes and trade centres :

   (a) Importance of transport—different modes of modern transport—Roads, inland water-ways, railways, shipping and airways. A descriptive study with special reference to India.

   (b) Trade routes : Land routes (road and rail), Water routes (ocean, canal and river), and Air routes. Examples of important routes. The Suez Canal and the Panama Canal.

   (c) Trade Centres :

      (i) Ports and harbours : their functions, relation with the hinterland ; required conditions for development. Some important ports of international standing. India's principal ports.

      (ii) Towns and Cities : Conditions favouring growth of some important trade centres of the World.

CLASS XI

6. Manufacturing Industries :

   (a) Essential factors for development—raw materials, power resources, climate, transport, labour and market. Important industries—Iron and steel, Textile (cotton, woollen, silk and artificial silk), Jute, Paper and Chemicals. Chief World centres.

   (b) Principal manufacturing industries in India—Cotton, Iron and Steel, Jute, Paper, Sugar, Chemicals and Engineering.

7. Foreign Trade of India—direction and composition.

8. Population—regional distribution—density of population—factors of density.

9. West Bengal—principal agricultural and mineral resources—large scale industries & industrial regions—Tea industry—Importance of Calcutta port.

সূচীপত্র

নবম ও দশম শ্রেণী

প্রথম খণ্ড : মানুষ ও তাহার পরিবেশ

দ্বিতীয় খণ্ড : প্রাথমিক উৎপাদন

---

* তারকাচিহ্নিত অংশটি পাঠ্য তালিকার বহির্ভূত; তবে বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণতা ও সঙ্গতির জন্য এই অংশটি সংযোজিত হইল।

তৃতীয় খণ্ডঃ পরিবহন ব্যবস্থা

একাদশ শ্রেণী

চতুর্থ খণ্ড ঃ গৌণ উৎপাদন

প্রথম খণ্ড

মানুষ ও তাহার পরিবেশ

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

(Introduction)

সংজ্ঞা ও প্রয়োজনীয়তা (**Definition and Importance**)—মানুষেব বৈষয়িক জীবনযাত্রার সহিত তাহাব পরিবেশের (environment) যে কার্যকাবণ-সম্বন্ধ আছে, সে বিষয়েব তত্ত্ববিচারকে বলে **বৈষয়িক** বা **অর্থনৈতিক ভূগোল**।

মানুষ পৃথিবীতে বাস কবে, পৃথিবীতেই তাহার জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকে। পৃথিবীব জলবায়ু, উদ্ভিজ্জ, ভূ-প্রকৃতি, খনিজ সম্পদ প্রভৃতির দ্বারা তাহাব জীবন নানাভাবে প্রভাবিত হয়; আবার তাহার ক্রিয়াকলাপের ফলেও তাহার চারিদিকেব পবিবেশে ঘটে নানারূপ পরিবর্তন—বনভূমির স্থলে দেখা দেয় গ্রাম বা শহরের মতো লোকালয়, যোজকের বুক চিরিয়া বাহির হইয়া আসে বড বড সামুদ্রিক খাল, এইরূপ আরও কত কী! মানুষ আর পৃথিবীর মধ্যে আছে এইরূপ একটি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধ, আর এই সম্বন্ধটির মূলে আছে কাযকারণের খেলা। ভূগোলের প্রধান কাজ হইল এই কাযকারণের স্বরূপ উদ্ঘাটন করা।

কিন্তু মানুষের ক্রিয়াকলাপ বহুমুখী। তাহার এই বহুমুখী ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যে দিকটা বিশেষ করিয়া তাহার বৈষয়িক জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহারই সঙ্গে তাহার পরিবেশের কার্যকাবণ-সম্বন্ধ কিরূপ, সে তত্ত্ব উদ্ঘাটনের দায়িত্ব বৈষয়িক বা অর্থনৈতিক ভূগোলের।

পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের বৈষয়িক জীবন এক ছাঁচে ঢালা নয়; কোথাও বনের ফলমূল সংগ্রহ করা আর বনের পশুপক্ষী শিকার করাই তাহার প্রধান উপজীবিকা; কোথাও তাহার প্রধান উপজীবিকা কৃষিকার্য; কোথাও প্রধানতঃ শ্রমশিল্পের অনুশীলনকেই সে জীবিকা অর্জনের পন্থা রূপে গ্রহণ করিয়াছে। এইরূপ পার্থক্যের কারণ কী?

ইহার কারণ প্রধানতঃ দুইটি। প্রথমতঃ, বিভিন্ন **পার্থিব পরিবেশ**

তাহাকে বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য করিয়া থাকে—যেখানে সংবৎসর মাটির উপর কঠিন বরফের স্তূপ জমিয়া থাকে, যেমন উত্তরের হিমমরু বা তুন্দ্রা অঞ্চলে, সেখানে কৃষিকার্য চলে না, যেখানে ভূমিভাগ পর্বতসঙ্কুল, অথবা যেখানে তিব্বতের মতো আকাশচুম্বী মালভূমির অবস্থান, সেখানে মাছের চাষ এক হাসির কথা। **দ্বিতীয়তঃ, মানুষের সংস্কৃতিগত পার্থক্য** অনুযায়ীও মানুষের বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপে পার্থক্য ঘটিয়া থাকে—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র খনিজ সম্পদে সুসমৃদ্ধ, কিন্তু সেখানকার রেড ইণ্ডিয়ানরা তাহার ব্যবহার জানিত না বলিয়া যান্ত্রিক শ্রমশিল্পে উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই, ইউরোপ হইতে ঔপনিবেশিকরা সেখানে বসতি স্থাপন করার পরই সেখানে বিবিধ যান্ত্রিক শ্রমশিল্পের উন্নতি ঘটে।

মানুষকে তাহার পার্থিব পরিবেশ, যেমন জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি হইতে পৃথক্ করিয়া দেখা যায়, কিন্তু তাহার সাংস্কৃতিক পরিবেশ হইতে তাহাকে পৃথক্ করিয়া দেখা যায় না—সে ভাবে দেখিতে গেলে মানুষ হইয়া দাঁড়ায় জৈবধর্মী প্রাণী মাত্র; জীবকুলের মধ্যে মানুষের বিশিষ্ট পরিচয়ই তাহার সভ্যতা-সংস্কৃতিতে। ঔপনিবেশিক যুগের ইউরোপীয়েরা ছিল সাধারণ ভাবে একই সভ্যতা-সংস্কৃতির অধিকারী; কিন্তু ক্যানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, পেরু, অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করায় পৃথক্ পৃথক্ পার্থিব পরিবেশে আসিয়া তাহারা আজ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নিজেদের বৈষয়িক জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে। এই সব দেশের বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপে আজ যে নানারূপ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহার মূল কারণ ইহাই। ভূগোল-বিজ্ঞানে তাই মানুষ বলিতে শুধু জৈবধর্মী মানুষকেই বুঝায় না, বুঝায় সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষকেও। মানুষের এই যে সংস্কৃতি, তাহা উচ্চ বা নীচ বা অন্য কিছু হইতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ সংস্কৃতি-বিহীন মানুষের অস্তিত্ব ভূগোল-বিজ্ঞানে স্বীকৃত হয় না। এই যে মানুষ, ইহারই বৈষয়িক জীবনযাত্রার আর যে পরিবেশে সেই জীবনযাত্রা নির্বাহিত হয় তাহার মধ্যে অবিরাম কার্যকারণ-সম্বন্ধের যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিতেছে, তাহার স্বরূপ উদ্ঘাটন করাই বৈষয়িক বা অর্থনৈতিক ভূগোলের যথার্থ কাজ। তাই অর্থনৈতিক ভূগোল একটি গতিশীল (dynamic) শাস্ত্র। এই শাস্ত্রের প্রাণকেন্দ্র হইল মানুষ। স্থানগত প্রাকৃতিক অবস্থানিচয়কে স্বীয় আয়ত্তে আনিয়া সামগ্রিক মঙ্গলের জন্য দ্রব্যসম্ভারের উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের যে সুপরিকল্পিত প্রয়াস তাহারই অনুশীলন এই শাস্ত্রের বিষয়বস্তু। এই দিক হইতে বিচার করিলে অর্থনৈতিক ভূগোলকে সমাজ-বিজ্ঞানের একটি বিশিষ্ট এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ শাখা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

অনুশীলন-ক্ষেত্র (Scope)—ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ মানবজাতির যে সমস্ত প্রধান প্রধান বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবান্বিত করে তাহাদের বিভিন্নতা হিসাবে অর্থনৈতিক ভূগোলের অনুশীলন চারি শ্রেণীতে বিভক্ত।

(১) ভূমি বা জলভাগ হইতে দ্রব্যাদি উৎপাদন করা মানুষের সর্বপ্রধান বৃত্তি। এই উৎপাদনকে মুখ্য বা **প্রাথমিক উৎপাদন** (Primary production) বলা হয়। প্রাথমিক উৎপাদন আবার পাঁচ প্রকারের—(ক) কৃষিজ উৎপাদন, (খ) মৎস্য উৎপাদন, (গ) খনিজ উৎপাদন, (ঘ) বনজ উৎপাদন এবং (ঙ) শিকার-বৃত্তি হইতে উৎপাদন। পৃথিবীর বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত কাঁচামাল এবং জনসাধারণের ভোগে ব্যবহৃত খাদ্যদ্রব্য প্রাথমিক উৎপাদনের সাহায্যেই সংগৃহীত হয়। প্রাথমিক উৎপাদন বন্ধ হইলে পৃথিবীর সর্বপ্রকার বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হইয়া যাইবে।

(২) প্রাথমিক উৎপাদনের দ্বারা আহৃত দ্রব্যাদি প্রায়শঃই উৎপাদন-ক্ষেত্রে ভোগ করা যায় না। সেই কারণে উৎপাদনকেন্দ্র হইতে ভোগকেন্দ্রে এই সমস্ত দ্রব্যাদি **পরিবহন** (Transport) করা প্রয়োজন। অতএব প্রাথমিক উৎপাদনের পরেই পরিবহনের স্থান।

(৩) আবার প্রাথমিক উৎপাদন দ্বারা আহৃত দ্রব্যসমূহ ভোগকেন্দ্রে পরিবাহিত হইবার পরও অনেক ক্ষেত্রে রূপান্তরিত না হইলে ভোগ করা সম্ভব হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, চাষের ক্ষেত্র হইতে আহৃত ধান ভোগকেন্দ্রে পরিবাহিত হইবার পরও চাউলে রূপান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত ভোগ করা সম্ভব হইয়া উঠে না। প্রাথমিক উৎপাদন দ্বারা আহৃত দ্রব্যাদির এই রূপান্তরীকরণকে **গৌণ উৎপাদন** (Secondary production) বা **যন্ত্রশিল্প** বলা হয়।

(৪) প্রাথমিক ও গৌণ উৎপাদন দ্বারা লব্ধ দ্রব্যাদি আভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক ভোগের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দ্রব্যাদির ব্যাপক ভোগ বা ব্যবহারই **বাণিজ্যের** (Trade) সূচক।

প্রাথমিক উৎপাদন, পরিবহন, গৌণ উৎপাদন ও বাণিজ্য—এই চারিটিই মানুষের অর্থনৈতিক বৃত্তি। মানুষের পরিবেশের সহিত এই বৃত্তিগুলির যে কার্যকারণ-সম্বন্ধ রহিয়াছে. তাহার স্বরূপ বিশ্লেষণ করাই অর্থনৈতিক ভূগোলের মূল উদ্দেশ্য।

অনুশীলনের পদ্ধতি (Methods of study)—অর্থনৈতিক ভূগোল অনুশীলনের জন্য সাধারণতঃ দুইটি পদ্ধতি অনুসৃত হইয়া থাকে। ইহাদের একটিকে **বিষয়ানুগ পদ্ধতি** (topical approach) এবং অপরটিকে **আঞ্চলিক পদ্ধতি** (regional approach) বলা হয়। বিষয়ানুগ পদ্ধতি অনুসারে

যে কোন একটি আর্থিক ক্রিয়াকলাপ, যেমন প্রাথমিক উৎপাদন, পরিবহন, যন্ত্রশিল্প প্রভৃতি, স্বতন্ত্রভাবে পৃথিবীর কোন্ কোন্ স্থানে কি কি ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রভাবে কিভাবে বিকাশলাভ করিয়াছে তাহার বিশদ আলোচনা করা হয়। আর, আঞ্চলিক পদ্ধতি অনুসারে পৃথিবীর কোন একটি অঞ্চলকে স্বতন্ত্র ভাবে লইয়া উহার পরিবেশ ও আর্থিক অবস্থার মধ্যে যে কার্যকারণের পারস্পরিক সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহারই বিশদ আলোচনা করা, হয়। বর্তমান পুস্তকে প্রধানতঃ বিষয়ানুগ পদ্ধতিই অনুসৃত হইবে।

ভূগোল শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখা (**Different branches of Geography**)—প্রত্যেকটি শাস্ত্রকেই অন্যান্য নানা শাস্ত্র হইতে বহু তথ্য সংগ্রহ করিতে হয়, ভূগোলও ইহার ব্যতিক্রমস্থল নহে—ইহাকেও ভূতত্ত্ব, আবহবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, সামুদ্রবিদ্যা, সমাজবিদ্যা, ধর্মবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি অন্যান্য বহু শাস্ত্র হইতে নানা তথ্য সংগ্রহ করিতে হয়। কিন্তু তাই বলিয়া ভূগোল এই সব শাস্ত্রের সার-সঙ্কলন নয়। অন্যান্য শাস্ত্রের মতো ভূগোলেরও একটি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আছে। সেই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিতেই ভূগোলে বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত তথ্যাদির বিচার হইয়া থাকে। ভূগোলের এই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষ ও তাহার পরিবেশ কার্যকারণ-সম্বন্ধের পারস্পরিক সূত্রে আবদ্ধ।

ভূগোল শাস্ত্রকে অন্যান্য বহুবিধ শাস্ত্র হইতে নানা তথ্য সংগ্রহ করিতে হয় বলিয়া ইহাকে প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। যথা—(১) **গাণিতিক ভূগোল** (Mathematical Geography)—মহাশূন্যে পৃথিবীর অবস্থান, ইহার আকার ও আয়তন, আবর্তন ও পরিক্রমণ, অক্ষাংশ ও দেশান্তরে ভূপৃষ্ঠের বিভাগ প্রভৃতিই ইহার আলোচ্য বিষয়বস্তু। (২) **প্রাকৃতিক ভূগোল** (Physical Geography)—ভূপৃষ্ঠের গঠন ও উচ্চাবচতা, স্থল ও জলভাগের বণ্টন, জলবায়ু, সমুদ্রস্রোত, মৃত্তিকা, খনিজ সম্পদ, প্রভৃতিই ইহার প্রধান আলোচ্য বিষয়বস্তু। (৩) **রাজনৈতিক ভূগোল** (Political Geography)—দেশ ও মহাদেশে ভূপৃষ্ঠের বিভাগ, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও মহাদেশের অধিবাসী, তাহাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা, আচার-ব্যবহার, উপজীবিকা প্রভৃতিই ইহার প্রধান আলোচ্য বিষয়বস্তু। (৪) **অর্থনৈতিক ভূগোল** (Economic Geography)—দেশগত ধনসম্পদের উৎপাদন, উহাদের বণ্টন, পরিবহন ও ভোগ প্রভৃতিই হইল এই শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়বস্তু। তবে অর্থনৈতিক ভূগোল বৃহত্তর ভূগোলের অংশবিশেষ হইলেও প্রাকৃতিক ভূগোল, রাজনৈতিক ভূগোল এবং গাণিতিক ভূগোলের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল—কোন কোন ভৌগোলিক

অর্থনৈতিক ভূগোল (Economic Geography) ও বাণিজ্যিক ভূগোল (Commercial Geography) বলিয়া দুইটি পৃথক্ শাস্ত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে পরিবেশের সহিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়া কি ভাবে মানুষের অর্থনৈতিক জীবন গড়িয়া উঠে তাহারই অনুশীলন অর্থনৈতিক ভূগোলের বিষয়বস্তু, আর বাণিজ্যিক ভূগোল হইতেছে এই ভাবে মানুষের বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপের তত্ত্ববিচার। তবে এইরূপ বিভাগ বিজ্ঞানসম্মত নহে; কারণ অর্থনৈতিক ভূগোলের প্রসার বাণিজ্যিক ভূগোলের প্রসার অপেক্ষা ব্যাপকতর এবং মানুষের পরিবেশ ও তাহার বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যে কার্যকারণ সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহার তত্ত্ববিচারও অর্থনৈতিক ভূগোলের অঙ্গীভূত।

প্রশ্নোত্তর

1. Define Economic Geography. Indicate the importance and the scope of the subject. (অর্থনৈতিক ভূগোল কাহাকে বলে? এই শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা এবং অনুশীলনক্ষেত্র নির্দেশ কর।) (পৃঃ ১—৩)

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানুষ ও তাহার পরিবেশ

(Man and His Environment)

মানুষ ও তাহার পরিবেশের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধ বর্তমান। পরিবেশের পার্থক্যের দরুন মানুষ কোথাও কৃষিজীবী, কোথাও পশুপালক, কোথাও শিকারী আবার কোথাও বা যাযাবর। কিন্তু ইহাও সত্য যে বর্তমান সভ্য মানুষ পরিবেশের (environment) দাস নহে। পরিবেশ মানুষের উপর শুধু প্রভাবই বিস্তার করে, তাহার জীবনযাত্রাকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। পরিবেশের প্রভাবে মানুষের মধ্যে যে কর্ম-প্রচেষ্টার উদ্ভব হয়, তাহার ফলে পরিবেশে ঘটে রূপান্তর, এই রূপান্তরিত পরিবেশ আবার নূতন করিয়া তাহার জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, আর তাহারই ফলে তাহার মধ্যে জাগে নবতর কর্মপ্রচেষ্টা, এবং সেই কর্ম-প্রচেষ্টার প্রভাবে পরিবেশেও ঘটে নবতর পরিবর্তন। মানুষের সহিত তাহার পরিবেশের সম্বন্ধ তাই স্থিতিশীল (static) নয়, নিয়তই গতিশীল (dynamic)।

পরিবেশের প্রকারভেদ—পরিবেশ দ্বিবিধ—**প্রাকৃতিক** (**Physical environment**) ও **সাংস্কৃতিক** (**Non-Physical** বা **Cultural environment**)। ভূপৃষ্ঠে স্থানবিশেষের ভৌগোলিক অবস্থান, সৈকতরেখা, আকার, আয়তন ও উহার ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, মৃত্তিকা, খনিজ সম্পদ, আভ্যন্তরীণ জলভাগ, সমুদ্রস্রোত, উদ্ভিজ্জ ও জৈব প্রকৃতি প্রভৃতি হইল প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান। প্রবংশ, ধর্ম, রাষ্ট্রতন্ত্র, জনসংখ্যা প্রভৃতিকে বলে সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপাদান।

পরিবেশ-সম্পর্কিত আলোচনার সময় ইহা সর্বদা মনে রাখা প্রয়োজন যে মানুষের বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপের উপর ইহাদের যে প্রভাব তাহা ব্যষ্টিগত নহে, সমষ্টিগত। পরিবেশের উপাদানগুলি প্রকৃতপক্ষে **সামগ্রিক ভাবেই** কার্যকরী হয়, ইহারা পৃথকভাবে কাজ করে না; কারণ স্বতন্ত্র সত্তা বলিয়া ইহাদের কিছুই নাই। স্থানীয় ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, মৃত্তিকা প্রভৃতি পরিবেশের এক একটি উপাদানের সহিত অন্য উপাদানগুলি অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে সংযুক্ত—অবিচ্ছেদ্যসূত্রে একত্রে গ্রথিত।

প্রাকৃতিক পরিবেশ (Physical Environment)

(১) ভৌগোলিক অবস্থান (Geographical location)

ভূপৃষ্ঠের প্রত্যেকটি স্থানেরই এক একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থান রহিয়াছে; গাণিতিক ভূগোলের ভাষায় এই অবস্থান অক্ষাংশ ও দেশান্তর দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু বৈষয়িক দৃষ্টিতে নানা প্রকার সুবিধা অসুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে ভৌগোলিক অবস্থানকে প্রধানতঃ **মহাদেশীয়** (Continental), **সমুদ্রপ্রান্তিক** (Littoral), **দ্বৈপ** (Insular) এবং **উপদ্বীপীয়** (Peninsular) এই চারি ভাগে বিভক্ত করা হয়। অবশ্য এ সমস্তই আপেক্ষিক প্রত্যয়; কারণ একই ক্ষেত্রের অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে এশিয়া মহাদেশের দিক হইতে বিচার করিলে ভারতের অবস্থান সমুদ্রপ্রান্তিক আবার আকারের দিক হইতে বিচার করিলে ভারতের অবস্থান প্রায় উপদ্বীপীয়। এইরূপ প্রায় যে কোন দেশের অবস্থানই পৃথক্ পৃথক্ দৃষ্টিতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রতিভাত হইতে পারে।

অর্থনৈতিক জীবনে ভৌগোলিক অবস্থানের প্রভাব (Influence of Geographical location on man's economic life)—কোন অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক জীবনকে নানাভাবে প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে। **প্রথমতঃ,** কোন দেশের **জলবায়ু** নির্ভর করে প্রধানতঃ তাহার অবস্থানের উপর। নিরক্ষবৃত্তের নিকটে এবং মেরু প্রদেশে একই প্রকারের জলবায়ু অনুভূত হয় না। জলবায়ু আবার স্থানীয় মৃত্তিকা ও উদ্ভিজ্জ প্রকৃতির উপর সুস্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে; আবার উদ্ভিজ্জ প্রকৃতিই বহুলাংশে জৈব প্রকৃতির নিয়ামক। এই সমস্তই মানবজীবনের উপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে। আবার আঞ্চলিক জলবায়ুর তারতম্য অনুসারে অধিবাসীদের কর্মশক্তি ও কর্মপদ্ধতি বহুলাংশে নিরূপিত হয়। উত্তর গোলার্ধের $\frac{৪}{৫}$ অংশ ভূমিভাগই নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর প্রভাবে শ্রমশিল্পে ও বাণিজ্যে উন্নতিশীল কিন্তু দক্ষিণ গোলার্ধের $\frac{৪}{৫}$ অংশ ভূমিভাগই উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর প্রভাবে শ্রমশিল্পে ও বাণিজ্যে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত।

দ্বিতীয়তঃ, দেশবিশেষের ভৌগোলিক অবস্থান তথাকার **ব্যবসা-বাণিজ্য** সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপকে বহুলাংশে প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে। মহাদেশীয় অবস্থানবশতঃ তুর্কীস্তান, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশ জলপথে দূর-দূরান্তরের সহিত বাণিজ্যিক সংযোগ স্থাপনে অসমর্থ। অপরপক্ষে সমুদ্রপ্রান্তিক অবস্থানবশতঃ নরওয়ে, সুইডেন, প্রভৃতি দেশের অধিবাসীরা সহজেই জলপথে

দূর-দূরান্তরের সহিত বাণিজ্যিক সংযোগ স্থাপনে সক্ষম হয়। এইরূপ দ্বৈপ অবস্থানবশতঃ জাপান ও ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ এবং উপদ্বীপীয় অবস্থানবশতঃ ভারত, ইতালী প্রভৃতি দেশের অধিবাসীদের পক্ষে বাণিজ্যে উৎকর্ষ লাভ সহজ ও স্বাভাবিক। তবে একথাও সর্বদা মনে রাখা প্রয়োজন যে মানবিক জগতে প্রত্যেক ক্ষেত্রেরই অবস্থান গতিশীল। অবস্থানের এই গতিশীলতার পরিপ্রেক্ষিতেই মানব জীবনের উপর ইহার প্রভাব বিচার করা প্রয়োজন। সোভিয়েট রুশিয়ার অবস্থান মহাদেশীয়, আবার এশিয়ার তুর্কীস্তান, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশের অবস্থানও মহাদেশীয়। কিন্তু এই সমস্ত দেশের পারস্পরিক অবস্থার কোন তুলনাই হয় না। আবার নৌবিদ্যায় উন্নতিশীল নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি দেশের অবস্থান সমুদ্রপ্রান্তিক কিন্তু কোচিন-চীন, কোরিয়া প্রভৃতি দেশের অবস্থান সমুদ্রপ্রান্তিক হইলেও এই দেশগুলি নৌবিদ্যায় সেরূপ পারদর্শী নহে।

তৃতীয়তঃ, রাজনৈতিক দিক হইতেও ভৌগোলিক অবস্থানের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। দ্বৈপ অবস্থানবশতঃ ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের যে স্বাভাবিক **রাজনৈতিক নিরাপত্তা** রহিয়াছে, মহাদেশীয় অবস্থানবশতঃ চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, অষ্ট্রিয়া, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের পক্ষে তাহা বাস্তবিকই ঈর্ষার বস্তু।

বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপের পক্ষে অনুকূল ভৌগোলিক অবস্থান (Geographical location favourable to economic activities)—কোন দেশের ভৌগোলিক অবস্থান যদি এইরূপ হয় যে দেশটির **সীমান্তরেখা** পাহাড় পর্বত, সাগর, মরু, নদী বা জলাভূমির দ্বারা স্বাভাবিক ভাবেই সুনির্দিষ্ট ও সুরক্ষিত, উহার **জলবায়ু** মৃদুভাবাপন্ন, দেশটি পৃথিবীর অন্যান্য উন্নতিশীল দেশসমূহের **কেন্দ্রস্থলে** অবস্থিত এবং দেশটির চতুষ্পার্শ্বস্থ ঐ সমস্ত দেশের সহিত অনুকূল সাংস্কৃতিক ও আর্থিক **যোগসূত্রে** আবদ্ধ তবেই ঐ দেশের অবস্থানকে উহার বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপের পক্ষে অনুকূল বলা যাইতে পারে।

দেশের **সীমান্তরেখা** প্রাকৃতিক অবস্থানিচয়ের দ্বারা স্বাভাবিক ভাবে সুনির্দিষ্ট ও সুরক্ষিত হইলে দেশটির রাজনৈতিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায়, দেশের অধিবাসীরা জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয় এবং দেশটির আর্থিক জীবনও স্থিতিশীল হইয়া থাকে। অপরপক্ষে, দেশের সীমান্তরেখা কৃত্রিম উপায়ে নির্দিষ্ট হইলে দেশের রাজনৈতিক নিরাপত্তা ও আর্থিক স্থিতিশীলতা বিশেষ ভাবে ব্যাহত হইয়া থাকে।

দেশের অবস্থান যদি **স্থলগোলার্ধের কেন্দ্রস্থলে** হয় তাহা হইলে সাধারণতঃ দেশটির ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় এবং আর্থিক ক্ষেত্রে দেশটি দ্রুত উন্নতিলাভ করিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে ব্রিটেন পৃথিবীর স্থলগোলার্ধের কেন্দ্রে অবস্থিত হওয়ায় পৃথিবীর বাণিজ্যপ্রধান কোন

অঞ্চলই ব্রিটেন হইতে অধিক দূরে অবস্থিত নহে এবং দেশটি উপযুক্ত বাণিজ্য-পথের দ্বারা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরের অন্তর্গত জাপানের অবস্থানটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এশিয়া ও আমেরিকার অন্তর্বর্তী প্রধান প্রধান সামুদ্রিক বাণিজ্যপথের প্রান্তে দেশটির অবস্থান ইহার ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইয়াছে।

দেশগত ভৌগোলিক অবস্থান যদি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক **সংযোগ স্থাপনের প্রেরণা** দেয় তবে বৈষয়িক ক্ষেত্রে দেশটি দ্রুত উন্নতিলাভ করিতে সক্ষম হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে নিকটবর্তী শিল্পপ্রধান দেশসমূহের সহিত সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সংযোগ সাধিত হওয়ায় ইতালীর সমাজজীবনে যে শিল্পচেতনা, উৎসাহ ও কারিগরী বিদ্যার প্রসারলাভ ঘটে তাহারই ফলে অতি অল্পকালের মধ্যেই দেশটি শিল্পবাণিজ্যে দ্রুত উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হয়। অপর পক্ষে, নানাবিধ প্রতিকূল পরিবেশের প্রভাবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত সাংস্কৃতিক সংযোগ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকায় চীন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্তও আর্থিক ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই।

ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান-এর প্রভাব (Influence of geographical location of India)—ভারতের ভৌগোলিক অবস্থানটি বিশেষ লক্ষণীয়। ৮°৪′ উঃ অক্ষাংশ হইতে ৩৭°৬′ উঃ অক্ষাংশ এবং ৯৭°২৫′ পুঃ দেশান্তর হইতে ৬৮°৭′ পূঃ দেশান্তর দ্বারা আবদ্ধ ভারত পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্র প্রতিরূপ। ২৩½° উঃ অঃ ভারতকে উত্তর-দক্ষিণে এবং ৮২½° পুঃ দেঃ পূর্ব-পশ্চিমে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছে। উত্তর-দক্ষিণে দেশটির দৈর্ঘ্য ৩২১৯ কি.মি. এবং পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তার ২৯৭৭ কি.মি.।

সমগ্রভাবে দেখিতে গেলে ভারত প্রাচ্য জগতের কেন্দ্রস্থলে এবং ভারত মহাসাগরের উত্তর তীরে অবস্থিত। আরব সাগর, বঙ্গোপসাগর এবং ভারত মহাসাগর দেশটিকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংযোগসূত্রের মধ্যভাগে স্থাপন করিয়াছে। প্রাচীনকালে সমুদ্রপথে ভারত কর্তৃক ব্যবসায়-বাণিজ্য ও উপনিবেশ বিস্তারের অন্যতম কারণ ছিল তৎকালীন সভ্যজগতের কেন্দ্রভাগে ভারতের এই স্বাভাবিক অবস্থান।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিলে বর্তমানকালেও **ভারতের** এই **অবস্থানের গুরুত্ব** উপলব্ধি করা যাইবে। **প্রথমতঃ,** পূর্ব-গোলার্ধের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হওয়ায় যে কোন অঞ্চলের সহিত ভারতের পক্ষে সহজে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হইয়াছে। **দ্বিতীয়তঃ,** ভারত মহাসাগরের শীর্ষে অবস্থিত থাকায় ভারতের পক্ষে সমুদ্রপথে বাণিজ্য করার বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে। **তৃতীয়তঃ,** পূর্ব-গোলার্ধের কেন্দ্রভাগে অবস্থান এবং ভারত

মহাসাগরের উপর অধিকার স্থাপনের সুযোগ ভারতীয় অবস্থানের সামরিক গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে। **চতুর্থতঃ,** উত্তর-গোলার্ধে অবস্থান হেতু উত্তর-গোলার্ধের অন্যান্য দেশগুলির সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা ভারতের পক্ষে সহজ হইয়াছে। **পঞ্চমতঃ,** উত্তরে দুর্লঙ্ঘ্য হিমালয় পর্বত-প্রাচীর, পশ্চিমে আরব সাগর, পূর্বে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় ভারতের সীমান্ত রেখা স্বাভাবিকভাবেই সুনির্দিষ্ট ও সুরক্ষিত হইয়াছে ; ফলে ভারতের রাজনৈতিক নিরাপত্তাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবশ্য বর্তমানে পশ্চিমে পশ্চিম-পাকিস্তান ও পূর্বে পূর্ব-পাকিস্তানের সহিত ভারতের সীমান্ত রেখা কৃত্রিম। **ষষ্ঠতঃ,** রাষ্ট্রটির দক্ষিণার্ধ উষ্ণ মণ্ডলে এবং উত্তরার্ধ উপক্রান্তীয় মণ্ডলে অবস্থিত হওয়ায় দেশটি কৃষিজাত নানাবিধ দ্রব্য উৎপাদনে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতের জলবায়ুও বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপের পরিপন্থী নহে।

(২) সৈকত রেখা (Coastline)

অর্থনৈতিক জীবনে সৈকতরেখার প্রভাব (Influence of coastline on man's economic life)—কোন দেশের সৈকতরেখা সেই দেশের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। সৈকতরেখা সরল, উচ্চ, নিম্ন অথবা ভগ্ন প্রভৃতি নানা প্রকারের হইতে পারে, তবে দেশগত বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে তীরভূমি ভগ্ন, নিম্ন, গভীর, সুবিস্তৃত ও তরঙ্গক্ষেপ হইতে সুরক্ষিত হইলে **বন্দর** ও **পোতাশ্রয়** গঠন সহজ হইয়া উঠে এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুবিধা হয়। কিন্তু নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি দেশের তটভূমি ভগ্ন হইলেও তটদেশ পর্বতময় বলিয়া তথায় উল্লেখযোগ্য বন্দরের উৎপত্তি হয় নাই। ব্রিটেনের সৈকতরেখা অতিশয় ভগ্ন, দেশটির কোন স্থানই সমুদ্রোপকূল হইতে একশত মাইলের অধিক দূরবর্তী নহে। দেশটির সৈকতরেখা ভগ্ন, নিম্ন, গভীর এবং দেশাভ্যন্তরে বহুদূর পর্যন্ত নাব্য অবস্থায় অনুপ্রবিষ্ট থাকায় দেশটিতে বহু স্বাভাবিক বন্দর ও পোতাশ্রয় রহিয়াছে। এই কারণেই **নৌবিদ্যায়** পারদর্শী ব্রিটিশ জাতি অতি প্রাচীন কাল হইতেই সমুদ্রপথে দূর-দূরান্তরের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিল। আবার বাণিজ্যের এই স্বাভাবিক সুবিধার জন্য ব্রিটেনের শ্রমশিল্পজাত দ্রব্যাদি বিদেশে প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হওয়ায় দেশটিতে **শ্রমশিল্পের** ব্যাপক প্রসার ঘটিয়াছে। অপর পক্ষে, ভারত, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের ন্যায় তীরভূমি অভগ্ন হইলে বন্দর ও পোতাশ্রয় গঠন কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে এবং দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য ব্যাহত হইয়া থাকে।

ভারতের সৈকতরেখার প্রভাব (Influence of coastline of

India)—ভারতের তটরেখার দৈর্ঘ্য মাত্র ৫৬৮৯ কি. মি. অর্থাৎ আয়তনের তুলনায় (আয়তন ৩২,৭৬,১৪১ বর্গ কি.মি.) প্রায় প্রতি ৬০০ কি.মি.তে ১ কি.মি. মাত্র। ভারতের এই উপকূল ভাগ প্রায় অভগ্ন। পশ্চিম উপকূলের নিকট দিয়া পশ্চিমঘাট পর্বতমালা বিস্তৃত, উপকূল সংকীর্ণ, উপকূল সংলগ্ন সমুদ্র সাধারণতঃ অগভীর এবং ইহার অনেকাংশ বালুকাময় সেইজন্য এ অঞ্চলে পোতাশ্রয় ও বন্দর নির্মাণ কষ্টকর। তবে এই উপকূলে কাণ্ডলা, বোম্বাই, গোয়া ও কোচিন এই চারিটি স্বাভাবিক বন্দর রহিয়াছে। আবার কাণ্ডলা, বোম্বাই ও গোয়া ব্যতীত এই উপকূলাঞ্চলের অন্যান্য বন্দর মে হইতে আগস্ট মাস পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু-প্রবাহের সময় বন্ধ থাকে। পূর্ব উপকূল সংলগ্ন সমুদ্র অত্যন্ত অগভীর ও তরঙ্গসংকুল হওয়ায় পূর্ব উপকূলে স্বাভাবিক বন্দর ও পোতাশ্রয়ের সংখ্যা অতি সামান্য। পূর্ব উপকূলের মাদ্রাজ বন্দরের পোতাশ্রয় কৃত্রিম এবং কলিকাতা বন্দরের পোতাশ্রয় অত্যন্ত অগভীর। আবার ভারতের সৈকতরেখা ভগ্ন নহে বলিয়া সমুদ্র দেশের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করে নাই, ফলে ভারতের অভ্যন্তরস্থিত রাজ্যগুলি সমুদ্রতীরের বা সমুদ্রপথের বিশেষ সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করিতে পারে না।

(৩) আয়তন (Size)

অর্থনৈতিক জীবনে দেশগত আয়তন-এর প্রভাব (Influence of size of a country on man's economic life)—দেশের আয়তন ক্ষুদ্র এবং জনসংখ্যা অধিক হইলে (যেমন ইংল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, জাপান প্রভৃতি দেশ) কৃষিজমির স্বল্পতাহেতু কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনের দ্বারা দেশগত চাহিদা মিটান সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় ঐরূপ দেশে সযত্ন কৃষি পদ্ধতি অনুসৃত হয় এবং শ্রমশিল্প ও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। অপর পক্ষে বৃহদায়তন দেশে (যেমন রুশিয়া) রেলপথ ও রাজপথ বিস্তারের, একচ্ছত্র শাসনের এবং শ্রমশিল্প ও কৃষিকার্যের উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আবার দেশের আয়তন বৃহৎ এবং জনসংখ্যা অধিক হইলে (যেমন চীন, ভারত ইত্যাদি) যন্ত্রশিল্প ও কৃষিকার্য উভয়ই প্রসার লাভ করে এবং ক্ষেত্র-বিশেষে যে স্থানে উৎপাদিত সামগ্রীর অধিকাংশই দেশাভ্যন্তরে জনসাধারণের চাহিদা মিটাইতে ব্যয়িত হইয়া যায়, তথায় বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। বিরল বসতিযুক্ত বৃহদায়তন দেশসমূহে (যেমন অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি) পশুচারণ শিল্পের প্রসার দেখিতে পাওয়া যায়।

(৪) আকার (Form)

অর্থনৈতিক জীবনে দেশগত আকার-এর প্রভাব (Influence of form of a country on man's economic life)—দেশের

আকার ও প্রকৃতি সুসংবদ্ধ (compact) হইলে (যেরূপ ভারত, চীন; রুশিয়া প্রভৃতি) দেশে রেলপথ, বাণিজ্য, শ্রমশিল্প ও বসতি বিস্তারের, একচ্ছত্র শাসনের এবং সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের সুযোগ ঘটে। কিন্তু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ লইয়া গঠিত (fragmented) দেশের (যেমন গ্রীস, পাকিস্তান) আর্থিক উন্নতি ও রাজনৈতিক নিরাপত্তা ব্যাহত হয়। আবার অনেক দৈর্ঘ্য ও অল্প বিস্তার যুক্ত সংকীর্ণ (attenuated) দেশে (যেমন চিলি) কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার অল্প।

(৫) ভূপ্রকৃতি (Topography)

অর্থনৈতিক জীবনে ভূ-প্রকৃতির প্রভাব (**Influence of topography** *or* **land forms on man's economic life**)—ভূপৃষ্ঠ বন্ধুর। ইহার কোন অংশ পর্বতময়, কোন অংশ সমতল, কোথাও মালভূমি, আবার কোথাও ভূমিভাগ সমুদ্রতল হইতে নিম্নে অবস্থিত। ভূ-প্রকৃতি যে কেবল জলবায়ু এবং উদ্ভিজ্জ জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া পরোক্ষভাবে মানবের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবান্বিত করে তাহাই নহে, পরন্তু ভূ-প্রকৃতি মানবজীবনের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রাকৃতিক সীমারেখা নির্ধারণ করিয়া দেয়। ভূ-প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভাব অতি সামান্যই। তাহাকে ভূ-প্রকৃতির সহিত সর্বদাই অভিযোজন (adaptation) সাধন করিয়া চলিতে হয়।

পার্বত্য অঞ্চলে ভূপ্রকৃতির বন্ধুরতা, ভূমিক্ষয়, মৃত্তিকার অনুর্বরতা এবং সমতল কৃষিভূমির স্বল্পতাহেতু **কৃষিকার্য** এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। তথাপি কোন কোন স্থলে, পর্বতগাত্রে থাক কাটিয়া সামান্য চাষ-আবাদ করা হয়। এতদঞ্চলে **যানবাহন** চলাচলেরও বিশেষ অসুবিধা রহিয়াছে। ভূ-প্রকৃতির বন্ধুরতা হেতু পার্বত্য নদীসমূহ খরস্রোতা—নাব্য নহে। রেলপথ এবং আধুনিক ধরণের হাঁটাপথ নির্মাণও কষ্টকর এবং ব্যয়সাধ্য। পার্বত্য অঞ্চলে **লোকবসতি** বিরল। অধিবাসীরা দরিদ্র এবং অনুন্নত। বিরল লোকবসতি, নিপুণ শ্রমিকের অভাব, উৎপন্ন দ্রব্য এবং চাহিদার স্বল্পতা, পরিবহনের অসুবিধা প্রভৃতি বিষয়গুলি পার্বত্য অঞ্চলে **শিল্প ও বাণিজ্যের** প্রসারকে ব্যাহত করে।

তবে বর্তমান মানব সভ্যতার পরিপোষণে পার্বত্যভূমির অবদানও নিতান্ত সামান্য নহে। পার্বত্য অঞ্চলে পৃথিবীর অধিকাংশ **বনভূমি** অবস্থিত। এই কারণে পৃথিবীর অধিকাংশ পর্বতাঞ্চলই অরণ্য সম্পদে সমৃদ্ধ। পর্বত-সানুদেশে তৃণভূমি অঞ্চলে নানাপ্রকার **পশু-পালন** এবং মধ্যবর্তী বনাঞ্চলে **পশু-শিকারের** যে সুযোগ রহিয়াছে পৃথিবীর অন্যত্র তাহা দুর্লভ।

খনিজদ্রব্য-সমৃদ্ধ পার্বত্য অঞ্চলে **খনিজ শিল্পের** প্রসার দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, রুশিয়া প্রভৃতি দেশের বহু পার্বত্য অঞ্চল খনিজ দ্রব্যের প্রাচুর্যহেতু জনবহুল শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। স্রোতস্বতী নদী ও জলপ্রবাহ অবলম্বন করিয়া পার্বত্য অঞ্চলে এক্ষণে **জলবিদ্যুৎ** উৎপাদন করা হইতেছে এবং এই জলবিদ্যুৎকে অবলম্বন করিয়া কোন কোন পার্বত্য অঞ্চলে সমৃদ্ধ শিল্পাঞ্চলেরও পত্তন হইয়াছে। পর্বতশ্রেণী বায়ুপ্রবাহের গতিপথে বাধাস্বরূপ হইয়া **বৃষ্টিপাতের** স্থান ও পরিমাণ নিরূপণ করে আবার কখনও কখনও শীতল ও শুষ্ক বায়ুর গতিরোধ করিয়া দেশকে রক্ষাও করে। পর্বতশৃঙ্গ হইতে দুর্বার বেগে পলিমাটি লইয়া **নদী** সমভূমির দিকে নামিয়া আসে এবং সমভূমিকে উর্বর করিয়া তোলে। পৃথিবীর অধিকাংশ নদনদীর উৎস হইল এই পার্বত্যভূমি। বহুক্ষেত্রে পর্বত-শ্রেণী দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ন্যায় দেশকে **বহিরাক্রমণ** হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। আবার বহু পার্বত্য অঞ্চলে মনোরম **শৈলাবাসও** গড়িয়া উঠে।

পৃথিবীর সমস্ত মালভূমি অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি সমশ্রেণীর নহে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন **মালভূমি অঞ্চলে** মানুষের কর্মতৎপরতারও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। মালভূমি অঞ্চলের মৃত্তিকা সমভূমি অঞ্চলের মৃত্তিকা অপেক্ষা অনুর্বর হওয়ায় ঐ সমস্ত অঞ্চলে **কৃষিকার্যের** বিশেষ প্রসার পরিলক্ষিত হয় না; তবে জলবায়ু অনুকূল হইলে অপেক্ষাকৃত সমতল মালভূমি অঞ্চলে কৃষিকার্য পরিচালিত হইতে পারে। মালভূমির বিস্তীর্ণ অংশ তৃণাচ্ছাদিত থাকিলে তথায় **পশুচারণ** শিল্পের প্রসার ঘটে। বহুক্ষেত্রে মালভূমি অঞ্চলগুলিকে **খনিজ** দ্রব্যে সমৃদ্ধ হইতে দেখা যায়, এইরূপ অঞ্চলে খনিজ শিল্পের প্রসার ঘটিয়া থাকে। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার মালভূমি অঞ্চলে দস্তা, সীসক ও স্বর্ণ প্রচুর পাওয়া যায় বলিয়া এতদঞ্চলে খনিজ শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে। উষ্ণমণ্ডলের অন্তর্গত মালভূমি অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত শীতল ও স্বাস্থ্যপ্রদ জলবায়ু ঐগুলিকে মনুষ্যবাসের উপযোগী করিয়া তুলিতেছে। এই কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার সম্মেলনে ইউরোপীয় অধিবাসীদের **বসতি**-ঘনত্ব নিবিড়। অবশ্য তিব্বতের ন্যায় উচ্চ মালভূমিসমূহে পরিবেশের প্রতিকূলতাহেতু লোকবসতি বিরল। সমভূমি অঞ্চলের ন্যায় মালভূমি অঞ্চলে **পরিবহন** ব্যবস্থার প্রসার ততটা সহজসাধ্য না হইলেও নাতিউচ্চ মালভূমি অঞ্চলসমূহে পরিবহন ব্যবস্থা সম্যক প্রসার লাভ করিয়াছে। তবে স্থূল কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে মালভূমি অঞ্চলসমূহে মানুষের আর্থিক অবস্থা ততটা সচ্ছল নহে।

সমভূমি অঞ্চলে কৃষিকার্যই জনসাধারণের প্রধান উপজীবিকা। পরিমিত বৃষ্টিপাত না হইলেও কৃত্রিম সেচব্যবস্থার সাহায্যে উর্বর সমভূমিতে

প্রচুর শস্য উৎপাদন করা যায়। এই কারণে পরিমিত উত্তাপ ও জমির উর্বরাশক্তিসমন্বিত সমভূমি অঞ্চলসমূহেই পৃথিবীর প্রধান প্রধান কৃষিবলয়গুলি অবস্থিত রহিয়াছে। এতদঞ্চলের **পরিবহন**-ব্যবস্থা উন্নত ধরণের বলিয়া ভাব-বিনিময়ও সহজ। পৃথিবীর শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ রেলপথই সমভূমি অঞ্চলে অবস্থিত। সমভূমি অঞ্চলের নদীগুলিও সুনাব্য। সমগ্র পৃথিবীর শতকরা ৯০ ভাগ লোক সমভূমি অঞ্চলেই **বসতি** স্থাপন করিয়াছে। কারণ প্রাকৃতিক সুযোগ-সুবিধাহেতু সমভূমি অঞ্চলেই মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কলাপ সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হয়। প্রাথমিকভাবে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর ও শিল্প-শ্রমিকের প্রাচুর্য, পরিবহনের সুবিধা, অধিবাসীদের চাহিদার বাহুল্য ও জটিলতা এবং বিক্রয়কেন্দ্রের সান্নিধ্যহেতু বর্তমানে বহু সমভূমি অঞ্চলে **শ্রমশিল্প**ও বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে। অবশ্য সমস্ত সমভূমি অঞ্চলই মনুষ্যবাসের পক্ষে সমান উপযোগী নহে। কঙ্গো ও আমাজন নদীর অববাহিকা, সাহারা ও তুন্দ্রার মরুঅঞ্চল সমভূমি হইলেও জলবায়ুর প্রতিকূলতা-হেতু এই সমস্ত অঞ্চলে লোকবসতি অতি বিরল।

ভারতের ভূ-প্রকৃতির প্রভাব (Influence of topography of India)—ভারতের উত্তর ও উত্তর-পূর্বের **পার্বত্যভূমি** বহুবিধ সম্পদে সমৃদ্ধ। চিরতুষারভাণ্ডার বলিয়া হিমালয় পর্বত বহু নদনদীকে সারাবৎসরই জলধারা-পুষ্ট করিতেছে এবং নদীর জলের সহিত পলল বিতরণ করিতেছে। এই সকল নদনদী সুনাব্য এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উপযোগী। এই পর্বত-মালা দঃ-পঃ মৌসুমী বায়ুকে বাধা দিয়া বৃষ্টিপাতের সহায়তা করিতেছে এবং উত্তরের শীতল মরুবায়ু হইতে ভারতকে রক্ষা করিতেছে। হিমালয়ের
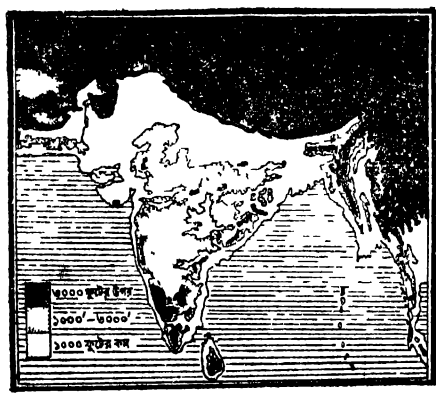
১নং চিত্র—ভারতের ভূপ্রকৃতি

পাদদেশে খনিজ তৈল, কয়লা, লবণ ও তাম্র পাওয়া যায়। এই পার্বত্যভূমি বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ, কিন্তু যানবাহনের অসুবিধা হেতু ইহাদের ব্যবহার অতি সামান্য। উচ্চতর অংশে আল্পীয় তৃণভূমিতে পশুপালন চলে। অপেক্ষাকৃত নিম্ন অংশে সামান্য পরিমাণে ধান ও ভুট্টা এবং চা ও ফল উৎপাদিত হয়।

পর্বতের গিরিপথসমূহ অতিশয় উচ্চ ও তুষারাচ্ছন্ন থাকায় কোন শত্রুই এই পথে সহসা ভারতে প্রবেশ করিতে পারে না।

ভারতের মধ্যভাগের নদীবিধৌত **সমভূমির** পশ্চিমাংশ ব্যতীত প্রায় সমগ্র অংশেরই জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র, মৃত্তিকা উর্বর। ইহা ভারতের শ্রেষ্ঠ কৃষি অঞ্চল। জমির প্রগাঢ় চাষই সাধারণ রীতি। ধান, গম, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা, ইক্ষু, পাট, শণ, তিসি, চীনাবাদাম, তামাক প্রভৃতি ফসল ও নানাবিধ ফল এতদঞ্চলে প্রচুর জন্মে। চারণযোগ্য বিস্তৃত তৃণভূমির অভাবে গৃহপালিত পশু সাধারণতঃ রুগ্ন। নদীসমূহ নাব্য ও মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ। খনিজ সম্পদ নাই বলিলেই চলে। অরণ্য অঞ্চল হইতে শাল, বাঁশ, সেগুন প্রভৃতি নানা জাতীয় কাষ্ঠ আহরণ করা হয়। ভূপ্রকৃতি সমতল হওয়ায় এই অঞ্চলে রাস্তা ও রেলপথ জালের ন্যায় বিস্তৃত রহিয়াছে। কাঁচামাল, শ্রমিক ও মূলধনের প্রাচুর্য এবং যানবাহনের সুবিধা হেতু ইহা ভারতের অন্যতম শিল্পপ্রধান অঞ্চল। প্রাথমিক উৎপাদনে, যানবাহন ব্যবস্থার প্রবর্তনে, গৌণ উৎপাদনে, বাণিজ্যে, সভ্যতায়, সংস্কৃতিতে এই সমভূমি অঞ্চলের অধিবাসীরা ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উন্নতিশীল এবং ইহা নিবিড়তম বসতি-পূর্ণ অঞ্চল। ভারতের উপকূলীয় সমভূমি অঞ্চলও উর্বর এবং কৃষি ও শিল্প সম্পদে সমৃদ্ধ। এতদঞ্চলের পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত এবং লোকবসতিও নিবিড়।

ভারতের দক্ষিণাংশের **মালভূমির** অনুকূল পরিবেশযুক্ত অংশে পর্ণমোচী বৃক্ষের নিবিড় অরণ্য দেখা যায়। চন্দন, সেগুন, আবলুস, শাল প্রভৃতি এই অঞ্চলের অরণ্যের অতি মূল্যবান সম্পদ। সুপ্রাচীন শিলাস্তরে গঠিত হওয়ায় এই অঞ্চলে স্বর্ণ ও অভ্র প্রচুর রহিয়াছে। লৌহ আকরিক, বক্সাইট, কয়লা, ম্যাঙ্গানীজ, গ্রাফাইট, ইলমেনাইট, মোনাজাইট প্রভৃতি খনিজও এই অঞ্চলে প্রচুর। এই অঞ্চলের মৃত্তিকা সাধারণতঃ অনুর্বর, বৃষ্টিপাত অনিয়মিত ও অপরিমিত এবং ভূমির ক্ষয় অধিক। সেই কারণে কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদনও অতি সামান্য। কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে কার্পাস, ধান, জোয়ার, বাজরা, তৈল-বীজ, ইক্ষু ও তামাক প্রধান। পর্বতের ঢালে চা ও কফি উৎপাদিত হয়। দক্ষিণ প্রান্তে এলাচ, দারুচিনি, মরিচ, লবঙ্গ প্রভৃতি মশলা জন্মে। পঃ ঘাটের বহু গিরিপথের (পাল ঘাট, থল ঘাট, ও ভোর ঘাট) মধ্য দিয়া প্রসারিত রাস্তা ও রেলপথ পশ্চিম উপকূলের সহিত মালভূমির পূর্ব অঞ্চলকে সংযুক্ত করিয়াছে। মালভূমির পূর্বদিকের ভূ-প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত অল্প বন্ধুর হওয়ায় যানবাহন চলাচল বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে। তবে নদীসমূহ বর্ষাকালে অত্যন্ত খরস্রোতা হয় এবং শীতকালে শুষ্ক হইয়া যায় বলিয়া ইহারা বিশেষ নাব্য নহে। সম্প্রতি এই মালভূমি অঞ্চলে শিল্প-বাণিজ্য দ্রুত প্রসার লাভ

করিতেছে। ভারতীয় যন্ত্রশিল্পের প্রধান কেন্দ্র-সমূহ এই অঞ্চলেই অবস্থিত। মালভূমি অঞ্চলের আর্থিক সঙ্গতি অল্প বলিয়া লোকবসতিও অল্প।

(৬) জলবায়ু (Climate)

অর্থনৈতিক জীবনে জলবায়ুর প্রভাব (Influence of climate on man's economic life)—মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উপর জলবায়ুর প্রভাব অতুলনীয়। (১) জলবায়ুর উপর **কৃষিকার্য** বহুলাংশে নির্ভর করে, সেই কারণে কৃষিজ ও অরণ্যজাত দ্রব্যসমূহ এবং উহাদের সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলি জলবায়ুর বিভিন্নতা অনুসারে স্থান বিশেষে বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে। **পশুচারণ** শিল্পও বহুলাংশে জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। দক্ষিণ আফ্রিকার ভেল্ড, উত্তর আমেরিকার প্রেইরী, দক্ষিণ আমেরিকার পম্পা প্রভৃতি যে সমস্ত অঞ্চলে অনুকূল জলবায়ুর প্রভাবে বহুবিস্তৃত তৃণক্ষেত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই সমস্ত স্থানে এই শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে। **মৎস্যচারণ** শিল্পেও জলবায়ুর প্রভাব বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অন্তর্গত সমুদ্রে, বিশেষতঃ শীতল ও উষ্ণ স্রোতের মিলনস্থলে, মনুষ্য-খাদ্য বহু প্রকার মৎস্য পাওয়া যায় বলিয়া মৎস্য শিল্প ঐ মণ্ডলেই সংঘবদ্ধভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। **মৃত্তিকা** গঠনেও জলবায়ুর প্রভাব অসামান্য।

(২) **যন্ত্রশিল্পের** উপরও জলবায়ুর প্রভাব ব্যাপক। সাধারণতঃ মৃদু-জলবায়ুসম্পন্ন অঞ্চলই যন্ত্র-শিল্প গঠনের অনুকূল। এই কারণে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলেই পৃথিবীর বৃহৎ যন্ত্র-শিল্পগুলি অধিক পরিমাণে গড়িয়া উঠিয়াছে। **প্রত্যক্ষভাবে** জলবায়ু শিল্পের **একদেশতাকে** নির্দেশ করে। বস্ত্রবয়ন শিল্পের জন্য আর্দ্র জলবায়ুর প্রয়োজন, কারণ শুষ্ক আবহাওয়ায় কার্পাসের তন্তু সহজেই ছিন্ন হইয়া যায়। তাই সমুদ্রের সান্নিধ্যে আর্দ্র আবহাওয়ায় কার্পাস শিল্পের প্রচলন ও প্রসার এত অধিক। বোম্বাই, ওসাকা, ম্যাঞ্চেস্টার, আমেদাবাদ প্রভৃতি শহর এই কারণেই কার্পাস শিল্পের কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। ময়দার কল আবার শুষ্ক অঞ্চলেই ভাল চলে; কারণ, আর্দ্র আবহাওয়ায় ময়দা সহজেই পচিয়া যায়। তাই করাচী, মিনিয়াপোলিস, বুদাপেস্ট প্রভৃতি শুষ্ক অঞ্চলে ময়দার কল স্থাপিত হইয়াছে। চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য সূর্যকিরণোজ্জ্বল আবহাওয়ার প্রয়োজন। তাই ক্যালিফোর্ণিয়া, ইতালী ও দক্ষিণ ফ্রান্সের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এই শিল্প বিশেষভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে।

যন্ত্রশিল্পের উপর জলবায়ুর **পরোক্ষ প্রভাব** অত্যধিক। (ক) জলবায়ু মানুষের **চাহিদাকে** নিয়ন্ত্রিত করিয়া শিল্প-সংগঠন নিয়ন্ত্রিত করে। শীত-প্রধান অঞ্চলে সাধারণতঃ পশমজাত দ্রব্যের চাহিদা অধিক। সুতরাং কাশ্মীর প্রভৃতি শীতপ্রধান অঞ্চলের শিল্প-প্রচেষ্টা সাধারণতঃ পশমজাত দ্রব্যের

চাহিদাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠাই স্বাভাবিক। অপরপক্ষে, বঙ্গদেশ প্রভৃতি গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে কার্পাসজাত দ্রব্যের চাহিদা অধিক থাকায় এ সমস্ত অঞ্চলে কার্পাস শিল্পের প্রসার দৃষ্ট হয়। (খ) জলবায়ু শিল্পে-ব্যবহৃত **কাঁচা মালের** উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিয়া শিল্পের গঠনকে নিয়ন্ত্রিত করে। কারণ, যে অঞ্চলে অনুকূল জলবায়ুর প্রভাবে পাট উৎপন্ন হয়, সে অঞ্চলে পাটকে কেন্দ্র করিয়া পাটশিল্প গড়িয়া উঠাই স্বাভাবিক। (গ) **শ্রমিকের সরবরাহ** এবং তাহাদের **কর্মনৈপুণ্য** নিয়ন্ত্রিত করিয়া জলবায়ু শিল্পের গঠন ও প্রসারকে নিয়ন্ত্রিত করে। শ্রমিকের সরবরাহ নির্ভর করে প্রধানতঃ জনসংখ্যা ও শ্রম-শক্তির উপর। কিন্তু এই জনসংখ্যাবণ্টনও জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। প্রতিকূল জলবায়ুযুক্ত অঞ্চলে লোকবসতি বিরল বলিয়া শ্রমিকের সরবরাহও অল্প, কিন্তু অনুকূল জলবায়ুযুক্ত অঞ্চলে লোকবসতি নিবিড় বলিয়া শ্রমিকের সরবরাহও অধিক হইয়া থাকে। আবার, অনুকূল জলবায়ুর প্রভাবে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অধিবাসীদের শ্রমশক্তি ও কর্মদক্ষতা উষ্ণ মণ্ডলের অধিবাসীদের অপেক্ষা বহুগুণে অধিক। (ঘ) উৎপাদনকেন্দ্র ও ভোগকেন্দ্রের মধ্যে **পরিবহন-ব্যবস্থা** সম্যক্ গঠিত না হইলে শিল্পের প্রসার ব্যাহত হয়। কিন্তু এই পরিবহন-ব্যবস্থাও জলবায়ু এবং আবহাওয়ার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। অত্যধিক তুষারপাতের ফলে রেলপথ ও নদীপথ সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। উষ্ণ মরু-অঞ্চলে বালিয়াড়ির আধিক্য ও উহার অনবরত পরিবর্তন হেতু রেলপথ নির্মাণ সম্ভব নহে। বিমানপথে যাতায়াত-ব্যবস্থা অনেক স্থানেই প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য ব্যাহত হয়। (ঙ) জলবায়ু **শিল্পাগারের আয়তন** নিয়ন্ত্রণ করে। সুইজারল্যাণ্ড পর্বতসঙ্কুল ও শীতপ্রধান দেশ। বৎসরের অধিকাংশ সময় এদেশে তুষারপাত হয় বলিয়া ঘরের বাহিরে কাজ করা সম্ভবপর হয় না। সেজন্য এখানে প্রধানতঃ কুটির শিল্পই গড়িয়া উঠিয়াছে। অপরপক্ষে, অনুকূল জলবায়ুযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের প্রসারই অধিক।

(৩) **উপনিবেশ স্থাপন** জলবায়ুর উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। কারণ যে দেশে উপনিবেশ স্থাপন করা হইবে সেই দেশের জলবায়ু যদি ঔপনিবেশিকের দেশের জলবায়ুর অনুরূপ না হয়, তাহা হইলে উপনিবেশ স্থাপন সাধারণতঃ সম্ভব হইয়া উঠে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, অস্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত কুইন্স্‌ল্যাণ্ডের উষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চল নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের শ্বেতাঙ্গদের বসবাসের উপযুক্ত নয়; সেই কারণে অধুনা-প্রবর্তিত 'শ্বেত-অস্ট্রেলিয়া নীতি' এই অঞ্চলে শ্বেতাঙ্গ-বসতি স্থাপনে যে কতদূর সহায়ক হইবে, তাহা বলা কঠিন।

সর্বশেষে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মানুষ

বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে আবহাওয়ার প্রভাবকে স্বীয় আয়ত্তে আনিয়াছে বটে. কিন্তু সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে পারে নাই, করিবার আশাও খুব অল্প।

(৭) প্রাকৃতিক সম্পদ (Natural Resources)

মানুষেব বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপের উপব প্রভাব-বিস্তারকারী অবস্থানিচয়ের মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের অবদান অনস্বীকার্য। যে সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে সচরাচর প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে তাহাদের মধ্যে (ক) মৃত্তিকা, (খ) খনিজসম্পদ, (গ) স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ ও (ঘ) জৈব প্রকৃতিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(ক) **মৃত্তিকা** (Soils)—মৃত্তিকা প্রাথমিক উৎপাদনেব উপব বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। যে অঞ্চলের মৃত্তিকা উদ্ভিদের খাদ্য উপকরণে সমৃদ্ধ, সে অঞ্চলে কৃষিকাযের অন্যান্য অবস্থাগুলি অনুকূল হইলে কৃষিকায বিশেষ উন্নতি লাভ করে এবং জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। ভারত, চীন, যুক্তবাষ্ট্র, উত্তব ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ এই কারণেই কৃষিজ সম্পদে এত সমৃদ্ধ। অপব পক্ষে, চাষের অন্যান্য অবস্থা অনুকূল হওয়া সত্ত্বেও মৃত্তিকা অনুর্বর হইলে কৃষিকায স্বাভাবিক ভাবে প্রসার লাভ করিতে পারে না। আবাব মৃত্তিকা ও জলবায়ুব গুণাগুণ অনুসারেই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জেব এবং কৃষিজাত দ্রব্যের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যে স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ নিরক্ষীয় অঞ্চলের মৃত্তিকায় জন্মে, তাহা শীতপ্রধান নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের মৃত্তিকায় জন্মে না। পাট বঙ্গদেশে জন্মে, কিন্তু বঙ্গদেশের অনুরূপ মৃত্তিকা পাঞ্জাবে না থাকায় তথায় পাট জন্মে না।

মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য—মৃত্তিকাব গুণাগুণ নির্ভব করে ইহার বর্ণ, কণিকার আকার ও গঠন, জলধারণেব ও বায়ু-প্রবেশের ক্ষমতা, গভীরতা, প্রবেশ্যতা, ঢাল, প্রাচীনতা, বাসায়নিক ধর্ম প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের উপব। সাধাবণতঃ ঘোর বাদামী বা কৃষ্ণ **বর্ণের** (colour) মৃত্তিকায় অধিক জৈব পদার্থ ও নাইট্রোজেন বিদ্যমান থাকায় উহা উর্বর ও কৃষিকাযের উপযোগী। হাল্কা বাদামী, ধূসর বাদামী, রক্ত, পীত, ধূসর ও শ্বেত বর্ণের মৃত্তিকায় অতি সামান্য জৈব পদার্থ বিদ্যমান থাকায় উহা সাধারণতঃ অনুর্বর। মৃত্তিকা সাধারণতঃ বিভিন্ন **আকারের** (texture) কণিকার সংমিশ্রণে গঠিত হয় বলিয়া ইহাকে বেলেমাটি, বেলে দো-আঁশ মাটি, দো-আঁশ মাটি (৩০-৫০ ভাগ বালি, ৩০-৫০ ভাগ পলি এবং ২০ ভাগের অনধিক কাদার সমন্বয়ে গঠিত), পলিমাটি ও কাদামাটি—এই কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। সূক্ষ্ম ধূলিচূর্ণ একত্রিত হইয়া মৃত্তিকার **গঠন** (structure) সৃষ্টি করে। মাঝারি গঠনের দো-আঁশ মাটিই কৃষিকার্যের বিশেষ উপযোগী। ভারী কাদামাটিতে কৃষিকার্য সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হয় না। হাল্কা

বেলেমাটিতে কৃষিকার্য একেবারেই চলে না। **রাসায়নিক ধর্ম** (chemical properties) হিসাবে মৃত্তিকাকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। **অম্লধর্মী** (acidic) মৃত্তিকায় চুনের পরিমাণ অল্প থাকে বলিয়া ইহা কৃষিকার্যের অনুপযোগী, তবে চুনযুক্ত হইলে ইহা শস্যপ্রসূ হয়। **ক্ষারধর্মী** (alkaline) মৃত্তিকায় চুনের পরিমাণ অধিক থাকে এবং ইহা কৃষিকার্যের বিশেষ উপযোগী।

মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ (Classification)—জলবায়ুর উপর মৃত্তিকার গঠন বহুলাংশে নির্ভর করে বলিয়া জলবায়ুর বিভিন্নতা হিসাবে পৃথিবীর পরিপুষ্ট মৃত্তিকাকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—(১) শুষ্ক তৃণাঞ্চলের মৃত্তিকা, (২) আর্দ্র বনাঞ্চলের মৃত্তিকা এবং (৩) মধ্যবর্তী অঞ্চলের মৃত্তিকা।

(১) **শুষ্ক তৃণাঞ্চলের মৃত্তিকা** (Pedocals)—এই মৃত্তিকা উর্বর, চুনপ্রধান এবং উদ্ভিদ্ খাদ্য নানা ধাতব পদার্থে পূর্ণ। ইহা ক্ষারধর্মী, এবং জলসিঞ্চিত হইলে ইহার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়। ইহার স্তর ভূপৃষ্ঠ হইতে ৩০-৬০ সে মি. পর্যন্ত গভীর হইয়া থাকে। বৃষ্টিপাতের তারতম্য হিসাবে এই মৃত্তিকাকে আবার কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। (ক) **কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা** (chernozems)—তৃণভূমি অঞ্চলের যে সমস্ত স্থানে বৃষ্টিপাত অধিক, বাষ্পীভবন অল্প এবং দীর্ঘ ও নিবিড় তৃণ জন্মে সেই সমস্ত অঞ্চলে এই শ্রেণীর মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়। এই মৃত্তিকা অতিশয় উর্বর, এবং জলসিঞ্চিত হইলে প্রচুর গম, যব, ভুট্টা, বীট, কার্পাস প্রভৃতি উৎপাদন করিতে সক্ষম হয়। দঃ পূঃ রুশিয়া হইতে সাইবেরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড, এবং উত্তর আমেরিকার বিস্তৃত সমভূমি অঞ্চলের ভূমিভাগ এই মৃত্তিকায় গঠিত। (খ) **রক্তাভ বাদামী মৃত্তিকা** (chestnut earths)—তৃণভূমি অঞ্চলের যে সমস্ত স্থানে বৃষ্টিপাত মধ্যম প্রকারের এবং নিকৃষ্ট তৃণ জন্মে সে স্থানে এই শ্রেণীর মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়। উপযুক্ত জলসেচ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে এই মৃত্তিকায় চারণযোগ্য তৃণ, গম, ভুট্টা, কার্পাস প্রভৃতি জন্মে। (গ) **বাদামী মৃত্তিকা** (brown earths)—তৃণভূমি অঞ্চলের যে সমস্ত স্থানে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৩৮ সে. মি-র অনধিক এবং তৃণ খর্বাকৃতিবিশিষ্ট সেই সমস্ত স্থানে হাল্কা, অল্প জৈব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ-যুক্ত এই মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়। এই মৃত্তিকাযুক্ত অঞ্চলসমূহে পশুপালন ও শুষ্ককৃষিপ্রথায় কৃষিকার্য পরিচালিত হয়। (ঘ) **পিঙ্গল বর্ণের মৃত্তিকা** (gray earths)—ইহা মরু ও মরুপ্রায় অঞ্চলের মৃত্তিকা। ফসফরাস ব্যতীত উদ্ভিদ্-খাদ্য ধাতবপদার্থে পূর্ণ ও অল্প জৈব ধাতব পদার্থ ও নাইট্রোজেন যুক্ত এই মৃত্তিকা প্রায় সকল কার্যেরই অনুপযুক্ত।

(২) **আর্দ্র অরণ্যাঞ্চলের মৃত্তিকা** (Pedalfers)—এই শ্রেণীর মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত অনুর্বর, অল্প চুন ও উদ্ভিদ্-খাদ্য জৈব ধাতব পদার্থ ও নাইট্রোজেন যুক্ত এবং লৌহ ও অ্যালুমিনিয়াম কণিকায় সমৃদ্ধ। ইহা অম্লধর্মী

এবং এই মৃত্তিকার স্তর ভূপৃষ্ঠ হইতে মাত্র ৩-৫ সে. মি. পর্যন্ত গভীর। এই শ্রেণীর মৃত্তিকাকে আবার কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। (ক) **ধূসরবর্ণের মৃত্তিকা** (podzol)—প্রধানতঃ সরলবর্গীয় এবং কখনও কখনও মিশ্র ও পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্যাঞ্চলে দৃষ্ট হয়। ইহা অত্যন্ত অম্লধর্মী ও অনুর্বর। চুন ও সারের ব্যবহারের দ্বারা এই মৃত্তিকাযুক্ত ভূখণ্ডে আলু ও চারণযোগ্য তৃণ উৎপাদিত হয়। (খ) **ধূসর বাদামী বর্ণের মৃত্তিকা** (gray brown earths) —মধ্য অক্ষাংশের অন্তর্গত উঃ পূঃ যুক্তরাষ্ট্র ও মধ্য ইউরোপের আর্দ্রতর ও উষ্ণতর অঞ্চলে এবং অভ্যন্তরভাগে তৃণগুল্মযুক্ত পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্যাঞ্চলে এই মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। ইহা অল্প অম্লধর্মী এবং সাধারণতঃ উর্বর। এই শ্রেণীর মৃত্তিকায় ফলের চাষ, পশুপালন, তামাক, খাদ্যশস্য ও দ্রাক্ষার উৎপাদন ভাল হয়। (গ) **রক্ত ও পীত বর্ণের মৃত্তিকা** (red and yellow earths)— প্রধানতঃ ক্রান্তীয় এবং কখনও কখনও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুযুক্ত অরণ্যাচ্ছাদিত অংশে এই মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। ইহা অত্যন্ত অম্লধর্মী ও অল্প উদ্ভিদ্-খাদ্যযুক্ত, তবে চুন ও সারের ব্যবহার করিলে এই মৃত্তিকাযুক্ত ভূমিভাগে তামাক, কার্পাস, নানাবিধ ফল প্রভৃতি প্রচুর জন্মে। (ঘ) **রক্তবর্ণের মৃত্তিকা** (red lateritic soil and laterite)—প্রধানতঃ ক্রান্তীয় আর্দ্র অঞ্চলের ভূমিভাগে এই মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। অল্প সরমাটি ও অধিক লৌহ কণিকাযুক্ত এই মৃত্তিকা অত্যন্ত অম্লধর্মী ; তবে উত্তম গঠনযুক্ত হওয়ায় সার ব্যবহারের দ্বারা শস্যাদি উৎপাদন করা সম্ভব। এইরূপ মৃত্তিকাযুক্ত অঞ্চলের স্থানে স্থানে অভ্যন্তরভাগে লৌহকণিকা প্রগাঢ় ভাবে সঞ্চিত হওয়ায় নিকৃষ্ট শ্রেণীর লৌহপ্রস্তর গঠিত হয়।

(৩) **মধ্যবর্তী অঞ্চলের মৃত্তিকা বা প্রেয়রী মৃত্তিকা** (**Prairie earths**)—ইহা পেডালফার ও পোডোক্যাল এই দুই শ্রেণীর মৃত্তিকারই গুণবিশিষ্ট। আর্দ্র অঞ্চলে দৃষ্ট হইলেও এই মৃত্তিকাযুক্ত ভূমিভাগে দীর্ঘ তৃণ নিবিড় ভাবে জন্মে। এইরূপ মৃত্তিকা মধ্য অক্ষাংশের তৃণভূমি অঞ্চলেই দৃষ্ট হয়। ইহাতে প্রায় সমপরিমাণ চুন, লৌহ ও অ্যালুমিনিয়াম কণিকা বিদ্যমান থাকায় ইহা সমধর্মী, তবে অবস্থানভেদে সামান্য অম্লধর্মীও হইয়া থাকে। ইহা কৃষ্ণবর্ণের এবং অত্যন্ত উর্বর। এই মৃত্তিকায় খাদ্যশস্য, বিশেষতঃ ভুট্টা ও গম, এবং কার্পাস প্রচুর জন্মে।

(খ) **খনিজ (Minerals)**—খনিজ পদার্থ মানব-সভ্যতাকে নানারূপে প্রভাবান্বিত করে। খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চলে খনিজ-সংক্রান্ত নানাবিধ শিল্প গড়িয়া উঠে এবং কালক্রমে সেই সমস্ত অঞ্চল জনসমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও সাকচী ছিল মনুষ্যবাসের অযোগ্য একটি নিবিড় বনাঞ্চল। কিন্তু টাটা কোম্পানীর ইস্পাত

কারখানা স্থাপিত হইবার পর হইতে উহা বর্তমানে জনসমৃদ্ধ জামসেদপুর শহররূপে পরিচিত হইয়াছে। যে সমস্ত খনিজ সম্পদ মনুষ্য-জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কয়লা ও লৌহই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর অধিকাংশ কয়লা-খনি অঞ্চল বর্তমানে জনসমৃদ্ধ শিল্পাঞ্চলে পরিণত হইয়াছে।

(গ) **উদ্ভিজ্জ প্রকৃতি** (Plant life)—মৃত্তিকার প্রকৃতি ও জলবায়ুর প্রকারভেদে পৃথিবীর নানাস্থানে নানা প্রকারের উদ্ভিজ্জ প্রকৃতি পরিলক্ষিত হয়। মানুষের বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপের উপর উদ্ভিজ্জ প্রকৃতির প্রভাব অপরিসীম। তৃণাঞ্চলসমূহ পশুপালন ও শস্যোৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী কিন্তু নিরক্ষীয় বনমণ্ডল মনুষ্যবাসের অনুপযুক্ত; আবার পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি অঞ্চলে কাষ্ঠ শিল্প সংঘবদ্ধভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে।

উদ্ভিজ্জ প্রকৃতি মানুষের জীবনধারণের উপায় নিরূপণ করিয়া দেয়, ভূমিক্ষয় রোধ করে, জলবায়ুর অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে, প্রবল বাত্যার গতিরোধ করে এবং বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ অটুট রাখে।

উদ্ভিজ্জ প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভাব দৃশ্যতঃ প্রচুর হইলেও মানুষ এবিষয়ে প্রকৃতির দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। পৃথিবীর বহুস্থানে স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ আজিও সম্পূর্ণ অব্যবহৃত রহিয়াছে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নূতন নূতন কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদনের সীমাও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ-প্রকৃতির দ্বারা নির্দিষ্ট হয় বলিয়া মানুষকে তাহার যাবতীয় বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপের ব্যাপারেই উদ্ভিজ্জ প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হয়।

(ঘ) **জৈব প্রকৃতি** (Animal life)—উদ্ভিজ্জ প্রকৃতির সহিত জৈব-প্রকৃতির অতি নিকট সম্পর্ক রহিয়াছে। নিরক্ষীয় বনভূমি অঞ্চলে বৃক্ষচারী প্রাণী, বিস্তীর্ণ তৃণভূমি অঞ্চলে হরিণ, সুমেরুপ্রদেশে বল্গাহরিণ ও শ্বেত ভল্লুক, মরু উদ্ভিদের আবেষ্টনীতে উট, স্যাভানা তৃণভূমি অঞ্চলে সিংহব্যাঘ্রাদি মাংসাশী এবং গোমহিষ্যাদি তৃণভোজী প্রাণী প্রভৃতি বসবাস করে। কেবলমাত্র যে বন্য জন্তুর ক্ষেত্রেই ইহা সত্য তাহাই নহে। গৃহপালিত জীবজন্তুর জন্যও অনুকূল পরিবেশের প্রয়োজন। এই কারণে পৃথিবীর তৃণাঞ্চলসমূহেই মানুষ গবাদি পশু পালন করিয়া থাকে। জৈবপ্রকৃতির উপর মানুষের প্রভাব দৃশ্যতঃ সর্বাধিক হইলেও মানুষ জৈব প্রকৃতিকে সর্বতোভাবে বশীভূত করিতে পারে নাই।

(৮) আভ্যন্তরীণ জলভাগ (Inland waterbodies)

অর্থনৈতিক জীবনে আভ্যন্তরীণ জলভাগ-এর প্রভাব (Influence of inland waterbodies on man's economic life)—নদী, খাল,

হ্রদ; প্রভৃতি দেশের আভ্যন্তরীণ জলভাগের অন্তর্গত। ইহাদের মধ্যে নদীই সর্বাধিক প্রয়োজনীয়। নদী দেশে পানীয় জল সরবরাহ করে, অতিরিক্ত জল নিষ্কাশন করে, পলি আনিয়া জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে, পণ্য পরিবহন ও বাণিজ্য প্রসারের সুযোগ দান করে এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও সেচকার্যে সহায়তা করিয়া থাকে। এই সমস্ত কারণে নদীমাতৃক দেশ চিরদিনই সম্পদশালী ও মনুষ্যবাসের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বৃষ্টিহীন দেশে জলসেচ-কার্যে নদী প্রভূত সাহায্য করিয়া থাকে। নদী হইতে জলসেচের সুবিধা থাকায় মিশর, সিন্ধু প্রভৃতি দেশের ন্যায় ঊষর মরু-অঞ্চলও উর্বর শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। আদিম যুগ হইতে বর্তমান যান্ত্রিক যুগ পর্যন্ত নদী এই সমস্ত কারণেই মানব-সভ্যতার বিকাশ ও বিস্তারের পক্ষে অপরিহার্য হইয়া রহিয়াছে। তাই দেখা যায় প্রাচীন নদীমাতৃক সভ্যতার পীঠস্থান ছিল মিশরের নীল নদের তীরে, ভারতের সিন্ধুগাঙ্গেয় সমভূমিতে, চীনের উই-হো ও হোয়াং হো নদীর তীরে এবং ব্যাবিলনের টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরে। নদী যেরূপ একদিকে অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়তা করে অন্যদিকে তেমনি সময় সময় প্রবল বন্যা দ্বারা মানুষের অপকারও করিয়া থাকে। উত্তর চীনের হোয়াং-হো নদীকে এই কারণে 'চীনের দুঃখ' বলা হয়।

জলপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া তাহা সেচ ও অন্যান্য নানাবিধ কার্যে নিয়োগ করা এবং নদীর ধ্বংস-ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করাই হইল নদী উপত্যকার অন্তর্গত অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনের দুইটি প্রধান সমস্যা। সমভূমি অঞ্চলে নদী ঘন ঘন গতিপথ পরিবর্তন করিয়া থাকে এবং ইহারই ফলে নদীতীরবর্তী স্থানসমূহের অধিবাসীদের জীবনে ঘটে আমূল পরিবর্তন। বন্যার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মানুষ আদিম কাল হইতেই নদীতে বাঁধ দিবার ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছে। তবে অবৈজ্ঞানিক প্রথায় বাঁধ দিবার ফলে অনেক ক্ষেত্রে নদী মজিয়া গিয়া সর্বনাশা বন্যার সৃষ্টি করে। এই সকল অসুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বর্তমান যুগের মানুষ একাধারে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তন, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহন প্রভৃতি বহু-উদ্দেশ্যমূলক নদী উপত্যকা পরিকল্পনার সাহায্যে বৈজ্ঞানিক প্রথায় নদীকে নিয়ন্ত্রণ করিতে চলিয়াছে।

(৯) সমুদ্রস্রোত (Ocean Currents)

অর্থনৈতিক জীবনে সমুদ্রস্রোত-এর প্রভাব (Influence of ocean currents on man's economic life)—সমুদ্রস্রোত দুই প্রকারের—উষ্ণ ও শীতল। মানব জীবনের উপর ইহাদের প্রভাব কোন কোন ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে আবার বহু ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে অনুভূত হইয়া থাকে। (১) সমুদ্রস্রোতের প্রভাবে স্রোতের অনুকূলে যেরূপ জাহাজ চালাইবার

সুবিধা হয় স্রোতের প্রতিকূলে তেমনি উহা সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠে। বর্তমানে অবশ্য যন্ত্রচালিত জাহাজের চলাচলের ক্ষেত্রে সমুদ্রস্রোত বিশেষ প্রভাব বিস্তার না করিলেও পাল-তোলা জাহাজগুলি আজও পর্যন্ত অনুকূল সমুদ্রস্রোতের সুযোগ লয় ও প্রতিকূল সমুদ্রস্রোত এড়াইয়া চলে। (২) সমুদ্রতীরবর্তী দেশসমূহের জলবায়ুর উপর সমুদ্রস্রোতের প্রভাব অত্যন্ত অধিক। শীতল স্রোত উপকূল-সন্নিহিত স্থানসমূহের উত্তাপ হ্রাস করে এবং উষ্ণ স্রোত উত্তাপ বৃদ্ধি করে। শীতল ল্যাব্রাডোর স্রোতের প্রভাবে উত্তর আমেরিকার সেন্ট লরেন্স নদী ও মোহানা বৎসরে নয় মাসই প্রায় বরফাবৃত থাকে, কিন্তু উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের প্রভাবে একই সমাক্ষ রেখায় অবস্থিত ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের উপকূলাঞ্চল কখনও তুষারাবৃত থাকে না। (৩) উষ্ণ স্রোতের উপর দিয়া প্রবাহিত বায়ুতে জলীয় বাষ্প অধিক থাকে বলিয়া উহা স্থলভাগের দিকে চালিত হইলে বৃষ্টিপাত হয়। পক্ষান্তরে, শীতল স্রোতের উপর দিয়া প্রবাহিত বায়ু শুষ্ক হইয়া থাকে বলিয়া উহাতে বৃষ্টি হয় না। (৪) শীতল ও উষ্ণ সমুদ্রস্রোতের মিলনস্থান সর্বদাই ঘন কুয়াসাবৃত থাকে। এই জন্য সুমেরু মহাসাগরীয় শীতল স্রোতের সহিত নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের নিকট উপসাগরীয় উষ্ণ স্রোত এবং জাপান উপকূলে উষ্ণ কুরোশিয়ো স্রোত মিলিত হওয়ায় ঐ দুইটি স্থানে প্রায়ই নিবিড় কুয়াসা এবং প্রবল ঝড়-তুফানের সৃষ্টি হইয়া থাকে। (৫) শীতল সমুদ্রস্রোতের সহিত প্রচুর মাছ আসে এবং যেখানে উষ্ণ স্রোতের সহিত শীতল স্রোতের মিলন হয় মাছগুলি সেখানেই থাকিয়া যায়। এই কারণে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, নরওয়ে ও জাপানের উপকূলে মৎস্য ব্যবসায় ব্যাপকভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। (৬) হিমশৈল উষ্ণ স্রোতের সংস্পর্শে গলিয়া যায় এবং উহার সহিত আনীত মাটি, কাদা, উদ্ভিদ প্রভৃতি জলের তলদেশে জমিয়া চড়া বা মগ্নভূমির সৃষ্টি করে। এই অগভীর জলে মৎস্য-খাদ্য প্ল্যাংকটন প্রচুর জন্মে এবং এই সমস্ত স্থানেই মাছেরা ডিম পাড়ে।

সাংস্কৃতিক পরিবেশ
(Cultural Environment)

অর্থনৈতিক জীবনে সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রভাব (Influence of cultural environment on man's economic life)—মানুষের বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপের উপর প্রভাব-বিস্তারকারী অবস্থা-নিচয়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক পরিবেশের অবদান উপেক্ষণীয় নহে। সাংস্কৃতিক পরিবেশের যে সমস্ত উপাদান মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে সচরাচর প্রভাবান্বিত করে

বলিয়া অনেকে মনে করেন তাহাদের মধ্যে প্রবংশ, ধর্ম, রাষ্ট্রতন্ত্র ও শাসনযন্ত্র এবং জনসংখ্যাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রবংশের (Race) তারতম্য অনুসারে মানুষের বৈষয়িক উন্নতিরও তারতম্য হয়—এইরূপ একটা সংস্কার কোন কোন ভৌগোলিকের মনে বাসা বাঁধিয়া আছে। উদাহরণ স্বরূপ তাঁহারা বৈষয়িক সভ্যতায় অনুন্নত আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের কৃষ্ণকায় জাতিদের কথা প্রায়ই উল্লেখ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে উত্তর-পূর্ব ও মধ্য এশিয়া, উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ, এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের পীতবর্ণ মঙ্গোলীয় অধিবাসীরা কৃষ্ণকায় জাতিদের তুলনায় কিছুটা উন্নতিশীল। তাঁহারা মনে করেন, উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ, রুশিয়া, মধ্য ও দক্ষিণ ইউরোপ, আরব, দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়া, উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা প্রভৃতি দেশের শ্বেতবর্ণ ককেশীয় অধিবাসীরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু এই মত বিচারসহ নয়। নৃতত্ত্ব-শাস্ত্রে আজিও এরূপ কোনও মতবাদ অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। পৃথিবীতে বিশুদ্ধ প্রবংশ কোথাও আছে কি না ঘোর সন্দেহের বিষয়। তথাকথিত অনুন্নত জাতিদের দুরবস্থার কারণ সম্পূর্ণ অন্যরূপ। জাতিসঙ্ঘ হইতে স্পষ্ট ভাষায় প্রবংশগত পার্থক্য অস্বীকৃত হইয়াছে।

ধর্ম (Religion) মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর প্রভাব বিস্তার করে—এইরূপ আর একটা সংস্কারও ভৌগোলিকদের মধ্যে আছে। কিন্তু ইহাও যথেষ্ট বিচারসহ নয়। গরু এবং শূকরের মাংস বৌদ্ধ চীনাদের বড়ই প্রিয় খাদ্য, চীনে এ সব জিনিসের কারবার যথেষ্ট আছে। ইসলামে লগ্নীর কারবার নিষিদ্ধ; কিন্তু আমাদের দেশে কাবুলীওয়ালাদের প্রধান উপজীবিকাই হইল লগ্নীর কারবার। এইসব ব্যবসায়ে চীনারা বা কাবুলীরা যে ইউরোপীয় খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী জাতিদেব মতো উন্নতি করিতে পারে নাই, তাহার কারণ রাজনৈতিক এবং যান্ত্রিক সভ্যতার সংঘাতে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক বিপর্যয়। অনেকের বিশ্বাস, ভারতে যান্ত্রিক শ্রম-শিল্পের আশানুরূপ প্রসার না হওয়ার কারণ এখানে হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদ-প্রথার অস্তিত্ব; কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই সেরূপ নয়। ভারতের সুদীর্ঘ কালের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরাধীনতা এবং তদপেক্ষাও দীর্ঘতর কালের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবই ইহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী।

রাষ্ট্রতন্ত্র ও শাসনযন্ত্র (Government) মানুষের বৈষয়িক ক্রিয়া-কলাপকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। স্থিতিশীল শাসনযন্ত্র যেরূপ দেশে অর্থ-নৈতিক উন্নতির সহায়ক, নিয়ত পরিবর্তনশীল শাসনযন্ত্র সেইরূপ অর্থ নৈতিক উন্নতির অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। মেক্সিকো এবং যুদ্ধপূর্ব চীন দেশ প্রাকৃতিক

সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়াও শাসনযন্ত্রের স্থিতিশীলতার অভাবে শিল্প ও বাণিজ্যে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। অপর পক্ষে জাপান ও জার্মানী এই দুইটি দেশ নিজ নিজ সরকারের সহযোগিতায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে তাহাদের অর্থনৈতিক বনিয়াদ পাকা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

জনসংখ্যার (Population) পরিমাণ, বৃদ্ধির হার ও বসতি-ঘনত্ব মানুষের বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। জনসংখ্যার পরিমাপের দ্বারা দেশে শ্রমিক ও মূলধনের সরবরাহ নির্ধারিত হয়। জনবহুল স্থানে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার যেরূপ ব্যাপক, জনবিরল স্থানে সেরূপ নহে। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চলও জনবিরল হইলে তথায় অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব হয় না। অস্ট্রেলিয়া জনবিরল হওয়ায় ঐ দেশে পশুচারণ শিল্প ব্যাপক প্রসার লাভ করিয়াছে, কিন্তু গ্রেট ব্রিটেন জনবহুল হওয়ায় ঐ দেশে যন্ত্রশিল্পের প্রসারই সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্নোত্তর

1. Give a brief account of man's relation to geographical location coast-line, area and form of a country. Explain your answer with the help of examples drawn from Indian conditions. (ভৌগোলিক অবস্থান, সৈকতরেখা, দেশগত আয়তন ও আকার-এর সহিত মানব-জীবনের কি সম্পর্ক তাহা ভারতের দৃষ্টান্ত উল্লেখপূর্বক সংক্ষেপে বুঝাইয়া লিখ।)

2 Discuss with reference to any region of India the influence of environment on the economic activities of man (ভারতের যে কোন অঞ্চলের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে পরিবেশের প্রভাব আলোচনা কর।)

3. Discuss the effects of physical environment on the economic activity of man, with reference to the Gangetic Plain of India. (গাঙ্গেয় সমভূমির প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব আলোচনা কর।)

4 Examine the effects of climate on man's economic activities Illustrate your answer with at least two suitable examples from Indian conditions (ভারত হইতে দুইটি দৃষ্টান্ত লইয়া জলবায়ু মানবজীবনের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে তাহা আলোচনা কর।) (B. U. (১৬-১৮ পৃষ্ঠা ও তৃতীয় অধ্যায়ে ভারতের জলবায়ু দেখ।)

5. "Rivers play a vital role in the economic development of a country." —Discuss. ("দেশগত অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে নদনদীসমূহ প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে।" —এই উক্তির তাৎপর্য নির্ণয় কর।)

6 Discuss the influence of either mountains or plains on the economic activities of man. Illustrate your answer with examples from India. (মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর পর্বত অথবা সমভূমির প্রভাব আলোচনা কর। ভারত হইতে উদাহরণ লইয়া উত্তর লিখ।) (C U P. U. '64. '67) (১২-১৬ পৃষ্ঠা)

7. Select any two regions of India with contrasting physical features and indicate their influence on the economic development of these regions (ভারতের যে কোন দুইটি বিপরীতধর্মী ভূপ্রকৃতিযুক্ত অঞ্চল নির্বাচন করিয়া আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে উহাদের প্রভাব নির্দেশ কর।) (১২-১৬ পৃষ্ঠা)

8 What do you mean by environment in economic geography? Show with suitable examples, that the economic activities of man are greatly influenced by this environment (পরিবেশ কাহাকে বলে? মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ যে তাহার পরিবেশের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয় তাহা উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও।) (C U P U. '63; H. S. '61) (১-২ পৃষ্ঠা)

তৃতীয় অধ্যায়

জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল
(Climate and Natural Regions)

প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল (Natural Regions)--অবস্থান, জলবায়ু, ভূপ্রকৃতি, উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি পার্থিব পরিবেশের বিভিন্নতা হেতু মানুষের জীবন-যাত্রা-প্রণালী বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। যে অঞ্চলে এই সকল পার্থিব পরিবেশের সমষ্টিগত প্রভাব একই প্রকারের সেই অঞ্চলকে একটি প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল বা অঞ্চল বলা হয়। অধ্যাপক হার্বার্টসন বলেন, প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল (Natural Region) বলিতে বুঝায়, "ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত এরূপ একটি ক্ষেত্র যেখানে মানবজীবনের উপর প্রভাবশীল অবস্থানিচয় মূলতঃ একই প্রকৃতির" ("An area of the earth's surface which is essentially homogeneous with respect to the conditions that affect human life")। আরব দেশের অবস্থান এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে, উত্তর-চিলির অবস্থান দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম তটে। স্থান-দুটির মধ্যে বিপুল ব্যবধান—একটি উত্তর-গোলার্ধে, অন্যটি দক্ষিণ-গোলার্ধে, একটি পূর্ব-গোলার্ধে, অন্যটি পশ্চিম-গোলার্ধে। তবুও আরব ও উত্তর চিলির ভৌগোলিক অবস্থানে মৌলিক সাদৃশ্য রহিয়াছে। দু'টি দেশেরই অবস্থান ভূমিভাগ হইতে প্রবাহিত জলকণাবিহীন রুক্ষ আয়নবায়ুর গতিপথে। ইহারই জন্য এ দু'টি দেশ বৃষ্টিহীন উষ্ণ মরুভূমি। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়া যেমন, ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি, অন্যান্য দিক দিয়াও তেমনই দূর-দূরান্তরের নানা দেশ মানবজীবনের উপর প্রভাবশীল অবস্থানিচয়ে মূলতঃ সমপ্রকৃতির হইতে পারে। এইরূপ দেশগুলিকে তাই সমশ্রেণীর প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা করা যায়।

সমশ্রেণীর প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের অন্তর্গত বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক পার্থক্য না থাকিলে বৈষয়িক উন্নতির সম্ভাবনা মূলতঃ একই প্রকারের হইয়া থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন অববাহিকায় যেরূপ চাষ-আবাদের বা যে সকল শ্রমশিল্পের পত্তন হইতে পারে, আফ্রিকার কঙ্গো অঞ্চলে কিংবা এশিয়ার সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতিতেও সে সব ব্যাপারের প্রবর্তন সম্ভবপর

বিবেচ্য বিষয় (**Factors to be noted**)—প্রাকৃতিক অঞ্চল পাঠের সময়ে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ স্মরণ রাখিতে হইবে—(১) পৃথিবীকে প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে বিভক্ত করার অর্থ হইতেছে প্রায় সমানধর্মী কয়েকটি অঞ্চলে

পৃথিবীকে ভাগ করা। সেই হেতু যে কোন একটি প্রাকৃতিক অঞ্চলের অন্তর্গত দেশসমূহের মধ্যে প্রভেদ অপেক্ষা সাদৃশ্যই অধিক পরিলক্ষিত হয়। (২) প্রাকৃতিক অঞ্চলসমূহ পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নহে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি প্রাকৃতিক অঞ্চল ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইতে হইতে অপর একটি অঞ্চলের সহিত মিশিয়া যায়। বহুক্ষেত্রে একাধিক প্রাকৃতিক অঞ্চলের মধ্যে সন্ধিক্ষেত্রও (transitional zone) দৃষ্ট হয়। (৩) ভূ-সংস্থান, অবস্থান প্রভৃতির পার্থক্যের দরুণ হয়ত একটি প্রাকৃতিক অঞ্চলের মধ্যে অপর একটি উপ-অঞ্চলের সৃষ্টি হইতে পারে। দক্ষিণ আমেরিকার ইকুয়েডর নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত হইলেও পার্বত্য অবস্থান বলিয়া এই অঞ্চলের জলবায়ু মৃদু ভাবাপন্ন। (৪) প্রাকৃতিক অঞ্চলসমূহ রাজনৈতিক সীমাদ্বারা আবদ্ধ নহে। কয়েকটি ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত দেশের সমগ্র বা অংশবিশেষ লইয়া এক একটি প্রাকৃতিক অঞ্চল গঠিত হয়।

পৃথিবীর প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলসমূহ (Major Natural Regions of the World)—জলবায়ু সংক্রান্ত আলোচনায় উত্তাপের তারতম্য অনুসারে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের প্রত্যেকটিকে চারিটি **তাপ-মণ্ডলে** বিভক্ত করা যাইতে পারে ; যথা—(১) প্রায় ৩০° উঃ ও দঃ সমাক্ষরেখার দ্বারা আবদ্ধ **উষ্ণমণ্ডল**, (২) সাধারণতঃ ৩০° উঃ হইতে ৪৫° উঃ এবং ৩০° দঃ হইতে ৪৫° দঃ সমাক্ষরেখার দ্বারা আবদ্ধ **গ্রীষ্মপ্রধান নাতিশীতোষ্ণ** বা **উপক্রান্তীয়** বা **উষ্ণশীতোষ্ণ মণ্ডল**, (৩) ৪৫° উঃ হইতে সুমেরুবৃত্ত এবং ৪৫° দঃ হইতে কুমেরুবৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ **শীতপ্রধান নাতিশীতোষ্ণ** বা **হিমশীতোষ্ণ মণ্ডল**, এবং (৪) মেরুবৃত্তদ্বয় হইতে পর্যায়ক্রমে উত্তর ও দক্ষিণে বিস্তৃত **হিমমণ্ডল**।

ভৌগোলিক হার্বার্টসন আবার প্রত্যেকটি তাপমণ্ডলের অন্তর্গত ভূমিভাগকে পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্য এই তিনটি প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে বিভক্ত করেন। পূর্ব ও পশ্চিম দিকস্থ পরিমণ্ডলসমূহের অবস্থান সমুদ্র-প্রান্তীয় কিন্তু মধ্যভাগের পরিমণ্ডলসমূহের অবস্থান মহাদেশীয়। অধ্যাপক হার্বার্টসনের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া, তবে উহা হইতে সামান্য পরিবর্তিত আকারে, পৃথিবীকে নিম্নলিখিত প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে বিভক্ত করা যাইতে পারে—

(ক) নিম্ন অক্ষাংশের (low latitudes) বা **উষ্ণমণ্ডলের** প্রাকৃতিক অঞ্চলসমূহ—(১) নিরক্ষীয় বা আমাজনীয় পরিমণ্ডল (Equatorial বা Amazon type), (২) মধ্যভাগে ক্রান্তীয় তৃণভূমি বা সুদানী পরিমণ্ডল (Tropical Grassland বা Sudan বা Savannah type), (৩) পূর্বপ্রান্তীয় ক্রান্তীয় মৌসুমী পরিমণ্ডল (Tropical Monsoon type), (৪) ইকুয়েডর দেশীয় উপমণ্ডল (Equador type), (৫) পশ্চিমপ্রান্তীয় উষ্ণ মরুদেশীয় পরিমণ্ডল (Hot Desert বা Sahara Type)।

(খ) মধ্য অক্ষাংশের* (middle latitudes) **উপক্রান্তীয় মণ্ডলের** প্রাকৃতিক অঞ্চলসমূহ—(১) পূর্ব-প্রান্তীয় চৈনিক পরিমণ্ডল (Warm Temperate East Coast বা China type), (২) পশ্চিম-প্রান্তীয় ভূমধ্যসাগরীয় পরিমণ্ডল (Mediterranean type), (৩) মধ্যভাগে মহাদেশীয় নিম্নভূমি
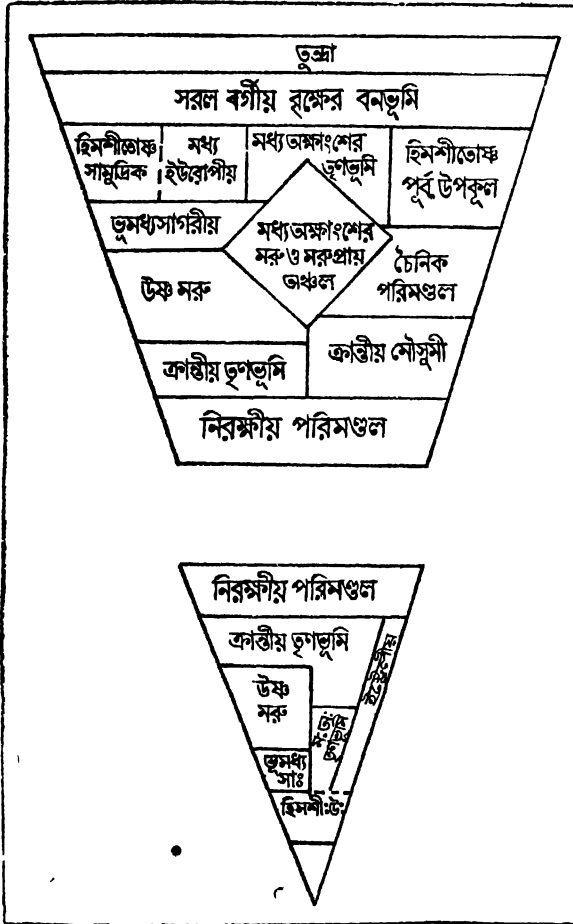
২ নং চিত্র—বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক
লক্ষ্য কর যে, উত্তর গোলার্ধের ভূমিভাগ প্রশস্ত এবং দক্ষিণ গোলার্ধের ভূমিভাগ ক্রমশঃ সংকীর্ণ

বা তুরানী জলবায়ু অঞ্চল (Interior Lowland বা Turan type), (৪) মধ্যভাগে মহাদেশীয় উচ্চভূমি বা ইরানী জলবায়ু অঞ্চল (Interior High-

* ৩০° উঃ হইতে ৬০° উঃ এবং ৩০° দঃ হইতে ৬০° দঃ অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ।

land বা Iran type), (৫) মধ্যভাগে তিব্বতীয় জলবায়ু অঞ্চল (Tibet type)। শেষোক্ত তিনটি অঞ্চলকে একত্রে 'মন্দোষ্ণ' মরু ও মরুপ্রায় অঞ্চল (Mid-latitude deserts and semi-deserts)-ও বলা হয়।

(গ) মধ্য অক্ষাংশের শীতপ্রধান **নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের** প্রাকৃতিক অঞ্চলসমূহ—(১) পূর্ব-প্রান্তীয় লরেন্সীয় বা হিমশীতোষ্ণ পূর্ব-উপকূলীয় পরিমণ্ডল (Cool Temperate East Coast বা St. Lawrence type) (২) সমগ্র উত্তরাংশ ব্যাপিয়া সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি অঞ্চল (Cold Temperate বা Taiga type), (৩) মধ্যভাগে মহাদেশীয় নিম্ন তৃণভূমি অঞ্চল (Mid-latitude Continental বা Steppe type), (৪) পশ্চিম-প্রান্তীয় নাতিশীতোষ্ণ সামুদ্রিক পরিমণ্ডল (Cool Temperate Oceanic বা British type), (৫) মধ্যভাগে মহাদেশীয় উচ্চভূমি বা আল্টাই পরিমণ্ডল (Interior Highlands বা Altai type)।

(ঘ) উচ্চ অক্ষাংশের* বা **হিম মণ্ডলের** প্রাকৃতিক অঞ্চলসমূহ—(১) তুন্দ্রা অঞ্চল (Tundra type), (২) মেরুদেশীয় উচ্চভূমি অঞ্চল (Polar Ice Caps)।

ক (১) নিরক্ষীয় জলবায়ু অধ্যুষিত পরিমণ্ডল

অবস্থান—নিরক্ষরেখার উত্তর ও দক্ষিণে সাধারণতঃ ৫°-১০° অক্ষাংশ পর্যন্ত এই জলবায়ু অঞ্চল বিস্তৃত। দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদীর অববাহিকা; মধ্য আফ্রিকার কঙ্গো নদীর অববাহিকা ও গিনি উপকূলাঞ্চল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপ ও প্রধান ভূভাগ সন্নিহিত অঞ্চলসমূহ এবং মালয় এই পরিমণ্ডলের অন্তর্গত। আমাজন নদীর অববাহিকা অঞ্চলেই এই জলবায়ু সমধিক পরিস্ফুট বলিয়া নিরক্ষীয় জলবায়ুকে **আমাজনীয়** (Amazon type) জলবায়ুও বলা হয়।

জলবায়ু[১]—এই অঞ্চলে (ক) সারা বৎসর গড় উত্তাপ ৭৫° ও ৮০° ফাঃ-এর মধ্যে থাকে। বার্ষিক ও দৈনিক তাপপ্রসর যথাক্রমে ৫° ও ২০° ফাঃ-এর অনধিক। (খ) বৎসরের অধিকাংশ দিনই বৈকালে বজ্রপাতের সহিত পরিচলন বৃষ্টি হয়। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ৮০", তবে স্থানবিশেষে ২০০"-ও হইয়া থাকে। (গ) নিরক্ষীয় শান্তবলয়ে অবস্থিত হওয়ায় বৎসরের কোন সময়েই প্রবল বাত্যা অনুভূত হয় না। (ঘ) বায়ু সর্বদাই উষ্ণ ও আর্দ্র থাকে। (ঙ) উষ্ণ ও আর্দ্র ঋতু ভিন্ন অন্য কোন ঋতু নাই। তবে বৎসরে যে দুইবার (মার্চ ও সেপ্টেম্বর মাসে) সূর্য নিরক্ষবৃত্তের উপর লম্ব হয় তাহারই নিকটবর্তী

---

*৬০° উঃ হইতে ৯০° উঃ এবং ৬০° দঃ হইতে ৯০° দঃ অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ।

১। বিভিন্ন দেশের জলবায়ুর তুলনামূলক আলোচনার সুবিধার জন্য বৃষ্টিপাত ইঞ্চিতে এবং উত্তাপ ফারেনহাইটে প্রকাশ করা হইয়াছে।

সময়ে বৃষ্টিপাতের ঈষৎ আধিক্য ঘটে, আর যে দুইবার সূর্য ক্রান্তিবৃত্ত দুইটির উপর লম্ব হয় (জুন ও ডিসেম্বর মাসে) তাহার নিকটবর্তী সময়ে বৃষ্টিপাতের ঈষৎ স্বল্পতা অনুভূত হয়।

নিরক্ষীয় পরিমণ্ডল—মাসিক গড় উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত

স্থান : মানাওস্ (অ: ৩০°১৫' দ:), ব্রাজিল ; উচ্চতা : ১৩১'

মাস	জা	ফে	মা	এ	মে	জু	জু	আ	সে	অ	ন	ডি	প্রসর	বার্ষিক
উত্তাপ (°ফা:)	৭৮	৭৮	৭৮	৭৮	৭৮	৭৯	৭৯	৭৯	৮০	৮০	৮১	৮০	২'৭	
বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি)	৯'৮	৯'৬	১১'৮	১৩'০	৭'৫	৫ ১	৩'০	১'৮	১'৫	৩'৯	৬'৪	১'৩		৮'৩৭

উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তু—নিরক্ষীয় অঞ্চল বৎসরের সকল সময়েই উত্তাপের প্রাবল্য ও বৃষ্টির প্রাচুর্য হেতু কঠিন কাষ্ঠযুক্ত চিরহরিৎ বৃক্ষের নিবিড় অরণ্যে (hardwood evergreen forests) আবৃত। এখানকার গুল্মসমূহও অত্যন্ত ঘনসন্নিবিষ্ট, তবে তৃণভূমির একান্ত অভাব রহিয়াছে। নদীতীরবর্তী বন্যাপ্লাবিত নিম্নভূমি অঞ্চলে **ইগাপু,** অপেক্ষাকৃত দৃঢ়ভূমিতে **কা-গুয়াজু** বা **সেল্‌ভা** এবং উপকূল অঞ্চলে **তালজাতীয়** বৃক্ষ এই অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিদ্। এতদঞ্চলে অরণ্যের উপরিভাগে বৃক্ষশাখার আচ্ছাদন এত নিবিড় যে উহা ভেদ করিয়া সূর্যালোক বনের তলদেশে পৌছিতে পারে না, ফলে অরণ্যের অভ্যন্তর ভাগ অন্ধকারময় এবং অতিকায় লতা ও অন্যান্য আগাছাতে পরিপূর্ণ থাকে। এতদঞ্চলের উদ্ভিদ্ জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মরক্ষার জন্য ঊর্ধ্বদেশের ক্ষীণ আলো লক্ষ্য করিয়া দীর্ঘ হইয়া উঠিতে থাকে বলিয়া নিরক্ষীয় অঞ্চলের বৃক্ষাদি অতিশয় দীর্ঘ হইয়া থাকে। অরণ্যের অভ্যন্তরভাগ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে বলিয়া এতদঞ্চলের প্রায় সমস্ত প্রাণীই বৃক্ষশাখায় বসবাস করে। তাই সরীসৃপ ও বানর এই অঞ্চলের আদিম অধিবাসী। তবে বরাহ, টেপির, জাগুয়ার, পুমা, নানাপ্রকারের পক্ষী ও কীটপতঙ্গ অরণ্যাঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়।

মৃত্তিকা—সংবৎসরব্যাপী প্রবল উত্তাপ ও পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের ফলে মৃত্তিকার ধাতব উপাদানের ক্ষয় ও অপসারণ হেতু নিরক্ষীয় পরিমণ্ডলের মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত অনুর্বর। এই অঞ্চলের মৃত্তিকা সাধারণতঃ অম্লধর্মী পেডালফার শ্রেণীর অন্তর্গত রক্তবর্ণের ল্যাটেরাইট জাতীয়। তবে সামান্য অম্লধর্মী নূতন লাভার দ্রুত আবহবিকারের ফলে গঠিত উচ্চভূমি অঞ্চলের মৃত্তিকা (যেরূপ যবদ্বীপের মৃত্তিকা) এবং নদীতীরবর্তী অঞ্চলসমূহে নবগঠিত পলিসমৃদ্ধ মৃত্তিকা অথবা পর্বতের সানুদেশে সঞ্চিত শাংকব পলিভূমির মৃত্তিকা বিশেষ উর্বর হইয়া থাকে।

বৈষয়িক অবস্থা—বৈষয়িক দিক দিয়া নিরক্ষীয় অঞ্চলসমূহ অত্যন্ত অনুন্নত। কারণ, (১) এই অঞ্চলের উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু মনুষ্যবাসের প্রতিকূল,

(২) এই অঞ্চলে গৃহপালিত পশুর অভাব থাকায় পশুচারণ শিল্প গড়িয়া উঠে নাই, (৩) বৃক্ষগুলি কাটিয়া ফেলিলে এত শীঘ্র আবার জন্মাইয়া উঠে যে অরণ্য কাটিয়া কৃষিকার্য করাও অসম্ভব, (৪) এই অঞ্চল গভীর অরণ্যাকীর্ণ হওয়ায় যানবাহনের ব্যবস্থা সহজসাধ্য নহে, (৫) এতদঞ্চলের মৃত্তিকা বিশেষ উর্বর নহে এবং ভূমিক্ষয়ও ব্যাপক। এই সমস্ত অন্তরায় থাকায় এই অঞ্চলের অধিবাসীরা আদিম অবস্থা হইতে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। অধিবাসীরা সাধারণতঃ দুর্বল, অসভ্য এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের দাস। নিবিড় অরণ্যাকীর্ণ হইলেও কাষ্ঠের ব্যবসায়ে নিরক্ষীয় অঞ্চল তেমন উন্নত নহে। অধিবাসীরা প্রধানতঃ উঞ্ছ ও শিকারজীবী। তবে স্থানে স্থানে 'মিলপা' বা 'ফ্যাঙ' প্রথায় কৃষিকায পরিচালিত হইয়া থাকে।

এই অঞ্চলের রবার, গাটাপাচা, তালতৈল, নারিকেলের শাঁস, কোকো, হস্তিদন্ত, নাট, গঁদ, চিক্‌ল্, কুইনাইন, সার্সাপ্যারিলা, ভ্যানিলা, কফি, চিনি প্রভৃতি কৃষিজ ও বনজ দ্রব্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এত অধিক প্রয়োজনীয় এবং ইহাদের চাহিদা শিল্পপ্রধান নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে এত ব্যাপক যে এই সমস্ত দ্রব্য আহরণের জন্য এতদঞ্চলে বর্তমানে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কৃষিকায আরম্ভ হইয়াছে। নিরক্ষীয় এশিয়ার মালয়বাসী, জাভার অধিবাসী এবং বোর্নিওর অধিবাসীরা উঞ্ছ ও শিকার-বৃত্তির পরিবর্তে কৃষিকাযেই বর্তমানে মনোনিবেশ করিয়াছে কিন্তু কঙ্গো ও আমাজন নদীর অববাহিকার অন্তর্গত অধিবাসীরা অদ্যাবধি অনুন্নতই রহিয়া গিয়াছে।

শ্রমিক সরবরাহ এই অঞ্চলের প্রধানতম সমস্যা। কারণ, এই **দুর্বলতার অঞ্চলে** (Regions of Debilitation) বৈদেশিকদের পক্ষে বসতি-স্থাপন সম্ভব নহে এবং এই অঞ্চলের আদিম অধিবাসীরাও সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য করিয়া উৎপাদন ও রপ্তানীর প্রযোজনীয়তা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে না। তবে নিরক্ষীয় অঞ্চলের বৈষয়িক ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এ অঞ্চলে ধান ও ভুট্টা ভাল জন্মে এবং বর্তমানে রবার, চা, চিনি, ও কোকোর চাষ ভালই হইতেছে। এই অঞ্চলে কঙ্গো প্রভৃতি খরস্রোতা নদী হইতে প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপাদনেরও সুবিধা রহিয়াছে। নিরক্ষীয় অঞ্চলের স্থানবিশেষে মূল্যবান খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। এই সমস্ত খনিজ সম্পদের মধ্যে মালয় ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের রাং, মাদাগাস্কার এবং সিংহলের গ্রাফাইট ; ঘানার বক্সাইট ও ম্যাঙ্গানীজ এবং আফ্রিকার কাটাঙ্গা ও উত্তর রোডেশিয়ার তাম্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ক (২) স্যাভানা জলবায়ু-অধ্যুষিত পরিমণ্ডল

অবস্থান—নিরক্ষীয় ও উষ্ণমরু অঞ্চলের মধ্যভাগে সুদানী জলবায়ু অঞ্চল অবস্থিত। ইহা যেন দুইটি বিপরীত প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যভাগে

মকরক্রান্তি রেখা
ক. উষ্ণ মণ্ডল
খ. গ্রীষ্ম প্রধান নাতিশীতোষ
ক১ নিরক্ষীয় ও মৌসুমী অরণ্য-অঞ্চল
ক২ সুদানী জলবায়ু অঞ্চল
ক৩ মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চল
ক৪ ইকুয়েডর জলবায়ু অঞ্চল
ক৫ সাহারা জলবায়ু অঞ্চল
খ১ চৈনিক জলবায়ু অঞ্চল
খ২ ভূমধ্য সাগরীয় অ
খ৩ মহাদেশীয় নিম্নভূমি
খ৪ মহাদেশীয় উচ্চভূমি
খ৫ তিব্বতীয় জলবায়ু অ
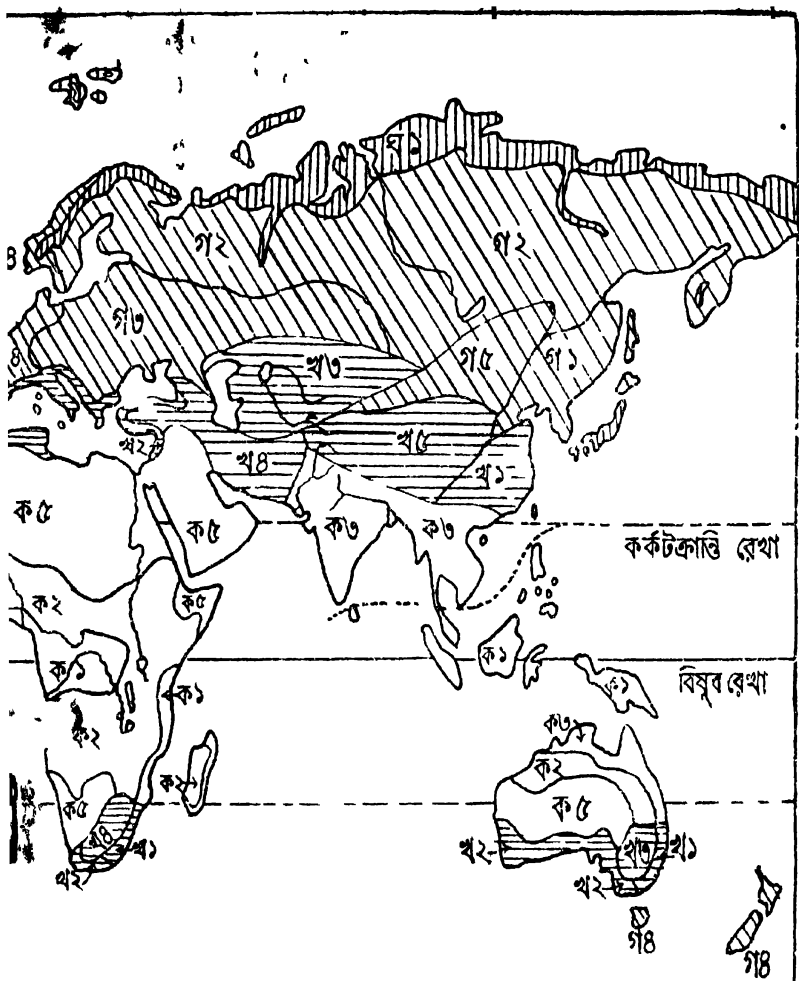
ষ্ণ মণ্ডল গ শীত প্রধান নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল ঘ. মেরু মণ্ডল

গ১ লরেন্সীয় জলবায়ু অঞ্চল	ঘ১ তুন্দ্রা অঞ্চল
গ২ মহাদেশীয় নিম্নভূমি অঞ্চল	ঘ২ মেরুদেশীয় উচ্চভূমি
গ৩ মহাদেশীয় নিম্নতৃণভূমি অঞ্চল	
গ৪ বৃটিশ জলবায়ু অঞ্চল	
গ৫ আল্টাই জলবায়ু অঞ্চল	

ঞ্চল
অঞ্চল
ঞ্চল

অবস্থিত এক বিস্তীর্ণ সন্ধিক্ষেত্র। নিরক্ষীয় জলবায়ুর উত্তর ও দক্ষিণ সীমা হইতে অল্পাধিক ১৫° পর্যন্ত এই পরিমণ্ডলটির প্রসার পরিলক্ষিত হয়। আফ্রিকার সুদান, রোডেশিয়া ও অ্যাঙ্গোলা; দঃ আমেরিকার আমাজন অববাহিকার উত্তরাংশ (ল্লানো) ও দক্ষিণাংশ (ক্যাম্পো) এবং উঃ ও উঃ-পূঃ অস্ট্রেলিয়া (কুইন্‌স্‌ল্যাণ্ডের মধ্যভাগ) এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

জলবায়ু—এই অঞ্চলে (১) দৈনিক ও ঋতুগত উষ্ণতার পার্থক্য অধিক (স্থানভেদে ১০° ফাঃ হইতে ৩০° ফাঃ পর্যন্ত)। (২) গ্রীষ্মকালীন গড়-উত্তাপ ৮০° হইতে ৯০° ফাঃ পর্যন্ত, শীতকালও উষ্ণ (গড়-উত্তাপ ৭০° হইতে ৭৮° ফাঃ পর্যন্ত)। (৩) স্থানভেদে বৃষ্টিপাতের তারতম্য দৃষ্ট হয়। বিষুব রেখার দিকে ১০০" বা ততোধিক, অপেক্ষাকৃত শুষ্ক অঞ্চলে ৪০" হইতে ৬৫" পর্যন্ত এবং মরুভূমির প্রান্তদেশে ১৫" বা তদপেক্ষাও অল্প বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাত গ্রীষ্মকালেই হয় এবং শীতকালে বায়ুমণ্ডল শুষ্ক থাকে। (৪) সারাবৎসরই প্রবল ধূলিঝড় সঞ্চালিত হয়। (৫) বৎসর সাধারণতঃ তিনটি ঋতুতে বিভক্ত—শুষ্ক শীত ঋতু, শুষ্ক উষ্ণ ঋতু এবং উষ্ণ আর্দ্র ঋতু। ইহারা পর্যায়ক্রমে আসে। এই জলবায়ু আফ্রিকার সুদানপ্রদেশে অত্যন্ত স্পষ্টরূপে অনুভূত হয় বলিয়া ইহাকে **সুদানী জলবায়ু** বলা হয়।

সুদানী পরিমণ্ডল—মাসিক গড় উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত

স্থান: তিম্বক্টু (অঃ ১৬'৩৭' উঃ) ফরাসী পঃ আফ্রিকা; উচ্চতা: ৮২০'

মাস	জা	ফে	মা	এ	মে	জু	জু	আ	সে	অ	ন	ডি	প্রসর	বার্ষিক
উত্তাপ (ফাঃ)	৭১	৭৪	৮৩	৯২	৯৪	৯৫	৮৯	৮৬	৮৯	৮৯	৮১	৭১	২৩·৪	
বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি)	০	০	০·১	০	০·৩	০·৯	৩·৫	২·৮	১·১	০·৪	০	০		৯·০

উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তু—এই অঞ্চলে প্রধানতঃ **দীর্ঘ তৃণ*** নিবিড়ভাবে জন্মে এবং মধ্যে মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষও দেখা যায়। এই তৃণভূমিকে **স্যাভানা** বা **ক্রান্তীয় তৃণভূমি** বলে। মরু-সন্নিহিত অঞ্চলে সামান্য ঘাস ও কাঁটার ঝোপ, ৪০" বৃষ্টিপাতযুক্ত স্থানে মধ্যে মধ্যে বৃক্ষযুক্ত বিস্তৃত তৃণভূমি, এবং ৬০" হইতে ৮০" পর্যন্ত বৃষ্টিযুক্ত স্থানে শাল, সেগুন প্রভৃতি পর্ণমোচী বৃক্ষ জন্মে। নিরক্ষীয় ও সামুদ্রিক অঞ্চলসন্নিহিত দেশসমূহে তৃণক্ষেত্রের মধ্যে মধ্যে বনভূমি দৃষ্ট হয়। বাবলা গাছ হইতে উৎপন্ন আরবী গঁদ এই অঞ্চল হইতে প্রচুর রপ্তানী হইয়া থাকে। তৃণভূমিতে জিরাফ, হরিণ, জেব্রা, অশ্ব প্রভৃতি দ্রুত সঞ্চরণশীল তৃণভোজী প্রাণী এবং সিংহ, চিতাবাঘ প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণীই প্রধান।

মৃত্তিকা—ক্রান্তীয় তৃণমণ্ডলের মৃত্তিকা সাধারণতঃ অম্লধর্মী পেডালফার শ্রেণীর অন্তর্গত রক্ত বা পীত বর্ণের ল্যাটেরাইট বর্গীয়। উষ্ণতা ও আর্দ্রতার

*বৃক্ষের জন্য সারাবৎসর ধরিয়াই আর্দ্রতার প্রয়োজন, কিন্তু তৃণের জন্য বসন্ত ও গ্রীষ্মকালের প্রারম্ভে বৃষ্টির এবং অন্যান্য সময়ে বায়ুমণ্ডলের শুষ্কতার প্রয়োজন।

একত্র সম্মিলনে রাসায়নিক ক্রিয়া দ্রুত হয় বলিয়া মৃত্তিকার জৈবাংশের প্রচুর ক্ষয় হইয়া থাকে। এই অঞ্চলের আর্দ্রতম অংশ হইতে শুষ্কতম অংশ পর্যন্ত মৃত্তিকার নানারূপ প্রকারভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে এই পরিমণ্ডলের অন্তর্গত অপেক্ষাকৃত শুষ্কাঞ্চলের মৃত্তিকা সাধারণতঃ উর্বর।

বৈষয়িক অবস্থা—এই অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রধানতঃ পশুপালক ও শিকারী। অপেক্ষাকৃত আদ্র এবং কৃত্রিম জলসেচব্যবস্থা-যুক্ত অঞ্চলসমূহে ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা, কার্পাস, ইক্ষু, বাদাম, নানা প্রকার তৈলবীজ এবং উষ্ণমণ্ডলের ফল জন্মে। সুদানী অঞ্চলকে **পরিশ্রমের অঞ্চল** (Regions of Effort) বলা হয়; কারণ এই অঞ্চলের অধিবাসীরা শারীরিক পরিশ্রম ব্যতীত জীবিকা অর্জন করিতে পারে না। ক্রান্তীয় তৃণভূমিসমূহের মধ্যে আফ্রিকার সুদান অঞ্চলই অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ এবং বাণিজ্যপরায়ণ।

শ্রমিক সমস্যা, যানবাহনের অসুবিধা, ব্যবসায় কেন্দ্র হইতে দূরত্ব এবং রাজনৈতিক গোলযোগের দরুণ ক্রান্তীয় তৃণভূমি অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হইতেছে। কিন্তু এই অঞ্চলের আর্থিক ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল। গ্রীষ্মকাল উত্তপ্ত এবং শীতকাল নাতিতীব্র হওয়ায়, জলসরবরাহের ব্যবস্থা করিতে পারিলে সারা বৎসর ধরিয়াই শস্যোৎপাদন সম্ভব। বর্তমানে এই অঞ্চলে কার্পাস ও তামাকের চাষ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। চামড়া, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা কফি, কার্পাস, তৈলবীজ, আরবী গঁদ, তামাক প্রভৃতি এই অঞ্চলের বাণিজ্যিক সম্পদ।

ক (৩) ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু-অধ্যুষিত পরিমণ্ডল

অবস্থান—ভারত, পূর্ব-পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোচীন, শ্যাম, এবং দক্ষিণ চীন সর্বতোভাবে ক্রান্তীয় মৌসুমীবায়ু প্রভাবান্বিত অঞ্চল। মাদাগাস্কার দ্বীপ, পূর্ব-আফ্রিকার উপকূলাঞ্চল, ক্যারিবীয়ান সাগর ও মেক্সিকো উপসাগরের উপকূলবর্তী দেশসমূহ, জাপান এবং পশ্চিম ও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কিয়দংশেও ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু দৃষ্ট হয়। মহাদেশ-সমূহের পূর্বপ্রান্তে আয়নবায়ুবলয়ের মধ্যেই এই জলবায়ু পরিস্ফুট।

জলবায়ু*—এই অঞ্চলে (১) সারা বৎসর ধরিয়া প্রবল উত্তাপ অনুভূত হয়। গ্রীষ্ম ও শীতকালীন গড়-উত্তাপ যথাক্রমে প্রায় ৯০° ও ৬০° ফাঃ।

* ক্রান্তীয় তৃণভূমি ও ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু মূলতঃ একই প্রকৃতির। দুইটিই ক্রান্তীয় অঞ্চলে পরিস্ফুট এবং দুইটিতেই আর্দ্র গ্রীষ্ম ও শুষ্ক শীতকাল পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ক্রান্তীয় তৃণভূমি অঞ্চলের বৃষ্টিপাত সূর্য ও চাপ বলয়ের স্বাভাবিক স্থান পরিবর্তন হেতু ঘটিয়া থাকে আর ক্রান্তীয় মৌসুমী অঞ্চলের বৃষ্টিপাত হয় স্থানীয় কারণে স্বাভাবিক বায়ু বলয়ের সম্পূর্ণ বিপর্যয় হেতু।

(২) মৌসুমীবায়ু প্রবাহের ফলে গ্রীষ্মকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং শীতকাল প্রায় শুষ্ক থাকে। বার্ষিক গড-বৃষ্টিপাত প্রায় ৫০'-৭৫'। অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতির তারতম্য অনুসারে উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। (৩) তিনটি মূল ঋতুর সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়—প্রায় বৃষ্টিহীন শীতকাল, রুক্ষ গ্রীষ্মকাল এবং বর্ষাকাল।

ক্রান্তীয় মৌসুমী পরিমণ্ডল—মাসিক গড় উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত
স্থান: বোম্বাই (অ: ১৮°৫৫' উ:) ভারত, উচ্চতা: ৩৭'

মাস	জা	ফে	মা	এ	মে	জু	জু	আ	সে	অ	ন	ডি	প্রসর	বার্ষিক
উত্তাপ (°ফা:)	৭৫	৭৫	৭৮	৮২	৮৫	৮২	৭৯	৭৯	৭৯	৮১	৭৯	৭৬	১০.১	
বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি)	০.১	০	০	০.১	০.৫	২০.৬	২৪.৬	১৪.৯	১০.১	১.৮	০.৫	০.১		৭৪.১

উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তু—এতদঞ্চলে ৮০'র অধিক বৃষ্টিযুক্ত স্থানে চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য, ৮০'-৪০' পর্যন্ত বৃষ্টিযুক্ত স্থানে পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য এবং ৪০'র অনধিক বৃষ্টিযুক্ত স্থানে নাতিদীর্ঘ তৃণগুল্ম পরিলক্ষিত হয়। কৃষিজ উদ্ভিদের মধ্যে ধান, জোয়ার, বাজরা, পাট, চা, ইক্ষু, কার্পাস, কফি, কোকো, নীল, তামাক, রবার, তৈলবীজ, কলাই প্রভৃতি প্রধান। গভীর বনে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, চিতাবাঘ, প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণী এবং হরিণ, গণ্ডার, হস্তী প্রভৃতি তৃণভোজী জন্তু বাস করে।

মৃত্তিকা—অন্যান্য ক্রান্তীয় অঞ্চলের ন্যায় মৌসুমী অঞ্চলের মৃত্তিকাও নানা প্রকারের হইয়া থাকে। তবে রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণের মৃত্তিকার প্রাধান্যই এতদঞ্চলে অধিক।

বৈষয়িক অবস্থা—কৃষিকার্য মৌসুমী অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। কৃষিকার্যের সুবিধা এবং জীবনধারণের উপযোগী সর্বপ্রকার খাদ্যের প্রাচুর্য থাকায় মৌসুমী অঞ্চলে লোক[illegible]ন। কৃষিশিল্পে এবং জনসংখ্যা-বণ্টনে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পৃথিবীতে [illegible]র করে। অরণ্যাকীর্ণ অঞ্চলে **বনজ শিল্পের** প্রসার দৃষ্ট হয়। ব্রহ্ম ও শ্যামদেশের সেগুন কাষ্ঠ এবং ভারতের চন্দন কাষ্ঠ ও লাক্ষা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঘন লোকবসতি এবং বিস্তৃত তৃণভূমির অভাব এই অঞ্চলের **পশুচারণ** শিল্পের প্রসারকে ব্যাহত করে। ব্রহ্মদেশ, ভারত এবং চীনদেশে **খনিজ শিল্প** ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতেছে। মৌসুমী অঞ্চলে **যন্ত্রশিল্প** তাদৃশ প্রসার লাভ করে নাই। খাদ্যদ্রব্য এবং কাঁচামাল উৎপন্ন করিয়া শিল্পপ্রধান পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহে রপ্তানী করা এবং আঞ্চলিক ভোগের জন্য পশ্চিম ইউরোপ হইতে শিল্পজাত দ্রব্য আমদানী করা মৌসুমী অঞ্চলসমূহের প্রধান কার্য। তবে বর্তমানে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের শিল্প-চেতনা ক্রমশঃই বৃদ্ধি

পাইতেছে। মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলকে **বৃদ্ধির অঞ্চল** (Regions of Increment) বলা হয়, কারণ অতি সামান্য পরিশ্রমেই মানুষ প্রকৃতি হইতে প্রচুর ফল লাভ করিয়া থাকে।

ক (৪) ইকুয়েডর দেশীয় জলবায়ু-অধ্যুষিত উপমণ্ডল

দক্ষিণ আমেরিকার ইকুয়েডর ও কলম্বিয়া এই অঞ্চলের অন্তর্গত। নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত হইলেও পার্বত্য **অবস্থান** হেতু এই অঞ্চলের উত্তাপ নিম্নভূমি অঞ্চল অপেক্ষা কম। উত্তাপ সারাবৎসর ধরিয়াই প্রায় সমান থাকে। বৃষ্টিপাতও সামান্য। তবে বৃষ্টিপাতের ঋতুগত বৈষম্য পরিলক্ষিত

ইকুয়েডর দেশীয় উপমণ্ডল—মাসিক গড় উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত

স্থান : কুইটো (অ: ০°১৪ দ:), ইকুয়েডর, উচ্চতা : ৯৩৫০′

মাস	জা	ফে	মা	এ	মে	জু	জু	আ	সে	অ	ন	ডি	প্রসর	বার্ষিক
উত্তাপ (°ফা:)	৫৫	৫৫	৫৫	৫৫	৫৫	৫৫	৫৫	৫৫	৫৫	৫৫	৫৪	৫৫	০.৭	
বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি)	৩২	৩'৯	৪৮	৭০	৪৬	১৫	১১	২২	২৬	৩০	৪০	৩৬		৪২ ৩

হয়। পর্বতগাত্রের যে সমস্ত স্থানে আরামপ্রদ **চিরবসন্ত** বিরাজমান সাধারণতঃ সেই সকল স্থানেই অধিবাসীরা বসতি স্থাপন করিয়াছে। এই অঞ্চলের **প্রাকৃতিক উদ্ভিদ্** অতি সামান্য। **কৃষিজ উদ্ভিদের** মধ্যে গম যব এবং ভুট্টাই প্রধান। পাহাড়ের গায়ে বিস্তীর্ণ চারণক্ষেত্রে গবাদি পশু ও মেষ প্রতিপালিত হয়।

ক (৫) উষ্ণমরুদেশীয় জলবায়ু-অধ্যুষিত পরিমণ্ডল

অবস্থান—২০° হইতে ৩০° উত্তর ও দক্ষিণ সমাক্ষরেখার মধ্যে কর্কট-ক্রান্তির নিকটে অবস্থিত আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি, এশিয়ার আরবের মরুভূমি ও ভারতবর্ষের থর মরুভূমি, উত্তর আমেরিকার কলোরাডো ও মেক্সিকোর মরুভূমি এবং মকরক্রান্তির নিকটে অবস্থিত পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমি, আফ্রিকার কালাহারী মরুভূমি ও দক্ষিণ আমেরিকার আটাকামা মরুভূমি এই অঞ্চলের অন্তর্গত। অধিকাংশ উষ্ণ মরুভূমি মহাদেশের পশ্চিমাংশে অবস্থিত।

উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের এই অঞ্চলসমূহ যথাক্রমে উ: পু: ও দ: পু: আয়ন বায়ুর দ্বারা প্রভাবিত। এই বায়ু ভূমিভাগের উপর দিয়া প্রবাহিত হয় এবং পশ্চিম প্রান্তে পৌছিবার বহু পূর্বেই জলকণাহীন হইয়া পড়ে। সেই হেতু আয়ন বায়ু বলয়ের পশ্চিমাংশে উষ্ণ মরু অঞ্চলের সৃষ্টি হইয়াছে। এই কারণে এই উষ্ণ মরুদেশীয় পরিমণ্ডলকে আয়ন বায়ু বলয়ের অন্তর্গত মরুভূমিও (Trade wind deserts) বলা হয়।

জলবায়ু—চরমভাবাপন্ন জলবায়ু উষ্ণ মরু অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই অঞ্চলে (১) গ্রীষ্ম ও শীতকালীন গড়-উত্তাপ যথাক্রমে প্রায় ৯০° ফা: এবং ৩০° ফা:। আকাশ মেঘহীন থাকায় এ অঞ্চলে দিবাভাগ অত্যন্ত গরম এবং রাত্রিকাল শীতল। দৈনিক সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন উত্তাপের তারতম্য ৬০° ফা: বা তদূর্ধ্ব। সমুদ্রসন্নিহিত অঞ্চল সমূহের এবং দক্ষিণ গোলার্ধের উষ্ণমরু অঞ্চলের জলবায়ু অপেক্ষাকৃত মৃদু। (২) বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২০'র কম—অনেক স্থান বৃষ্টিহীন। কোন কোন স্থানে পাঁচ বৎসরে ৫'-১০ বৃষ্টিপাত হয়। মরু অঞ্চলের উত্তর প্রান্তে শীতকালে এবং দক্ষিণ প্রান্তে গ্রীষ্মকালে সামান্য বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে।

উষ্ণ মরুদেশীয় পরিমণ্ডল—মাসিক গড় উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত

স্থান : জাকোবাবাদ (অ: ২৮ ১৭ উ:), প: পাকিস্তান উচ্চতা : ১৮৬'

মাস	জা	ফে	মা	এ	মে	জু	জু	আ	সে	অ	ন	ডি	প্রসর	বার্ষিক
উত্তাপ (°ফা:)	৫৭	৬২	৭৫	৮৬	৯২	৯৮	৯৫	৯১	৮৯	৭৯	৬৮	৫৯	৪১	
বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি)	•৩	•৩	•৩	•২	•১	•২	১•০	১	•৩	•০	•১	•১		৪ ৯

উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তু—উষ্ণ মরুভূমিতে শুষ্ক তৃণ ও ছোট ছোট কাঁটা ঝোপ জন্মিয়া থাকে। উষ্ণ মরু অঞ্চলের উদ্ভিদ্‌সমূহ দীর্ঘমূল ও তৈলাক্ত পত্রবিশিষ্ট হইয়া থাকে। মরূদ্যান অঞ্চলে খেজুর, কার্পাস, ধান, ইক্ষু, বাজরা, জোয়ার, টোমাটো, তামাক এবং তরমুজ প্রভৃতি নানাবিধ ফল জন্মে। উষ্ণ মরুভূমির প্রধান জন্তু উট। ছাগল ও অশ্বতর এই অঞ্চলে দৃষ্ট হয়।

মৃত্তিকা—উষ্ণ মরু অঞ্চলে প্রধানতঃ ক্ষারধর্মী পেডোক্যাল শ্রেণীর অন্তর্গত পিঙ্গল বর্ণের মৃত্তিকাই পরিলক্ষিত হয়। ইহা লঘু ও মিহি এবং প্রায় জৈবাংশ বর্জিত। তবে মরু অঞ্চলের প্রত্যন্ত ভাগে ঈষৎ বাদামী আভাযুক্ত পিঙ্গল বর্ণের মৃত্তিকাও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতেও জৈবাংশের ভাগ অতি সামান্য। সুপরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং নাইট্রোজেন ঘটিত সারের ব্যবহার-দ্বারা এই অঞ্চলের মৃত্তিকায় কৃষিকার্য সম্ভব।

বৈষয়িক অবস্থা—মরুভূমি অঞ্চলে লোকবসতি অত্যন্ত বিরল। জীবিকা অর্জনের পদ্ধতির তারতম্য অনুসারে মরু অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধানতঃ যাযাবর, মরূদ্যানের স্থায়ী অধিবাসী এবং খনির শ্রমিক এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। মরূদ্যানের স্থায়ী অধিবাসীরা কৃষিকার্য ও পশু-পালনের সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে। এই অঞ্চলসমূহ অত্যন্ত অনুন্নত। দক্ষিণ গোলার্ধের কোন কোন উষ্ণ মরু অঞ্চলে প্রচুর খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার স্বর্ণ, সীসক ও দস্তা, দক্ষিণ আমেরিকায় চিলির নাইট্রেট ও তাম্র, পেরুর খনিজ তৈল এবং আফ্রিকার কিম্বার্লির তাম্র ও হীরক খনি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উত্তর গোলার্ধের সাহারা মরু

অঞ্চলে লবণ, কলোরাডো অঞ্চলে স্বর্ণ এবং ইরাকে খনিজ তৈল পাওয়া যায়। উষ্ণ মরু অঞ্চলকে **স্থায়ী কষ্টের অঞ্চল** (Regions of Lasting Difficulties) বলা হয়

খ (১) চৈনিক জলবায়ু-অধ্যুষিত পরিমণ্ডল

অবস্থান—মহাদেশের পূর্বপ্রান্তে মোটামুটিভাবে ৩০° হইতে ৪৫° উঃ ও দঃ সমাক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্বাংশ, দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্ব ব্রাজিল ও উরুগুয়ে, আফ্রিকার নাটাল, অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ পূর্ব উপকলাঞ্চল এবং উত্তর ও মধ্য চীন এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

জলবায়ু—এই অঞ্চলে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ জলবায়ু বর্তমান। তবে মোটামুটি ভাবে বলা যাইতে পারে যে এই অঞ্চলে—(১) বার্ষিক তাপপ্রসর ক্রান্তীয় মৌসুমী অঞ্চল অপেক্ষা অধিক। (২) সারাবৎসর ধরিয়াই বৃষ্টিপাত হয়, তবে গ্রীষ্মকালে আয়ন বায়ুপ্রবাহের ফলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অধিক এবং শীতকালে প্রত্যায়ন বায়ুপ্রবাহের ফলে অতি অল্প পরিমাণ ঘূর্ণিবৃষ্টি হইয়া থাকে। (৩) এই অঞ্চলে প্রায়শঃই ক্ষতিকারক প্রবল ঝড়ো অনুভূত হয়। চীন, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের উপকূলাঞ্চলে 'টাইফুন', দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রে 'নর্দার', আর্জেন্টিনার পূর্বপ্রান্তে 'প্যাম্পেরো' ও 'জোণ্ডা', অস্ট্রেলিয়ার 'সাদার্নিবার্স্টার, ভিক্টোরিয়ার 'ব্রিকফিল্ডার্স' প্রভৃতি ঘূর্ণিবৃষ্টি উল্লেখযোগ্য।

যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণপূর্বাংশে সারাবৎসরই বৃষ্টিপাত হয়, তবে গ্রীষ্মকালে উঃ আমেরিকার মধ্যভাগে নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে জলকণাসম্পৃক্ত উপসাগরীয় বায়ুপ্রবাহের ফলে বৃষ্টিপাতের আধিক্য ঘটিয়া থাকে। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৭০"-৬০" পর্যন্ত। গ্রীষ্ম ও শীতকালীন গড়-উত্তাপ যথাক্রমে ৮০° ও ৪৭° ফাঃ। এই অঞ্চলের জলবায়ুকে 'উপসাগরীয় জলবায়ু'ও বলা হয়।

উপসাগরীয় জলবায়ু—মাসিক গড় উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত

স্থান : চার্লসটন (অঃ ৩২° ৪৮' উঃ), দক্ষিণ ক্যারোলিনা, যুক্তরাষ্ট্র

মাস	জা	ফে	মা	এ	মে	জু	জু	আ	সে	অ	ন	ডি	প্রসর	বার্ষিক
উত্তাপ (ফা°)	৫০	৫২	৫৮	৬৫	৭৩	৭৯	৮২	৮১	৭৭	৬৮	৫৮	৫১	৩১ ৪	
বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি)	৩০	৩১	৩৩	২৪	৩৩	৫'১	৬২	৬'৫	৫'০	৩৭	২৫	৩২		৪৭৩

উত্তর ও মধ্য চীনে গ্রীষ্মকালে মহাসাগরীয় আর্দ্র মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ এশিয়ার অভ্যন্তরস্থ নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে প্রবাহিত হইবার কালে সামান্য বৃষ্টিপাত ঘটায়। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড় ২৫"-৪৫" পর্যন্ত। এদিকে শীতের প্রাধান্য ভারত অপেক্ষা অধিক। গ্রীষ্ম ও শীতকালীন গড় উত্তাপ যথাক্রমে ৮০° ও ২৫° ফাঃ। এই অঞ্চলের জলবায়ুকে 'চৈনিক জলবায়ু' বলে। অস্ট্রেলিয়ার

চৈনিক জলবায়ু—বার্ষিক গড় উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত

স্থান: সাংহাই (অঃ ৩১° ১৫' উঃ), চীন

মাস	জা	ফে	মা	এ	মে	জু	জু	আ	সে	অ	ন	ডি	প্রসর	বার্ষিক
উত্তাপ (ফাঃ)	৩৮	৩৯	৪৬	৫৬	৬৬	৭৫	৮০	৮০	৭৩	৬৩	৫২	৪২	৪২৮	
বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি)	৮ ২ ০ ৩ ৯ ৪ ৪ ৭ [illegible] ৬ ৭ ৪ ৪ ৭ ৩ ৯ ৩ ৭ ১ ৭ ১ ৩													৪৫ ৮

দঃ পূঃ উপকূলভাগের এইরূপ জলবায়ুকে 'ইস্টেলীয় জলবায়ু' বলা হয়। এই পরিমণ্ডলের অন্তর্গত দঃ গোলার্ধের দেশসমূহে স্থলভাগের সংকীর্ণতা হেতু বার্ষিক তাপপ্রসর সামান্য।

অস্ট্রেলীয় জলবায়ু—মাসিক গড় উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত

স্থান: সিডনী (অঃ ৩৩° ৫৫' দঃ), অস্ট্রেলিয়া

মাস	জা	ফ	মা	এ	মে	জু	জু	আ	সে	অ	ন	ডি	প্রসর	বার্ষিক
উত্তাপ (ফাঃ)	৭২	৭১	৬৯	৬৫	৫৯	৫৪	৫২	৫৫	৫৯	৬২	৬৭	৭০	২০	
বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি)	৩ ৬ ১ ৪ ৪ ৯ ৫ ১ ১ ১ ৮ ৫.০ ৩ ০ ২ ৯ ২ ৯ ১ ৮ ২ ৮													৪৭ ৭

এই জলবায়ু বহুলাংশে ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ুর ন্যায় বলিয়া ইহাকে **উপক্রান্তীয় মৌসুমী বা মন্দোষ্ণ পূর্ব উপকূলীয়** (Warm Temperate East Coast) **জলবায়ু** বলা হয়।

উদ্ভিদ্—এই অঞ্চলের সমভূমি অংশে পর্ণমোচী বৃক্ষ ও পার্বত্য অংশে সরলবর্গীয় বৃক্ষের নিবিড় অরণ্য দৃষ্ট হয়। ওক, মেপল, আকরোট, হিকোরী প্রভৃতি বহু মূল্যবান কাষ্ঠ এবং ফার্ন, কর্পূর, বাঁশ প্রভৃতি সম্পদ এই অঞ্চলের অরণ্যে পাওয়া যায়। কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে উষ্ণ ও আর্দ্র স্থানে ধান, কার্পাস, ইক্ষু, চা এবং শীতল ও অপেক্ষাকৃত অল্পবৃষ্টিযুক্ত স্থানে গম, ভুট্টা প্রভৃতি প্রধান।

মৃত্তিকা—এই অঞ্চলের মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত অনুর্বর রক্ত ও পীতবর্ণের 'পেডালফার' বর্গীয়। মৃত্তিকায় কৃত্রিম সারের ব্যবহার ব্যতীত বাণিজ্যিক কৃষিকার্য সম্ভব নহে। তবে বদ্বীপ ও প্লাবনভূমি অঞ্চলের মৃত্তিকা পলিসমৃদ্ধ বলিয়া বিশেষ উর্বর

বৈষয়িক অবস্থা—বসতিস্থাপন এবং অর্থনৈতিক উন্নতি সম্পর্কে এই অঞ্চলের প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে। উত্তর ও মধ্য চীনে প্রচুর ধান, কার্পাস, চা এবং রেশম উৎপন্ন হয় এবং ইহা পৃথিবীর অন্যতম বসতিপূর্ণ অঞ্চল। যুক্তরাষ্ট্রের উপসাগরীয় অঞ্চলে পৃথিবীর অধিকাংশ কার্পাস এবং ভুট্টা উৎপন্ন হয়। নাটালে ইক্ষু, চা, ধান, আনারস প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ আমেরিকার এই অঞ্চলের অধিবাসীরা অধিকাংশই পশুপালক, যদিও সামান্য পরিমাণে দ্রাক্ষা, ইক্ষু, ভুট্টা প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। একসঙ্গে পশুপালন, কৃষি এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যের উৎপাদন নিউ সাউথ ওয়েল্‌সের অধিবাসীদের প্রধান

উপজীবিকা। দক্ষিণ জাপান ভিন্ন এই অঞ্চলেব অন্তর্গত অন্য কোন দেশে যন্ত্রশিল্প তেমন প্রসাবলাভ করে নাই। ধান, গম, ইক্ষু, কার্পাস, তামাক, চা, এবং রেশম এই অঞ্চলেব প্রধান বাণিজ্যিক দ্রব্য

খ (২) ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু-অধ্যুষিত পরিমণ্ডল

অবস্থান—মহাদেশসমূহেব পশ্চিম প্রান্তে মোটামুটি ৩০° হইতে ৪৫° উত্তর ও দক্ষিণ সমাক্ষবেখার মধ্যে অবস্থিত ইউবোপ, আফ্রিকা ও এশিয়াব ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশসমূহ (স্পেন, পর্তুগাল, দক্ষিণ ফ্রান্স, ইতালী, যুগোশ্লাভিযা, বলকান উপদ্বীপ, সিরিয়া এবং উত্তব আফ্রিকা), উত্তব আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া, দক্ষিণ আমেবিকাব মধ্য-চিলি, আফ্রিকাব দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ, অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্বাংশ এবং নিউজীল্যাণ্ডেব উত্তব দ্বীপ এই অঞ্চলেব অন্তর্গত।

জলবায়ু—ভূমধ্যসাগবেব চতুষ্পার্শ্বস্থ দেশসমূহ গ্রীষ্মকালে শুষ্ক আযন বায়ু এবং শীতকালে আর্দ্র প্রত্যায়ন বায়ুবলয়েব অন্তর্গত হওয়ায় এ অঞ্চলে গ্রীষ্মকাল শুষ্ক এবং শীতকাল আর্দ্র। বার্ষিক গড-বৃষ্টিপাত স্থানভেদে ১০ হইতে ৪০" পর্যন্ত হইয়া থাকে। মরুভূমি-সন্নিহিত অঞ্চলে বৃষ্টিপাত সাধারণতঃ ১০" বা তৎস্থানীয়। (২) ভূমধ্যসাগবীয় অঞ্চল গ্রীষ্মকালে গবম (গড়-উত্তাপ প্রায় ৯০° ফাঃ), কিন্তু শীতকালে মৃদু শীতল (গড-উত্তাপ প্রায় ৫০° ফাঃ)। (৩) সারা বৎসর ধবিযা, বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে, আকাশ মেঘমুক্ত থাকে এবং দিনগুলি সূর্যকিবণোজ্জ্বল। (৪) এই অঞ্চলে বসন্তকালে এবং গ্রীষ্মকালের প্রাবম্ভে প্রবল বাত্যা অনুভূত হয়। সিসিলি ও ইতালীব 'সিবোক্কো', ক্যালিফোর্নিয়াব 'ওয়া' প্রভৃতি বাত্যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইউরোপেব ভূমধ্যসাগবীয় অঞ্চলে এই সময়ে উত্তর দিক হইতে প্রবাহিত শুষ্ক শীতল বায়ুব প্রকোপ দেখা যায। ফ্রান্সে ইহাকে 'মিস্ট্রাল' এবং ডালমাসিযা অঞ্চলে ইহাকে 'বোবা' বলা হয়।

ভূমধ্যসাগরীয় পবিমণ্ডল—মাসিক গড উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত

স্থান : আলজিয়ার্স (অঃ ৩৬°৪' উঃ) উঃ আফ্রিকা, উচ্চতা : ৭২'

মাস	জা	ফে	মা	এ	মে	জু	জু	আ	সে	অ	ন	ডি	প্রসর	বার্ষিক
উত্তাপ (°ফাঃ)	৫৩	৫৫	৫৪	৬১	৬৬	৭১	৭৭	৭৮	৭৫	৬৮	৬২	৫৬	২৪·১	
বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি)	৪ ২	৩ ৫	৩ ৫	২·৩	১ ৩	০ ৬	০·১	০ ৩	১ ১	৩ ১	৪ ৬	৫ ৪		৩০ ০

উদ্ভিদ্—শীতকালেই এখানকার বৃক্ষলতাদি জন্মে। ছোট ছোট বৃক্ষ এবং ঝোঁপঝাড়ই এতদঞ্চলে অধিক। যে সমস্ত অঞ্চলে অধিক জল পাওয়া যায় সেখানে ওক এবং চিরহরিৎ বৃক্ষ জন্মে। বায়ুমণ্ডলের শুষ্কতা হেতু উদ্ভিদ্ দেহে

নিয়ত প্রস্বেদন চলে বলিয়া এতদঞ্চলের উদ্ভিদসমূহ প্রস্বেদন রোধ করিবার জন্য দীর্ঘমূল ও তৈলাক্ত পত্রবিশিষ্ট হইয়া থাকে। কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে গম, যব, তুঁত, ভুট্টা এবং আঙ্গুর, আপেল, কমলালেবু, জলপাই, ন্যাসপাতি, লেবু, পীচ প্রভৃতি নানাবিধ ফল ও বহুপ্রকারের ফুল এই অঞ্চলে প্রচুর জন্মে। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলসমূহ ফলের জন্য প্রসিদ্ধ।

মৃত্তিকা—এতদঞ্চলের মৃত্তিকা প্রধানতঃ ক্ষারধর্মী পেডোক্যাল বর্গীয়। মৃত্তিকায় উদ্ভিদখাদ্য খনিজ দ্রব্যের প্রাচুর্য থাকলেও জৈবাংশের পরিমাণ অতি সামান্য। তবে ক্ষেত্রে নাইট্রোজেন ঘটিত সারের প্রয়োগ করিয়া বাণিজ্যিক কৃষিকার্য সম্ভব। ভূমিক্ষয় অধিক হওয়ায় পর্বতগাত্রের মৃত্তিকা সাধারণতঃ অনুর্বর তবে নিম্নভূমি অঞ্চলের মৃত্তিকা পর্বতগাত্র-বাহিত পলির দ্বারা সমৃদ্ধ হওয়ায় বিশেষ উর্বর।

বৈষয়িক অবস্থা—এই অঞ্চলের অরণ্যসমূহ **বনজ** সম্পদে সমৃদ্ধ নহে। দক্ষিণ-পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার ভূমধ্যসাগরীয় অরণ্য হইতে 'জারা' কাষ্ঠ, পর্তুগালের অরণ্য হইতে 'কর্ক' এবং অন্যান্য অরণ্যাঞ্চল হইতে নানা শ্রেণীর বাদাম ও সুপারি জাতীয় ফলের আহরণ উল্লেখযোগ্য। গ্রীষ্মকালীন শুষ্ক জলবায়ুর প্রভাবে এতদঞ্চলে **ফল** আহরণ ও শুষ্কীকরণ এবং তৎসংক্রান্ত নানাবিধ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। **কৃষিই** ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। এই অঞ্চলে তৃণ ভাল জন্মে না বলিয়া **পশুচারণ** লাভজনক নহে। অনুকূল জলবায়ু যুক্ত অঞ্চলে অতি সামান্য পরিমাণে গবাদি পশু, মেষ, অশ্ব, শূকর প্রভৃতি পালিত হয়। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে কয়লা একরূপ দুষ্প্রাপ্য বলিয়া বৃহদাকারের **যন্ত্রশিল্প** এই অঞ্চলে গড়িয়া উঠে নাই। মদ্য তৈয়ারী, সাবান, চিনি ও রেশম শিল্পের প্রসার এই অঞ্চলে ব্যাপক। খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চলে (যেমন ক্যালিফোর্নিয়াতে স্বর্ণ ও খনিজ তৈল, ইটালীতে মর্মর, গন্ধক প্রভৃতি) খনিজ শিল্প সঙ্ঘবদ্ধভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। জলবায়ু অনুকূল বলিয়া চলচ্চিত্র শিল্প এখানে ব্যাপকভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। ক্যালিফোর্নিয়ার লস্ এঞ্জেলস্-এ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র-কেন্দ্র হলিউড্ অবস্থিত। মৌসুমী অঞ্চলের ন্যায় এই অঞ্চলকেও **বৃদ্ধির অঞ্চল** বলা হয়। কাষ্ঠ, কর্ক, রেশম, মদ্য, ফল ও ফুল এই অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্যিক উপকরণ।

খ (৩-৫) মধ্য-অক্ষাংশের মরুমণ্ডল

এই পরিমণ্ডলটির অবস্থান সম্পর্কে দুইটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথমতঃ ইহা মহাদেশীয় ভূমিভাগের অভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ এবং দ্বিতীয়তঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহা মালভূমি অধিকার করিয়া বিদ্যমান। চারিদিকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া ইহা যেন **জলবায়ুর**

একটি বিরাট **সন্ধিক্ষেত্র** সৃষ্টি করিয়াছে। এই পরিমণ্ডলের অন্তর্গত বিভিন্ন ক্ষেত্রে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৫"র অনধিক এবং বৃষ্টিপাত প্রধানতঃ গ্রীষ্মকালেই হইয়া থাকে। উচ্চতর ভূখণ্ডে বৃষ্টিপাতের পরিবর্তে তুষারপাত পরিলক্ষিত হয়। সাধারণতঃ গ্রীষ্ম ও শীতকালীন গড় উত্তাপ যথাক্রমে ৭০° ও ২৫° ফাঃ, তবে স্থানভেদে ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। দৈনিক ও বার্ষিক তাপপ্রসর অত্যন্ত অধিক। এই অঞ্চলের **মৃত্তিকা** পিঙ্গলবর্ণের পেডোক্যাল বর্গীয়। এই মৃত্তিকা উদ্ভিদ্‌খাদ্য খনিজ দ্রব্যে সমৃদ্ধ হইলেও কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য ক্ষেত্রে জৈবাংশ-প্রধান সারের ব্যবহার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

এই পরিমণ্ডলটির অন্তর্গত বিভিন্ন ক্ষেত্রের উচ্চাবচতা ও দেশান্তরের পার্থক্য অনুযায়ী জলবায়ুরও নানারূপ পার্থক্য ঘটিয়া থাকে বলিয়া এই পরিমণ্ডলটিকে তুরানী, ইরানী ও তিব্বতী এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।

খ (৩) তুরানী জলবায়ু-অধ্যুষিত পরিমণ্ডল

ইউরেশিয়ার অন্তর্গত কাস্পিয়ান ও আরল সাগর হইতে মধ্য-এশিয়ার পর্বতাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত নিম্নভূমি (তুর্কীস্থান বা তুরান), দক্ষিণ আমেরিকার পারানা নদীর পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত নিম্নভূমি, অস্ট্রেলিয়ার মারে-ডার্লিং নদীর অববাহিকার অন্তর্গত নিম্নভূমির কিয়দংশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য পশ্চিমাঞ্চলের কতক স্থান এই অঞ্চলের অন্তর্গত। অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতি অনুসারে এই অঞ্চলের **জলবায়ুর** বিশেষ তারতম্য অনুভূত হয়, তবে এই অঞ্চলে (১) গ্রীষ্মকালীন উত্তাপ অত্যন্ত প্রখর এবং শীতকালীন উত্তাপ হিমাঙ্ক পর্যন্ত নামিয়া আসে। (খ) এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাত অতি সামান্য এবং তাহা গ্রীষ্মকালেই

তুরানী পরিমণ্ডল—মাসিক গড় উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত

স্থান : লুকচুন (তারিম অববাহিকা), তুর্কীস্থান, চীন ; উচ্চতা : ৫০'

মাস	জা	ফে	মা	এ	মে	জু	জু	আ	সে	অ	ন	ডি	প্রসর	বার্ষিক
উত্তাপ (°ফাঃ)	১৩	২৭	৪৬	৬৬	৭৫	৮৫	৯০	৮৫	৭৪	৫৬	৩৩	১৮	৭৭	
বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি)	পরিমাণ অজ্ঞাত													

সীমাবদ্ধ। বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে **তৃণ** এবং বৃষ্টিবিরল অঞ্চলে **গুল্ম** জন্মিয়া থাকে। এই অঞ্চলের অন্তর্গত দেশসমূহ অত্যন্ত **অনুন্নত**। **পশুচারণই** অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। অপেক্ষাকৃত আর্দ্র অঞ্চলে সেচব্যবস্থার সাহায্যে সামান্য পরিমাণে ভুট্টা, গম, যব, কার্পাস, ফল প্রভৃতি **কৃষিজ** দ্রব্য উৎপাদন করা হয়।

খ (৪) ইরানী জলবায়ু-অধ্যুষিত পরিমণ্ডল

মধ্য-মেক্সিকো, দক্ষিণ-পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনার পশ্চিমাংশ এবং এশিয়া মাইনর, আর্মেনিয়া, কুর্দিস্থান, পারস্য, গোবি মরুভূমি, আফগানিস্থান

এবং বেলুচিস্তানের মধ্যভাগের উচ্চ মালভূমি (ইরান) অঞ্চলসমূহ ইহার অন্তর্গত। জলবায়ু হিসাবে প্যাটাগোনিয়াকেও ইহার অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

ইরানী পরিমণ্ডল—মাসিক গড় উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত

স্থান: তেহরান (অঃ ৩৫ ৪১′ উঃ), পারস্য, উচ্চতা: ৪'০২′

মাস	জা	ফে	মা	এ	মে	জু	জু	আ	সে	অ	ন	ডি	প্রসর	বার্ষিক
উত্তাপ (°ফাঃ)	৩৯	৪২	৪৮	৬১	৭১	৮০	৮৫	৮৩	৭৭	৬৬	৫২	৪২	৫১'১	
বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি)	১'২	০'৯	২ ৮	০'৯	০ ৪	০ ০	০ ৪	০'০	০ ১	০ ১	১'১	১'৬		৮'০

এই অঞ্চলের **জলবায়ু** চরমভাবাপন্ন। অপেক্ষাকৃত বৃষ্টিবহুল স্থানে **তৃণ** এবং অল্পবৃষ্টিযুক্ত অঞ্চলে **গুল্ম** ও ঝোপঝাড় দৃষ্ট হয়। **কৃষিজ** দ্রব্যের মধ্যে খাদ্যশস্য, ফল, কার্পাস, তামাক, ইক্ষু, বীট ও গোলাপ ফুলই প্রধান। এই অঞ্চলের অন্তর্গত দেশসমূহ অত্যন্ত **অনুন্নত**। দক্ষিণ আফ্রিকার কিয়দংশে কৃষিকার্য চলে, কিন্তু অন্যান্য অংশে **পশুচারণই** অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। এই অঞ্চলে পর্যাপ্ত খনিজ সম্পদ থাকা সত্ত্বেও শ্রমিক ও মূলধনের অভাবহেতু **খনিজ শিল্প** তাদৃশ প্রসার লাভ করে নাই।

খ (৫) তিব্বতী জলবায়ু-অধ্যুষিত পরিমণ্ডল

এশিয়ার তিব্বত ও দক্ষিণ আমেরিকার বলিভিয়ার মালভূমি এই অঞ্চলের অন্তর্গত। তিব্বতের **জলবায়ু** চরমভাবাপন্ন। শীতকাল দীর্ঘ ও তীব্র, গ্রীষ্মকাল অল্পস্থায়ী ও উষ্ণ। বলিভিয়ার মালভূমি অঞ্চলে শীতপ্রধান নাতি-

তিব্বতী পরিমণ্ডল—মাসিক গড় উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত

স্থান: লা পা পাজ (১৬°৩১′ দঃ), বলিভিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা, উচ্চতা: ১২১০০′

মাস	জা	ফে	মা	এ	মে	জু	জু	আ	সে	অ	ন	ডি	প্রসর	বার্ষিক
উত্তাপ (°ফাঃ)	৫২	৫১	৫১	৪৯	৪৭	৪৪	৪৫	৪৬	৪৮	৫০	৫৩	৫২	৮'৬	
বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি)	৩'৯	৪'৫	২'৬	১'৫	০'৫	০'১	০ ২	১'২	০ ৮	১'৩	১'৫	৪'৩		২১'২

শীতোষ্ণ জলবায়ু বর্তমান। মালভূমির উচ্চাংশে ও ঢালে **পশুচারণ** এবং উপত্যকাতে সামান্য পরিমাণ **কৃষিকার্যই** অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। এই অঞ্চলে প্রচুর খনিজ পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু উপযুক্ত যানবাহন ব্যবস্থার অভাবে খনিজ শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই।

ইরানী, তুরানী ও তিব্বতী জলবায়ু অঞ্চলকে একত্রে **স্থায়ী কষ্টের অঞ্চল** (Regions of Lasting Difficulties)-ও আখ্যা দেওয়া হয়

গ (১) লরেন্সীয় জলবায়ু-অধ্যুষিত পরিমণ্ডল

অবস্থান—পশ্চিমা বায়ুবলয়ে ৪৫° হইতে ৬৬½° উত্তর ও দক্ষিণ সমাক্ষ-রেখার মধ্যে মহাদেশের পূর্বভাগে অবস্থিত ক্যানাডার পূর্বাংশ, যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর পূর্বাংশ, সাইবেরিয়ার আমুর নদীর অববাহিকার দক্ষিণাংশ, মাঞ্চুরিয়া এবং জাপান এই অঞ্চলের অন্তর্গত। তবে সমুদ্রবেষ্টিত হওয়ায় জাপানের জলবায়ু অনেকটা 'ব্রিটিশ জলবায়ু'র অনুরূপ। দক্ষিণ আমেরিকার প্যাটাগো-নিয়া এরূপ অক্ষরেখায় অবস্থিত হইলেও ইহা সংকীর্ণ হওয়ায় এবং পশ্চিমে আন্দিজ পর্বতশ্রেণী অবস্থিত থাকায় ইহা মরুভূমিপ্রায়।

জলবায়ু—(১) পশ্চিমা বায়ুবলয়ে অবস্থিত হওয়ায় শীতকালে অভ্যন্তরস্থ শীতলতম প্রদেশ হইতে শীতল বায়ুপ্রবাহ এখানে আসে বলিয়া এই অঞ্চলে শীতের আধিক্য বেশী (প্রায় ১০° ফাঃ), আবার গ্রীষ্মকালে পূর্বসমুদ্র হইতে বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় গ্রীষ্মের তীব্রতা হ্রাস পায়—গড়ে ৬৫° ফাঃ। অনুরূপ অক্ষাংশের অন্তর্গত পশ্চিম প্রান্তীয় হিমশীতোষ্ণ সামুদ্রিক অঞ্চল (গ৪) অপেক্ষা

লরেন্সীয় পরিমণ্ডল—মাসিক গড় উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত

স্থান মন্ট্রীল (অঃ ৪৫ ৩১ উঃ), কুইবেক ক্যানাডা।

মাস	জা	ফে	মা	এ	মে	জু	জু	আ	সে	অ	ন	ডি	প্রসর	বার্ষিক
উত্তাপ (ফাঃ)	১৩	১৫	২৫	৪১	৫৫	৬৫	৬৯	৬৭	৫৯	৪৭	৩৩	১৯	৫৬	
বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি)	৩ ৭	৩ ২	৩ ৭	২ ৬	৩ ১	৩ ৫	৩ ৮	৩ ৬	৩ ৫	৩ ৩	৩ ৪	৩ ৭		৪০ ৭
স্থান : হারবিন (অঃ ৭৫°৪৬′ উঃ), মাঞ্চুরিয়া।														
উত্তাপ (ফাঃ)	—২	৬	২৪	৪২	৫৬	৬৬	৭২	৬৯	৫৮	৪০	২১	৩	৭৩ ৮	
বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি)	০ ১	০ ২	০ ৪	০ ৯	১ ৭	৩ ৮	৪ ৫	৪ ১	১ ৮	১ ৩	০ ৩	০ ২		১৯ ৩

এতদঞ্চলে বার্ষিক তাপপ্রসর অধিক। (২) বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২০″-৪০″ পর্যন্ত। প্রায় সকল মাসেই সামান্য পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। উত্তর আমেরিকার সেন্ট্ লরেন্স নদীর অববাহিকার জলবায়ু হইতে লরেন্সীয় জলবায়ু নামের উৎপত্তি হইয়াছে। তবে মাঞ্চুরিয়া ও আমুরিয়া মৌসুমী বায়ুর প্রভাবাধীন বলিয়া এতদঞ্চলে গ্রীষ্মেই অধিক বৃষ্টিপাত হয়। এই কারণে অনেকে এতদঞ্চলের জলবায়ুকে মাঞ্চুরীয় জলবায়ুও বলিয়া থাকেন।

উদ্ভিদ্—এই অঞ্চলের উষ্ণতর অংশে নাতিশীতোষ্ণ পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য এবং শীতলতর অংশে চিরহরিৎ সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্যই প্রধান।

মৃত্তিকা—এই পরিমণ্ডলের অন্তর্গত বৃষ্টিবহুল স্থানের মৃত্তিকা অম্লধর্মী পেডালফার শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত অনুর্বর পোডসল্ জাতীয়। তবে বৃষ্টিবিরল অংশে ক্ষারধর্মী পেডোক্যাল শ্রেণীর অন্তর্গত উর্বর কৃষ্ণ ও বাদামী বর্ণের মৃত্তিকাও পরিলক্ষিত হয়।

বৈষয়িক অবস্থা—পশুশিকার এবং কাষ্ঠের ব্যবসায়ই এই অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। তবে উত্তর আমেরিকার পূর্বাংশের বহু অরণ্যাঞ্চল বর্তমানে কৃষি ও চারণ ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে এবং ঐ সমস্ত অঞ্চলে কৃষি, খনিজ, কাষ্ঠ ও যন্ত্রশিল্প দ্রুত উন্নতি লাভ করিতেছে। এশিয়ার পূর্বপ্রান্তিক দেশসমূহ যানবাহনের অব্যবস্থা, খনিজ সম্পদের অপ্রতুলতা, শিল্পাঞ্চল ও বাণিজ্যকেন্দ্র হইতে দূরত্ব, শাসনযন্ত্রের অব্যবস্থা, বিরল লোক-বসতি প্রভৃতি কারণে এখনও অনুন্নত রহিয়াছে। শারীরিক শ্রম ব্যতীত এতদঞ্চলের অধিবাসীরা জীবিকা অর্জন করিতে পারে না বলিয়া এই অঞ্চলকে "পরিশ্রমের অঞ্চল" (Region of Effort) বলা হয়। সয়াবীন, গম, যব, রাই ও কাষ্ঠ এই অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্যিক উপকরণ।

এই পরিমণ্ডলকে অনেকে হিমশীতোষ্ণ পূর্ব-উপকূলীয় (Cool Temperate East Coast) বা আর্দ্র মহাদেশীয় (Humid Continental) পরিমণ্ডল-ও বলিয়া থাকেন।

গ (২) সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি বা 'তৈগা' অঞ্চল

অবস্থান—উত্তর গোলার্ধের শীতপ্রধান নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের উত্তরে এই অঞ্চল অবস্থিত। ক্যানাডার পূর্বাংশ, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড, উত্তর রুশিয়া এবং উত্তর সাইবেরিয়া এই অঞ্চলের অন্তর্গত। দক্ষিণ গোলার্ধের এই অংশে স্থলভাগ নিতান্ত অল্প। তবে দঃ আমেরিকার প্রান্তদেশে এবং নিউজীল্যাণ্ডের পার্বত্য ভূমিভাগে এই জাতীয় জলবায়ু অনুভূত হয়।

জলবায়ু—(১) বার্ষিক গড় উত্তাপ ৪০° ফাঃ-এর অনধিক। শীতকাল অতি দীর্ঘ ও তীব্র এবং গ্রীষ্মকাল হ্রস্ব (২ ৩ মাসের অনধিক) ও উষ্ণ। শীতকালে দিন হ্রস্ব ও রাত্রি দীর্ঘ এবং গ্রীষ্মকালে রাত্রি হ্রস্ব ও দিন দীর্ঘ হয়। মহাদেশীয় ভূমিভাগের অভ্যন্তরে উষ্ণতম ও শীতলতম মাসের উত্তাপের পার্থক্য প্রায় ১০০° ফাঃ। তবে সমুদ্রপ্রান্তীয় স্থানসমূহে তাপপ্রসর অল্প। (২) বৃষ্টিপাত অতি সামান্য। উপকূলাঞ্চল ব্যতীত বার্ষিক গড়-বৃষ্টিপাত ২০"র অধিক নহে। এই অঞ্চলে বৃষ্টি অপেক্ষা তুষারপাতই অধিক।

তৈগা অঞ্চল—মাসিক গড় উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত

স্থান : ভারখয়ানস্ক (অঃ ৬৭°৫০' উঃ), রুশিয়া, উচ্চতা : ৩৩০'

মাস	জা	ফে	মা	এ	মে	জু	জু	আ	সে	অ	ন	ডি	প্রসর	বার্ষিক
উত্তাপ (°ফাঃ)	-৫৯	-৪৭	-২৪	৭	৩৫	৫৪	৬০	৫০	৩৬	৫	-৩৪	-৫৩	১১৮·৬	.
বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি)	০·২	০·১	০	০·১	০·২	০·৫	১·২	০·৯	০·২	০·২	০·২	০·৩		৩·৯

উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তু—এই অঞ্চলে কোমল কাষ্ঠযুক্ত চিরহরিৎ সরলবর্গীয় (soft wood evergreen coniferous) বৃক্ষের নিবিড় অরণ্য দৃষ্ট হয়। পাইন, ফার লার্চ, স্প্রুস, ডীল, হেমলক প্রভৃতি এই অরণ্যাঞ্চলের মূল্যবান কাষ্ঠ। এই সমস্ত বৃক্ষের কাষ্ঠ অতি কোমল হওয়ায় ইহা হইতে দিয়াশলাই-এর কাঠি, বাক্স ও কাগজের মণ্ড প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। স্থানে স্থানে নাতি-শীতোষ্ণ পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্যও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই অঞ্চলের উত্তর দিকে বৃক্ষসমূহ ক্রমশঃ হ্রস্ব হইয়া গিয়াছে। সেবল্, আরমিন্ প্রভৃতি লোমশ পশু এই অঞ্চলে দৃষ্ট হয়। ইউরোপ ও আমেরিকায় এই পশুর লোম পরিচ্ছদ তৈয়ারীতে ব্যবহৃত হয়।

বৈষয়িক অবস্থা—এই অঞ্চলে লোকবসতি অতি বিরল। পশুপালনই অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। এই অঞ্চলের স্থায়ী অধিবাসীরা অরণ্য হইতে কাষ্ঠ আহরণ, কাষ্ঠশিল্প এবং তাপিন, রজন প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া জীবিকা অর্জন করে। শীতের তীব্রতা হেতু কৃষিকার্য সম্ভব নহে। অপেক্ষাকৃত উষ্ণ স্থানে অতি সামান্য পরিমাণে রাই, ওট এবং যব উৎপন্ন হয়। এতদঞ্চলের **মৃত্তিকা** অম্লধর্মী পেডালফার শ্রেণীর অন্তর্গত অনুর্বর পোড্‌সল জাতীয়।

গ (৩) মহাদেশীয় নিম্নভূমি বা 'স্তেপ' অঞ্চল

অবস্থান—মহাদেশসমূহের অভ্যন্তরে মোটামুটি ভাবে ৪৫° হইতে ৬৬½° উত্তর ও দক্ষিণ সমাক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত মধ্য ক্যানাডা এবং উত্তর যুক্ত-রাষ্ট্রের নিম্নভূমি, মধ্য ইউরোপ হইতে সাইবেরিয়ার উচ্চভূমি অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত নিম্নভূমি, মঙ্গোলিয়া, আর্জেন্টিনা এবং অস্ট্রেলিয়ার মারে-ডার্লিং অববাহিকার অংশবিশেষ ও দঃ আফ্রিকার উচ্চভূমি এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

জলবায়ু—সমুদ্র হইতে দূরত্বের জন্য এই অঞ্চলের জলবায়ু চরমভাবাপন্ন। এই অঞ্চলে (১) গ্রীষ্মকাল নাতিদীর্ঘ, কিন্তু যথেষ্ট উত্তপ্ত (৭০° হইতে ৮০° ফাং-এর মধ্যে) এবং শীতকাল দীর্ঘ ও অত্যন্ত তীব্র (০° অপেক্ষাও অল্প)। (২) বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১০ হইতে ৩০"র মধ্যে এবং বৃষ্টিপাত সাধারণতঃ বসন্তকালে ও গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই হইয়া থাকে।

স্তেপ অঞ্চল—মাসিক গড় উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত

স্থান। বার্নাউল (অঃ ৫৩ ২৬' উঃ) রুশিয়া, উচ্চতা : ৪৮০'

মাস	জা	ফে	মা	এ	মে	জু	জু	আ	সে	অ	ন	ডি	প্রসর	বার্ষিক
উত্তাপ (°ফাঃ)	—২	১	১৩	৩৩	৫১	৬২	৬৭	৬২	৫০	৩৫	১৬	৪	৬৯	৩
বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি)	০·৩	০·২	০·৩	০·৪	১·০	১·৪	১·৮	১·৬	০·৯	০·৯	০·৭	০·৬		১০·১

উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তু—সাধারণতঃ বৃক্ষবর্জিত কোমল হ্রস্ব তৃণই এতদঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিদ্। স্যাভানা অঞ্চলের ন্যায় এই অঞ্চলের তৃণ দীর্ঘ বা নিবিড় নহে। এই তৃণভূমিকে ইউরেশিয়ায় 'স্তেপ', উঃ আমেরিকায় 'প্রেয়রী, দঃ আমেরিকায় 'পম্পা', দঃ আফ্রিকায় 'ভেল্ড' এবং অস্ট্রেলিয়ায় 'ডাউন্স' বলে। এই পাবমগুলকে **মধ্য অক্ষাংশের তৃণভূমি** (Midlatitude grassland) অঞ্চলও বলা হয়। অশ্ব, গদভ, মেষ প্রভৃতি তৃণভোজী পশু এবং মাংসাশী হিংস্র জন্তুও এই অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়।

মৃত্তিকা—এতদঞ্চলে ক্ষারধর্মী 'পেডোক্যাল' শ্রেণীর অন্তর্গত উর্বর কৃষ্ণবর্ণের (Chernozem) মৃত্তিকারই প্রাধান্য দেখা যায়। ইহা জৈবাংশে সুসমৃদ্ধ এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মৃত্তিকার মধ্যে উৎপাদিকা শক্তির জন্য সুবিখ্যাত। তবে অপেক্ষাকৃত বৃষ্টিবিরল অংশের মৃত্তিকা ঈষৎ বাদামী বর্ণেরও হইয়া থাকে, তবে ইহারাও অতিশয় উর্বর।

বৈষয়িক অবস্থা—এই অঞ্চলের অধিবাসীরা যাযাবর পশুপালক। তবে বর্তমানে এতদঞ্চলে বাণিজ্যিক চাষক্ষেত্রের প্রবর্তন করা হইয়াছে এবং কৃষিকার্যেরও সমূহ উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। ক্যানাডার 'প্রেয়রী', সাইবেরিয়ার 'স্তেপ', দক্ষিণ আমেরিকার 'পম্পা', আফ্রিকার 'ভেল্ড' এবং অস্ট্রেলিয়ার 'ডাউন্স' অঞ্চলে বর্তমানে প্রচুর গমের চাষ হইতেছে। এই তৃণভূমি অঞ্চলকে বর্তমানে পৃথিবীর শস্যভাণ্ডার বলা চলে। যব, যই ও রাই এই অঞ্চলে জন্মে। এই অঞ্চল জনবিরল হওয়ায় উৎপন্ন দ্রব্যের অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানী করা হয়। মাঞ্চুরিয়ার নিম্নভূমি এই অঞ্চলের মধ্যে কৃষিশিল্পে অপেক্ষাকৃত উন্নত। সয়াবিন এবং রেশম মাঞ্চুরিয়ার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। গোমাংস, মেষ মাংস, পশম, গম, যব, ভুট্টা, রাই, যই ও বীট এই অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্য-দ্রব্য

গ (৪) শীতপ্রধান নাতিশীতোষ্ণ সামুদ্রিক জলবায়ু-অধ্যুষিত পরিমণ্ডল

অবস্থান—মোটামুটিভাবে ৪৫° উঃ হইতে ৬০° উঃ ও ৪০° দঃ হইতে ৫৫° দঃ সমাক্ষরেখার দ্বারা আবদ্ধ নিয়ত বায়ুবলয়ের অন্তর্গত মহাদেশের পশ্চিমাংশে অবস্থিত উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ, দক্ষিণ-পশ্চিম ক্যানাডা, উত্তর-পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ চিলি, টাসমানিয়া এবং নিউজীল্যাণ্ডের দক্ষিণাংশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এই জলবায়ু ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে পরিস্ফুট বলিয়া এই অঞ্চলকে **ব্রিটিশ জলবায়ু অঞ্চল**ও (British type) বলা হয়।

জলবায়ু—এই অঞ্চলে (১) প্রত্যায়ন বায়ুপ্রবাহের ফলে সারা বৎসর ধরিয়াই বৃষ্টিপাত হয়, তবে শীতেই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অধিক। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০"-৩০" পর্যন্ত তবে স্থানভেদে বৃষ্টিপাতের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। (২) গ্রীষ্মকালীন উষ্ণতা অল্প গড়ে ৬০° ফাঃ এবং উপকূলাঞ্চলে উষ্ণ সমুদ্রস্রোত প্রবাহের ফলে শীতকালেও শীত তীব্র নহে—গড়ে ৪০° ফাঃ। বার্ষিক তাপপ্রসর সামান্য। (৩) আবহাওয়ার মুহুর্মুহুঃ পরিবর্তন এই জলবায়ুর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ইউরোপে এই পরিমণ্ডলের জলবায়ুকে অপেক্ষাকৃত সমভাবাপন্ন উঃ পঃ ইউরোপীয় জলবায়ু এবং অপেক্ষাকৃত চরমভাবাপন্ন মধ্য ইউরোপীয় জলবায়ু এই দুইটি অংশে বিভক্ত করা হয়।

বিটিশ জলবায়ু—মাসিক গড় উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত

মাস	জা	ফে	মা	এ	মে	জু	জু	আ	সে	অ	ন	ডি	প্রসর	বার্ষিক
স্থান : লণ্ডন (অ ৫১°৩০' উঃ), যুক্তরাজ্য, উচ্চতা : ১৮'														
উত্তাপ (ফাঃ)	৩	৪০	৪৩	৪৭	৫৩	৫৯	৬১	৬৮	৫৭	৪৯	৪৭	৩৯	২৪ ১	
বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি)	১ ৮	১ ৭	১ ৭	১ ৭	১-৮	২ ৩	২ ৬	২ ৪	২ ০	২ ৭	২ ৩	২ ১		২১ ১
স্থান বার্লিন (অঃ ৫২°৩২ উঃ) জার্মানী উচ্চতা : ১৬৪'														
উত্তাপ (°ফাঃ)	৩১	৩২	৩৭	৪৬	৫৫	৬২	৬৫	৬৩	৫৭	৪৮	৩৮	৩১	৩৪ ৩	
বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি)	১ ১	১ ৫	১ ৯	১ ৪	১·৭	২ ৫	২ ৭	২ ২	১ ৭	২ ০	১·৯	১ ১		২২ ২

উদ্ভিদ—এই অঞ্চলে ওক, এলম, মেপ্‌ল্‌, বীচ, বাচ, প্রভৃতি নাতিশীতোষ্ণ পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য এবং পার্বত্য অংশে চিরহরিৎ সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য দৃষ্ট হয়।

মৃত্তিকা—এই পারমণ্ডলটির অন্তর্গত অধিকাংশ অঞ্চলের মৃত্তিকা অম্লধর্মী পেডালফার শ্রেণীর অন্তর্গত অনুর্বর পোড্‌সল জাতীয়। কৃত্রিম সার প্রযুক্ত হইলে ইহা শস্যপ্রসূ হইয়া থাকে। বদ্বীপ ও প্লাবনভূমি অঞ্চলসমূহের মৃত্তিকা পলিসমৃদ্ধ হওয়ায় অতিশয় উর্বর।

বৈষয়িক অবস্থা—বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতায় এই অঞ্চল পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করে। জলবায়ু মৃদুভাবাপন্ন হওয়ায় অধিবাসীরা অত্যন্ত কর্মঠ ও উন্নত। বর্তমানে বহু অরণ্যাঞ্চল পরিষ্কৃত করিয়া কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করা হইয়াছে। গমই এই অঞ্চলের প্রধান কৃষিজ দ্রব্য। অপেক্ষাকৃত অনুর্বর ভূখণ্ডে এবং শীতল আবহাওয়ায় যই, রাই, যব, আলু এবং বীটের চাষ হয়

তৃণভূমিতে পশুপালন ও সমুদ্রসন্নিহিত অঞ্চলে মৎস্য আহরণ এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য শিল্প। কাঁচামাল, খনিজ সম্পদ, কয়লা ও অন্যান্য শক্তিসম্পদের প্রাচুর্য, শ্রমনিপুণ, কর্মক্ষম, বুদ্ধিমান ও সংঘবদ্ধ শ্রমিকদের সরবরাহ এবং যানবাহনের সুবিধা হেতু শিল্পে ও বাণিজ্যে এই অঞ্চল পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, বেলজিয়াম প্রভৃতি শিল্পপ্রধান দেশসমূহ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এই অঞ্চলে লোকবসতি অত্যন্ত ঘন। ব্রিটিশ কলম্বিয়াতে কাষ্ঠশিল্প, মৎস্যশিল্প, খনিজশিল্প ও ফলের চাষই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। টাসমানিয়া এবং নিউজীল্যাণ্ড কৃষিপ্রধান অঞ্চল। দক্ষিণ চিলি অপেক্ষাকৃত অনুন্নত। হিমশীতোষ্ণ সামুদ্রিক অঞ্চলকে পরিশ্রমের অঞ্চল (Region of Effort) বলা হইয়া থাকে। গম, যব, যই, রাই, বীট, অতসী, শণ, আলু ন্যাসপাতি, পিয়াব, দুগ্ধজাত দ্রব্য এবং কাষ্ঠ এই পরিমণ্ডলের প্রধান বাণিজ্যিক দ্রব্য।

গ (৫) আল্‌টাই জলবায়ু-অধ্যুষিত পরিমণ্ডল

উত্তর আমেরিকার শৃঙ্খলিত পর্বতমালার উত্তর-পশ্চিমাংশ (ক্যানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চল) এবং দক্ষিণ-পূর্ব সাইবেরিয়ার উচ্চভূমি এই অঞ্চলের অন্তর্গত। অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতির তারতম্য হিসাবে এই অঞ্চলে জলবায়ুরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে, তবে সাধারণতঃ এই অঞ্চলের **জলবায়ু** চরমভাবাপন্ন। এতদঞ্চলে সরলবর্গীয় বৃক্ষের **অরণ্য** বিদ্যমান। ডগ্‌লাস্, ফার, স্প্রুস, এবং লাচই অরণ্যের প্রধান কাষ্ঠ। এই অঞ্চলের অন্তর্গত দুইটি স্থানের মধ্যে উত্তর আমেরিকার পর্বতাঞ্চলই বিশেষ উন্নতিশীল। পূর্বে এই অঞ্চলের অধিবাসীরা শিকার ও উঞ্ছজীবী ছিল, কিন্তু বর্তমানে খনিজ, কাষ্ঠ, পশুচারণ এবং কৃষিশিল্পে বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব সাইবেরিয়ার উচ্চভূমি অঞ্চল নানা প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হইলেও প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রতিকূল হওয়ায় আশানুরূপ উন্নতি লাভ করে নাই। পশুচারণ ও খনিজ শিল্পই এই অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। এই সমস্ত অঞ্চলে জলসেচব্যবস্থা দ্বারা সামান্য কৃষিকার্য চলে।

ঘ (১) তুন্দ্রা অঞ্চল

এই অঞ্চল সুমেরু বৃত্ত হইতে সুমেরু বিন্দু পর্যন্ত বিস্তৃত। রুশিয়া এবং সাইবেরিয়ার উত্তরের নিম্নভূমি এবং আলাস্কা ও ক্যানাডার উত্তরাঞ্চল তুন্দ্রা নামে অভিহিত। দক্ষিণ গোলার্ধের এই অংশ মনুষ্যবর্জিত। এতদঞ্চলে (১) গ্রীষ্ম ও শীতকালীন উত্তাপ যথাক্রমে ৫৫° ও ১০° ফাঃ-এর অনধিক। গ্রীষ্মকাল হ্রস্ব এবং শীতকাল দীর্ঘ ও তীব্র। (২) গড় বৃষ্টিপাত ১০"র অধিক

নহে, তাহা গ্রীষ্মকালেই হয় এবং শীতকালে তুষারপাত হইয়া থাকে। শীতকালে এই অঞ্চল বরফাবৃত থাকে বলিয়া এ অঞ্চলে কোন প্রকার তৃণ দৃষ্ট হয় না। গ্রীষ্মকালে বরফ গলিয়া গেলে এই সমস্ত অঞ্চল একপ্রকার গুল্মে আবৃত হইয়া যায়। কৃষিকার্য এই অঞ্চলে অসম্ভব। মৃত্তিকাও অম্লধর্মী পেডালফার শ্রেণীর অন্তর্গত অনুর্বর পোড্‌সল জাতীয়। এস্থানের অধিবাসীরা যাযাবর। মৎস্য ও পশু শিকার ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। এই অঞ্চল অত্যন্ত অনুন্নত।

ঘ (২) মেরুদেশীয় উচ্চভূমি অঞ্চল

উত্তর আলাস্কা, উত্তর গ্রীনল্যাণ্ড, আণ্টার্কটিকা, কামসাটকা এবং ইহাদের সন্নিহিত অঞ্চলসমূহ সারা বৎসর ধরিয়াই তুষারাবৃত থাকে। এই তুষারের গভীরতা কোথাও বা ১ ফুট আবার কোথাও ৩,০০০ ফুট। এই অঞ্চলে প্রাকৃতিক উদ্ভিদ্ একেবারেই দৃষ্ট হয় না।

ভারতের জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলসমূহ

ভারতের জলবায়ু—কর্কটক্রান্তি ভারতকে উত্তর দক্ষিণে প্রায় সমদ্বিখণ্ডিত করিয়াছে। সুতরাং অক্ষাংশ অনুসারে ইহার উত্তরাংশ নাতিশীতোষ্ণ এবং দক্ষিণাংশ উষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত। কিন্তু উষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত হইলেও ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা ও সমুদ্রসান্নিধ্যহেতু দক্ষিণ ভারতের জলবায়ু মৃদুভাবাপন্ন। আবার নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত হইলেও হিমালয় পর্বত প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকায় উত্তরের শীতলবায়ু এদেশে প্রবেশ করিতে পারে না। সেই কারণে উত্তর ভারতের মালভূমি গ্রীষ্মকালে কতকটা উষ্ণ থাকে এবং শীতকালেও শীত তীব্র হয় না। দাক্ষিণাত্যের উপকূলভাগ নিম্নভূমি হওয়ায় মালভূমি অপেক্ষা উষ্ণতর। আবার সিন্ধু গঙ্গার সমভূমির পূর্বাংশ নিম্ন হওয়া সত্ত্বেও সমুদ্রসান্নিধ্য ও প্রচুর বৃষ্টিপাত হেতু মৃদুভাবাপন্ন। কিন্তু সমভূমির পশ্চিমাংশের জলবায়ু উষ্ণ মরুপ্রকৃতির।

নানাপ্রকার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সত্ত্বেও মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ এদেশের জলবায়ুর নিয়ামক বলিয়া ভারতের জলবায়ু মূলতঃ ক্রান্তীয় মৌসুমী প্রকৃতির। ঋতুভেদে মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের তারতম্য পরিলক্ষিত হয় বলিয়া ভারতের জলবায়ু ও আবহাওয়ার ঋতুগত পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। ভারতে চারিটি ঋতুর প্রভাব অনুভূত হয়। ঋতু অনুসারে ভারতের বৃষ্টিপাত, তথা জলবায়ু নিম্নে বিবৃত হইল।

(ক) **শীতকাল** (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী)—শীতকালে জানুয়ারী মাসের প্রারম্ভে সূর্য মকরক্রান্তির উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। এই সময় মধ্য এশিয়ার

উচ্চচাপবলয় হইতে উত্তরপূর্বাভিমুখী বায়ুপ্রবাহ দক্ষিণ গোলার্ধের নিম্নচাপবলয়ের দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করে। এই বায়ুপ্রবাহকে **উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু** বলে। শীতল স্থলভাগ অতিক্রম করিয়া আসে বলিয়া এই বায়ু শুষ্ক, শীতল ও তীব্র। তবে ইহার কতক অংশ হিমালয় অঞ্চল হইতে দক্ষিণে আসিবার সময় তুষার হইতে সামান্য জলীয় বাষ্প আহরণ করে বলিয়া শীতকালে উত্তর ভারতে কখনও কখনও বৃষ্টিপাত হয়।

৪নং চিত্র

শীতকালে ও বসন্তের প্রারম্ভে ইরাণ মালভূমি হইতে আগত শীতল উত্তর-পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে পাঞ্জাব, কাশ্মীর ও উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশে সামান্য ঘূর্ণিবৃষ্টি হয়। তবে এই সামান্য বৃষ্টিপাত ও গম, যব প্রভৃতি রবিশস্য চাষের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। এই সময়ে আকাশ প্রায়ই নির্মেঘ থাকে।

(খ) **গ্রীষ্মকাল** (মার্চ-মে)—মার্চ মাস হইতে সূর্য মকরক্রান্তি পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃই কর্কটক্রান্তির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ফলে ভারতের ভূমিভাগের উপর উত্তাপের আধিক্য ক্রমশঃই অনুভূত হইতে থাকে এবং ক্রমে মে মাসে সমগ্র উত্তর ভারতে এবং জুন মাসে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশে (১২০° ফাঃ) একটি বিরাট নিম্নচাপবলয়ের সৃষ্টি হয়। গ্রীষ্মকালে পশ্চিমবঙ্গে ("কালবৈশাখী") ও আসামে অপরাহ্নের দিকে মধ্যে মধ্যে বজ্রপাতের সহিত ঝড় ও বৃষ্টি হয়। এই বৃষ্টি আউস ধান্যোৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। পাঞ্জাবে ও উত্তর প্রদেশে এই সময়ে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিহীন ধূলিঝড় ("আঁধি") বহিয়া থাকে। দক্ষিণ ভারতেও স্থানে স্থানে এই সময় বজ্রপাতের সহিত বৃষ্টি হয়।
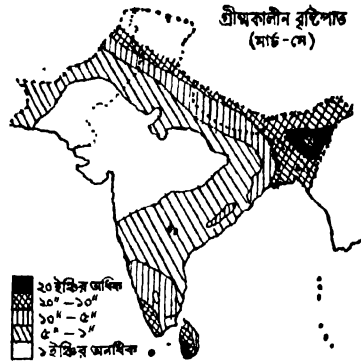
৫নং চিত্র

(গ) **বর্ষাকাল** (জুন-অক্টোবর)—গ্রীষ্মকালে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম

ভারতের বায়ুমণ্ডলে যে নিম্নচাপবলয়ের সৃষ্টি হয় সেই নিম্নচাপের দিকে জলীয়বাষ্পসম্পৃক্ত দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ুপ্রবাহ প্রবলবেগে আসিতে থাকে। ইহাই **দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু**। এই বায়ুপ্রবাহ দুইটি প্রধান শাখায় বিভক্ত হইয়া ভারতে প্রবেশ করে—একটি **আরবীয় শাখা,** অপরটি **বঙ্গোপসাগরীয় শাখা**।

আরবীয় দঃ পঃ মৌসুমী বায়ুর এক অংশ পঃ ঘাট পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া কঙ্কণ ও মালাবার উপকূলে প্রচুর (১০০"-১৫০') বারিবর্ষণ করে। কিন্তু পঃ ঘাটের বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চলে অবস্থিত মহারাষ্ট্রের পুর্বাংশ, অন্ধ্র, মহীশূর ও তামিলনাড়ুর দক্ষিণাংশে বৃষ্টির পরিমাণ বার্ষিক ৪০"-র অধিক নহে। ইহার দ্বিতীয় শাখা সিন্ধু প্রদেশ (পাকিস্তান) ও রাজস্থানের উপব দিয়া বহিয়া যাইবার সময় কেবলমাত্র আবাবল্লী পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া উহার দক্ষিণ অংশে প্রায় ৪০"-৬০' বারি বর্ষণ করিয়া উত্তর-পুর্বদিকে পাঞ্জাবের উপর দিয়া বহিয়া উহার উত্তর-পুর্বাংশে সামান্য বৃষ্টিপাত ঘটায়। ইহার তৃতীয় শাখা বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া নর্মদা ও তাপ্তীর উপত্যকা অঞ্চলে প্রচুর বারি বর্ষণ করে। অতঃপর এই বায়ুপ্রবাহ উত্তর-পূর্ব মালভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হয় এবং পথিমধ্যে বঙ্গোপসাগরীয় শাখার সহিত মিলিত হয়।

বঙ্গোপসাগরীয় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু উত্তর-পুর্বের পার্বত্য অঞ্চলে প্রতিহত হওয়ায় তথায় পর্যাপ্ত পরিমাণে বারিবর্ষণ করে। খাসিয়া পর্বতের চেরাপুঞ্জি অঞ্চলে বার্ষিক গড বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৩০০"-৫০০"। তবে শিলং, গৌহাটি প্রভৃতি খাসিয়া পর্বতের বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত অল্প।
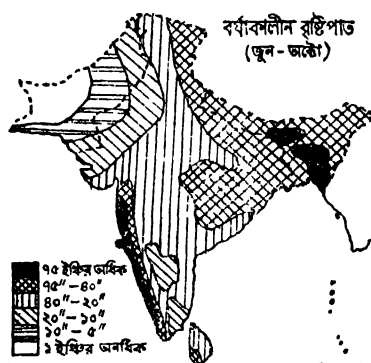
৬ নং চিত্র

এই বায়ু-প্রবাহের ফলে বঙ্গদেশেও প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

অতঃপর এই সম্মিলিত বায়ুপ্রবাহ উত্তরদিকে যাইবার সময়ে হিমালয়ে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় বঙ্গদেশের সর্বত্র বারিবর্ষণ করে। অবশেষে এই বায়ুপ্রবাহ পশ্চিমাভিমুখী হইয়া ক্রমক্ষীয়মাণ বারিবর্ষণ করিতে করিতে বিহার ও উত্তর প্রদেশের মধ্য দিয়া পাঞ্জাবে পৌছিলে প্রায় বৃষ্টিহীন হইয়া পড়ে।

অর্থনৈতিক উন্নতির দিক হইতে বিচার করিলে বর্ষাকাল ভারতের

সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ঋতু। মোট বৃষ্টিপাতের শতকরা ৮০।৯০ ভাগ এই সময়েই পতিত হয়। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। বৃষ্টির প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। এই সময়ে খারিফ শস্যের উৎপাদন হয় এবং খারিফ শস্যের উৎপাদনই ভারতে সর্বাপেক্ষা অধিক।

তবে দঃ পঃ মৌসুমী বায়ু-প্রবাহের ফলে ভারতে যে বৃষ্টিপাত হয় তাহার তিনটি উল্লেখযোগ্য **বৈশিষ্ট্য** পরিলক্ষিত হইয়া থাকে—(১) মৌসুমী বায়ুর বিলম্বে আগমন, (২) নির্দিষ্ট সময়ের বহু পরে বা বহু পূর্বে মৌসুমী বায়ুর তিরোভাব, এবং (৩) জুলাই বা আগষ্ট মাসে দীর্ঘ বিরতি বা প্রবল বর্ষণ। ইহার সব কয়টিই কৃষির পক্ষে ক্ষতিকর। কারণ বর্ষাকাল বিলম্বে আরম্ভ হইলে বীজ বপনের কাজ বন্ধ থাকে। বর্ষাকাল দীর্ঘস্থায়ী হইলে দেশে বন্যার প্রকোপ দেখা যায়, আবার ক্ষণস্থায়ী হইলে বাড়ন্ত ফসল শুকাইয়া যায়। জুলাই ও আগস্ট মাসে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবল বর্ষণ হইলে ফসলের চারাগুলি জলে ডুবিয়া পচিয়া যায়, আবার এই সময়ে দীর্ঘকাল বৃষ্টি না হইলে চারাগুলি পুড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়।
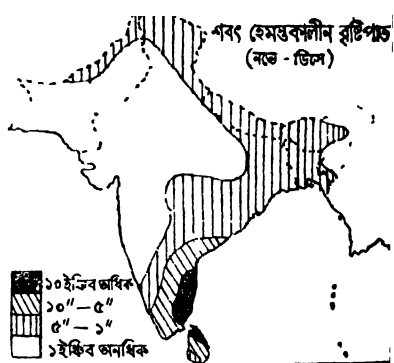
৭ নং চিত্র

(ঘ) **শরৎ ও হেমন্তকাল** (নভেম্বর-ডিসেম্বর)—শীতের প্রারম্ভে, নভেম্বর মাসে সূর্যের মকর ক্রান্তির দিকে প্রত্যাগমন হেতু উত্তর ভারতে ক্রমশঃই উচ্চচাপবলয়ের সৃষ্টি হইতে থাকে। উত্তর ভারতে এই উচ্চচাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় আরবীয় ও বঙ্গোপসাগরীয় দঃ পঃ মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ স্থলভাগ হইতে পশ্চাৎ দিকে সরিতে বাধ্য হয়। উত্তর ভারত হইতে অপসারণ করিলেও এই বায়ু মাদ্রাজ উপকূলাঞ্চলে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত প্রবাহিত হইতে থাকে। এই সময় উত্তর ভারতে নিয়ত উঃ-পূঃ মৌসুমী বায়ু ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতে থাকে এবং বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট বহু ঘূর্ণিবাত পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া মাদ্রাজের উপকূলাঞ্চলে বৃষ্টিপাত ঘটায়। নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে উত্তর-ভারতে বিশেষ বৃষ্টিপাত হয় না কিন্তু **অপস্রিয়মাণ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর** প্রভাবে তামিলনাড়ুর দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে।

ভারতে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪২"। কিন্তু বৃষ্টিপাত সকল

বৎসর সমান হয় না। মধ্যে মধ্যে অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি হইয়া দেশে দুর্ভিক্ষ ও বন্যার সৃষ্টি করে। আবার পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও দাক্ষিণাত্যের মধ্যাঞ্চলে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত অপরিমিত ও অনিশ্চিত।

বৃষ্টিপাত-অঞ্চল—বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের তারতম্য অনুসারে ভারতকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়:—(১) ১৫০"-এর অধিক বৃষ্টিযুক্ত অঞ্চল—মালাবার উপকূল, আসাম উপত্যকার অংশবিশেষ, দার্জিলিং ও বক্সাদুয়ার। (২) ১০০" হইতে ১৫০" পর্যন্ত বৃষ্টিপাত অঞ্চল—কঙ্কণ ও মালাবার উপকূলের অংশবিশেষ, আসাম উপত্যকার অবশিষ্টাংশ, পূর্ব-হিমালয় অঞ্চল। (৩) ৭৫' হইতে ১০০ পর্যন্ত বৃষ্টিযুক্ত অঞ্চল—পশ্চিম-বঙ্গের কতকাংশ, আসাম, বিহারের পূর্ণিয়া জেলার উত্তরাংশ, কঙ্কণ ও মালাবার উপকূল। (৪) ৫০" হইতে ৭৫' পর্যন্ত বৃষ্টিযুক্ত অঞ্চল—পশ্চিম ঘাট, অবহিমালয় অঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ, বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের পূর্বাংশ। (৫) ২৫" হইতে ৫০" পর্যন্ত বৃষ্টিযুক্ত অঞ্চল—দাক্ষিণাত্যের বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চল. রাজস্থানের পশ্চিমাঞ্চল, পাঞ্জাবের উত্তর-পূর্বার্ধ এবং উত্তর প্রদেশের দক্ষিণাংশ ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চল। (৬) ১০" হইতে ২৫" পর্যন্ত বৃষ্টিযুক্ত অঞ্চল—দাক্ষিণাত্যের বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চল ও পাঞ্জাবের অবশিষ্টাংশ। (৭) ৫" হইতে ১০" পর্যন্ত বৃষ্টিযুক্ত অঞ্চল—উষ্ণ মরু অঞ্চল
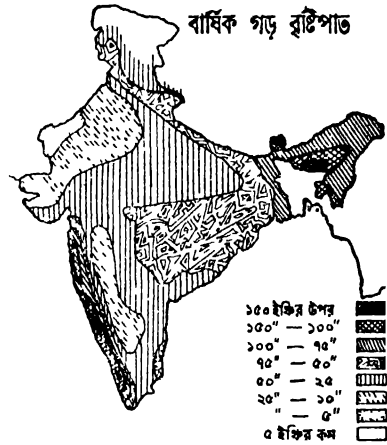
৮নং চিত্র—ভারতের বৃষ্টিপাত অঞ্চল

ভারতের প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলসমূহ—ভূপ্রকৃতির বন্ধুরতা অনুসারে ভারতকে চারিটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—(ক) উত্তর ও উত্তর-পূর্বের পার্বত্যভূমি, (খ) মধ্যভাগের নদীবিধৌত সমভূমি, (গ) দক্ষিণের মালভূমি এবং (ঘ) উপকূলবর্তী অপ্রশস্ত নিম্নভূমি।

(ক) **উত্তর ও উত্তর-পূর্বের পার্বত্যভূমি**—উত্তর-পশ্চিমে নাঙ্গাপর্বত শৃঙ্গ হইতে উত্তর-পূর্বে নামচা বারওয়া শৃঙ্গ পর্যন্ত প্রায় ২,৪১৪ কি. মি. দীর্ঘ ও ২৪০/৩২০ কি. মি. প্রস্থযুক্ত হিমালয়ের সমগ্র অংশই ভারতের অন্তর্গত। এই পর্বতমালা প্রধানতঃ তিনটি সমান্তরাল পর্বতশ্রেণী দ্বারা গঠিত। ইহাদের মধ্যে মধ্যে বিস্তীর্ণ উপত্যকা ও মালভূমি রহিয়াছে। তিনটি শ্রেণীর মধ্যে দক্ষিণ দিকের অল্প উচ্চতা ও দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট শ্রেণীকে **অবহিমালয় শ্রেণী**,

মধ্যভাগের ১'৮-৩'৬ কি. মি. পর্যন্ত উচ্চতা-বিশিষ্ট দ্বিতীয় শ্রেণীটিকে **মধ্য-হিমালয় শ্রেণী,** এবং সর্বোত্তরে গড়ে প্রায় ৬ কি. মি. উচ্চতা বিশিষ্ট তৃতীয় শ্রেণীটিকে **প্রধান হিমালয় শ্রেণী** বলে। হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিমে গড়ে প্রায় ৫'৫ কি. মি. উচ্চতা-বিশিষ্ট কারাকোরাম পর্বতশ্রেণী অবস্থিত। হিমালয়ের পূর্ব প্রান্ত হইতে একটি পর্বতশ্রেণী পাতকোই, চীন, নাগা ও লুসাই নামে বিস্তৃত। নাগার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বরাইল পর্বত হইতে পশ্চিম দিকে আসামের জয়ন্তিয়া, খাসিয়া ও গারো পাহাড় নির্গত হইয়াছে। উত্তর ও পূর্বের এই বিশাল পার্বত্য প্রাচীরের মধ্যে বহু গিরিপথ বিদ্যমান রহিয়াছে।

হিমালয়ের পার্বত্যভূমিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি **প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে** বিভক্ত করা যায় :—(১) **উত্তর-পূর্বের পার্বত্য অঞ্চল**—আসাম ও ব্রহ্ম সীমান্তের ১'৮ হইতে ৩'০ কি. মি উচ্চতাবিশিষ্ট পাতকোই, নাগা, লুসাই, খাসিয়া, গারো ও জয়ন্তিয়া পর্বত লইয়া গঠিত এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত অধিক এবং চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী বৃক্ষের নিবিড় অরণ্য বিদ্যমান। উচ্চতর অংশে সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমিও দেখা যায়। ধান, চা, কার্পাস, আনারস ও কমলা এতদঞ্চলের প্রধান কৃষিজদ্রব্য। তুঁত গাছে রেশম কীট পালিত হয়। খনিজ তৈল ও কয়লা পাওয়া যায়। যানবাহন-ব্যবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত ও লোক-বসতি বিরল। **শিলং, চেরাপুঞ্জী, ইম্ফল** প্রধান শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র। পূর্ব সীমান্তে টুজু, মণিপুর, আন ও টোন্‌গুপ গিরিদ্বার দিয়া ব্রহ্মদেশে যাইবার পথ রহিয়াছে। (২) **পূর্বহিমালয় অঞ্চল**—হিমালয়ের পূর্ব প্রান্ত হইতে নেপালের পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ১'৫ কি. মি.-র অধিক উচ্চতাবিশিষ্ট পর্বতশ্রেণী লইয়া গঠিত এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত প্রচুর, উত্তাপ অল্প। নিম্নতর অংশে চিরহরিৎ বৃক্ষের ও উচ্চতর অংশে সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য এবং সর্বোচ্চ অংশে আল্পীয় তৃণভূমি দৃষ্ট হয়। যানবাহনের অসুবিধা হেতু বনজ সম্পদের আহরণ অতি সামান্য। লোকবসতি অল্প ও কৃষিকার্য কষ্টসাধ্য। চা, কমলা ও সিঙ্কোনার আবাদ রহিয়াছে। সামান্য কয়লা ও তাম্র পাওয়া যায়। **কাঠমাণ্ডু, দার্জিলিং ও কালিম্পং** বিখ্যাত শহর। দার্জিলিং হইতে চুম্বি উপত্যকার উপর দিয়া জেলেপ্ লা ও নাথু লা গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া তিব্বতের রাজধানী লাসা পর্যন্ত একটি রাস্তা গিয়াছে। (৩) **পূর্ব অবহিমালয় অঞ্চল**—পূর্ব হিমালয় অঞ্চলের দক্ষিণে অবস্থিত ১'৫ কি.মি-এর অনধিক উচ্চতাবিশিষ্ট নিম্ন পার্বত্যভূমি লইয়া গঠিত এই অঞ্চলের জলবায়ু উষ্ণ, আর্দ্র ও অস্বাস্থ্যকর। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত পূর্বে ১০০" হইতে পশ্চিমে ৪০" পর্যন্ত। এই অঞ্চলে মৌসুমী পর্ণমোচী বৃক্ষের ও স্থানে স্থানে চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য রহিয়াছে। অরণ্য হইতে প্রচুর শালকাঠ পাওয়া যায়। উপত্যকা অংশে

ধান, চা ও ভুট্টা জন্মে। লোকবসতি পূর্ব হিমালয় অঞ্চল অপেক্ষা ঘন। **সাহারানপুর, পিলভিত, খেরী, বারাইচ, মতিহারী ও জলপাইগুড়ি** প্রধান শহর। ইহারা রেলপথের দ্বারা বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত। (৪) **পশ্চিম হিমালয় অঞ্চল**—নেপাল রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত হইতে হিমালয়ের পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত ১·৫ কি. মি-এর অধিক উচ্চতাবিশিষ্ট পার্বত্য-প্রদেশ লইয়া গঠিত এই অঞ্চলের জলবায়ু পূর্ব হিমালয় অঞ্চল অপেক্ষা শুষ্ক ও শীতল। সরলবর্গীয় অরণ্যাঞ্চল হইতে বহু মূল্যবান কাষ্ঠ আহৃত হয়। অপেক্ষাকৃত নিম্ন অংশে ধান, জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা, গম ও নানাবিধ ফল জন্মে। তৃণভূমি অঞ্চলে পশুপালন উল্লেখযোগ্য। পশম শিল্পের প্রসার দৃষ্ট হয়। **নৈনিতাল, মুসৌরী, সিমলা, শ্রীনগর** প্রভৃতি প্রধান শহর। এই অঞ্চলের অন্তর্গত বোটাঙ, বরালাচা লা, জোজি লা, কারাকোরাম, বারজিল, সিপ্‌কি এবং নিতি গিরিবর্ত্মের সাহায্যে সীমান্তবর্তী দেশসমূহে যাতায়াত চলে। (৫) **পশ্চিম অবহিমালয় অঞ্চল**—পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলের দক্ষিণে অবস্থিত শিবালিক ও বহির্হিমালয়ের অন্তর্গত ১·৫ কি. মি.-র অনধিক উচ্চতাবিশিষ্ট নিম্নপর্বতশ্রেণী লইয়া এই অঞ্চল গঠিত। বৃষ্টিপাত ৩০′-৪০ পর্যন্ত। শিবালিক পর্বতাঞ্চলে মৌসুমী অঞ্চলের অরণ্য, বাঁশ ও গুল্ম ভূমি এবং বহির্হিমালয় অঞ্চলে চিরপাইন বৃক্ষই প্রধান। সেচব্যবস্থার সাহায্যে গম, ভুট্টা, ছোলা, জোয়ার, বাজরা প্রভৃতি ফসল উৎপাদিত হয়ে। এই অঞ্চলে লোকবসতি নিবিড়। গঙ্গাতীরে **হরিদ্বার** প্রধান শহর। (৬) **লাদাক অঞ্চল**—কাশ্মীরের উত্তর-পূর্বে তিব্বতীয় মালভূমির শীততীব্র অংশ ইহার অন্তর্গত। পশুপালন অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। যানবাহন ব্যবস্থা অনুন্নত। লোকবসতি বিরল। **লেহ্‌** এই অঞ্চলের বিখ্যাত বাণিজ্য-কেন্দ্র।

(খ) **মধ্যভাগের নদীবিধৌত সমভূমি**—উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত এবং পশ্চিমে পাঞ্জাব হইতে পূর্বে আসামের পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত ২৪১৪ কি.মি. দীর্ঘ ও ২৪১-৩২১ কি.মি. বিস্তারযুক্ত এই সমভূমি সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও তাহাদের উপনদী ও শাখানদী কর্তৃক বাহিত পলিমাটি দ্বারা গঠিত। ইহার কোন অংশই সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৫০-১৮০ মিটারের অধিক উচ্চ নহে, তবে পূর্বাংশ ক্রমশঃ পূর্বদিকে ঢালু। মধ্যে আরাবল্লী পর্বত ও উহার উত্তর-পূর্বের অনুচ্চ শৈলশিরা এই সমভূমির জলবিভাজিকা।

এই সমভূমিকে নিম্নলিখিত **প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে** বিভক্ত করা যায় :—

(১) **পাঞ্জাবের সমভূমি**—সিন্ধুনদের চারিটি প্রধান উপনদীর পলিগঠিত উর্বর অববাহিকা লইয়া এই সমভূমি গঠিত। বৃষ্টিপাত দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ ব্যতীত অন্যত্র গড়ে ২০″-৩০″; জলবায়ু চরমভাবাপন্ন, মৃত্তিকা উর্বর। কৃত্রিম সেচব্যবস্থার সাহায্যে গম, যব, জোয়ার, বাজরা, কার্পাস, তামাক, ইক্ষু, ভুট্টা,

ধান, চা, তৈলবীজ প্রভৃতি শস্য উৎপাদিত হয়। অরণ্যভূমিতে দেবদারু জন্মে। সামান্য খনিজ লবণ পাওয়া যায়। উত্তরের চারণভূমিতে বহু পশু পালিত হয়। রেশম ও পশম বস্ত্র, চর্ম, শর্করা প্রভৃতি এই অঞ্চলের প্রধান শিল্প। অমৃতসর, জলন্ধর, লুধিয়ানা, আম্বালা, সিমলা প্রভৃতি প্রধান শহর। (২) **উত্তরগঙ্গার সমভূমি**—পশ্চিমে দিল্লী হইতে পূর্বে এলাহাবাদের পূর্বাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত এই
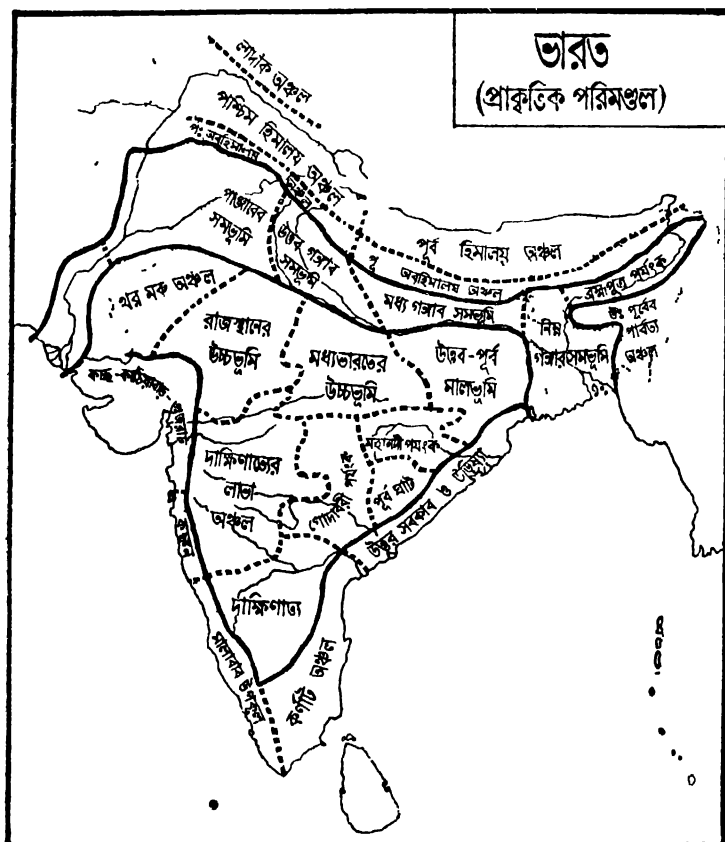
৯ নং চিত্র—ভারতের প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল

সমভূমি অঞ্চলের গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পশ্চিমাংশে ২৫′ হইতে পূর্বাংশে ৪০′ পর্যন্ত। জলবায়ু পাঞ্জাবের সমভূমি অঞ্চলের ন্যায় চরমভাবাপন্ন নহে। এই অঞ্চল গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি বহু নদীপ্রবাহ বিধৌত, পাললিক মৃত্তিকায় উর্বর এবং জলসেচে সমৃদ্ধিশালী। কৃষিকার্যই অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। গম, ইক্ষু (সর্বপ্রধান), জোয়ার, বাজরা, যব, ধান, ভুট্টা,

ছোলা, কার্পাস, তৈলবীজ প্রভৃতি প্রধান কৃষিজ দ্রব্য। লোকবসতি ঘন। এই অঞ্চলের কার্পাস, ইক্ষু, চর্ম, রাসায়নিক দ্রব্য, দুগ্ধজাত দ্রব্য, কাচ, কাগজ, দিয়াশলাই প্রভৃতি সংক্রান্ত শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, মথুরা, ফরাক্কাবাদ, কানপুর, মীরাট, মোরাদাবাদ, আলীগড় প্রভৃতি বিখ্যাত শিল্পাঞ্চল। (৩) **মধ্যগঙ্গার সমভূমি**—এলাহাবাদের পূর্বাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গার উত্তরস্থিত উত্তর প্রদেশ ও বিহারের প্রায় সমগ্র অংশ লইয়া গঠিত এই অঞ্চল পলিসমৃদ্ধ ও উর্বর। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত পশ্চিমাংশে ৪০ হইতে পূর্বাংশে ৭০ পর্যন্ত। জলবায়ু মৃদুভাবাপন্ন। স্থানে স্থানে সেচ ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে ধান, গম, যব, জোয়ার, বাজরা, রাই, তিসি, ইক্ষু, কার্পাস, ভুট্টা, তামাক, ছোলা, মটর, অড়হর, মসুর, আফিং, নীল, আম, লিচু, প্রভৃতি প্রধান। লোকবসতি নিবিড়। ভাগলপুরের বেগুলিন ও রেশম শিল্প বিখ্যাত। বারাণসী, গোরক্ষপুর, মির্জাপুর, ফৈজাবাদ, পাটনা, ভাগলপুর, মুঙ্গের, দ্বারভাঙ্গা, মজঃফরপুর, ছাপরা প্রভৃতি প্রধান শহর। (৪) **নিম্নগঙ্গার সমভূমি**—গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পলিদ্বারা গঠিত এই সমভূমি ও বদ্বীপ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত অধিক, জলবায়ু সাধারণতঃ উষ্ণ ও আর্দ্র এবং ভূমি উর্বর। ধান, গম, জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা, পাট, তৈলবীজ, ইক্ষু কার্পাস প্রভৃতি এই অঞ্চলের ফসল। স্থানে স্থানে তুঁতগাছে রেশমকীট পালিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের আসানসোল ও রাণীগঞ্জের কয়লার খনি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লোকবসতি অত্যন্ত ঘন। শর্করা, রাসায়নিক দ্রব্য, কাগজ, দিয়াশলাই, সিগারেট, চীনামাটির বাসন প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যের শিল্প এই অঞ্চলে রহিয়াছে। কলিকাতা, ভাটপাড়া, টিটাগড়, শ্রীরামপুর, আসানসোল, রাণীগঞ্জ প্রভৃতি বিখ্যাত শিল্প কেন্দ্র। (৫) **ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা**—ব্রহ্মপুত্র-বিধৌত আসামের উত্তরাংশ লইয়া গঠিত প্রায় ৮০০ কি মি দীর্ঘ ও প্রায় ৮০ কি মি. প্রস্থ যুক্ত এই অঞ্চলের ভূপৃষ্ঠ সমতল ও পাললিক শিলায় গঠিত, বৃষ্টিপাত ৮০ র উপর, জলবায়ু মৃদু ও আর্দ্র। ধান, চা, তৈলবীজ, পাট, কমলালেবু, আনারস প্রভৃতি কৃষিজ দ্রব্য, খনিজ তৈল, চুন প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য, শাল, শিশু প্রভৃতি বনজ দ্রব্য এবং রবার, সিঙ্কোনা প্রভৃতি নানাবিধ ফসল এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। ব্রহ্মপুত্রই প্রধান নদীপথ। গৌহাটি হইতে শিলং এবং ডিমাপুর পর্যন্ত মোটর পথ রহিয়াছে।

(গ) **দক্ষিণের মালভূমি**—সমভূমির দক্ষিণ প্রান্তে পশ্চিম পূর্বে বিস্তৃত বিন্ধ্য-রাজমহল পর্বতাঞ্চল হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ একটি বিশাল মালভূমি। এই মালভূমি দুইভাগে বিভক্ত। উত্তরে বিন্ধ্য-রাজমহল ও দক্ষিণে সাতপুরা-মহাদেব-মহাকাল-পরেশনাথ পাহাড়ের অন্তর্বর্তী ক্ষুদ্রতর মালভূমিকে **মধ্য ভারতের মালভূমি** এবং ইহার দক্ষিণাংশের বৃহত্তর

ত্রিভুজাকৃতি ভূমিভাগকে **দক্ষিণাপথের মালভূমি** বলা হয়। ইহার পূর্বদিকে পূর্বঘাট (গড় উচ্চতা ৪৫০ মি.) ও পশ্চিমে পশ্চিমঘাট (গড় উচ্চতা ৯০০ মি) পর্বতশ্রেণী। এই দুইটি পর্বতশ্রেণী দক্ষিণে নীলগিরি পর্বতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। দক্ষিণাপথের মালভূমি প্রায় ৬০০ মি. উচ্চ এবং পূর্বদিকে ঢালু, এই কারণে পশ্চিমঘাট পর্বত হইতে নির্গত নদীসমূহ পূর্ববাহিনী।

মধ্য ভারতের মালভূমিকে নিম্নলিখিত **প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে** বিভক্ত করা যায়ঃ—(১) **মধ্য ভারতের উচ্চভূমি**—উত্তরে গাঙ্গেয় সমভূমি এবং দক্ষিণে নর্মদা শোন অববাহিকার অন্তর্বর্তী কেলাসিত শিলাস্তরে গঠিত উচ্চভূমি ইহার অন্তর্গত। বার্ষিক বৃষ্টিপাত প্রায় ৪ , জলবায়ু মৃদুভাবাপন্ন। ধান, কার্পাস, তৈলবীজ, জোয়ার প্রভৃতি কৃষিজ দ্রব্য এবং মর্মর এই অঞ্চলের প্রধান সম্পদ। **ঝাঁসী** ও **জব্বলপুর** বিখ্যাত শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্র। (২) **রাজস্থানের উচ্চভূমি**—আরাবল্লী পর্বত এবং উহার উত্তরপূর্ব অঞ্চলের অন্তর্বৃত্তি, দক্ষিণ রাজস্থানের পর্বত, পূর্ব রাজস্থানের উপত্যকাভূমি এবং নর্মদার উপত্যকাভূমি লইয়া গঠিত এই অঞ্চলের জলবায়ু শুষ্ক ও চরমভাবাপন্ন, বৃষ্টিপাত অপরিমিত ও অনিশ্চিত। সেচব্যবস্থার বিশেষ সুবিধা নাই। জোয়ার, বাজরা, ছোলা, গম, যব, ভুট্টা, তৈলবীজ ও কার্পাস প্রধান ফসল। লোকবসতি অল্প। পশুচারণ অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। এ অঞ্চলের কার্পাস ও পশম বয়নশিল্প উল্লেখযোগ্য। এই উচ্চভূমির মধ্য দিয়া কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ বোম্বাই হইতে আগ্রা ও দিল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। **আজমীর, জয়পুর, আবু** ও **উদয়পুর** এই অঞ্চলের বিখ্যাত শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র। (৩) **থর মরু অঞ্চল**—উত্তর-পশ্চিমে সিন্ধু-বিধৌত সমভূমি এবং দক্ষিণ পূর্বে আরাবল্লী পর্বত দ্বারা আবদ্ধ উষ্ণ মরু-প্রকৃতির ভূভাগ ইহার অন্তর্গত। লোকবসতি অত্যন্ত বিরল। জোয়ার ও বাজরা প্রধান কৃষিজ দ্রব্য। **বিকানীর** উল্লেখযোগ্য নগর।

দাক্ষিণাত্যের মালভূমিকে তিনটি **প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে** বিভক্ত করা যায়। (১) **দাক্ষিণাত্য অঞ্চল**—বর্তমান মহীশূর রাজ্যের দক্ষিণাংশ এবং তামিলনাড়ুর পশ্চিমাংশ লইয়া গঠিত এই অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি বন্ধুর, মৃত্তিকা সাধারণতঃ লোহিতবর্ণের ও বার্ষিক বৃষ্টিপাত সাধারণতঃ ২০" হইতে ৪০" পর্যন্ত। কৃত্রিম সেচব্যবস্থার সাহায্যে কৃষিকার্য সম্পাদিত হয়। ইহা ভারতের অন্যতম দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চল। এই অঞ্চলের সেগুন, চন্দন, শাল প্রভৃতি বনজ, স্বর্ণ, লৌহ, ম্যাঙ্গানীজ, ক্রোমাইট, কয়লা প্রভৃতি খনিজ এবং ধান, গম, জোয়ার, বাজরা, কার্পাস, ইক্ষু, তৈলবীজ, কফি, চা প্রভৃতি কৃষিজ দ্রব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তৃণভূমিতে গবাদি পশু ও মেষ প্রতিপালিত হয়। বিভিন্নস্থানে জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হইতেছে। বয়ন শিল্প, সিমেণ্ট, বিমান-

পোত নির্মাণ, সাবান, চন্দনতৈল প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুতির শিল্প এ অঞ্চলে রহিয়াছে। মহীশূর, ব্যাঙ্গালোর, বেলারী, কুর্নুল ও হায়দরাবাদ শিল্পপ্রধান অঞ্চল। (২) **দাক্ষিণাত্যের লাভা অঞ্চল**—বর্তমান মহারাষ্ট্র ও গুজরাট প্রদেশের সমগ্র কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল, মহীশূর রাজ্যের উত্তরাংশ ও মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমাংশ লইয়া গঠিত এই অঞ্চলের মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণের, উর্বর ও জলসঞ্চয়ী। বৃষ্টিপাত অল্প এবং জলবায়ু উষ্ণ ও শুষ্ক। কার্পাস, জোয়ার, বাজরা, গম, তৈলবীজ প্রভৃতি প্রচুর জন্মে। সহ্যাদ্রির পূর্ব ঢালে বনজ সম্পদ পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে বহু কার্পাস শিল্পপ্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। সোলাপুর, গুলবর্গা, আকোলা, অমরাবতী, পুণা ও নাগপুর প্রসিদ্ধ শিল্পকেন্দ্র। (৩) **উত্তর-পূর্ব মালভূমি অঞ্চল**—ছোটনাগপুরের মালভূমি, মধ্য ভারতের উচ্চভূমির পূর্বাংশ, পূর্বঘাটের উত্তরাংশ এবং মহানদী ও গোদাবরীর উপত্যকা লইয়া ইহা গঠিত। বৃষ্টিপাত ৪০" হইতে ৬০" পর্যন্ত। এই মালভূমি অরণ্য-সম্পদে সমৃদ্ধ। অরণ্য হইতে শাল, লাক্ষা ও রেশমকীট আহৃত হয়। নদী-উপত্যকা অঞ্চলে ধান, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা, তৈলবীজ, ডাল প্রভৃতি জন্মে। কয়লা, লৌহ, অভ্র, প্রভৃতি খনিজ এই অঞ্চলে প্রচুর পাওয়া যায়।

(ঘ) **উপকূলভূমি**—ভারতের পশ্চিম উপকূলে অপ্রশস্ত এবং পূর্ব উপকূলে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত সমভূমি রহিয়াছে। উভয় উপকূলের পশ্চাদ্-ভাগেই পর্বতমালা অবস্থিত। তবে, পশ্চিম উপকূলের পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থিত পশ্চিমঘাট পর্বতমালা একটি উচ্চ অবিচ্ছিন্ন প্রাচীরের ন্যায়, কিন্তু পূর্ব উপকূলের পশ্চাদভাগে অবস্থিত পূর্বঘাট পর্বতমালা অপেক্ষাকৃত অনুচ্চ ও বিচ্ছিন্ন পর্বতসমষ্টি লইয়া গঠিত। পশ্চিম উপকূলে জুন হইতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় কিন্তু পূর্ব উপকূলে শীত ও গ্রীষ্মে দুইবার মাঝারি ধরণের বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। উভয় উপকূলাঞ্চলই প্রায় অভগ্ন এবং উভয় উপকূলেই কতকগুলি লবণাক্ত উপহ্রদ রহিয়াছে। পশ্চিম উপকূল দিয়া প্রবাহিত নদীসমূহ হ্রস্ব ও খরস্রোতা বলিয়া উহাদের মোহানায় বিশেষ বদ্বীপ নাই কিন্তু পূর্ব উপকূলাঞ্চল দিয়া প্রবাহিত নদীসমূহ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও মন্দস্রোতা বলিয়া উহাদের মোহানায় বহু বদ্বীপ রহিয়াছে। পশ্চিম উপকূলের মৃত্তিকা বালুকা-প্রধান কিন্তু পূর্ব উপকূলাঞ্চলের মৃত্তিকা পলিপ্রধান। তবে সামগ্রিক বিচারে বলা যাইতে পারে যে ভারতের উপকূলীয় সমভূমি অঞ্চল উর্বর, এবং কৃষি ও শিল্পসম্পদে সমৃদ্ধ। এতদঞ্চলের পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত এবং লোকবসতি নিবিড়।

পশ্চিম উপকূলের সমভূমিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি **প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে** বিভক্ত করা যায়:—(১) **কচ্ছ-কাঠিয়াবাড়-গুজরাট অঞ্চল**—ইহা একটি বৃষ্টিহীন, অনুর্বর ও বন্ধুর ভূখণ্ড। অনুকূল জলবায়ুযুক্ত

অঞ্চলে গম, ধান, জোয়ার, বাজরা ও কার্পাস জন্মে। চুনাপাথর ও লবণ প্রধান খনিজ। গুজরাটের পূর্বাঞ্চল অরণ্যাকীর্ণ। দমন, সুরাট, ব্রোচ, বরোদা, আমেদাবাদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য নগর, **কাণ্ডলা** নবনির্মিত বন্দর। (২) **কঙ্কণ উপকূল**—বোম্বাই হইতে গোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত এই উপকূলভূমির জলবায়ু মৃদু ও আর্দ্র। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৮০"। পার্বত্য অংশে সেগুন, শাল, ও আবলুস বৃক্ষের নিবিড় অরণ্য রহিয়াছে। সমভূমি অঞ্চলে নারিকেল, সুপারী ও ধান প্রচুর জন্মে। নদীসমূহ খরস্রোতা হওয়ায় নাব্য নহে, তবে কাষ্ঠ পরিবহন ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। লোকবসতি ঘন। **বোম্বাই** বিখ্যাত বন্দর ও শিল্পকেন্দ্র। ইহা ভারতের অন্যান্য অংশের সহিত রেলপথ-দ্বারা সংযুক্ত। (৩) **মালাবার উপকূল**—গোয়া হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তৃত এই উপকূলভূমির জলবায়ু মৃদু ও আর্দ্র। পার্বত্য ভূমিতে সেগুন, চন্দন, আবলুস, সিঙ্কোনা প্রভৃতি বৃক্ষের বন ও সমভূমি অঞ্চলে ধান, নারিকেল, রবার, সুপারী, এলাচ, মরিচ প্রভৃতি জন্মে। লোকবসতি ঘন। নারিকেল সংক্রান্ত নানাবিধ শিল্প, মৎস্য ও রবার শিল্প এই অঞ্চলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মালাবার উপকূলাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে রেলপথ বিস্তৃত রহিয়াছে। কালিকট, ত্রিবান্দ্রাম, আলেপ্পী, কুইলন প্রভৃতি বিখ্যাত বন্দর ও শিল্পকেন্দ্র।

পূর্ব-উপকূলের সমভূমিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি **প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে** বিভক্ত করা যায়:—(১) **কর্ণাট বা তামিল অঞ্চল**—পশ্চিমে কার্ডামম পর্বত, উত্তর-পশ্চিমে মালভূমির প্রান্তভাগ, পূর্বে বঙ্গোপসাগর, উত্তরে কৃষ্ণা নদী ও দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তৃত পাললিক শিলাস্তরে গঠিত কর্ণাট অঞ্চলের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। সেচব্যবস্থার সাহায্যে জোয়ার, বাজরা, ধান, বাদাম, কার্পাস, ইক্ষু, তামাক, চা, নারিকেল প্রভৃতি কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদিত হয়। শুষ্ক পার্বত্যভূমিতে মেষ পালিত হয়। পার্বত্য বনভূমিতে চন্দন, আবলুস, সেগুন ও সিঙ্কোনা বৃক্ষ জন্মে। অভ্র ও লবণ খনিজ পদার্থের মধ্যে প্রধান। উপকূলের সর্বত্র শঙ্খ, মৎস্য এবং স্থানে স্থানে মুক্তা সংগ্রহের ব্যবসায় আছে। লোকবসতি ঘন। মাদ্রাজ, তুতিকোরিন কুদ্দালোর, নেগাপত্তম, ত্রিচিনপল্লী, তাঞ্জোর, তিনেভেলী, মাদুরা, পন্দিচেরী প্রভৃতি এই অঞ্চলের বন্দর ও শিল্পবাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। পাট, তৈল, নারিকেলের ছোবড়ার দড়ি, চুরুট, সাবান, দিয়াশলাই প্রভৃতি নানাবিধ শিল্প এ অঞ্চলে রহিয়াছে। (২) **অন্ধ্র ও উড়িষ্যার উপকূল অঞ্চল**—কৃষ্ণা নদীর উত্তর হইতে মহানদীর মোহানা পর্যন্ত বিস্তৃত ও উর্বর মৃত্তিকাযুক্ত এই অঞ্চলের জলবায়ু অন্যান্য উপকূলাঞ্চল অপেক্ষা শুষ্ক। ধান, জোয়ার, বাজরা, মশলা, নারিকেল, ইক্ষু প্রভৃতি কৃষিজ দ্রব্য ; ম্যাঙ্গানীজ, লবণ প্রভৃতি

খনিজ দ্রব্য; পার্বত্য বনভূমিতে শাল, সেগুন প্রভৃতি কাষ্ঠ এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ। লোকবসতি অত্যন্ত ঘন। কলিকাতা হইতে বিশাখাপত্তনম পর্যন্ত উপকূলাঞ্চল দিয়া রেলপথ প্রসারিত রহিয়াছে। এই অঞ্চলের জাহাজ নির্মাণ, লবণ ও মৎস্য শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশাখাপত্তনম, কটক, পুরী প্রভৃতি বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র।

প্রশ্নোত্তর

1. Define a natural region Into how many natural regions can the world be divided? Name them and indicate their position in a diagram (প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল কাহাকে বলে? পৃথিবীকে কয়টি প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে বিভক্ত করা যায়? উহাদের নাম লিখ এবং চিত্র অঙ্কন করিয়া উহাদের অবস্থান নির্দেশ কর।) (পৃ: ২৭-৩০)

2. Describe the climate of the Equatorial Region. Indicate the different types of agriculture and agricultural products in such a climatic region. (নিরক্ষীয় অঞ্চলের জলবায়ুর বিবরণ লিখ। এই অঞ্চলের কৃষিকার্য ও কৃষিজ দ্রব্যের নির্দেশ কর।) (H. S. '61) (পৃ: ৩০-৩২)

3. Describe the natural region where hardwood evergreen forests are the prevailing natural vegetation. (কঠিন কাষ্ঠযুক্ত চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি যে প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের স্বাভাবিক উদ্ভিদ তাহার বর্ণনা কর।) (নিরক্ষীয় পরিমণ্ডল, (পৃ: ৩০-৩২)

4. Locate, classify, and account for the chief areas of natural grasslands in the world. Examine the nature of economic development of these regions (পৃথিবীর প্রধান প্রধান তৃণভূমি অঞ্চলসমূহের শ্রেণীবিভাগ সাধনপূর্বক উহাদের প্রত্যেকটির অবস্থান ও উৎপত্তির কারণ নির্দেশ কর। প্রত্যেকটি তৃণভূমি অঞ্চলের বৈষয়িক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা কর।) (H. S '65) (সাভানা জলবায়ু, পৃ: ৩২-৩৮; ও স্তেপ জলবায়ু, পৃ: ৪৬-৪৭)

5. Describe and account for the characteristics of climate of the region where softwood evergreen forests are the prevailing natural vegetation. (কোমলকাষ্ঠযুক্ত চিরহরিৎ সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি যে প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের স্বাভাবিক উদ্ভিদ তাহার বর্ণনা কর এবং তদঞ্চলের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর।) (তৈগা অঞ্চল, পৃ: ৪৫-৪৬)

6. Compare and contrast the Mediterranean type of climate with the Monsoonal type. (মৌসুমী ও ভূমধ্যসাগরীয় পরিমণ্ডলের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া উহাদের পার্থক্য দেখাও।) (H. S. '63,'64, U. E. '61, P. U. '61) (পৃ: ৩৪-৩৬, ৪০-৪১)

[নির্দেশ : ভূমধ্যসাগরীয় ও মৌসুমী জলবায়ুর তুলনা]

ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু	মৌসুমী জলবায়ু
অবস্থান—ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল মহাদেশের পশ্চিম প্রান্তে প্রায় ৩০ হইতে ৪৫° উঃ ও দঃ সমাক্ষরেখার মধ্যে শীতকালে পশ্চিমা এবং গ্রীষ্মকালে আয়ন বায়ুবলয়ে অবস্থিত।	অবস্থান—মৌসুমী অঞ্চল মহাদেশের পূর্ব-প্রান্তে প্রায় ২০ হইতে ৩০° উঃ ও দঃ সমাক্ষ-রেখার মধ্যে আয়নবায়ুবলয়ে অবস্থিত। কিন্তু এখানকার বায়ুপ্রবাহ আয়নবায়ু অপেক্ষা স্থানীয় কারণে অন্যদিক হইতে অধিক প্রবাহিত হয়।
জলবায়ু—(১) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয় এবং গ্রীষ্মকাল সাধারণতঃ শুষ্ক থাকে। (২) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ৩০″। (৩) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে পশ্চিমাবায়ু প্রবাহের ফলে বৃষ্টিপাত হয়। (৪) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে গ্রীষ্ম ও শীতকালীন উত্তাপ পর্যায়ক্রমে ৯০ ফাঃ ও ৫০ ফাঃ। (৫) বৎসরের অধিকাংশ দিনই আকাশ নির্মেঘ থাকে।	জলবায়ু—(১) মৌসুমী অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত হয় এবং শীতকাল শুষ্ক থাকে। (২) মৌসুমী অঞ্চলে বার্ষিক গড়বৃষ্টিপাত প্রায় ৫০″-৭৫″। (৩) মৌসুমী অঞ্চলে আয়নবায়ু অপেক্ষা স্থানীয় কারণে অন্যান্য দিক হইতে আগত বায়ুপ্রবাহের দ্বারা বৃষ্টিপাত হয়। (৪) মৌসুমী অঞ্চলে গ্রীষ্ম ও শীতকালীন উত্তাপ পর্যায়ক্রমে ৯০° ফাঃ ও ৬০ ফাঃ। (৫) বৎসরের অধিকাংশ দিনই আকাশ মেঘাবৃত থাকে।
উদ্ভিদ—(১) প্রাকৃতিক উদ্ভিদের মধ্যে ছোট ছোট বৃক্ষ ও ঝোপ-ঝাড়ই অধিক। পর্যাপ্ত বৃষ্টিযুক্ত অঞ্চলে ওক এবং চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য দৃষ্ট হয়। (২) কৃষিজ উদ্ভিদের মধ্যে আঙ্গুর, পীচ, ডুমুর, কমলালেবু, কলা প্রভৃতি ফল, গম, যব প্রভৃতি খাদ্যশস্য এবং রেশম প্রধান। (৩) কৃষিকার্য সাধারণতঃ শীতকালে হয়।	উদ্ভিদ—(১) সেগুন, শাল প্রভৃতি চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য দৃষ্ট হয়। এই অঞ্চল বনজ-সম্পদে সমৃদ্ধ। (২) কৃষিজ উদ্ভিদের মধ্যে ধান, পাট, গম, জোয়ার, বাজরা, কার্পাস, শণ, অতসী, যব, তৈলবীজ, চা, কফি, তামাক, সিনকোনা, রবার, ডাল প্রভৃতি প্রধান। (৩) কৃষিকার্য সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে হয়।

7. Account for the variety in the distribution of rainfall in India and show its effects on the chief products. (ভারতে বৃষ্টিপাতের তারতম্যের কারণ নির্দেশ কর এবং শস্য-উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই তারতম্যের প্রভাব নির্ধারণ কর।) (P. U. '63)

(পৃঃ ৫০-৫৪)

8. Dıvıde India ınto natural regıons. Descrıbe and account for the climate, products and ındustrıes of each regıon (ভারতকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে বিভক্ত কর এবং প্রত্যেকটি পরিমণ্ডলের জলবায়ু, উৎপন্ন দ্রব্য ও শিল্প-সংগঠন সম্পর্কে লিখ।) (পৃ ৫৪-৬২)

9 Compare and contrast the e ıst coast of Indıa with the west coast. (ভারতের পূর্ব-উপকূলের সহিত পশ্চিম-উপকূলের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া উহাদের পার্থক্য নির্দেশ কর।) (পৃঃ ৬০-৬১)

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রাথমিক উৎপাদন

চতুর্থ অধ্যায়

কৃষিকার্য

(Agriculture)

অর্থনৈতিক ভূগোল অনুশীলনের চারিটি ক্ষেত্রের মধ্যে (প্রাথমিক উৎপাদন, পরিবহন, গৌণ উৎপাদন ও বাণিজ্য) প্রাথমিক উৎপাদনের গুরুত্বই সর্বাপেক্ষা অধিক। প্রাথমিক উৎপাদন আবার পাঁচ প্রকারের হইতে পারে—কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন, মৎস্য উৎপাদন, খনিজ দ্রব্যের উৎপাদন, বনজ দ্রব্যের উৎপাদন এবং শিকার-বৃত্তি হইতে উৎপাদন। পৃথিবীর বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত কাঁচামাল এবং জনসাধারণের ভোগে ব্যবহৃত খাদ্যদ্রব্যাদি প্রাথমিক উৎপাদনের সাহায্যেই সংগৃহীত হইয়া থাকে। প্রাথমিক উৎপাদন বন্ধ হইলে পৃথিবীর সর্বপ্রকার বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপও বন্ধ হইয়া যাইবে। প্রাথমিক উৎপাদনের পাঁচটি বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনই হইল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

কৃষির উপর পরিবেশের প্রভাব (Influence of environment on agriculture)—নিম্নলিখিত প্রাকৃতিক অবস্থাগুলির উপর কৃষিকার্য বহুলাংশে নির্ভর করিয়া থাকে—

(১) **উত্তাপ**—গ্রীষ্মকালেই অধিকাংশ শস্যের জন্ম ও বৃদ্ধি হয় বলিয়া দীর্ঘ গ্রীষ্মকাল শস্য উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। যে সমস্ত অঞ্চলের গ্রীষ্মকালীন সর্বোচ্চ উত্তাপ ৫০° ফাঃ-এর অনধিক সেই সমস্ত অঞ্চলে কোন প্রকার কৃষিকার্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। তবে উচ্চতর অক্ষাংশে দিনমান দীর্ঘ হওয়ায় অল্প উত্তাপেও কৃষিকার্য চলিয়া থাকে।

(২) **বৃষ্টিপাত**—কৃষিকার্যের জন্য মৃত্তিকার পরিমিত আর্দ্রতা আঞ্চলিক বৃষ্টিপাত ও উত্তাপের উপর নির্ভর করে। যে অঞ্চলে বাষ্পীভবন অধিক এবং আবহাওয়া শুষ্ক, সে অঞ্চলে শস্য উৎপাদনের জন্য অন্য অঞ্চল অপেক্ষা অধিকতর বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয়। কৃষিবিজ্ঞানীদের মতে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে ১০" এবং ক্রান্তীয় অঞ্চলে ২০"-র অনধিক বৃষ্টিপাত হইলে শস্য উৎপাদন স্বাভাবিকভাবে সম্ভব হয় না। ঐরূপ অবস্থায় কৃত্রিম উপায়ে জল সরবরাহের প্রয়োজন হয়।

বৃষ্টিপাতের আঞ্চলিক তারতম্য অনুসারে কৃষিকার্যের নিম্নরূপ **প্রকারভেদ** ঘটিয়া থাকে। (ক) যে সমস্ত অঞ্চলের বৃষ্টিপাত ৩০" বা তদূর্ধ্ব সে সমস্ত অঞ্চলে স্বাভাবিকভাবে কৃষিকার্য চলিয়া থাকে। এই কৃষিপ্রথাকে **আর্দ্র কৃষি** (humid farming) বলা হয়। (খ) যে সমস্ত অঞ্চলে পরিমিত বৃষ্টি হয় না, জলসেচ করিয়া কৃষিকার্য করিতে হয়, সেই সমস্ত অঞ্চলের কৃষির প্রণালীকে **সেচ কৃষি** (irrigation farming) বলে। (গ) যে সমস্ত অঞ্চলে বৃষ্টিপাত সাধারণতঃ ২০"র অনধিক, এবং কৃত্রিম জলসেচ ব্যবস্থার সুবিধা নাই সেই সমস্ত অঞ্চলে সামান্য বৃষ্টিপাতের সাহায্যেই কিছু কিছু কৃষিকার্য চলে। এই প্রণালীর কৃষিকে **শুষ্ক কৃষি** (dry farming) বলা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের রকি পর্বতমালার পূর্বাঞ্চল, অস্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, পশ্চিম এশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি অঞ্চলের অপরিমিত বৃষ্টিযুক্ত স্থানে শুষ্ক কৃষি ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে অবলম্বিত হয়।

[শুষ্ক কৃষি প্রণালী অনুসারে কৃষিক্ষেত্র বৃষ্টিপাতের পূর্বে গভীরভাবে কর্ষণ করা হয় এবং প্রতি পশলা বৃষ্টির পরই ক্ষেত্র হইতে জলের বাষ্পীভবন নিবারণের জন্য সূক্ষ্ম ধূলিচূর্ণ (mulch) দ্বারা ক্ষেত্রকে আবৃত করা হয়। এইরূপ কয়েক পশলা বৃষ্টির পর ক্ষেত্র আর্দ্র হইলে ক্ষেত্রের আগাছা নষ্ট করিয়া অপেক্ষাকৃত শুষ্ক অঞ্চলের ফসল, যথা—গম যই, যব, রাই প্রভৃতির চাষ করা হয়। আর্দ্র ও সেচ কৃষি অপেক্ষা শুষ্ক কৃষি ব্যবস্থায় উৎপন্ন পণ্যের উৎপাদন-ব্যয় অধিক এবং পরিমাণ কম হয়।]

(৩) **মৃত্তিকা**—কৃষিকার্যের উপযোগী ভূমির মূল্য নির্ভর করে প্রধানতঃ মৃত্তিকা ও বৃষ্টিপাতের উপর। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে (২য় অধ্যায়—মৃত্তিকা দেখ) পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে মৃত্তিকার গুণগত ও পরিমাণগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে এবং সকল মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তিও সমান নহে। কৃষিকার্য সম্পর্কিত আলোচনায় সেই কারণে মৃত্তিকা সম্বন্ধেও বিচার করা প্রয়োজন।

(৪) **ভূ-প্রকৃতি**—ভূ-প্রকৃতি কৃষিকার্যকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। সাধারণতঃ সমভূমি অঞ্চলে যন্ত্রপাতির সাহায্যে কৃষিকার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলে ইহা সম্ভব নহে। পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়-পর্বতের গায়ে থাক কাটিয়া কাটিয়া ক্ষেত তৈয়ারী করা হয় এবং উহাতে অতি সামান্য পরিমাণে কৃষিকার্য চলিয়া থাকে।

এই সকল প্রাকৃতিক অবস্থা ব্যতীত কয়েকটি **অর্থনৈতিক অবস্থার** উপরও কৃষিকার্যের উন্নতি-অবনতি নির্ভর করে। জনসংখ্যা বণ্টন, শ্রমিক সরবরাহ, শ্রমিকের বুদ্ধি ও কর্মনৈপুণ্য, কৃষিজ দ্রব্যের চাহিদা, পণ্য পরিবহনের সুযোগ-সুবিধা, ক্রয়বিক্রয় কেন্দ্রের সান্নিধ্য বা দূরবর্তিতা প্রভৃতি অবস্থাগুলির উপরও কৃষিকার্য নির্ভর করিয়া থাকে।

কৃষি-প্রণালী (Systems of Agriculture)—পরিবেশের তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার কৃষি-প্রণালী অনুসৃত হয়। (১) আমাজন ও কঙ্গো অববাহিকার, উঃ পূঃ ভারতের পার্বত্য অংশের এবং মধ্য এশিয়ার অংশবিশেষের নিম্ন জীবনমানসম্পন্ন আদিম অধিবাসীরা কেবলমাত্র নিজেদের অভাব মিটাইবার জন্যই যে কার্যপ্রথা অবলম্বন করে তাহাকে **স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষিপ্রণালী** (self-sufficient agriculture) বলে। (২) কোন কোন দেশের ভূমিভাগ হইতে পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কোন একটিমাত্র নির্দিষ্ট ফসলের উৎপাদন করা হয়। এই কৃষিপ্রণালীকে **এক-ফসলী চাষ** (one-crop agriculture) বলে। ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে **আবাদী** (plantation) প্রথায় যে কৃষিকার্য পরিচালিত হয় তাহা প্রায়শঃই এক-ফসলী হইয়া থাকে। চা, কফি, রবার, ইক্ষু, তামাক, কলা, আনারস প্রভৃতি কৃষিজ দ্রব্যগুলি প্রধানতঃ আবাদী প্রথাতেই উৎপাদিত হইয়া থাকে। আবাদী প্রথায় চাষ করিলে ফসল উচ্চস্তরের হয় এবং একর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। তবে এই প্রথা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এক-ফসলী কৃষি-ব্যবস্থার বিশেষ **সুবিধা** এই যে ইহা অল্প ব্যয় ও শ্রমসাধ্য এবং উৎপাদিত ফসল সংশ্লিষ্ট শিল্প-সংগঠনে সহায়ক। তবে উৎপাদিত ফসলের মূল্যের অনিশ্চয়তা, নূতন নূতন প্রতিযোগীর আবির্ভাব, পরিবর্ত-সামগ্রীর উৎপাদন ও ব্যবহার, ভূমির উর্বরতা হ্রাস, ফসল নষ্ট হইয়া গেলে দেশের আর্থিক দৈন্য, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গোলযোগের দরুণ রপ্তানীর অসুবিধা প্রভৃতি এই প্রথার বিশেষ বিশেষ **অন্তরায়**। ক্যানাডা, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল প্রভৃতি রাজ্যে এই প্রথা বিদ্যমান। (৩) এক-ফসলী চাষের অসুবিধা দূর করিবার জন্য বর্তমানে পঃ ও মধ্য ইউরোপ, রুশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা প্রভৃতি দেশের কৃষিকে **বহুমুখী কৃষিতে** (diversified agriculture) পরিণত করার চেষ্টা চলিতেছে। এইরূপ কৃষি-ব্যবস্থায় দেশে নানাবিধ ফসল উৎপন্ন হয় এবং রাজনৈতিক গোলযোগ ও আর্থিক মন্দা সমস্ত কৃষিব্যবস্থাকে একত্রে বিপর্যস্ত করিতে পারে না। সম্প্রতি উপরোক্ত দেশসমূহে **মিশ্রকৃষি** প্রথা (mixed farming) প্রবর্তিত হইয়াছে। এই প্রথা অনুসারে কৃষিক্ষেত্রের এক অংশে পশুপালন এবং অবশিষ্টাংশে চাষ আবাদ হয়। মিশ্রকৃষি প্রথায় কৃষকদের আর্থিক সচ্ছলতা, উন্নত ধরণের কৃষি-যন্ত্রপাতি ও শ্রমিকের সম্বৎসর ব্যবহার, স্বাভাবিক শস্যাবর্তন, অল্পব্যয়ে পর্যাপ্ত উৎপাদন প্রভৃতি **সুবিধা** দর্শে। তবে উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা, উন্নত ধরণের যানবাহন ব্যবস্থা ও পর্যাপ্ত নিপুণ শ্রমিকের সরবরাহ না থাকিলে এই প্রথা অবলম্বিত হয় না।

কর্ষণযোগ্য ভূমির সরবরাহ ও কৃষিজ দ্রব্যের চাহিদার তারতম্য অনুসারে কৃষিকার্যের নিম্নরূপ প্রকারভেদ দৃষ্ট হয়—(১) ক্যানাডা, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া,

প্রভৃতি যে সমস্ত দেশে অধিবাসীর তুলনায় কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ অধিক এবং যে-সমস্ত অঞ্চলে খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা অল্প, ভূমিভাগ সাধারণতঃ অনুর্বর, জলবায়ু কৃষিকার্যের প্রতিকূল, যানবাহন ব্যবস্থাও উন্নত নহে সেই সমস্ত স্থানে শ্রম ও পুঁজি ব্যাপকভাবে ব্যবহার না করিয়াই বৃহৎ বৃহৎ ক্ষেত্র সাধারণ ভাবে চাষ করা হয়। এই প্রকার কৃষি-ব্যবস্থাকে **ভূমিপ্রধান** বা **ব্যাপক কৃষি** (extensive cultivation) বলে। (২) পশ্চিম ইউরোপ, ভারত, চীন প্রভৃতি যে সমস্ত দেশে জনসংখ্যার তুলনায় কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ সামান্য এবং যে সমস্ত দেশে কৃষিজ দ্রব্যের চাহিদা অত্যন্ত অধিক, যানবাহন ব্যবস্থা উন্নত, ভূমিভাগ উর্বর, এবং অন্যান্য উৎপাদক অঞ্চলসমূহের সহিত প্রতিযোগিতাও তীব্র সেই সমস্ত অঞ্চলে সামান্য পরিমাণ কৃষিক্ষেত্র হইতে অধিক শস্য উৎপাদনের জন্য একই ক্ষেত্রে বারংবার প্রচুর অর্থ ও শ্রমিক নিয়োগ করা হয়। এই প্রকার কৃষিকে **শ্রম ও পুঁজিপ্রধান** বা **সযত্ন কৃষি** (intensive cultivation) বলা হয়।

ভারতের কৃষি ব্যবস্থা

ভারতীয় কৃষির বৈশিষ্ট্য (Features of Indian agriculture)—ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশে সমগ্র অধিবাসীদের ৭০% প্রত্যক্ষভাবে এবং ২০% পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। আবার মোট জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধাংশ কৃষি ও তৎসংশ্লিষ্ট কার্যাদি হইতেই উপার্জিত হয়। ১৯৬০-৬১ সালে ভারতে কৃষিকার্যে নিযুক্ত ভূমির পরিমাণ ছিল ৩২·৮০ কোটি একর—মাথাপ্রতি ১ একরেরও কম। কৃষিপ্রধান দেশ হইলেও ভারতীয় কৃষি-শিল্পের অবস্থা অত্যন্ত **অনুন্নত**। বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে জমির বিভক্তীকরণ ও বিক্ষিপ্ত বণ্টন, কৃষিক্ষেত্রে সারের অব্যবহার, জমির উর্বরা শক্তির হ্রাস, প্রাচীন পদ্ধতিতে শস্যোৎপাদন এবং যান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির অভাব, কৃষিকার্যে নিযুক্ত গবাদি পশুর হীনস্বাস্থ্য, পশুখাদ্য হিসাবে কোন ফসল উৎপাদন করার বিধিসম্মত প্রচেষ্টার অভাব, উপযুক্ত বীজ নির্বাচন ও সংরক্ষণ সম্বন্ধে চাষীদের অজ্ঞতা এবং সর্বোপরি চাষীদের নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্য ভারতীয় কৃষিশিল্পের প্রসার ও উন্নতির অন্তরায়। কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও কৃষিশিল্পের অনুন্নতির দরুণ ভারতে একরপ্রতি ফসল উৎপাদনের হার পৃথিবীর যে কোন উন্নত দেশ অপেক্ষা অল্প।

ভারতের কৃষিকার্য বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় না, এদেশের কৃষি-ব্যবস্থা জীবিকা অর্জনের একটি উপায় মাত্র। খাদ্যশস্যের উৎপাদন করাই

ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার প্রধান কার্য। কৃষিকার্যে প্রযুক্ত ভূমিভাগের প্রায় ৮৬% অংশেই খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয় এবং মাত্র ১৪% অংশে বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদিত হইয়া থাকে। এতৎ সত্ত্বেও ভারত খাদ্যশস্যের উৎপাদন বিষয়ে স্বাবলম্বী নহে। তবে কৃষিজ প্রাথমিক দ্রব্য উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। লাক্ষা, চা ও বাদাম উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে প্রথম এবং ধান, পাট, রেড়ী, তিল, তিসি ও চিনি উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

ভারতের ভূমিব্যবহার [কোটি হেক্টারে*]

	১৯৫০-৫১	১৯৬২-৬৩
মোট আয়তন	৩২·৮৭	৩২·৬৮
সংখ্যা সরবরাহক অঞ্চলসমূহের আয়তন †	২৮·৫৩	৩০·৫৮
বনভূমি	৪·০৫	৫·৬৭
কৃষির অনুপযুক্ত		
(১) অন্য কার্যে ব্যবহৃত	১·১২	১·৪৭
(২) ঊষর জমি	৩·৬৩	৩·৪২
মোট	৪·৭৫	৪·৮৯
পতিত ব্যতীত অনাবাদী জমি		
(১) চারণ ভূমি	০·৬৭	১·৪৫
(২) ফলবৃক্ষ সমন্বিত জমি	১·৯৯	০·৫০
(৩) কর্ষণযোগ্য	২·২৯	১·৭৪
মোট	৪·৯৫	৩·৭০
পতিত জমি		
(১) চলতি	১·০৭	১·০৩
(২) অন্যান্য	১·৭৪	১·০৩
মোট	২·৮১	২·০৯
নীট কৃষি জমি	১১·৮৭	১৩·৬২
মোট আবাদী জমি	১৩·১৯	১৫·৬১
একাধিকবার ফসল উৎপাদক জমি	১·৩২	১·৯৯

* ১ হেক্টার=২·৪৭১ একর

† গোয়া, দমন, দিউ, নাগাল্যাণ্ড, নেফা ও পণ্ডিচেরী ব্যতীত।

ফসলের ঋতু (Crop season)—ভারতের উৎপন্ন শস্যকে খারিফ ও রবি এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। বর্ষার প্রারম্ভে বীজ বপন করিয়া হেমন্তকালে যে শস্য সংগ্রহ করা হয় তাহাকে **খারিফ শস্য** বলে। ধান, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা, পাট, কার্পাস, ইক্ষু, তামাক, বাদাম, রেড়ি, তিল প্রভৃতি খারিফ শস্য। শীতের প্রারম্ভে বীজ বপন করিয়া যে শস্য গ্রীষ্মের প্রারম্ভে সংগ্রহ করা হয় তাহাকে **রবি শস্য** বলে। গম, যব, মটর, ছোলা, সরিষা, অতসী প্রভৃতি রবি শস্য।

কৃষি পদ্ধতি (Types of cultivation)– ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার কৃষিপদ্ধতি প্রযুক্ত হয়। ৮০"-র অধিক বৃষ্টিযুক্ত স্থানে **আর্দ্র কৃষি** প্রথায় ধান, পাট, চা ও ইক্ষুর চাষ হয়, ৪০"-৮০ পর্যন্ত বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলসমূহে **স্বল্পার্দ্র কৃষি** প্রথায় কার্পাস, গম, ভুট্টা ও তৈলবীজ জন্মে, ২০"-৪০ পর্যন্ত বৃষ্টিযুক্ত অঞ্চলসমূহে **সেচন কৃষি** প্রথায় কার্পাস, গম, ইক্ষু ও ভুট্টার চাষ হয় এবং ২০"-র অনধিক বৃষ্টিযুক্ত অঞ্চলসমূহে **শুষ্ক কৃষি** প্রথায় জোয়ার, বাজরা, ডাল প্রভৃতি শস্যের চাষ হইয়া থাকে।

কৃষি অঞ্চল (Agricultural regions)—তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার, উড়িষ্যা ও উত্তরপ্রদেশই ভারতের **কৃষিপ্রধান অঞ্চল**। অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু, বন্ধুর ভূপ্রকৃতি ও গভীর অরণ্য হেতু আসামে ও হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে, মরু প্রকৃতির জলবায়ু হেতু রাজস্থানে, ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হেতু উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের স্থানে স্থানে এবং অনুর্বর মৃত্তিকাহেতু পূর্ব মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশের কিয়দংশে কৃষিকার্য এক কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

ভারতের জলসেচ-ব্যবস্থা (Irrigation system of India)—উদ্ভিদের জন্য এবং পুষ্টিসাধনের জন্য কৃষিক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিমাণে জলসেচ করা প্রয়োজন। কারণ মৃত্তিকায় জলের পরিমাণ বিশীর্ণ সীমা (wilting point) অপেক্ষা অল্প হইলে উদ্ভিদের মূল তাহা গ্রহণ করিতে পারে না, আবার জলের পরিমাণ ক্ষেত্রসীমার (field capacity) অধিক হইলে উহা উদ্ভিদের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়।

জলসেচের প্রয়োজনীয়তা (Importance of Irrigation)—ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষিকার্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধানের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ বৃষ্টিপাতের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ভারতের বৃষ্টিপাত নানা দিক দিয়াই ত্রুটি-বহুল। যেমন—(১) ভারতের সর্বত্র সমপরিমাণে বৃষ্টি হয় না। রাজস্থান, পাঞ্জাব ও দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ স্থলেই বৃষ্টিপাত অত্যন্ত অল্প। আবার আসাম, পঃ উপকূল প্রভৃতি স্থানে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত অধিক, (২) এদেশে কেবলমাত্র বর্ষা-কালেই অধিকাংশ বৃষ্টিপাত হয়, শীতকাল সাধারণতঃ শুষ্ক। শীতকালীন রবি-

শস্য উৎপাদনের জন্য কৃত্রিম সেচ-ব্যবস্থার প্রয়োজন, (৩) ভারতে কোন কোন বৎসর প্রচুর, আবার কোন কোন বৎসর অল্প বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে, আবার কখনো কখনো দীর্ঘকাল ধরিয়া অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টিও দেখা যায়। এই সকল কারণে কৃষিকার্যের জন্য কেবলমাত্র বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করিয়া থাকা চলে না। জলসেচের দ্বারা শস্যক্ষেত্রে কৃত্রিম উপায়ে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হয়, (৪) ধান, ইক্ষু প্রভৃতি কতকগুলি কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদনের জন্য নিয়মিত ও পরিমিত বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন। কিন্তু ভারতের কয়েকটি স্থান ব্যতীত অন্যত্র নিয়মিত ও পরিমিত বৃষ্টিপাত হয় না। সেই কারণে কৃত্রিম সেচ-ব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়া পড়ে, এবং (৫) জলসেচের সাহায্যে শস্য উৎপাদনের হার বহুগুণে বৃদ্ধি করা যায়।

সেচ-ব্যবস্থার প্রাকৃতিক সুবিধা (**Geographical advantages for irrigation**)—ভারতের কতকগুলি ভৌগোলিক সুবিধা থাকার ফলে সেচব্যবস্থা এতাদৃশ উন্নতি লাভ করিয়াছে, যেরূপ—(১) উত্তর ভারতের নদীসমূহ গলিত তুষার ও বৃষ্টির জলের দ্বারা পুষ্ট হওয়ায় বার মাসই জলপূর্ণ থাকে। ইহাদের জল সেচকার্যের জন্য সম্বৎসরই ব্যবহার করা চলে। (২) ভারতের সমভূমি অঞ্চলসমূহ স্বভাবতই ঢালু বলিয়া খাল-নালা প্রভৃতির খননকার্য অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয় ও শ্রমসাধ্য। (৩) আবার, ভূত্বক পলিগঠিত হওয়ায় বৃষ্টির জল সমভূমি অঞ্চলের পলিস্তর চুয়াইয়া অভ্যন্তরের কর্দমাক্ত স্তরে সঞ্চিত হইতে থাকে পরে কূপ খনন করিয়া সঞ্চিত জল সেচকার্যের জন্য ব্যবহার করা যায়।

জলসেচ পদ্ধতি (Methods of irrigation)—ভূপ্রকৃতি, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি নানা বিষয়ের পার্থক্য হেতু ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারের জলসেচপদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছে। এই দেশে সাধারণতঃ চারি উপায়ে সেচকার্য চলে—(১) কূপ, (২) পুষ্করিণী, (৩) খাল ও (৪) ডোঙ্গা।

(১) **কূপ**—সেচকার্যে কূপের ব্যবহার ভারতের প্রায় সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। কারণ, প্রথমতঃ কূপ খনন অন্যান্য সেচব্যবস্থা অপেক্ষা অল্পব্যয়সাধ্য, এবং দ্বিতীয়তঃ, উত্তর ভারতের ভূত্বক কূপ খননের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। উত্তর-প্রদেশের স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ কাশী ও দিল্লীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে, দক্ষিণ-বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে কূপের ব্যবহার সর্বাপেক্ষা অধিক। তামিলনাড়ু, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজস্থান প্রভৃতি স্থানেও কূপের সাহায্যে সেচব্যবস্থার প্রচলন দেখা যায়। কিন্তু কূপের সাহায্যে সেচকার্যের কতকগুলি অসুবিধা রহিয়াছে। (১) কূপের জল দ্বারা বহুদূরবিস্তৃত ক্ষেত্রে জলসেচ করা কঠিন; (২) কূপের জল লবণাক্ত হইলে শস্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক হয়; (৩) গ্রীষ্ম-কালে বহু অগভীর কূপ শুষ্ক হইয়া যায়; এবং (৪) একই কূপ হইতে বহুক্ষণ

ধরিয়া জল তুলিলে কূপের জল কমিয়া যায়। ১৯৫০-৫১ ও ১৯৬২-৬৩ সালে যথাক্রমে ভারতের মোট ০·৬০ ও ০·৭৭ কোটি হেক্টার পরিমিত কৃষিজমি কূপের সাহায্যে জলসিক্ত হয়। বর্তমানে বহুস্থানে বিদ্যুচ্চালিত নলকূপের সাহায্যে জমিতে জলসেচ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে বিহার ও উত্তর প্রদেশে এইরূপ প্রায় ২৫০০ নলকূপ ছিল।

(২) **পুষ্করিণী**—প্রধানতঃ তামিলনাড়ু, মহীশূর, অন্ধ্র ও মহারাষ্ট্রের বৃষ্টিবিরল স্থানে এবং বিহার ও উড়িষ্যার স্থানে স্থানে জলাশয় হইতে খাল কাটিয়া ক্ষেত্রে জলসেচ করা হয়। তবে পুষ্করিণীর সাহায্যে জলসেচের দুইটি প্রধান অন্তরায় রহিয়াছে: (ক) গ্রীষ্মকাল বা অনাবৃষ্টি হইলে জলাশয় শুষ্ক হইয়া যায়, এবং (খ) প্রতিবৎসরই এইগুলির সংস্কার না করিলে এগুলি মজিয়া যায়। ১৯৫০-৫১ ও ১৯৬২-৬৩ সালে যথাক্রমে ভারতের মোট ০·৩৬ ও ০·৪৭ কোটি হেক্টার কৃষিজমি পুষ্করিণীর সাহায্যে জলসিক্ত হয়।

১০নং চিত্র—ভারতের জলসেচ-ব্যবস্থা
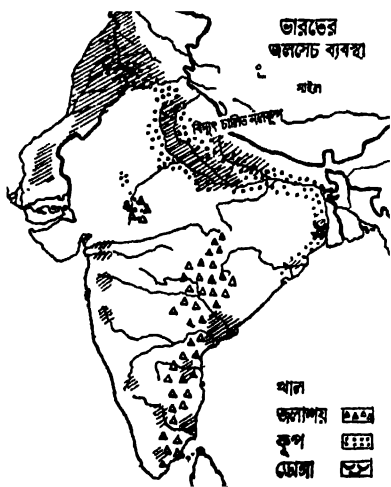
(৩) **খাল**—নদী হইতে প্রসারিত খালের সাহায্যে জলসেচের ব্যবস্থা এদেশে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ১৯৫০-৫১ ও ১৯৬২-৬৩ সালে খালের সাহায্যে যথাক্রমে ০·৮৩ ও ১·০৯ কোটি হেক্টার কৃষিজমি জলসিঞ্চিত হয়। নদী-খাল-সমূহকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে; যথা—(ক) **প্লাবন খাল**—এগুলি বর্ষাকালে জলপূর্ণ হয় এবং বর্ষার শেষে শুষ্ক হইয়া যায়। শীতকালে প্লাবন খালের সাহায্যে সেচকার্য চলে না। (খ) **নিত্যবহ** বা **স্থায়ী খাল**—এই সমস্ত খালে সারা বৎসরই জলপ্রবাহ থাকে। **পাঞ্জাবের** শিরহিন্দ, উত্তর বারিদোয়াব, ভাক্রা-নাঙ্গাল ও পশ্চিম যমুনা খাল; **উত্তর প্রদেশের** পূর্ব যমুনা, গঙ্গা, সদা ও আগ্রার খাল; **তামিলনাড়ু ও মহীশূরের** পেরিয়ার, কাবেরী, মেতুর ও বাকিংহাম খাল; **পশ্চিমবঙ্গের** দামোদর খাল এবং **উড়িষ্যার** মহানদীর খাল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য নিত্যবহ খাল। বর্তমানে বহু প্লাবন খালকে নিত্যবহ খালে পরিবর্তিত করা হইতেছে। দাক্ষিণাত্যে ও মধ্য-প্রদেশে গ্রীষ্মকালে নদীর জল শুষ্ক হইয়া যায় বলিয়া ঐ সমস্ত অঞ্চলের নদীর উপত্যকায় বাঁধ বাঁধিয়া বর্ষার জল সঞ্চিত করিয়া রাখা হয় এবং পরে খাল

কাটিয়া ঐ জল দ্বারা শস্যক্ষেত্রে জলসেচ করা হয়। এইরূপ খালকে **জলাধার** বা **"স্টোরেজ"** খাল বলে।

খালের সাহায্যে জলসেচ-ব্যবস্থার দুইটি প্রধান অন্তরায় রহিয়াছে : (১) কৃষকদের অসাবধানতা-বশতঃ প্রায়শঃই খালের জল বহুস্থানে আটকাইয়া যায় এবং জমিকে কৃষিকার্যের অনুপযোগী করিয়া তোলে ; এবং (২) পাঞ্জাব, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের নানা স্থানে ভূত্বকের নিম্নস্থিত লবণাক্ত জল উৎক্ষিপ্ত হইয়া জমিকে লবণাক্ত ও কৃষিকার্যের অনুপযুক্ত করিয়া ফেলে।

(৪) **ডোঙা**—তাল বা নারিকেল বৃক্ষের গুঁড়ি চাঁচিয়া কিংবা টিন দিয়া অনেকটা নৌকার মত ডোঙা প্রস্তুত করা হয়। ঐ ডোঙা বাঁশের ডগায় ঝুলাইয়া তাহাদ্বারা নিকটবর্তী খাল, বিল, পুকুর প্রভৃতি জলাধার হইতে জল তুলিয়া জমিতে জলসেচ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথায় জলসেচের ব্যবস্থা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ১৯৫০-৫১ ও ১৯৬২-৬৩ সালে ডোঙা ও অন্যান্য প্রথায় জলসিক্ত জমির পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ০·২৯ ও ০·২৪ কোটি হেক্টার।

১৯৫০-৫১ ও ১৯৬২-৬৩ সালে মোট সেচসমন্বিত জমির পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২·০৮ ও ২·৫৭ কোটি হেক্টার (নীট)—মোট কৃষিজমির মাত্র ১৭·৫% ও ২০%।

ভারতের মৃত্তিকা (Indian Soils)—মৃত্তিকা কৃষির পক্ষে অপরিহার্য। ভারতের তিনটি প্রাকৃতিক বিভাগে প্রধানতঃ তিন **শ্রেণীর** মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায় :

(ক) **উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলের মৃত্তিকা**—অবস্থান ও উচ্চতার উপর নির্ভরশীল এই অঞ্চলের মৃত্তিকাসমূহ উর্বরতায়, গঠনে ও প্রকৃতিতে বৈচিত্র্যময়। এই অঞ্চলের মৃত্তিকাকে পাঁচটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা—(১) হিমরেখার ঠিক নিম্নাংশেই দেখা যায় বালুকা ও কঙ্করপ্রধান **হিমবাহ-প্রভাবিত মৃত্তিকা** (Glacial soils)। (২) উহার নিম্নাংশে রহিয়াছে হিমবাহ-পরিত্যক্ত **প্রস্তরবহুল কর্দম** (Boulder clay)। (৩) ইহার নিম্নাংশে সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্যাঞ্চলে রহিয়াছে **পোডসল**-প্রধান অম্লধর্মী অনুর্বর মৃত্তিকা (Podzols)। এই মৃত্তিকাযুক্ত অঞ্চলসমূহে প্রচুর আলু জন্মে। (৪) আরও নিম্নাংশের উপত্যকাসমূহের মৃত্তিকা উচ্চতাবিশেষে কোথাও বা কর্দমবহুল, আবার কোথাও বা উৎকৃষ্ট পলিবহুল। পর্বতের ঢালে অবস্থিত ক্ষেত্রসমূহ **অবশেষ-প্রধান মৃত্তিকা** (Residual soil) দ্বারা গঠিত।

(খ) **গাঙ্গেয় সমভূমির মৃত্তিকা**—এই অঞ্চলের মৃত্তিকা পাললিক শিলা-স্তরে গঠিত, তবে প্রাচীনত্বের দিক হইতে এই মৃত্তিকাকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা—(১) **প্রাচীন পলিগঠিত মৃত্তিকা** (Old Alluvium)—

ইহা প্রাচীন ও নিঃশেষিত প্রায় ধাতব পদার্থযুক্ত হওয়ায় অনুর্বর। এই জাতীয় মৃত্তিকা নদীতীর হইতে দূরে পর্বতের সানুদেশে অথবা দুই উপত্যকার মধ্যবর্তী অঞ্চলে দৃষ্ট হয়। পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের অধিকাংশ মৃত্তিকা এই শ্রেণীর। (২) **নূতন পলিগঠিত মৃত্তিকা** (New Alluvium)—নদীতীরবর্তী প্লাবন-স্পর্শী ভূমিভাগে এই জাতীয় মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। লবণ বা বালুকা প্রধান না হইলে ইহা অতিশয় উর্বর হয়। এই শ্রেণীর পলিকে আবার তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—বালুকাপ্রধান মৃত্তিকা বা **বেলেমাটি** (Sandy

১১নং চিত্র—ভারতের মৃত্তিকা

soil)—ইহা জলধারণে অক্ষম বলিয়া জলসমৃদ্ধ ফসল উৎপাদনের বিশেষ উপযোগী; (খ) কর্দমপ্রধান মৃত্তিকা বা **এঁটেল মাটি** (Clay soil)—ইহা চুন ও হিউমাস-প্রধান ও উর্বর, তবে অত্যন্ত জমাট বলিয়া জল সহজে অভ্যন্তর-ভাগে প্রবেশ করিতে পারে না; (গ) **দোআঁশ মাটি** (Loamy soil)—বালুকা, পলি, কর্দম প্রভৃতির উৎকৃষ্ট সমাবেশে গঠিত এই মৃত্তিকা জলধারণক্ষম ও অতিশয় উর্বর। সমভূমির পশ্চিম প্রান্তের **মরু অঞ্চলে** লবণাক্ত, বালুকাময়

ও ধূসর বর্ণের মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তনে এই শ্রেণীর মৃত্তিকাযুক্ত অঞ্চলসমূহ শস্যসমৃদ্ধ হইতে পারে। নদীর মোহনায় ও বদ্বীপাঞ্চলে লবণাক্ত ও ঘাসের চাপড়াযুক্ত **জলাভূমির মৃত্তিকা** দৃষ্ট হয়। উপকূলীয় সমভূমির মৃত্তিকা সাধারণতঃ কর্দমময় ও লবণাক্ত।

(গ) **মালভূমির মৃত্তিকা**—এই অঞ্চলের মৃত্তিকা অবশেষ প্রধান। বর্ণের তারতম্য অনুসারে এই শ্রেণীর মৃত্তিকাকে আবার নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা—(১) নাগপুর, সোলাপুর ও আমেদাবাদ দ্বারা বেষ্টিত এক ত্রিকোণাকার ভূভাগে আগ্নেয়গিরি-নিঃসৃত ক্ষয়ীভূত লাভা দ্বারা গঠিত **কৃষ্ণ মৃত্তিকা** (Regur) দৃষ্ট হয়। এই মৃত্তিকা নানা রাসায়নিক গুণযুক্ত কর্দমবহুল, ভারী ও প্রচুর জলধারণক্ষম। কার্পাস, জোয়ার, গম, ছোলা, মসিনা প্রভৃতি এই মৃত্তিকাযুক্ত অঞ্চলের প্রধান ফসল। (২) **রক্তবর্ণের দো-আঁশ মৃত্তিকা** (Red loam)—মালভূমির অবশিষ্ট প্রায় সমগ্র অংশের মৃত্তিকা এই শ্রেণীর। ইহা হাল্কা, বালুকাপ্রধান ও জলধারণের ক্ষমতাহীন। জলসেচের সাহায্যে এই মৃত্তিকাযুক্ত ভূখণ্ডে ধান, ইক্ষু, কার্পাস প্রভৃতির চাষ করা হয়। (৩) **ইষ্টক বর্ণের মৃত্তিকা** (Lateritic soil)—মালাবারে ও ছোটনাগপুর মালভূমির পূর্বপ্রান্তে ঈষৎ রক্তবর্ণের এবং লৌহ ও এ্যালুমিনিয়াম কণিকায় সমৃদ্ধ এই শ্রেণীর মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়। (৪) **কফি অঞ্চলের মৃত্তিকা** (Coffee soil)—নীলগিরি ও পঃ ঘাটের ক্রমনিম্ন গাত্রে হিউমাস-সমৃদ্ধ পঙ্কিল অরণ্যভূমির মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। ইহা কফি উৎপাদনের সহায়ক।

ভূমির ক্ষয় (Soil erosion)—জল ও বায়ুর দ্রুত প্রবাহের ফলে অরক্ষিত ভূমিভাগের উপরিস্থিত অতি প্রয়োজনীয় মৃত্তিকার অতিমাত্রায় অপসারণকে ভূমির ক্ষয় বলা হয়। উঃ পঃ ভারতের পর্বতসন্নিহিত প্রদেশে ও দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতে ভূমির ক্ষয় এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়াছে। ভূমিক্ষয়ের ফলে ভারতের কৃষিভূমির একটি ক্রমবর্ধমান অংশ কৃষিকার্যের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িতেছে এবং বহুস্থানে বন্যার প্রকোপ দেখা দিতেছে। আসাম, উঃ বিহার ও উত্তর প্রদেশের কুমায়ুন অঞ্চলে ভূমির সমপরিমাণ ক্ষয় (Sheet erosion); বিহার, উত্তর প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রণালী ক্ষয় (Gully erosion) এবং পাঞ্জাব ও রাজস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলে বায়ুতাড়িত ভূমিক্ষয়ের (Wind erosion) প্রকোপ অধিক। বর্তমানে ভারতের মোট ভূমিভাগের প্রায় এক চতুর্থাংশেই (প্রায় ২০ কোটি একর) ভূমিক্ষয়ের প্রকোপ দেখা যাইতেছে। ভূমিক্ষয়ের **কারণ** হিসাবে বনোৎপাটন, অতিচারণ, অবৈজ্ঞানিক চাষ প্রণালী ও বিবেচনাহীন ভাবে মৃত্তিকা অপসারণের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভূমিক্ষয় ভারতের একটি প্রকাণ্ড সমস্যা, এবং ক্রমশঃ ইহা গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। উপযুক্ত **প্রতিরোধক ব্যবস্থা** অবলম্বিত

না হইলে অধিকতর শস্য উৎপাদন ও বহুমুখী পরিকল্পনা দ্বারা বন্যা নিরোধের কথা একেবারেই নিরর্থক। ভূমির ক্ষয়প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসাবে নূতন অরণ্য রচনা, নিয়ন্ত্রিত চারণ, বায়ুপ্রবাহ-রোধক অরণ্যবলয় রচনা, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য ও ক্ষয়-প্রণালীর পূরণ আশু কর্তব্য।

ভারতে ভূমিক্ষয়রোধকল্পে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। ১৯৫৩ সালে একটি কেন্দ্রীয় মৃত্তিকা সংরক্ষণ সংস্থা স্থাপিত হয়, ইহা ব্যতীত অরণ্যরচনা, চারণক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণ, মৃত্তিকা সংরক্ষণকল্পে শিক্ষিত কর্মিদল গঠন, নদী পরিকল্পনার মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পার্বত্য অঞ্চলে ধাপ কাটিয়া কৃষিব্যবস্থার প্রচলন প্রভৃতি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে

প্রধান প্রধান কৃষিজ ফসলের শ্রেণীবিভাগ

কৃষিজ ফসল
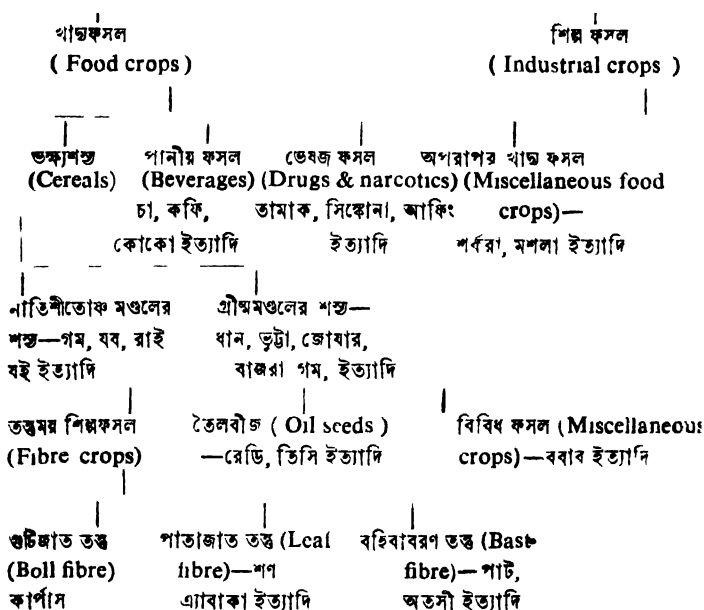
প্রধান প্রধান কৃষিজ ফসল

(Principal Agricultural Products)

(১) খাদ্যফসল

গম (Wheat)—গম প্রধানতঃ নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলেই জন্মিয়া থাকে। পৃথিবীর অধিকাংশ গম-ক্ষেত্র ৩৫° দঃ এবং ৬০° উঃ অক্ষাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

গম চাষের অনুকূল অবস্থা (Conditions of growth for wheat)—গম উৎপাদনের পক্ষে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত প্রাকৃতিক অবস্থাগুলি অনুকূল—(১) অঙ্কুর উদ্গমের সময় ও বৃদ্ধি পাইবার কালে প্রায় ২০" হইতে ৪৮" বৃষ্টিপাত। (২) উত্তাপের পরিমাণ ৫০° ফাঃ হইতে ৭০° ফাঃ পর্যন্ত হওয়া প্রয়োজন। (৩) অঙ্কুর উদ্গমের সময় আর্দ্র ও শীতল আবহাওয়া, বৃদ্ধির সময়ে শুষ্ক ও মন্দোষ্ণ আবহাওয়া, ফসল পাকিবার অব্যবহিত পূর্বে সামান্য বৃষ্টিপাত ও কাটিবার সময় প্রচুর উত্তাপ, সূর্যকিরণ ও শুষ্ক আবহাওয়ার প্রয়োজন। (৪) উর্বর, নরম কাদামাটি, অথবা ভারী দো-আঁশ মাটি গম চাষের পক্ষে উপযুক্ত। (৫) বড় বড় কৃষি-যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিবার সুবিধার জন্য এবং জলনিকাশের উত্তম ব্যবস্থার জন্য সমতল অথবা কিঞ্চিৎ ঢালু জমিই গম চাষের পক্ষে উপযুক্ত। (৬) গম ক্ষেত্রে উপযুক্ত সেচ-ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন (৭) গম চাষের পক্ষে ১১০টি তুহিনমুক্ত দিবসের প্রয়োজন, তবে কয়েক প্রকার গম অল্প দিনেই বৃদ্ধি পাইতে পারে। (৮) গম চাষের জন্য প্রচুর শ্রমিক সরবরাহের প্রয়োজন হয় না। কারণ বর্তমানে যন্ত্রপাতির সাহায্যেই ভূমিকর্ষণ হইতে শস্যকর্তন পর্যন্ত প্রায় সমুদয় কার্যই সাধিত হইতেছে।

উপক্রান্তীয় মণ্ডলে শীতকালে এবং শীতল নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে গ্রীষ্মকালে গমের চাষ হইয়া থাকে। ঋতুভেদে উৎপাদিত গমকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়: (ক) **শীতকালীন গম** (winter wheat)—শরৎকালে ইহার বীজ বপন করিয়া গ্রীষ্মকালে শস্য আহরণ করিতে হয়। উপক্রান্তীয় অঞ্চলেই ইহার চাষ ব্যাপক। (খ) **বাসন্তিক গম** (spring wheat)—বসন্তকালে ইহার বীজ বপন করিয়া গ্রীষ্মের শেষে শস্য আহরণ করা হয়। শীতপ্রধান নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলেই ইহার চাষ ব্যাপক।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of production)—বণ্টন ও ব্যবহারের দিক হইতে বিচার করিলে পৃথিবীর গম-উৎপাদক অঞ্চলসমূহকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়: (১) পশ্চিম ইউরোপের জনবহুল দেশসমূহ, যথা—গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, জার্মানী প্রভৃতি। আভ্যন্তরীণ চাহিদার অনুপাতে ইহাদের উৎপাদন এত অল্প যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে এই দেশগুলিতে গম আমদানী করিতে হয়। (২) অপেক্ষাকৃত জনবিরল দেশসমূহ, যথা—রুশিয়া, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, পঃ পাকিস্তান ইত্যাদি। আভ্যন্তরীণ চাহিদা অল্প থাকায় বিশেষভাবে রপ্তানীর জন্যই এই সমস্ত দেশে গমের চাষ হইয়া থাকে।

ইউরোপ—দক্ষিণ ইউরোপের ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহ প্রচুর গম উৎপাদন করে। শীতপ্রধান সামুদ্রিক জলবায়ু-সেবিত উত্তর-পশ্চিম ইউরোপীয়

দেশসমূহের অপেক্ষাকৃত রৌদ্রোজ্জ্বল অংশে গমের চাষ ব্যাপক। ব্রিটেন, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড এবং বেলজিয়ামে প্রচুর গমের চাষ হয়। রুশিয়া ব্যতীত ইউরোপীয় দেশসমূহের মধ্যে কেবলমাত্র ফ্রান্সেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে গমের চাষ হয়। অপেক্ষাকৃত চরমভাবাপন্ন মধ্য-ইউরোপীয় জলবায়ুযুক্ত জার্মানী, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া ও বুলগেরিয়ার সমতল ভূমিভাগেও প্রচুর গম জন্মিয়া থাকে।

রুশিয়া—রুমানিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া ইউক্রেনের কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল এবং কাস্পিয়ান হ্রদের উত্তর দিয়া সাইবেরিয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে রুশিয়ার অধিকাংশ গম উৎপন্ন হইয়া থাকে। বর্তমানে উত্তর রুশিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম সাইবেরিয়া, ওরেনবার্গ প্রভৃতি অঞ্চলেও গমের চাষ প্রসারলাভ করিয়াছে। গম উৎপাদনে পৃথিবীতে সোভিয়েট রুশিয়ার স্থান প্রথম। রুশিয়ায় বাসন্তিক গমের চাষই অধিক। কৃষ্ণসাগরের তীরে অবস্থিত ওডেসা ও খেরসন বন্দর হইতে রুশিয়ার গম বিদেশে রপ্তানী হয়।

উত্তর আমেরিকা—এই মহাদেশের অন্তর্গত ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে গমের উৎপাদন সর্বাধিক। **ক্যানাডার** অন্তর্গত ম্যানিটোবা, স্যাসকাচুয়ান ও আলবার্টা প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত দিয়া বিস্তৃত ৭০০ মাইল দীর্ঘ ও ২০০ মাইল প্রস্থযুক্ত প্রেয়রী গম-বলয়ে প্রচুর বাসন্তিক গম উৎপাদিত হয় (মোট উৎপাদনের প্রায় ৯২%)। লরেন্সীয় নিম্নভূমিতে শীতকালীন গমের চাষ হয়। শুষ্ক পশ্চিমাঞ্চলেও সামান্য পরিমাণে গম জন্মিয়া থাকে। ক্যানাডার উইনিপেগ-ই বিখ্যাত গম-কেন্দ্র। গম রপ্তানীতে ক্যানাডা পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করে। পোর্ট আর্থার, চার্চিল, ফোর্ট উইলিয়ম, উইনিপেগ, মণ্ট্রীল, হ্যালিফ্যাক্স, ভ্যানকুভার প্রভৃতি বন্দর হইতে ক্যানাডীয় গম যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, আফ্রিকা ও সুদূর প্রাচ্যের দেশসমূহে রপ্তানী হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে উৎপন্ন গমের প্রায় এক-চতুর্থাংশ উৎপাদন করে। ক্যানাডার বাসন্তিক গমবলয়ের দক্ষিণাংশ হইতে মিসিসিপি অববাহিকার মধ্যভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত এই কৃষিবলয়টিতে শীতকাল দীর্ঘ ও তীব্র, গ্রীষ্মকাল হ্রস্ব ও মৃদু এবং বৃষ্টিপাত মাঝারি ধরণের হওয়ায় এতদঞ্চলে প্রচুর বাসন্তিক গম উৎপাদিত হয়। বাসন্তিক গম-বলয়ের দক্ষিণাংশে পশ্চিমে উঃ-পুঃ কলরাডো হইতে পূর্বে নিউইয়র্ক ও নিউজার্সি পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে প্রচুর শীতকালীন গম জন্মিয়া থাকে। এই অঞ্চলের অন্তর্গত নেব্রাস্কা, কানসাস্ এবং ওকলাহামা রাজ্যেই গমের চাষ সমধিক। ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুযুক্ত ক্যালিফোর্নিয়া, সামুদ্রিক জলবায়ু-সেবিত উত্তর-পূর্বের রাজ্যসমূহ এবং শুষ্ক পশ্চিমাঞ্চলেও সামান্য পরিমাণে গম জন্মিয়া থাকে। মিনিয়াপোলিসে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ময়দার কলসমূহ অবস্থিত। নিউইয়র্ক বন্দর হইতে যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ গম বিদেশে রপ্তানী হয়।

দক্ষিণ আমেরিকা—এই মহাদেশের অন্তর্গত আর্জেন্টিনাতে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে গম উৎপন্ন হয়। আর্জেন্টিনা প্রচুর গম রপ্তানী (রপ্তানী বন্দর বুয়েনস আয়ার্স) করে। চিলিতেও অল্পাধিক গম উৎপন্ন হয়।

অস্ট্রেলেশিয়া—অস্ট্রেলিয়ার কর্ষিত ভূমির অর্ধেকেরও অধিক ক্ষেত্রে প্রধানতঃ রপ্তানীর জন্যই গমের চাষ হয়। অস্ট্রেলিয়ার দুইটি গম বলয়ই—একটি দক্ষিণ-পূর্বভাগে (ভিক্টোরিয়া ও নিউ সাউথ ওয়েলস অঞ্চল) এবং অপরটি পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া প্রদেশের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে মোটামুটি ১০'-৩০' সমবর্ষণরেখার মধ্যে অবস্থিত। অস্ট্রেলিয়ার উৎপন্ন গমের উদ্বৃত্তাংশ প্রধানতঃ এ্যাডিলেড, সিডনী ও মেলবোর্ন বন্দর দিয়া বিদেশে রপ্তানী হয়। **নিউজীল্যাণ্ডের** দক্ষিণ দ্বীপে অবস্থিত ক্যান্টারবেরীর সমভূমিতে প্রচুর গম জন্মে।

উত্তর **আফ্রিকার** নীলনদের নিম্ন অববাহিকায়, ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুযুক্ত মরক্কো, আলজেরিয়া ও টিউনিস অঞ্চলে, দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনের নিকটবর্তী অঞ্চলে ও পূর্বাঞ্চলের মালভূমির কোন কোন অংশে গমের চাষ হয়।

এশিয়া--জাপান ও **চীন** দেশের উত্তরাংশে প্রধানতঃ দেশাভ্যন্তরে ব্যবহারের জন্যই প্রচুর গমের চাষ হয়। **মাঞ্চুরিয়াতেও** গমের চাষ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ **ভারতের** শুষ্ক ও উষ্ণ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে (পূর্ব পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশ) এবং মধ্যপ্রদেশে গমের চাষ হইয়া থাকে। **পশ্চিম পাকিস্তানের** সিন্ধু অববাহিকাতে পঃ পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশ) এবং **উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশে** জলসেচের দ্বারা প্রচুর গম উৎপন্ন হইতেছে।

বাণিজ্য (Trade)—পৃথিবীতে উৎপন্ন সমগ্র গমের প্রায় ১২% আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পণ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং ইহার প্রায় ৮৮% ক্যানাডা (২৩%), যুক্তরাষ্ট্র (৪২%), আর্জেন্টিনা (১০%), এবং অস্ট্রেলিয়া (১৩%), মিলিতভাবে **রপ্তানী** করিয়া থাকে। গমের ব্যবসায়ে দক্ষিণ গোলার্ধের গম উৎপাদক স্থানসমূহের বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে, কারণ—(১) উত্তর গোলার্ধে উৎপাদন অপেক্ষা চাহিদা অধিক, কিন্তু দক্ষিণ গোলার্ধে চাহিদা অপেক্ষা উৎপাদন অধিক। (২) দক্ষিণ গোলার্ধে যখন গম পাকে উত্তর গোলার্ধে তখন গম নিঃশেষ হইয়া যায়। ফলে তৎস্থানে গমের দাম বৃদ্ধি পায় এবং দক্ষিণ গোলার্ধের গম রপ্তানীকারকদের বিশেষ সুবিধা হয়।

পশ্চিম ইউরোপের শিল্পপ্রধান ও জনবহুল দেশসমূহ, যথা গ্রেটব্রিটেন, ইতালী, জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ইত্যাদি সর্বাপেক্ষা অধিক গম **আমদানী** করে। গ্রেটব্রিটেন তাহার প্রয়োজনীয় গমের অধিকাংশই ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং আর্জেন্টিনা হইতে লইয়া থাকে। ভারত, চীন, জাপান

এবং ব্রাজিলও অল্পাধিক গম আমদানী করে। বিশ্ব-বাণিজ্যে ব্যবহৃত গমের প্রায় ৩০%-ই যুক্তরাজ্য গ্রহণ করে।

ধান (Rice)—চাউল পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক লোকের প্রধান খাদ্যশস্য

ধান চাষের অনুকূল অবস্থা (Conditions of growth for rice) —ধান ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল হইলেও ক্রান্তীয় মৌসুমী অঞ্চলই ইহার পক্ষে সর্বোত্তম ক্ষেত্র। ধান উৎপাদনের পক্ষে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি বিশেষ অনুকূল: (১) গ্রীষ্মকালে ধান গাছ বৃদ্ধির সময় প্রচুর উত্তাপ (৬০°-৮০ ফা:) এবং পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত (৪০-৮০) প্রয়োজন। (৩) জন্মাইবার প্রথম অবস্থায় ধান্যক্ষেত্র প্লাবিত হওয়া দরকার। (৩) ধানচাষের জমির বহিঃস্তরের মাটি উর্বর পলিস্তর দ্বারা গঠিত এবং আভ্যন্তরীণ স্তরের
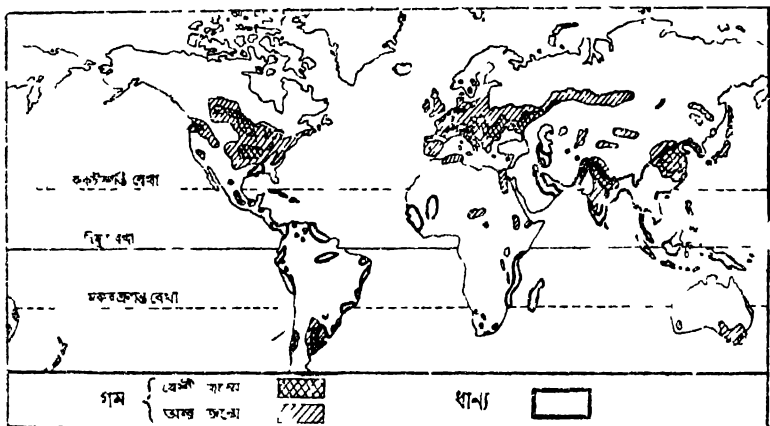
১২ নং চিত্র—পৃথিবীর ধান ও গম উৎপাদক অঞ্চলসমূহ

মাটি কঠিন বা আংশিকভাবে অপ্রবেশ্য হওয়া দরকার, কারণ ইহা ধান্যক্ষেত্র প্লাবনের পক্ষে সুবিধাজনক। (৪) ধান জন্মাইবার জন্য, অঙ্কুরকে স্থানান্তরিত করিয়া রোপণের জন্য, এবং সর্বদা উহার তত্ত্বাবধানের জন্য প্রচুর সুলভ শ্রমিকের আবশ্যক। অপেক্ষাকৃত অল্পশ্রমিকযুক্ত অঞ্চলসমূহে বীজ ছড়াইয়া এবং প্রচুর শ্রমিকযুক্ত অঞ্চলসমূহে রোপণপ্রথায় ধানের চাষ করা হয়। রোপণপ্রথায় ধান উৎপন্ন হয় অধিক, তবে উহার উৎপাদন-ব্যয়ও অধিক হইয়া পড়ে। (৫) ধান পাকিবার সময় উষ্ণ ও শুষ্ক জলবায়ু বিশেষ হিতকর। উপরোক্ত অবস্থাগুলি অনুশীলন করিলে প্রতীয়মান হয় যে চাষের অবস্থা অনুকূল হওয়ায় মৌসুমী অঞ্চলের বদ্বীপগুলিতে, নিরক্ষীয় অঞ্চলে এবং সামুদ্রিক জলবায়ুযুক্ত উষ্ণ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে ধান জন্মিয়া থাকে।

শ্রেণীবিভাগ (Classification)—উপরের বর্ণিত অবস্থায় যে সমস্ত ধান জন্মিয়া থাকে তাহাকে **জলাভূমির ধান** (swamp rice) বলা হয়। উচ্চভূমিতে অপেক্ষাকৃত শুষ্ক অবস্থায় আর একপ্রকার ধান জন্মে। তাহাকে **উচ্চভূমির ধান** (upland rice) বলা হয়। ইহার পরিমাণ অতি অল্প। মালয় উপদ্বীপের অধিবাসীরা এবং আমেরিকা ও আফ্রিকার উষ্ণমণ্ডলের আদিম অধিবাসীরা এইরূপ ধানের চাষ করিয়া থাকে।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of production)—ব্যবহার ও বণ্টনের দিক হইতে বিচার করিলে পৃথিবীর ধান উৎপাদক অঞ্চলগুলিকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অপেক্ষাকৃত জনবহুল দেশসমূহ, যথা—ভারত, পাকিস্তান, চীন, জাপান, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া প্রভৃতি। উপরোক্ত দেশগুলির মধ্যে চীন ধান উৎপাদনে শীর্ষস্থান অধিকার করে এবং উহার পরেই ভারত ও পাকিস্তানের স্থান। চীন, জাপান, ভারত এবং পাকিস্তান মিলিতভাবে পৃথিবীতে উৎপন্ন সমগ্র ধানের প্রায় ৭০% উৎপাদন করে। তবে আভ্যন্তরীণ চাহিদা প্রচুর থাকায় এই সমস্ত দেশগুলিকে বাহির হইতে অল্পবিস্তর চাউল আমদানী করিতে হয়। (২) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অপেক্ষাকৃত জনবিরল অঞ্চলসমূহ, যথা—ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, মালয় ও ইন্দোচীন। আভ্যন্তরীণ চাহিদা অল্প থাকায় এই সমস্ত দেশ উৎপাদিত ধানের অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানী করিয়া থাকে। (৩) এশিয়া ব্যতীত অন্যান্য দেশসমূহ, যথা—(ক) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি নদীর বদ্বীপে এবং ক্যালিফোর্নিয়া ও টেক্সাসে, (খ) দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল উপকূলে, ব্রিটিশ গিয়ানাতে এবং পেরুর মরু অঞ্চলে, (গ) আফ্রিকা মহাদেশের মিশর এবং সিয়েরালিয়নে, (ঘ) ইতালীর পো নদীর সমভূমির দক্ষিণ-পূর্বে, যুগোশ্লাভিয়ার নিম্নভূমিতে, স্পেনের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে, (ঙ) অস্ট্রেলিয়া, মধ্য আমেরিকা, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং রুশিয়াতেও ধানের চাষ হয়। এই অঞ্চলগুলিতে যে ধান উৎপন্ন হয় তাহার অধিকাংশই স্থানীয় চাহিদা মিটাইতে ব্যয়িত হয়। উপরোক্ত অঞ্চলসমূহে প্রধানতঃ জলসেচের সাহায্যেই ধান উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বাণিজ্য (Trade)—পৃথিবীতে উৎপন্ন চাউলের মাত্র ৭% আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত হয়। ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, মালয় এবং ইন্দোচীন প্রধান প্রধান চাউল **রপ্তানী**কারক দেশ। ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুন, বেসিন ও আকিয়াব, শ্যামের ব্যাংকক, ইন্দোচীনের সাইগন ও হাইফং চাউল রপ্তানীর প্রধান প্রধান বন্দর। সিংহল, মালয়, ভারত, জাভা ও জাপান প্রধান চাউল **আমদানীকারক** দেশ। আমদানীকারক বন্দরগুলির মধ্যে সিংহলের কলম্বো, ভারতের কলিকাতা ও

মাদ্রাজ; ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা; পাকিস্তানের চট্টগ্রাম এবং জাপানের কোবে ও ইয়োকোহামা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(২) পানীয় ফসল

চা (Tea)—এক জাতীয় চিরহরিৎ বৃক্ষের পাতা শুকাইয়া চা প্রস্তুত করা হয়।

চা-চাষের অনুকূল অবস্থা (Conditions of growth for tea)—চা-গাছ মূলতঃ উপক্রান্তীয় অঞ্চলের উদ্ভিদ্। চা-গাছের জন্ম ও বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত অবস্থাগুলিই বিশেষ অনুকূল:

(১) দীর্ঘকালস্থায়ী প্রচুর উত্তাপ (৫৪°—৮০° ফাঃ) এবং পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত (৬০"-১০০") চা-গাছের বৃদ্ধির ও প্রচুর পাতা উৎপাদনের পক্ষে সহায়ক। (২) চা-ক্ষেত্রে উত্তম জলনিষ্কাশন-ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। কারণ চা-গাছের
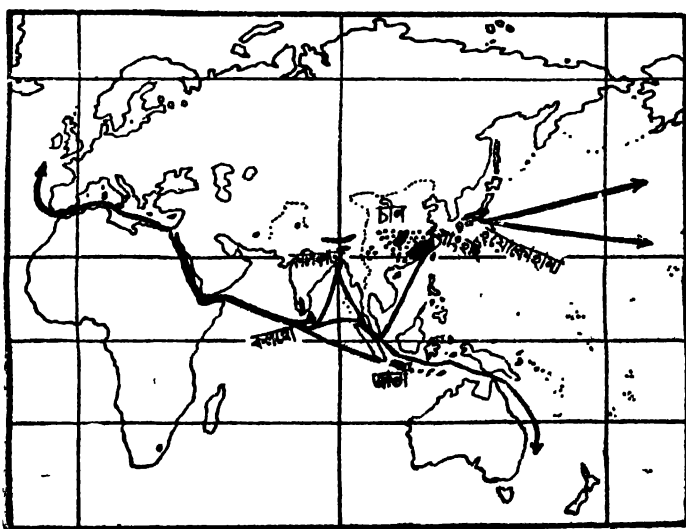
১৩নং চিত্র—চা উৎপাদক এবং রপ্তানীকারক দেশ ও বন্দরসমূহ

মূলে জল সঞ্চিত হইলে চারা নষ্ট হইয়া যায়। এই কারণে পর্বতের ঢালেই সাধারণতঃ চা-এর চাষ হয়। (৩) হাল্কা, উর্বর, জৈব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ এবং লৌহকণিকা-মিশ্রিত দো-আঁশ মাটি চা-চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। (৪) তুহিন চা-গাছের বিশেষ ক্ষতি না করিলেও, একর প্রতি চা-এর উৎপাদন-হার কমায়। (৫) চা-গাছ জমির উর্বরাশক্তিকে নিঃশেষ করিয়া দেয় বলিয়া, মধ্যে মধ্যে চা-ক্ষেত্রে কৃত্রিম সার দিবার প্রয়োজন হয়। (৬)

চা-পাতা হাত দিয়া তুলিতে হয় বলিয়া, পর্যাপ্ত ও সুলভ শ্রমিকের সরবরাহ অত্যন্ত প্রয়োজন।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of production)—চা সাধারণতঃ ৩২° উত্তর ও ৮° দক্ষিণ সমাক্ষরেখা এবং ৮০° পূর্ব ও ১৪০° পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখাদ্বারা সীমাবদ্ধ অঞ্চলেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর চা-উৎপাদক অঞ্চলসমূহকে উৎপাদন ও রপ্তানীর তারতম্য অনুসারে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) **দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ-সমূহ**—চা-উৎপাদনে **চীন** (ইয়াংসি ও সিকিয়াং নদীর অববাহিকার উত্তরাঞ্চল) পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করে। পৃথিবীর শতকরা ৪০ ভাগ চা ই চীন দেশে উৎপন্ন হয়, কিন্তু রপ্তানীব পরিমাণ অতি সামান্য। **ভারত** চা-উৎপাদনে পৃথিবীতে দ্বিতীয় এবং চা-রপ্তানীতে প্রথম স্থান অধিকাব করে। ভারতের আসাম অঞ্চলেই (ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা) চা-এর উৎপাদন সর্বাপেক্ষা অধিক। তবে দার্জিলিং-সন্নিহিত হিমালয়ের পর্বতগাত্রে যে চা উৎপন্ন হয় তাহা অতি সুগন্ধযুক্ত এবং উচ্চশ্রেণীর। দক্ষিণ ভারতের পশ্চিমঘাট পর্বতমালার উচ্চতর অংশেও চা উৎপন্ন হয়। পশ্চিম হিমালয়ের কাংড়া উপত্যকায় সবুজ চা উৎপন্ন হয়। মধ্য ও দক্ষিণ **জাপানের** পার্বত্য অঞ্চলের পূর্ব ও পশ্চিম ঢালে প্রচুর চা জন্মে। জাপানে আভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য সবুজ চা উৎপন্ন হয়। **ফরমোজার** উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রচুর চা জন্মে। এখানকার উলং চা স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয়। এই চা প্রচুর পরিমাণে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী হইয়া যায়। **ইন্দোনেশিয়ার** অন্তর্গত জাভা দ্বীপের পশ্চিমাংশে আগ্নেয় পার্বত্য অঞ্চলে চা জন্মে। জাভার চা নিকৃষ্ট শ্রেণীর। অধুনা সুমাত্রা দ্বীপের উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও উচ্চশ্রেণীর প্রচুর চা উৎপন্ন হইতেছে। **সিংহলের** দক্ষিণ দিকের পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর চা জন্মে। **পূর্ব পাকিস্তানের** শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে সামান্য পরিমাণে চা উৎপন্ন হয়। (২) **আমেরিকা**—দক্ষিণ-পূর্ব ব্রাজিল, ক্যালি-ফোর্নিয়া ও দক্ষিণ ক্যারোলিনা প্রভৃতি অঞ্চলে জলবায়ু অনুকূল হইলেও, সুলভ ও দক্ষ শ্রমিকের অপ্রাচুর্য-হেতু চা-এর উৎপাদন অতি সামান্য। (৩) **অন্যান্য অঞ্চলসমূহ**—পূর্ব আফ্রিকা, মাদাগাস্কার, ফিজি, ট্রান্সককেশিয়া, জ্যামেইকা, দক্ষিণ ব্রহ্ম, টংকিং, প্রণালী উপনিবেশ প্রভৃতি অঞ্চলেও সামান্য পরিমাণে চা উৎপন্ন হয়।

বাণিজ্য (Trade)—চা-রপ্তানীতে ভারত পৃথিবীতে প্রথম এবং সিংহল দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। চীন, জাপান এবং জাভাও চা রপ্তানী করে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, মিশর ও দঃ আফ্রিকা চা-এর প্রধান **আমদানীকারক** দেশ। বর্তমানে রুশিয়া চা-উৎপাদনে স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা করিতেছে। পৃথিবীর মধ্যে লণ্ডন চা-এর প্রধান ক্রয়বিক্রয়-কেন্দ্র।

ভারতের কলিকাতা, কোচিন ও মাদ্রাজ; সিংহলের কলম্বো, এবং ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা বিখ্যাত চা-রপ্তানীর বন্দর।

চা-এর শ্রেণীবিভাগ (Classification of tea)—বহির্বাণিজ্যে যে সমস্ত চা ব্যবহৃত হয় তাহা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর—কালো চা ও সবুজ চা। ইহাদের পার্থক্য চা তৈয়ারীর প্রণালীর উপর নির্ভর করে। ভারত, সিংহল এবং ইন্দোনেশিয়ায় প্রধানতঃ কালো চা প্রস্তুত হয়। জাপান প্রচুর পরিমাণে সবুজ চা প্রস্তুত করে। চীনদেশে কালো ও সবুজ চা প্রায় সমপরিমাণে উৎপন্ন হয়।

কফি (Coffee)—কফি এক জাতীয় উদ্ভিদের ফল।

কফি চাষের অনুকূল অবস্থা (Conditions of growth for coffee)—চা-এর ন্যায় কফিও উষ্ণমণ্ডলের ফসল। কফি চাষের পক্ষে

১৪নং চিত্র—কফি উৎপাদক অঞ্চলসমূহ

নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি বিশেষ অনুকূল :—(১) বাৎসরিক গড় উত্তাপ অন্ততঃ ৭০° ফাঃ এবং উত্তাপের তারতম্য ৪১° ফাঃ—৯৫° ফাঃ-এর মধ্যে হওয়া প্রয়োজন। (২) প্রচুর বৃষ্টিপাত (৮৫" হইতে ১২০" পর্যন্ত) কফি চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। গাছের বৃদ্ধি এবং ফল ধরিবার সময়ই বেশী বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন। (৩) কফিক্ষেত্র উর্বর জৈব ও উদ্ভিজ্জপদার্থযুক্ত হওয়া দরকার। ক্ষেত্রে উত্তম সার দিবার এবং জলনিকাশের সুবন্দোবস্ত থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। (৪) তুহিন, প্রখর রৌদ্র এবং প্রবল বাত্যা কফি গাছের পক্ষে ক্ষতিকারক। সেই কারণে কফিগাছ, অন্ততঃপক্ষে চারা-অবস্থায়, অন্যান্য গাছের ছায়ায় অথবা আচ্ছাদিত অবস্থায় রাখা প্রয়োজন। (৫) ফল পাকিবার ও তুলিবার সময় প্রচুর সূর্যকিরণ এবং শুষ্ক আবহাওয়া আবশ্যক। (৬) ফল তুলিবার জন্য এবং ফলের বীজকে চূর্ণ করিয়া পানীয় কফি প্রস্তুত করিবার জন্য প্রচুর সুলভ শ্রমিকের আবশ্যক। (৭) উচ্চতর ভূখণ্ডে উত্তমস্বাদযুক্ত কফি প্রস্তুত হয়।

কফি-গাছের বৃদ্ধি এবং ফলধারণের জন্য তিন হইতে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত সময়ের প্রয়োজন। কফি-গাছে একবার ফল ধরিতে আরম্ভ করিলে ইহা একযোগে প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবৎ ফল দিতে থাকে। ফলের বীজগুলিকে রৌদ্রে ও ছায়ায় শুকাইয়া পরে উহাকে অল্প আঁচে ভাজিয়া কফি প্রস্তুত করা হয়।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of production)—কফি চাষের উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রগুলি সাধারণতঃ উষ্ণমণ্ডলের অন্তর্গত মহাদেশগুলির পূর্ব প্রান্তের পর্বতগাত্রে অথবা মালভূমির ঢালে অবস্থিত। **দক্ষিণ আমেরিকার** ব্রাজিলে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে (পৃথিবীর প্রায় ৬০%) কফি জন্মিয়া থাকে। দক্ষিণ ব্রাজিলের সাওপলো অঞ্চলেই ব্রাজিলের অধিকাংশ কফি জন্মিয়া থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, ইকুয়েডর, গিয়ানা এবং বলিভিয়া রাজ্যে, **মেক্সিকোয়**, **মধ্য আমেরিকার** গুয়াটেমালা, স্যান স্যালভেডর, ও কোস্টারিকায়, **পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের** জ্যামেইকা ও হাইতীতে, **আফ্রিকার** কেনিয়া, লাইবেরিয়া, ট্যাঙ্গানিকা ও অ্যাঙ্গোলাতে, **সিংহলে**, **জাভায়**, **আরবের** ইয়েমেন প্রদেশে ও **ভারতের** দক্ষিণাংশে কফি উৎপাদিত হয়। দক্ষিণ আরবের ইয়েমেন প্রদেশের 'মোকা' কফি পৃথিবীপ্রসিদ্ধ। তবে জলসেচ ব্যবস্থার অপ্রাচুর্য, যানবাহনের অসুবিধা, অত্যধিক করভার এবং শাসনতন্ত্রের অব্যবস্থা প্রভৃতি কারণে মোকা কফির উৎপাদন অতি সামান্য। পৃথিবীতে উৎপন্ন সমগ্র কফির প্রায় ৭৫ ভাগই দক্ষিণ আমেরিকা উৎপাদন করিয়া থাকে।

বাণিজ্য (Trade)—পৃথিবীর বহির্বাণিজ্যে ব্যবহৃত কফির প্রায় ৬০%ই ব্রাজিল **রপ্তানী** করিয়া থাকে। কলম্বিয়া, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, মধ্য আমেরিকা, পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, আফ্রিকা, ভেনেজুয়েলা, ভারত প্রভৃতি দেশও কফি রপ্তানী করিয়া থাকে। পৃথিবীতে উৎপন্ন কফির অর্ধেকেরও অধিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র **আমদানী** করে। ফ্রান্স, জার্মানী, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, সুইডেন, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশও প্রচুর পরিমাণে কফি আমদানী করে

(৩) অপরাপর খাদ্য ফসল

চিনি (Sugar)—নানাপ্রকার গা ' রস হইতে চিনি প্রস্তুত হয়। তবে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে প্রধানতঃ ইক্ষু এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে বীট হইতে অধিক চিনি উৎপন্ন হইয়া থাকে। বর্তমানে পৃথিবীতে উৎপাদিত মোট চিনির প্রায় ⅔ ভাগ ইক্ষু হইতে ও ⅓ ভাগ বীট হইতে উৎপন্ন হইতেছে।

ইক্ষু (Sugarcane)—ইক্ষু ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল।

ইক্ষু চাষের অনুকূল অবস্থা (**Conditions of growth for sugarcane**)—নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি ইক্ষু-চাষের পক্ষে অনুকূল: (১) সারা

বৎসর ধরিয়া প্রচুর উত্তাপ প্রয়োজন। গ্রীষ্মের গড় উত্তাপ ৬০°-৮০° ফাঃ পর্যন্ত হওয়া দরকার। (২) বার্ষিক গড়-বৃষ্টিপাত ৪০"-৭০" পর্যন্ত হওয়া দরকার। বৃষ্টিপাত ইহা অপেক্ষা অল্প হইলে জলসেচব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। অত্যধিক বৃষ্টি হইলে ইক্ষুর রস পাতলা হয় এবং নিকৃষ্ট শ্রেণীর ইক্ষু জন্মিয়া থাকে। (৩) চুন ও লবণ যুক্ত ফাঁপা, উর্বর, দো-আঁশ মাটি ইক্ষু চাষের উপযোগী। জমিতে মাঝে মাঝে সার দিবার বন্দোবস্ত থাকা ভাল। ইক্ষু ক্ষেত্রে জলনিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। (৪) ইক্ষু ক্ষেত্র তুহিনমুক্ত হওয়া প্রয়োজন। (৫) ফসল পাকিবার ও কাটিবার সময় আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত শুষ্ক ও রৌদ্রযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। (৬) প্রচুর সুলভ শ্রমিকের আবশ্যক। (৭) সমুদ্রবায়ুর প্রভাব ইক্ষু-চাষের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় না হইলেও বিশেষ অনুকূল। উপরোক্ত অবস্থাগুলি হইতে বুঝা যায় যে, যে সমস্ত স্থানে ধান-চাষ হইতে পারে সেই সমস্ত স্থানে ইক্ষুও জন্মে। কিন্তু ইক্ষুক্ষেত্রে জল দাঁড়াইলে ইক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। ক্রান্তীয় নিম্ন অঞ্চল, বিশেষতঃ ক্রান্তীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং উপকূলাঞ্চল, ইক্ষু চাষের পক্ষে আদর্শস্থানীয়।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of production)—পৃথিবীর ইক্ষু চাষের প্রধান প্রধান ক্ষেত্রগুলি মোটামুটি ৩০° উঃ এবং ৩০° দঃ অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত। ভারত, কিউবা, জাভা, হাওয়াই, পোর্টোরিকো, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, মরিসাস, সুমাত্রা ও জ্যামেইকা ইক্ষু-চাষের প্রধান কেন্দ্র। চীন দেশের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে; ব্রাজিলের উষ্ণ ও আর্দ্র পূর্ব উপকূলে; যুক্তরাষ্ট্রের উপসাগরীয় অঞ্চলে ও মিসিসিপির বদ্বীপে; আফ্রিকার নাটালে ও মিশরে, অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যাণ্ডে; এবং ডোমিনিকা ও ফরমোসাতেও ইক্ষু উৎপন্ন হয়।

ইক্ষু-উৎপাদনে ভারত প্রথম এবং কিউবা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। কিন্তু জাভা, মরিসাস প্রভৃতি দেশের তুলনায় ভারতের একর-প্রতি উৎপাদন অতি সামান্য। একর প্রতি ভারত মাত্র ১৫ টন, কিন্তু কিউবা ১৭ টন, জাভা ৫৬ টন ও হাওয়াই ৬২ টন ইক্ষু উৎপাদন করে।

বাণিজ্য (Trade)—কিউবা, ব্রাজিল, হাওয়াই, অস্ট্রেলিয়া, জাভা, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, ফরমোসা, মরিসাস, পোর্টোরিকো, জ্যামেইকা ও মিশর ইক্ষু-চিনি **রপ্তানী** করে; যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানী ও ইউরোপীয় দেশসমূহ এবং জাপান ও দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশ প্রচুর পরিমাণে ইক্ষু-চিনি **আমদানী** করে। ভারত ইক্ষু-উৎপাদনে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিলেও, আভ্যন্তরীণ চাহিদা প্রচুর থাকায় উৎপন্ন চিনির অতি সামান্য অংশই বিদেশে রপ্তানী করিতে পারে।

(খ) **বীট** (Sugar beet)—বীট নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের ফসল। এই গাছের মূল হইতে চিনি উৎপন্ন হয়।

বীট চাষের অনুকূল অবস্থা (Conditions of growth for sugar beet)—নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি বীট চাষের পক্ষে অনুকূল :—(১) গ্রীষ্মকালীন উত্তাপ গড়ে ৬৭°-৭২° ফাঃ হওয়া প্রয়োজন। (২) গাছের প্রাথমিক বৃদ্ধির সময় যথেষ্ট বৃষ্টিপাত (২০"-৪০"), এবং প্রায় ৫ মাস কাল উষ্ণ আবহাওয়ার প্রয়োজন। সূর্যকিরণ অধিক হইলে বীটের মূলে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। (৪) চুন-সংযুক্ত, কংকরহীন, উর্বর দো-আঁশ মাটি বীট চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।
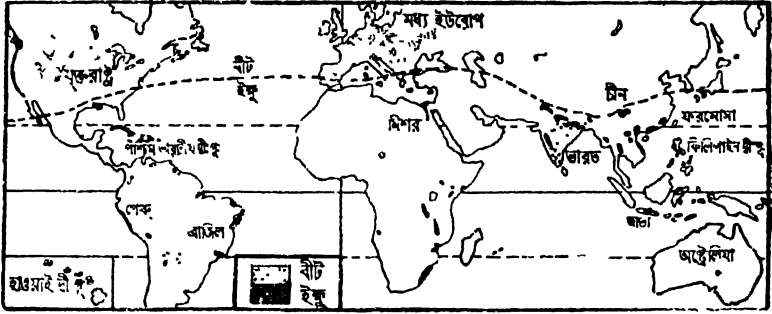
১৫ নং চিত্র—পৃথিবীর ইক্ষু ও বীট উৎপাদক অঞ্চলসমূহ

প্রতিবৎসরই বীটের জমিতে সার দিলে ভাল হয়। (৫) বীট তুলিবার জন্য প্রচুর সূর্যালোকযুক্ত দিন প্রশস্ত। (৬) প্রচুর নিপুণ ও সুলভ শ্রমিক সরবরাহের প্রয়োজন। মহাদেশীয় জলবায়ুযুক্ত অঞ্চলের যে সমস্ত স্থানে বৃষ্টিপাত নিতান্ত অল্প নহে এবং যে সমস্ত অঞ্চল জনবহুল, সেই সমস্ত স্থানেই বীটের চাষ হইয়া থাকে।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of production)—বর্তমানে ইউরোপে ফ্রান্সের পশ্চিম প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, জার্মানী (ম্যাগডেবার্গ সন্নিহিত অঞ্চল), চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়ার মধ্য দিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম রুশিয়া, ট্রান্স-ককেশিয়া, পশ্চিম সাইবেরিয়া, এবং দক্ষিণ ও মধ্য রুশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে বীটের চাষ হইতেছে। দক্ষিণ সুইডেন, ডেনমার্ক ও ইতালীতেও বীটের চাষ হইয়া থাকে। বর্তমানে বীট উৎপাদনে সোভিয়েট রুশিয়ার স্থান সর্বোচ্চ। যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডার প্রেয়রী অঞ্চলেও অল্প পরিমাণে বীটের চাষ হয়।

বাণিজ্য (Trade)—বীট প্রধানতঃ স্থানীয় প্রয়োজনেই উৎপন্ন ও ব্যয়িত হইয়া থাকে। কাজেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ইহার তেমন প্রসিদ্ধি নাই। চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড এবং হাঙ্গেরী ব্যতীত অন্যান্য বীট-উৎপাদক অঞ্চলগুলি স্ব স্ব উৎপাদনের অধিকাংশই আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইতে ব্যয় করে বলিয়া উহারা বীট চিনি বিদেশে রপ্তানী করিতে পারে না। যুক্তরাজ্যই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বীট চিনি আমদানী করে।

(৪) তন্তুময় শিল্প ফসল

কার্পাস (Cotton)—কার্পাস ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল।

কার্পাস চষের অনুকূল অবস্থা (Conditions of growth for cotton)—কার্পাস চাষের পক্ষে নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি বিশেষ অনুকূল :—(১) অঙ্কুরোদ্গম ও প্রাথমিক বৃদ্ধির সময় ২০″ হইতে ৪৭″ পর্যন্ত বৃষ্টিপাত এবং গাছে গুটি ধরিবার পর ক্রমক্ষীয়মাণ বৃষ্টিপাত। (২) অঙ্কুরোদ্গমের সময় গড়-উত্তাপ প্রায় ৭৫° ফাঃ। প্রাথমিক বৃদ্ধির সময় ক্রমবর্ধমান তাপ, এবং গাছ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে ক্ষীয়মাণ তাপ বিশেষ কার্যকরী। (৩) উত্তম শ্রেণীর আঁশ জন্মাইতে হইলে গুটি বাহির হইবার পর হইতে পর্যাপ্ত উজ্জ্বল সূর্যকিরণ ও শুষ্ক আবহাওয়া। (৪) গুটি তুলিবার সময় অপেক্ষাকৃত শুষ্ক আবহাওয়া। (৫) উর্বর, হাল্কা, লবণাক্ত, চুনসম্পন্ন ও জলনিষ্কাশনক্ষম গভীর দো-আঁশ মাটি। মাটি সর্বদা আর্দ্র থাকা প্রয়োজন, তবে জলদ্বারা পরিপ্লুত হইলে গাছ মরিয়া যায়। (৬) জমিতে মধ্যে মধ্যে সার দিবার ব্যবস্থা। (৭) উত্তম শ্রেণীর কার্পাস চাষের জন্য প্রায় সাত মাস কাল তুহিনমুক্ত আবহাওয়া। সামুদ্রিক বাতাস কার্পাস গাছের পুষ্টিসাধন করে, এজন্য সমুদ্র-সন্নিহিত অঞ্চলসমূহেই সর্বোত্তম কার্পাসের চাষ হয়। (৮) কার্পাসের চাষ, জমির তত্ত্বাবধান এবং গুটি তুলিবার জন্য প্রচুর জনমজুরের সরবরাহ।

শ্রেণী বিভাগ (Classification)—আঁশের দৈর্ঘ্য, সূক্ষ্মতা, মসৃণতা, ঔজ্জ্বল্য, রং, দৃঢ়তা প্রভৃতি বিচার করিয়া কার্পাসকে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত চারিটি বর্গে ভাগ করা হয়। **১ম বর্গ :** তন্তুর দৈর্ঘ্য ১⅞″-২¼″। ইহা প্রায় রেশমের ন্যায় সূক্ষ্ম ও মসৃণ। ঔজ্জ্বল্যে ও দৃঢ়তায়ও অদ্বিতীয়। ইহাকে **দীর্ঘতন্তু** বা **সাগরদ্বীপীয় কার্পাস** বলে। মিশর, প্রতীচ্য দ্বীপপুঞ্জ, এবং যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া, ফ্লোরিডা ও দক্ষিণ ক্যারোলিনায় ইহার চাষ হইতেছে। **২য় বর্গ :** তন্তুর দৈর্ঘ্য ১⅛-″র উপরে। প্রকৃতপক্ষে ইহা হইতেছে **মধ্যতন্তু** বা **মিশরীয় কার্পাস**। মিশর, পেরু, উঃ ব্রাজিল, এবং পূর্ব আফ্রিকার উগাণ্ডা ও ট্যাঙ্গানিকার অধিকাংশ কার্পাসই এই বর্গের। **৩য় বর্গ :** তন্তুর দৈর্ঘ্য ⅞″-১⅛″। ইহা হইল **হ্রস্বতন্তু** বা **উচ্চভৌমিক কার্পাস**। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, রুশিয়া প্রভৃতির অধিকাংশ কার্পাসই এই জাতীয়। চীন ও আফ্রিকায় যে কার্পাস জন্মে তাহার একাংশও এইরূপ। **৪র্থ বর্গ :**—তন্তুর দৈর্ঘ্য ⅞″ ইঞ্চিরও কম। ইহাকে **খর্বতন্তু কার্পাস** বলা চলে। চীন, ভারত এবং প্রাচ্যের অন্যান্য স্থানের অধিকাংশ কার্পাস এই বর্গের।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of production)—**উত্তর আমেরিকা** মহাদেশের **যুক্তরাষ্ট্রই** পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কার্পাস উৎপাদন

করে। যুক্তরাষ্ট্রের কার্পাসবলয়টি ঐ রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বাংশের উপসাগরীয় জলবায়ুসেবিত অঞ্চলের অন্তর্গত। এই বলয়টি পশ্চিমে ২৩' সমবর্ষণরেখা, দক্ষিণে ৬০' সমবর্ষণরেখা, উত্তরে ৭৭° ফাঃ জুলাই সমোষ্ণরেখা (এই রেখার দক্ষিণাংশে বৎসরে প্রায় ২০০টি দিন তুহিনমুক্ত আবহাওয়া বর্তমান) এবং পূর্বে প্রায় আটলান্টিক উপকূলরেখার দ্বারা আবদ্ধ। এই বলয়টির অন্তর্গত টেকসাস ও আলাবামার কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চল এবং মিসিসিপি অববাহিকাব পলিসমৃদ্ধ অঞ্চলেই কার্পাসের উৎপাদন সর্বাপেক্ষা অধিক। যুক্তরাষ্ট্রের কার্পাসেব অধিকাংশই হ্রস্বতন্তু উচ্চভৌমিক কার্পাস, তবে মিসিসিপি অববাহিকা এবং দক্ষিণ ক্যারোলিনায় দীর্ঘতন্তু কার্পাসেরও চাষ হইয়া থাকে। এই কার্পাস-বলয়টিব বহির্ভূত ক্যালিফোর্নিয়াব ইম্পিরিয়াল অববাহিকা এবং আরিজোনার সল্ট নদীব অববাহিকায় মিশবীয় ও দীর্ঘতন্তু কার্পাসের চাষ অধিক। শবৎকালে অত্যধিক বৃষ্টিপাত এবং মৃত্তিকাব অনুবর্বতাহেতু উপসাগবীয় উপকূলাঞ্চলে এবং দক্ষিণ ফ্লোবিডায় কার্পাসেব চাষ অসম্ভব। **মেক্সিকোতে**
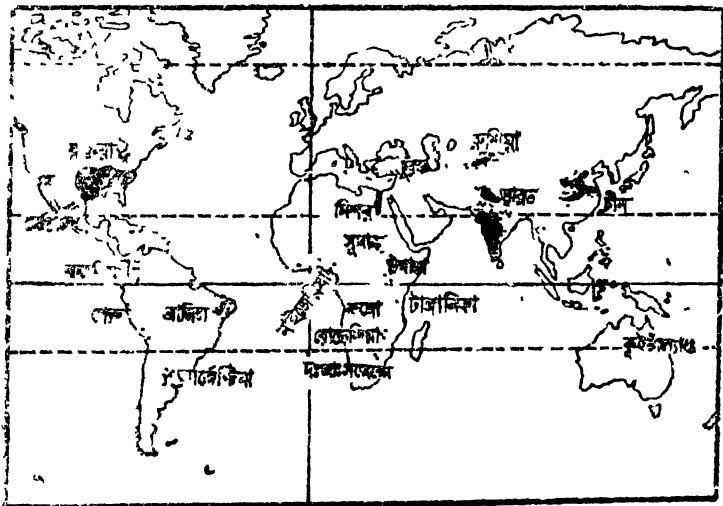
১৬নং চিত্র—পৃথিবীর কার্পাস উৎপাদক অঞ্চলসমূহ

প্রচুর কার্পাসেব চাষ হয়। **দক্ষিণ আমেরিকার** ব্রাজিল, পেরু ও আর্জেন্টিনার উত্তরাঞ্চলে কার্পাসের চাষ হয়। **এশিয়া** মহাদেশের অন্তর্গত ভারতে প্রধানতঃ হ্রস্ব তন্তুযুক্ত ও পাকিস্তানে (পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে) দীর্ঘ এবং মধ্যম তন্তুযুক্ত কার্পাসের চাষ হয়। চীন দেশের হোয়াংহো ও ইয়াংসি নদীর অববাহিকায় এবং উত্তরের সমভূমিতে কার্পাস জন্মে। চীন দেশে

উৎপাদিত অধিকাংশ কার্পাস আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইতে ব্যবহৃত হয়। চোজেন, তুরস্ক, ইরান এবং ইরাকও সামান্য পরিমাণে কার্পাস উৎপাদন করে। সমগ্র **ইউরোপ** মহাদেশে কার্পাসের উৎপাদন অতি সামান্য। একমাত্র **রুশিয়াই** (২য়) তাহার আভ্যন্তরীণ চাহিদার প্রায় অনুরূপ পরিমাণ কার্পাস জন্মাইয়া থাকে। সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার উজবেকিস্তান, এবং ককেসাস, ক্রিমিয়া ও ইউক্রেনের দক্ষিণাঞ্চল কার্পাস চাষের পক্ষে অনুকূল। **আফ্রিকা** মহাদেশে অবস্থিত মিশরের নীলনদের অববাহিকায় প্রচুর পরিমাণে কার্পাস জন্মে। সুদান, উগাণ্ডা, ট্যাঙ্গানিকা, নাইজেরিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সম্মেলনেও প্রচুর কার্পাস জন্মিয়া থাকে। **অস্ট্রেলিয়ার** ক্রান্তীয় অঞ্চলে, বিশেষতঃ কুইন্সল্যাণ্ড রাজ্যেও কার্পাসের চাষ হয়।

বাণিজ্য (Trade)—বহির্বাণিজ্যের পণ্য হিসাবে ব্যবহৃত কার্পাসের প্রায় ৫০%ই যুক্তরাষ্ট্র তাহার নিউ অরলিয়ঁ, স্যাভানা ও গ্যালভেস্টন বন্দর দিয়া বিদেশে **রপ্তানী** করে। পাকিস্তান, মিশর, ব্রাজিল, পেরু, উগাণ্ডা, সুদান প্রভৃতি দেশও কার্পাস রপ্তানী করে। মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া, পাকিস্তানের করাচী, ব্রাজিলের স্যালভেডর ও রায়ো-ডি-জেনেরো বিখ্যাত কার্পাস রপ্তানীর বন্দর। যুক্তরাজ্য, জাপান, চীন, জার্মানী, ফ্রান্স এবং ইতালী প্রচুর পরিমাণে কার্পাস **আমদানী** করিয়া থাকে। মিশর ও পাকিস্তান হইতে ভারত উচ্চশ্রেণীর কার্পাস আমদানী করে।

পাট (Jute)—পাট ক্রান্তীয় অঞ্চলের একচেটিয়া সম্পদ।

পাট চাষের অনুকূল অবস্থা (Conditions of growth for jute)—পাট চাষের জন্য নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি বিশেষ অনুকূল—(১) বার্ষিক গড় উত্তাপ ৮০° ফাঃ-এর অধিক হওয়া প্রয়োজন। (২) বৃষ্টিপাত ৮০"-রও অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে বীজবপনের সময় ও চারার প্রাথমিক বৃদ্ধিকালে প্রবল বৃষ্টিপাত পাট-চাষের পক্ষে ক্ষতিকারক। (৩) উর্বর পলিমাটি বা দো-আঁশ মাটি পাট-চাষের বিশেষ উপযোগী। (৪) যে সমস্ত নিম্ন সমতল ক্ষেত্রে জল জমিতে পারে সে সমস্ত ক্ষেত্রই পাট-চাষের অনুকূল। কিছু পাট উচ্চ-ভূমিতেও জন্মে। (৫) বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা অধিক হওয়া পাট-চাষের পক্ষে অনুকূল। (৬) পাট-চাষের জন্য প্রচুর সুলভ ও দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন। অতএব ক্রান্তীয় অঞ্চলের যে সমস্ত স্থানে লোকবসতি ঘন, বৃষ্টিপাত ও উষ্ণতা অধিক এবং মৃত্তিকা পলিসমৃদ্ধ সেই সমস্ত অঞ্চলেই প্রচুর পাট-চাষ হয়। পাট পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বহিরাবরণ তন্তু।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of production)—পাট ক্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল হইলেও গঙ্গার ব-দ্বীপাঞ্চলেই ইহার চাষ সর্বাধিক। এই অঞ্চলের অন্তর্গত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বঙ্গদেশ, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যায় এবং পূর্ব-

পাকিস্তানের ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, ফরিদপুর, পাবনা, বগুড়া এবং রাজসাহী জেলাতেই ব্যাপক ভাবে পাটের চাষ করা হয়। সম্প্রতি ভারতের উঃ প্রদেশের তরাই অঞ্চলে এবং মাদ্রাজ ও কেরালা রাজ্যেও পাটের চাষ করা হইতেছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান মিলিতভাবে সমগ্র পৃথিবীর উৎপাদনের মোট ৯৫ ভাগ পাট উৎপাদন করে—তন্মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তানই ৭০-৭৫ ভাগ। পূর্ব-পাকিস্তানের পাট অতি উচ্চশ্রেণীর। সিংহল, ফরমোসা, চীন, মালয়, মিশর, শ্যাম, ইন্দোচীন, ব্রাজিল, মেক্সিকো, প্যারাগুয়ে প্রভৃতি দেশেও পাট বা পাটজাতীয় উদ্ভিদ্ উৎপন্ন হইতেছে। বর্তমানে পৃথিবীর বহু দেশেই পাট উৎপাদনের প্রচেষ্টা চলিতেছে।

বাণিজ্য (Trade)—পাকিস্তান পাটের প্রধান রপ্তানীকারক দেশ। এই দেশের চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দর হইতে প্রচুর পাট ভারত, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ক্যানাডা, জাপান, ইতালী এবং আর্জেন্টিনাতে **রপ্তানী** হইয়া যায়। ভারত হইতে পাটজাত সামগ্রী—চট, থলে প্রভৃতি রপ্তানী হয়।

পাটের পরিবর্ত সামগ্রী (Substitutes for jute)—আজ পর্যন্ত পাটের নানাবিধ পরিবর্ত সামগ্রী আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে রুশিয়ায় শণ; যুক্তরাষ্ট্রে কাগজের থলে; যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী প্রভৃতি দেশে কাষ্ঠমণ্ড হইতে প্রস্তুত তন্তু; জাভায় রোজেলা তন্তু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি চুকাই বৃক্ষের আঁশ হইতে পাটের পরিবর্ত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য ভারতে গবেষণা চলিতেছে। তবে এই সমস্ত পরিবর্ত সামগ্রীর বাণিজ্যিক সাফল্য এখনও নিরূপিত হয় নাই।

শণ (Hemp)—কয়েক শ্রেণীর শণের পাতা হইতে তন্তু প্রস্তুত হয়। শণের তন্তু অত্যন্ত দৃঢ়। ইহার দ্বারা প্রধানতঃ রজ্জু, ত্রিপল, চট প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

শণ চাষের অনুকূল অবস্থা (Conditions of growth for hemp)—অতসীর ন্যায় বীজ এবং তন্তুর জন্য শণের চাষ হয়। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে প্রধানতঃ তন্তুর জন্যই ইহার চাষ হইয়া থাকে। তন্তুর জন্য চাষ করা হইলে উর্বর দো-আঁশ মাটি, ১৫"-৩০" বৃষ্টিপাত, ৩৫°-৫৫° ফাঃ উত্তাপ, আর্দ্র আবহাওয়া ও প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হয়।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of production)—রুশিয়া সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে শণের চাষ করে। ইতালীতে সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেণীর শণ উৎপন্ন হয়, তবে ইতালীর উৎপাদন অতি সামান্য। পোল্যাণ্ড, যুগোস্লাভিয়া, রুমানিয়া,

হাঙ্গেরী, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, কোরিয়া এবং ভারতেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে শণের চাষ হয়। শণের পাতা হইতে ভারতে ভাঙ্গ ও গাঁজা প্রস্তুত হয়।

বাণিজ্য (Trade)—ইতালী প্রধান শণ-রপ্তানীকারক দেশ। গ্রেটব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং জাপান প্রধান শণ-আমদানীকারক দেশ।

শণের শ্রেণীবিভাগ (Classification)—তন্তুপ্রদায়ী শণ সাধারণতঃ চারি শ্রেণীর হইয়া থাকে, যথা—(১) **আসল শণ** (True hemp)—রুশিয়া, ইতালী, যুগোশ্লাভিয়া, পোল্যাণ্ড, কোরিয়া, ভারত প্রভৃতি দেশে ইহার চাষ হয়। এই শণ হইতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর রজ্জু প্রস্তুত হইয়া থাকে। (২) **ম্যানিলা শণ**—ইহা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে উৎপন্ন হয়। এই শণ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। ইহার দ্বারা অত্যন্ত দৃঢ় রজ্জু ও কাগজ তৈয়ারী হয়। (৩) **শিশল শণ**—মেক্সিকো, প্রতীচ্য দ্বীপপুঞ্জ, হাওয়াই, কেনিয়া এবং ট্যাঙ্গানিকায় এই নামে উৎকৃষ্ট শণ উৎপন্ন হয়, ইহা ম্যানিলা শণ অপেক্ষা সস্তা, ইহা দ্বারা রজ্জু প্রস্তুত হয়। (৪) **ফরমিয়াম্**—এই শণ নিউজীল্যাণ্ডে উৎপন্ন হয়।

রেশম : রেশম উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা (Conditions for the production of silk)—গুটিপোকা হইতে কীটজ রেশম পাওয়া যায়। বাহিরে উন্মুক্ত স্থানে গুটিপোকা পালন করিতে হইলে গ্রীষ্মকালীন গড় উত্তাপ প্রায় ৬০° ফাঃ হওয়া প্রয়োজন। কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফুটাইতে হইলে একাদিক্রমে এগার মাস ধরিয়া ডিমগুলিকে ৬৪° ফাঃ উত্তাপের মধ্যে রাখা দরকার। ডিম ফুটিয়া যে রেশম-কীট বাহির হয় উহা কিছুদিন পরে নিজের দেহ হইতে নিঃসৃত লালার দ্বারা একটি আবরণ বা গুটি (cocoon) সৃষ্টি করে (গুটির গড় আয়তন ১"×¾")। এই গুটিকে গরম জলে সিদ্ধ করিয়া উহা হইতে রেশম বাহির করা হয়। এক একটি গুটি হইতে ৩০০-৫০০ গজ অতি সূক্ষ্ম রেশমী সূতা পাওয়া যায়। কয়েকটি গুটি হইতে সূতা বাহির করিয়া একত্রে পাক (reel) দিয়া বয়ন উপযোগী সূতা প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

গুটিপোকা প্রধানতঃ তুঁত গাছের পাতা খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। এক পাউণ্ড ওজনের ডিম হইতে যতগুলি গুটিপোকা বাহির হয় সেগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য প্রায় ১০ টন তুঁত পাতার (mulberry leaves) প্রয়োজন হয়। প্রতি টন পাতার জন্য গড়ে ৩০।৪০টি তুঁত গাছের প্রয়োজন হইয়া থাকে। ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে প্রায় ৩৫° সমাক্ষরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে তুঁতগাছ জন্মায়। তুঁত গাছের চাষ, গুটিপোকা পালন এবং গুটিপোকা হইতে রেশম উৎপাদন প্রভৃতি কার্যে বহু দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। সেই কারণে ঘনবসতিপূর্ণ ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের যে সমস্ত স্থানে প্রচুর তুঁত গাছ জন্মে সেই অঞ্চলেই কীটজ রেশম উৎপাদিত হয়।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of production)—পৃথিবীতে তিনটি

প্রধান কীটজ রেশম উৎপাদক অঞ্চল রহিয়াছে : (১) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্তর্গত দেশসমূহ—ইহাদের মধ্যে (ক) চীনের ইয়াংসি ও সিকিয়াং নদীর উপত্যকা, লোহিত পর্যঙ্ক ও সাংটাং উপদ্বীপাঞ্চল ; (খ) জাপানের নাগোয়া, বিওয়া হ্রদ ও সিওয়া নদীর মোহানা-সংলগ্ন অঞ্চল; (গ) কোরিয়া; (ঘ) ভারতের বঙ্গদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, মহীশূর ও কাশ্মীর এবং (ঙ) ইন্দোচীন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্তর্গত এই দেশগুলি পৃথিবীর সমগ্র উৎপাদনের প্রায় ৮০% কীটজ রেশম উৎপাদন করে। কীটজ রেশম উৎপাদনে ও রপ্তানীতে জাপান পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। (২) পশ্চিম

১৭ নং চিত্র—পৃথিবীর রেশম উৎপাদক দেশসমূহ

এশিয়ার অন্তর্গত দেশসমূহ, যথা—ইরান, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, তুরস্ক ইত্যাদি। এই সমস্ত দেশে উৎপন্ন কীটজ রেশমের পরিমাণ অতি সামান্য। (৩) ভূমধ্যসাগর-সন্নিহিত দক্ষিণ ইউরোপীয় দেশসমূহ—ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত দেশগুলিই উল্লেখযোগ্য : (ক) ইতালী—পো নদীর উপত্যকা অঞ্চলে ইতালীর প্রায় সমুদয় এবং ইউরোপের প্রায় ৯০% কীটজ রেশম উৎপন্ন হয়। বোলোনা, মিলান ও লুক্কা ইতালীর বিখ্যাত রেশমকেন্দ্র। (খ) ফ্রান্সের রোণ নদীর উপত্যকা অঞ্চলে রেশম উৎপন্ন হয়। লিয়ঁ এই অঞ্চলের প্রধান রেশম কেন্দ্র। (গ) স্পেন, বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, সুইজারল্যাণ্ড ও রুশিয়াও সামান্য পরিমাণে রেশম উৎপাদন করে। বর্তমানে দঃ আমেরিকার ব্রাজিলেও সামান্য পরিমাণে কীটজ রেশম উৎপন্ন হইতেছে।

বাণিজ্য (Trade)—জাপান, চীন, ইতালী ও তুরস্ক কীটজ রেশম **রপ্তানীতে** পৃথিবীতে **শীর্ষস্থান** অধিকার করে। ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানী ও সুইজারল্যাণ্ড কীটজ রেশমের প্রধান **আমদানীকারক দেশ**।

[বয়নশিল্পে ব্যবহৃত প্রধান প্রধান তন্তুময় ফসলগুলিকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—(১) উদ্ভিজ্জ তন্তু। ইহাদের আবার তিনটি উপবিভাগ রহিয়াছে, যথা—(ক) গুটিজাত তন্তু (কার্পাস) (খ) পাতাজাত তন্তু (শণ, এ্যাবাকা) এবং (গ) বহিরাবরণ তন্তু (পাট, অতসী) এবং (২) প্রাণিজ তন্তু ; যথা—(ক) রেশম ও (খ) পশম। ব্যবহার হিসাবে এই তন্তুময় ফসলগুলিকে আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে, যথা—(১) বস্ত্রশিল্পে ব্যবহৃত তন্তু—রেশম, পশম, কার্পাস, অতসী প্রভৃতি এবং (২) রজ্জুশিল্পে ব্যবহৃত তন্তু—পাট, শণ প্রভৃতি।]

(৫) অপরাপর শিল্প ফসল

(ক) **তৈলবীজ ও উদ্ভিজ্জ তৈল** (Oilseeds & vegetable oil) —বহু প্রকার গাছের ফল ও বীজ হইতে উদ্ভিজ্জ তৈল সংগৃহীত হয়। মোমবাতি, সাবান, মার্গারিন, রং প্রভৃতি তৈয়ারী করিবার জন্য উদ্ভিজ্জ তৈল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

জলপাই (Olive) **ও জলপাইয়ের তৈল**—ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুযুক্ত অঞ্চলে জলপাই বৃক্ষ প্রচুর জন্মে। জলপাই-এর তৈল সাবান ও মার্গারিন তৈয়ারীর জন্য প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইতালী, ফ্রান্স ও স্পেন এই তৈলের প্রধান **রপ্তানীকারক** এবং যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা, তুরস্ক, গ্রীস প্রভৃতি প্রধান **আমদানীকারক দেশ**।

বাদাম (Groundnut) **ও বাদাম তৈল**—পশ্চিম আফ্রিকা, যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, মেক্সিকো, অর্জেন্টিনা, ভারত, চীন ও ইন্দোনেশিয়ায় বাদাম হইতে প্রচুর তৈল উৎপন্ন হয়। ভারত বাদাম তৈলের প্রধান **রপ্তানীকারক** দেশ এবং ফ্রান্স ও জার্মানী প্রধান **আমদানীকারক** দেশ। রন্ধনকার্যে ও সাবান তৈয়ারীর জন্য এই তৈল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

এরণ্ড (Castor) **ও এরণ্ড তৈল**—ভারত (১ম), জাভা, ব্রাজিল, ইন্দোচীন এবং মাঞ্চুরিয়াতে এরণ্ড ফলের বীজ হইতে প্রচুর এরণ্ড বা রেড়ির তৈল উৎপন্ন হয়। ভারত হইতে এই বীজ ও তৈল যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়াম, জার্মানী প্রভৃতি দেশে প্রচুর পরিমাণে **রপ্তানী** হইয়া যায়। ঔষধ ও সাবান তৈয়ারীর জন্য এবং পিচ্ছিলকারক পদার্থ হিসাবে এই তৈলের ব্যবহার ব্যাপক।

নারিকেল (Cocoanut) **ও নারিকেল তৈল**—উষ্ণমণ্ডলের দ্বীপসমূহে এবং সমুদ্রের উপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রচুর নারিকেল বৃক্ষ জন্মে। নারিকেলের শুষ্ক শাঁস হইতে নারিকেল তৈল উৎপন্ন হয়। খাদ্য ও কেশতৈল হিসাবে, মার্গারিন ও সাবান তৈয়ারীর জন্য ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

তিসি (Linseed) **ও তিসির তৈল**—আর্জেন্টিনা, ইতালী, রুশিয়া, ভারত, চীন, যুক্তরাষ্ট্র ও হল্যাণ্ডে তিসির চাষ অধিক। ঐ সমস্ত অঞ্চলেই

তিসির বীজ হইতে তৈল উৎপন্ন হয়। তবে তিসির তৈল উৎপাদনে আর্জেন্টিনা পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করে। আর্জেন্টিনা, ভারত এবং রুশিয়া তিসি ও তিসির তৈলের প্রধান **রপ্তানীকারক** এবং গ্রেট ব্রিটেন প্রধান **আমদানী-কারক** দেশ। এই তৈল বার্নিশ, রং ও অয়েলক্লথ তৈয়ারীর জন্য ব্যবহৃত হয়।

তাল (Palm) **তৈল**—একপ্রকার তালজাতীয় উদ্ভিদের ফলের শাঁস হইতে তাল তৈল পাওয়া যায়। এই জাতীয় তাল গাছ নাইজেরিয়া, ঘানা, সিয়েরা লিয়ন ও ইন্দোনেশিয়ায় প্রচুর জন্মে। পৃথিবীর প্রায় ৯০% তাল তৈল নাইজেরিয়া, ঘানা এবং সিয়েরা লিয়ন হইতে আসে। সাবান, মোমবাতি, মার্গারিন প্রভৃতি তৈয়ারীর জন্য এবং পিচ্ছিলকারক পদার্থ হিসাবে এই তৈল ব্যবহৃত হয়।

কার্পাস বীজের (Cotton seed) **তৈল**—যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, মিশর এবং উগাণ্ডাতে কার্পাস বীজ হইতে প্রচুর তৈল নিষ্কাশিত হয়। খাদ্য হিসাবে, এবং সাবান, মোমবাতি ও গ্রামোফোন রেকর্ড তৈয়ারীতে এই তৈল ব্যবহৃত হয়।

সয়াবিন (Soyabean) **ও সয়াবিনের তৈল**—মাঞ্চুরিয়া, জাপান, চীন, ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর সয়াবিন ও উহা হইতে তৈল উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর প্রায় ৯০ ভাগ সয়াবিন তৈল মাঞ্চুরিয়াতে উৎপন্ন হয়। চীনে এই তৈল খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সাবান প্রস্তুত করিবার জন্যও এই তৈলের ব্যবহার হয়।

(খ) **রবার** (Rubber)—নিরক্ষীয় অঞ্চলের কয়েকটি বৃক্ষের ঘনীভূত রস হইতে রবার উৎপন্ন হয়। ভূমিজ রবার দুই প্রকারের—বন্য রবার ও আবাদী বা কৃষিজ রবার। বন্য রবার-বৃক্ষ আমাজন ও কঙ্গো নদীর অববাহিকার অরণ্যে জন্মে।

বন্য রবার সংগ্রহের বহু অসুবিধা রহিয়াছে, যথা—(১) দুর্গম অরণ্য হইতে ইহার সংগ্রহ অতি কঠিন ও ব্যয়সাধ্য, (২) এই সমস্ত অঞ্চলে যানবাহনের কোন ব্যবস্থা নাই এবং কোন কোন উৎপাদক অঞ্চল ক্রয়বিক্রয়-কেন্দ্র হইতে বহুদূরে অবস্থিত, (৩) অরণ্যে নিপুণ শ্রমিকের সরবরাহ অত্যন্ত অপ্রতুল। অপর পক্ষে বন্য রবার অপেক্ষা আবাদী রবার (ক) উৎকৃষ্ট, (খ) বৃক্ষ প্রতি ইহার উৎপাদন বন্য রবার অপেক্ষা অধিকতর, (গ) ইহার উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ-যোগ্য; (ঘ) ইহার সংগ্রহ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য, (ঙ) আবাদী রবারক্ষেত্রগুলি জনবহুল অঞ্চলে অবস্থিত থাকায় এই সমস্ত স্থানে নিপুণ শ্রমিকের সরবরাহ প্রচুর, এবং (চ) আবাদী রবার অঞ্চলগুলি পৃথিবীর প্রধান প্রধান বাণিজ্য-পথের অন্তর্বর্তী। বর্তমানে পৃথিবীতে উৎপন্ন সমস্ত রবারের শতকরা ৯০ ভাগই আবাদী রবার।

রবার চাষের অনুকূল অবস্থা (Conditions of growth for rubber)—রবার প্রধানতঃ নিরক্ষীয় অঞ্চলের ফসল। ইহার চাষের জন্য নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি বিশেষ অনুকূল :—(১) সারা বৎসর ধরিয়া ৮০° ফাঃ বা ততোধিক উত্তাপ। মাসিক উত্তাপ ৭০° ফাঃ-এর অল্প হওয়া রবার বৃক্ষের পক্ষে ক্ষতিকারক। (২) বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৮০" হইতে ২০০"র মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। মাসিক বৃষ্টিপাত ২"র অধিক হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। বৃষ্টিপাত সাধারণতঃ অপরাহ্ণে হইলেই ভাল হয়, কারণ ইহাতে প্রাতে রবার বৃক্ষ হইতে রবার-সংগ্রহ সহজসাধ্য হয়। একাদিক্রমে বহুদিন অনাবৃষ্টি রবার বৃক্ষের পক্ষে ক্ষতিকারক। (৩) গভীর উর্বর, দো-আঁশ মাটি রবার চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। (৪) রবার-ক্ষেত্রে জল সঞ্চিত হইলে বৃক্ষের অনিষ্ট হয়। এই কারণে আবাদী রবারের ক্ষেত্রগুলি সাধারণতঃ পর্বতের ঢালে অবস্থিত। (৫) রবার বৃক্ষের বহিরাবরণ ছিন্ন করিয়া নিপুণতার সহিত রস সংগ্রহ করিতে, ক্ষেত্র পরিষ্কার রাখিতে এবং সতত বৃক্ষের তত্ত্বাবধান করিতে প্রচুর সুলভ ও নিপুণ শ্রমিকের প্রয়োজন।

১৮নং চিত্র—পৃথিবীর রবার উৎপাদক অঞ্চলসমূহ

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of production)—বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় ৯০ ভাগ আবাদী রবার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্তর্গত মালয়, জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও, সিংহল, ইন্দোচীন, শ্যাম ও ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে উৎপন্ন হয়। কারণ (১) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিরক্ষীয় জলবায়ু রবার চাষের পক্ষে আদর্শস্থানীয় অথচ দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন অববাহিকা বা মধ্য আফ্রিকার কঙ্গো অববাহিকার ন্যায় অস্বাস্থ্যকর নহে ; (২) এই দেশগুলির অধিকাংশই পৃথিবীর প্রধান প্রধান সামুদ্রিক বাণিজ্যপথসমূহের অন্তর্বর্তী ; (৩) এতদঞ্চলে সুদক্ষ ও সুলভ শ্রমিকেরও প্রাচুর্য রহিয়াছে এবং (৪) এতদঞ্চলে রবারের বৃহদায়তন আবাদগুলির অধিকাংশই বৈদেশিক (বিশেষতঃ ব্রিটিশ ও ওলন্দাজ)

মূলধন সহায়তায় পুষ্ট। মালয়, সুমাত্রা, জাভা, এবং সিংহল মিলিতভাবে পৃথিবীর শতকরা ৯০ ভাগ আবাদী রবার উৎপাদন করে।

বাণিজ্য (Trade)—উৎপাদক দেশসমূহে রবার অতি সামান্যই ব্যবহৃত হয়। যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সমগ্র উৎপাদনের অর্ধেকেরও অধিক রবার ক্রয় করে। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালী, স্পেন এবং রুশিয়াও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে রবার **আমদানী** করে। মালয় ও ইন্দোনেশিয়া পৃথিবীর সমগ্র রবার চাহিদার প্রায় ৯০ ভাগ সরবরাহ করে। সিংহল, ব্রাজিল, বোর্নিও এবং ইন্দোচীন অন্যান্য প্রধান **রপ্তানীকারক** দেশ।

কৃত্রিম বা বিশ্লেষিত রবার (Synthetic Rubber)—বিগত যুদ্ধের পূর্বে রবার সম্পর্কে স্বাবলম্বী হইবার উদ্দেশ্যে জার্মানী, যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, ফ্রান্স, জাপান, রুশিয়া এবং গ্রেটব্রিটেন কৃত্রিম রবার উৎপাদনে সচেষ্ট হয়। আমেরিকাতে এ্যাসিটিলিন ('ডুপ্রেন' এবং 'নুপ্রেন') এবং পরিত্যক্ত খনিজ তৈল হইতে ('চোমগাম'), জার্মানীতে ক্যালসিয়াম কারবাইড হইতে ('বুনা'), রুশিয়াতে 'সুরাসার' হইতে, জাপানে 'সয়াবিন' হইতে এবং যুক্তরাজ্যে 'কয়লা' হইতে কৃত্রিম রবার উৎপন্ন হইতেছে। অনেকের ধারণা এই যে এই সমস্ত কৃত্রিম রবার সাধারণ রবারের মতই গুণসম্পন্ন। ১৯৫০ সাল হইতে বিশ্লেষিত রবারের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারে স্বাভাবিক রবারের চাহিদা ক্রমাগতই হ্রাস পাইতেছে।

ভারতের প্রধান প্রধান কৃষিজ ফসল

(১) খাদ্য শস্য

ভারতের **খাদ্যশস্যের** মধ্যে ধান, গম, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা, যব, বই ও নানাপ্রকার ডাল প্রধান।

ধান—[চাষের অনুকূল অবস্থা, ৮০ পৃঃ দেখ] ভারতের কৃষিজ সম্পদগুলির মধ্যে ধানই প্রধান। মোট কর্ষিত ভূমির প্রায় ৩০% জমিতে প্রধানতঃ রোপণ পদ্ধতিতেই ধানের চাষ হইয়া থাকে। ভারতে উচ্চভূমি অপেক্ষা নিম্নভূমির ধানই অধিক।

উৎপাদক অঞ্চল—তামিলনাড়ু (চিংলাপাট এবং তাঞ্জোর অঞ্চল), বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, উড়িষ্যা (কটক, পুরী ও সম্বলপুর অঞ্চল), আসাম (কামরূপ ও গোয়ালপাড়া অঞ্চল), মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর ধান উৎপাদিত হয়।

উৎপাদন, আভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও বাণিজ্য (Production, Consumption and Trade)—ভারতে তিন প্রকার ধানের চাষ হয়—(১) **আউশ** বা শরৎকালীন ধান, (২) **আমন** বা হৈমন্তিক ধান, এবং (৩)

বোরো বা গ্রীষ্মকালীন ধান। ভারতে পূর্বাঞ্চলের প্রদেশসমূহে এই তিন শ্রেণীর ধানই উৎপাদিত হয়। মধ্যপ্রদেশে আউশ ধানের উৎপাদন অধিক, তবে সমগ্র ভারতে আমন ধানের উৎপাদনই সর্বাপেক্ষা অধিক। ১৯৫০-৫১, ১৯৫৫-৫৬, ১৯৬০-৬১ ও ১৯৬৪-৬৫ সালে ভারতে যথাক্রমে ৩,০৮,১০, ৩,১৫,২১, ৩,৪১,২৮ ও ৩,৬০,৭৭ হাজার হেক্টার জমিতে ২,০৫,৭৬, ২,৭৫,৫৭, ৩,৪৫,৭৪ ও ৩,৮৭,৩২ (অনুমিত) হাজার টন ধান জন্মে। ভারতে একর প্রতি ধানের উৎপাদন অতি সামান্য। তবে সম্প্রতি জাপানী প্রথায় ধান চাষ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় একর প্রতি উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পাইতেছে।
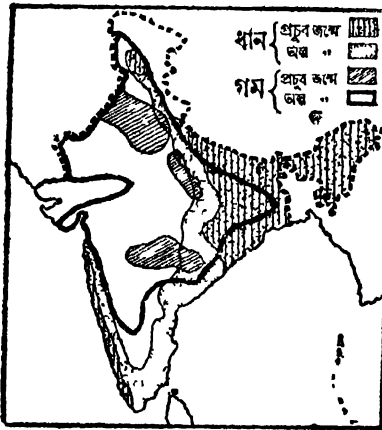
১৯ নং চিত্র—ধান ও গম উৎপাদক অঞ্চলসমূহ

যদিও ধান উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে তথাপি আভ্যন্তরীণ চাহিদা এত অধিক যে মাঝে মাঝে ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশ হইতে ধান ও চাউল আমদানী করিতে হয়। ভারতের বিভিন্ন চাউল উৎপাদক রাজ্যসমূহের মধ্যে আসাম, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশে আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইয়াও বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত থাকে। পশ্চিমবঙ্গে প্রতিবৎসরই চাউলের ঘাটতি হয়। তামিলনাড়ু, বিহার, মহারাষ্ট্র ও উত্তরপ্রদেশ আটা ও ময়দার ব্যবহার করিয়া চাউলের ঘাটতি মিটায়। বহুমুখী নদী-পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী হইলে ভারতে চাউলের উৎপাদন বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

গম—[চাষের অনুকূল অবস্থা—পৃঃ ৭৭ দেখ] ভারতে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে বীজ বপন করিয়া মার্চ-এপ্রিল মাসে গম সংগ্রহ করা হয়।

উৎপাদক অঞ্চল—গম উৎপাদনে উত্তর প্রদেশ ভারতে প্রথম এবং পাঞ্জাব দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। উত্তর প্রদেশের গঙ্গা-ঘর্ঘরা এবং গঙ্গা-যমুনার দোয়াব অঞ্চলে প্রচুর গম উৎপাদিত হয়। দেরাদুন, সাহারানপুর, মজঃফরপুর, মীরাট, মোরাদাবাদ, এটাওয়া, সাহাজাহানপুর, বুদাউন, নৈনীতাল এবং গোরক্ষপুর এই রাজ্যের প্রধান গম উৎপাদক অঞ্চল। পাঞ্জাব এবং উত্তর প্রদেশে কৃত্রিম জলসেচের সাহায্যে গম উৎপাদিত হয়। মধ্যপ্রদেশ (নর্মদার অববাহিকা অঞ্চল ও মধ্যভারত), বিহার, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মহীশূর, রাজস্থান, পশ্চিম বঙ্গ (নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, মালদহ ও দিনাজপুর),

প্রভৃতি স্থানেও গম জন্মে। আসাম ও উড়িষ্যায় বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টি হওয়ায় ঐ সমস্ত অঞ্চলে গমের চাষ হয় না।

উৎপাদন, আভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও বাণিজ্য (Production, Consumption and Trade)—১৯৫০-৫১, ১৯৫৫-৫৬, ১৯৬০-৬১ ও ১৯৬৪-৬৫ সালে ভারতে যথাক্রমে ৯৭,৪৬, ১,২৩,৬৭, ১,২৯,২৭ ও ১,৩৪,৫৮ হাজার হেক্টার জমিতে ৬৪,৬২, ৮৭,৬০, ১,০৯,৯৭ ও ১,২০,৭৮ (অনুমিত) হাজার টন গম জন্মে। ভারতে একর প্রতি গম উৎপাদনের হার অন্যান্য দেশের তুলনায় নিতান্তই সামান্য। তবে কৃত্রিম জলসেচযুক্ত অঞ্চলে উৎপাদনের হার অধিক। পুসার "কেন্দ্রীয় গম-গবেষণা সংস্থা"টির চেষ্টায় একর প্রতি গম উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পাইয়েছে। ভারত বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে গম আমদানী করে।

(২) পানীয় ফসল

চা—[চাষের অনুকূল অবস্থা—৮২-৮৩ পৃঃ দেখ] চা-উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

উৎপাদক অঞ্চল—ভারতের উল্লেখযোগ্য চা উৎপাদন কেন্দ্রসমূহ ৩৩° উঃ ও ১০° উঃ সমাক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত। ভারতের সমগ্র চা-উৎপাদনের প্রায় ৭৩% আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে এবং ২০% দক্ষিণ ভারতে জন্মিয়া থাকে। তবে সর্বভারতীয় উৎপাদনের প্রায় ৬০% চা একমাত্র আসামেই উৎপাদিত হয়। দারাং, শিবসাগর, লখিমপুর, কাছাড়, শ্রীহট্ট এবং সদিয়ার সীমান্ত অঞ্চল আসামের উল্লেখযোগ্য চা-উৎপাদন কেন্দ্র। ভারতে উৎপাদিত মোট চা-এর ২০%-২৫% পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ চা-উৎপাদনের ক্ষেত্রই জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জেলায় সীমাবদ্ধ। দার্জিলিং-এর চা সর্বোৎকৃষ্ট। ত্রিপুরা রাজ্যেও সামান্য চা উৎপাদিত হয়। দক্ষিণ ভারতের কেরালা, তামিলনাড়ু, মহীশূর ও মহারাষ্ট্রের সাতারা অঞ্চলে সর্বভারতীয় উৎপাদনের মোট ১৮% চা উৎপাদিত হয়। পাঞ্জাবের কাংড়া উপত্যকায়, উত্তর প্রদেশের গাড়োয়াল ও আলমোড়ায় এবং বিহারের পূর্ণিয়া, রাঁচী এবং হাজারিবাগ অঞ্চলে সামান্য চা উৎপাদিত হয়। ভারতে 'কালো চা' এর উৎপাদন অধিক। কাংড়া উপত্যকায় সামান্য পরিমাণে 'সবুজ চা' উৎপাদিত হয়।

উৎপাদন, আভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও বাণিজ্য (Production, Consumption & Trade)—১৯৫০-৫১, ১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৬০-৬১ সালে ভারতে যথাক্রমে ৩,১৪, ৩,১৬ ও ৩,৩১ হাজার হেক্টার জমিতে ২,৭৫, ২,৮৫ ও ৩,২১ হাজার টন চা উৎপাদিত হয়। ভারতে চা-এর আভ্যন্তরীণ চাহিদা অল্প

থাকায় মোট উৎপাদনের প্রায় ৭৬%-ই বিদেশে রপ্তানী করা হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত চা-এর ৫০% ভারতের অধিকারে। ১৯৫৫-৫৬ সালে ৪০১০ লক্ষ পাঃ চা রপ্তানী হয়। ভারতীয় চা-এর প্রধান ক্রেতা যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ড। বিদেশের বাজারে ভারতের চা-কে চীন, যবদ্বীপ, সিংহল প্রভৃতি দেশের চা-এর সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হয়।

ভারত হইতে রপ্তানীকৃত চা-এর ৮৬% কলিকাতা এবং অবশিষ্টাংশ মাদ্রাজ বন্দর হইতে রপ্তানী করা হয়। দেশাভ্যন্তরে ও বিদেশে ভারতীয় চা-এর চাহিদা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে 'সেণ্ট্রাল টি বোর্ড' নামক একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। প্রচারকার্যের দ্বারা এই সংস্থাটি স্বদেশে ও বিদেশে, বিশেষতঃ যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় চা-এর চাহিদা বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে।

৮ **কফি**—[চাষের অনুকূল অবস্থা—পৃঃ ৮৪-৮৫ দেখ]। ভারতে বর্ষাকালে কফির বীজ বপন করা হয়। এই গাছে ৫/৭ বৎসর পরে ফল ধরিতে আরম্ভ করে। অক্টোবর মাসে ফল পাকিতে আরম্ভ হয় এবং জানুয়ারী মাসে ফল সংগ্রহ করা হয়।

উৎপাদক অঞ্চল—ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে কফি উৎপাদিত হয়। মহীশূরের কাডুর, সিমোগা, হাসান, কুর্গ এবং মহীশূর জেলায়, তামিলনাড়ুর উত্তর আর্কট হইতে তিনেভেলি পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে, কেরালা এবং মহারাষ্ট্রের সাতারা অঞ্চলে প্রচুর কফি উৎপাদিত হয়। ভারতে উৎপাদিত মোট কফির ৭৬%-এর অধিক মহীশূর রাজ্যে এবং ২৩% তামিলনাড়ু রাজ্যে উৎপাদিত হয়।

উৎপাদন, আভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও বাণিজ্য (Production, Consumption & Trade)—১৯৫০-৫১, ১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৬০-৬১ সালে ভারতে যথাক্রমে ৯১ ; ১,০১ ও ১,১৪ হাজার হেক্টার জমিতে ২৫ ; ৩৪ ও ৪৩ হাজার টন কফি উৎপাদিত হয়। দক্ষিণ ভারতের কিঞ্চিদধিক ৭০০০ কফি-বাগানে প্রায় ১ লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত রহিয়াছে। একমাত্র মহীশূর রাজ্যেই ৪৬০০টি কফি বাগান রহিয়াছে। ভারতের কফি-বাগানসমূহের প্রায় ৭০%-ই ভারতীয়দের হাতে।

ভারতে উৎপাদিত কফির প্রায় অর্ধাংশ আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় এবং বাকী অর্ধাংশ পঃ ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন অংশে ম্যাঙ্গালোর (৭৬%), তেলিচেরী (১১%), কালিকট (১০%) ও মাদ্রাজ (৩%)

বন্দর হইতে রপ্তানী হইয়া যায়। আন্তর্জাতিক বাজারে ব্রাজিলীয় কফির প্রতিযোগিতা তীব্র হওয়ায় ভারতের কফি-রপ্তানী-বাণিজ্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। দেশাভ্যন্তরে এবং বিদেশে ভারতীয় কফির চাহিদা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে "দি ইণ্ডিয়ান কফি বোর্ড" গঠিত হইয়াছে। এই "বোর্ড" উৎপাদিত ও রপ্তানীকৃত কফির উপর কর ধার্য করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে এবং সেই অর্থের সাহায্যে স্বদেশে ও বিদেশে প্রচারকার্যের দ্বারা ভারতীয় কফির চাহিদা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই বোর্ড দেশাভ্যন্তরে কফির চাহিদা বৃদ্ধি করিবার জন্য কলিকাতা, বোম্বাই ও নয়া দিল্লীতে "কফি হাউস" স্থাপন করিয়াছে। উৎপাদিত কফির ৫০% দেশাভ্যন্তরে ব্যবহৃত হয়।
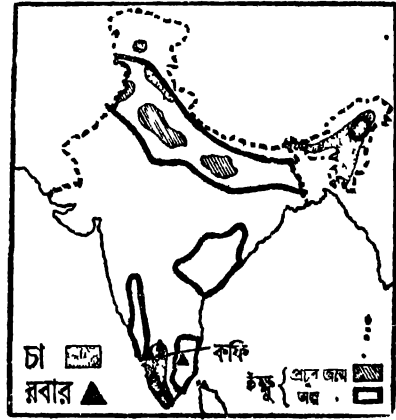
২০ নং চিত্র—ইক্ষু, চা, কফি ও রবার উৎপাদক অঞ্চলসমূহ

(৩) অপরাপর খাদ্য ফসল

ইক্ষু—[চাষের অনুকূল অবস্থা—পৃঃ ৮৫-৮৬ দেখ] ইক্ষু উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে।

উৎপাদক অঞ্চল—ভারতে উৎপাদিত ইক্ষুর প্রায় ৬০% উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুর, সাহাজাহানপুর, ফৈজাবাদ, গোরক্ষপুর, আজমগড়, বালিয়া, জৌনপুর, কাশী এবং বুলন্দসর অঞ্চলে উৎপাদিত হয়। বিহারের (২য় স্থান) চম্পারণ, শরণ, দ্বারভাঙ্গা এবং মজঃফরপুরে, পাঞ্জাবের অমৃতসর, জলন্ধর ও রোটাক অঞ্চলে এবং পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, বর্ধমান ও নদীয়া জেলাতেও ইক্ষু জন্মে। পশ্চিমবঙ্গের ইক্ষু উচ্চশ্রেণীর নহে এবং উৎপাদনের পরিমাণও অতি সামান্য। অন্ধ্র, তামিল নাড়ু, মহারাষ্ট্র, মহীশূর প্রভৃতি অঞ্চলেও ইক্ষুর চাষ হয়। দক্ষিণ ভারতের জলবায়ু ও মৃত্তিকা ইক্ষু চাষের বিশেষ উপযোগী। দক্ষিণ ভারতে একর প্রতি ইক্ষুর উৎপাদন উত্তর ভারত অপেক্ষা চারিগুণ অধিক, আবার আখ মাড়াই করিবার সময়ের ব্যাপকতা উত্তর ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ ভারতে দ্বিগুণ। অতএব ভৌগোলিক দৃষ্টিতে মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু ও মহীশূর রাজ্যই ইক্ষু উৎপাদনের আদর্শ ক্ষেত্র।

উৎপাদন, আভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও বাণিজ্য (Production, Consumption & Trade)—১৯৫০-৫১, ১৯৫৫-৫৬, ১৯৬০-৬১ ও ১৯৬৪-৬৫ সালে ভারতে যথাক্রমে ১৭,০৭, ১৮,৪৭, ২৫,১৫, ও ২৫,৪৪ হাজার হেক্টার জমিতে ৫,৭০,৫১, ৬,০৫,৪৩, , ১০,৮৯,৭৩ ও ১২,২১,২৭ (অনুমিত) হাজার টন ইক্ষু জন্মে। ভারতে প্রতি একব জমিতে ইক্ষু উৎপাদনের পরিমাণ অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অনেক অল্প। ইক্ষুর মূল্য হ্রাস করিতে হইলে একর প্রতি ইক্ষু উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক। "ইণ্ডিয়ান সেন্ট্রাল সুগার কমিটি" ভারতে ইক্ষু চাষের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করিতেছেন।

(৪) তন্তুময় শিল্পফসল

কার্পাস—[চাষের অনুকূল অবস্থা—৮৮ পৃঃ দেখ] ভারত পৃথিবীর একটি উল্লেখযোগ্য কার্পাস উৎপাদক অঞ্চল।

উৎপাদক অঞ্চল—দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণমৃত্তিকাযুক্ত মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশে প্রচুর কার্পাসের চাষ হয়। উত্তর ভারতের উঃ প্রদেশ, পাঞ্জাব ও রাজস্থানের অংশবিশেষে এবং দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু, অন্ধ্র ও মহীশূর অঞ্চলেও প্রচুর কার্পাসের চাষ হইয়া থাকে। ভারতে কার্পাসের চাষে প্রযুক্ত জমির প্রায় অর্ধাংশই মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত।

উৎপাদন, আভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও বাণিজ্য (Production, Consumption & Trade)—ভারতে উৎপাদিত কার্পাসের অধিকাংশই হ্রস্ব আঁশযুক্ত নিম্নশ্রেণীর কার্পাস। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে হ্রস্ব আঁশযুক্ত নিম্নশ্রেণীর কার্পাস উৎপাদিত হয়। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মহীশূর ও তামিলনাড়ু অঞ্চলে অতি সামান্য পরিমাণে দীর্ঘ আঁশযুক্ত আমেরিকান কার্পাসের চাষ হইয়া থাকে। ১৯৫০-৫১, ১৯৫৫-৫৬, ১৯৬০-৬১ ও ১৯৬৪-৬৫ সালে ভারতে যথাক্রমে ৫৮,৮২, ৮০,৮৬; ৭৬,১০ ও ৮১,৫৪ হাজার হেক্টার জমিতে ২৮,৭৫, ৩৯,৪৯, ৫২,৯৩ ও ৫৪,০৮ (অনুমিত) হাজার গাঁইট (প্রতি গাঁইটের ওজন ১৮০ কি. গ্রা.) কার্পাস উৎপাদিত হয়। "দি ইণ্ডিয়ান সেন্ট্রাল কটন কমিটি" বর্তমানে ভারতে উচ্চ শ্রেণীর কার্পাস উৎপাদনের জন্য গবেষণা কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র বা মিশর অপেক্ষা ভারতে একর প্রতি কার্পাস উৎপাদনের হার অল্প। প্রতি একর জমিতে যুক্তরাষ্ট্রে ২০০ পাঃ, মিশরে ৪৫০ পাঃ এবং ভারতে মাত্র ৮৫ পাঃ কার্পাস উৎপাদিত হয়। আবার কার্পাস বুনিবার সময় যুক্তরাষ্ট্র বা মিশরীয় কার্পাস

অপেক্ষা ভারতীয় কার্পাস শতকরা ১০ ভাগের অধিক নষ্ট হয়। অবিভক্ত ভারত পৃথিবীর দ্বিতীয় কার্পাস রপ্তানীকারক দেশ ছিল। ভারত বিভক্ত হইবার ফলে ভারত হইতে কার্পাসের রপ্তানী বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। বর্তমানে ভারত পাকিস্তান, মিশর ও যুক্তরাষ্ট্র হইতে দীর্ঘ আঁশযুক্ত কার্পাস প্রচুর পরিমাণে আমদানী করিতেছে।

২১নং চিত্র—কার্পাস ও পাট উৎপাদক অঞ্চলসমূহ
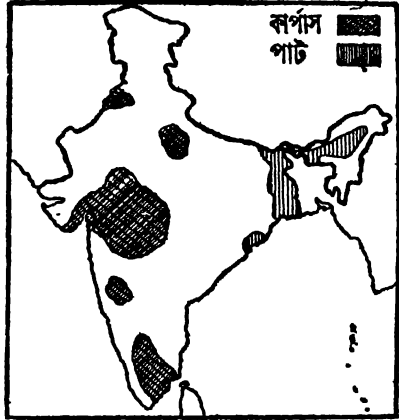
পাট—[চাষের অনুকূল অবস্থা—৯০ পৃঃ দেখ] পাট পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বহিরাবরণ তন্তু (bast fibre)।

উৎপাদক অঞ্চল—পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যে পাট উৎপাদিত হয়। বিহার প্রদেশে উৎপাদিত সমগ্র পাটের প্রায় ৯০% পুর্ণিয়া জেলা হইতে, উড়িষ্যার ৯২% পাট কটক জেলা হইতে এবং আসামের পাট ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা অঞ্চল হইতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি উঃ প্রদেশের অবহিমালয় সন্নিহিত অঞ্চলসমূহে পাট চাষ বৃদ্ধি করার চেষ্টা চলিতেছে।

উৎপাদন, আভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও বাণিজ্য (Production, Consumption & Trade)—১৯৫০-৫১, ১৯৫৫-৫৬, ১৯৬০-৬১ ও ১৯৬৪-৬৫ সালে ভারতে যথাক্রমে ৫,৭১, ৭,০৪, ৬,২৯ ও ৮,৪১ হাজার হেক্টার জমিতে ৩৩,০৯, ৪২,৩২, ৪১,৩৪ ও ৬০,৭৯ (অনুমিত) হাজার গাঁইট (প্রতি গাঁইটের ওজন ১৮০ কি. গ্রা.) পাট উৎপাদিত হয়। উহার মধ্যে পশ্চিম বঙ্গের উৎপাদনই সর্বাপেক্ষা অধিক।

অবিভক্ত ভারতে উৎপাদিত সমগ্র পাটের ৭৩·৪% পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলসমূহে এবং অবশিষ্ট মাত্র ২৬·৬% ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত হইত। ভারত বিভক্ত হইবার পর হইতেই বিভিন্ন রাজ্যে পাট চাষে নিযুক্ত জমির পরিমাণ এবং একর প্রতি উৎপাদনের হার বৃদ্ধি, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস ও পাটের উৎকর্ষ বৃদ্ধি সম্পর্কিত নানারূপ পরিকল্পনা অনুসৃত হইবার ফলে ভারতে পাটের চাষ ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তবে এখনও পর্যন্ত ভারত এ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হইয়া উঠে নাই। "দি সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়ান জুট কমিটি" পাট চাষের উৎকর্ষ সাধনে নিযুক্ত রহিয়াছে।

সম্প্রতি পৃথিবীর বাজারে পাটের ও পাটজাত দ্রব্যাদির দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় মিশর, ইরান, শ্যাম, ইন্দোচীন, জাপান, ফরমোজা, ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে এবং মেক্সিকোতে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে। আবার পাটের পরিবর্ত সামগ্রী হিসাবে আফ্রিকার কঙ্গোদেশে "ইউরিনা লোবাটা", জাভাতে "রোজেলা", মাঞ্চুকুয়োতে "কেনাফ", ফিলিপাইন অঞ্চলে "ম্যানিলা হেম্প" এবং ইন্দোচীনে "পলম্পনের" উৎপাদন দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে।

রেশম—ভারত একটি উল্লেখযোগ্য রেশম-উৎপাদক দেশ। প্রতিবৎসর প্রায় ৩০ লক্ষ পাঃ রেশম এদেশে উৎপাদিত হয়। ভারতে নিম্নলিখিত চারি শ্রেণীর রেশম দেখা যায়। (১) **গরদ**—তুঁত গাছে পালিত পোকা হইতে যে রেশম উৎপাদিত হয় তাহাকে গরদ বলে। মহীশূর, তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটোর জেলা, পশ্চিম বঙ্গ (মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, বীরভূম জেলা) ও কাশ্মীর অঞ্চলে প্রচুর গরদ উৎপাদিত হয়। ভারতে উৎপাদিত গরদের ৳ অংশ মহীশূর ও কোয়েম্বাটোর জেলা হইতে আসে। নিকৃষ্ট শ্রেণীর তুঁত রেশম হইতে **মটকা** প্রস্তুত হয়। (২) **তসর**—মহুয়া, কুসুম, কুল প্রভৃতি গাছের পাতা খাইয়া তসর পোকা বাঁচে এবং ঐ সকল গাছেই গুটি তৈয়ারী করে। ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও পশ্চিম বঙ্গ (বাঁকুড়া) অঞ্চলে তসর উৎপাদিত হয়। (৩) **এণ্ডি**—এরণ্ড গাছের পাতা খাইয়া এণ্ডির পোকা (ইরি পোকা) বাঁচিয়া থাকে এবং ঐ গাছেই গুটি তৈয়ারী করে। আসামের উপত্যকা অঞ্চলে প্রচুর এণ্ডি পাওয়া যায়। (৪) **মুগা**—জয়পত্র জাতীয় বৃক্ষের পাতা খাইয়া মুগা পোকা বাঁচিয়া থাকে এবং ঐ সমস্ত গাছে গুটি তৈয়ারী করে। আসাম, নীলগিরি পর্বত ও কাশ্মীর অঞ্চলে মুগা উৎপাদিত হয়। মুগা, এণ্ডি ও তসর ভারতের নিজস্ব সম্পদ। উহা অন্য কোন দেশে পাওয়া যায় না।

শণ—মধ্যম প্রকারের উত্তাপ ও বৃষ্টিযুক্ত অঞ্চলে শণ উৎপাদিত হয়। ভারতে আঁশ ও বীজের জন্য শণের চাষ হয়। ভারতে তিন শ্রেণীর শণ দেখিতে পাওয়া যায়। (১) মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্র এবং তামিলনাড়ুতে প্রচুর **শণ** উৎপাদিত হয়। ভারতে উৎপাদিত বিভিন্ন প্রকার শণের মধ্যে ইহাই উৎকৃষ্ট। (২) সিমলা, কাশ্মীর, কুমায়ুন, কাঙড়া প্রভৃতি স্থানে গাঁজা গাছের চাষ হয়। এই গাছের বহিরাবরণ হইতে **ভারতীয় শণ** প্রস্তুত হয়। তন্তু অপেক্ষা পাতা হইতে ভাঙ, গাঁজা ও চরস উৎপাদনের জন্যই ইহার চাষ অধিক হয়। (৩) ত্রিহুত, মহারাষ্ট্র ও দক্ষিণ ভারতের স্থানে স্থানে উৎপাদিত শিশল গাছের বহিরাবরণ হইতে **শিশল শণ** উৎপাদিত হয়। ভারতে শিশল শণের উৎপাদন অতি সামান্য। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানী ও বেলজিয়ামে ভারত হইতে শণ রপ্তানী করা হয়।

(৫) অপরাপর শিল্পফসল

(ক) **তৈলবীজ**—ভারতের তৈলবীজসমূহের মধ্যে বাদাম, এরণ্ড বা রেড়ী, তিসি বা মসিনা, সর্ষপ, তিল, নারিকেল ও কার্পাস বীজই প্রধান। তৈলবীজ উৎপাদন ও রপ্তানীতে ভারত পৃথিবীতে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। তবে দেশাভ্যন্তরে তৈলবীজের ব্যবহার বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক বাজারে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা ও যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা এবং ভারত হইতে রপ্তানীকৃত তৈলবীজের মূল্যবৃদ্ধি হেতু সম্প্রতি ভারত হইতে তৈলবীজ রপ্তানীর পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৫০ ৫১, ১৯৫৫ ৫৬, ১৯৬০ ৬১ ও ১৯৬৪ ৬৫ সালে ভারতে যথাক্রমে ১,০৭,২৭ , ১,২০,৮৫ , ১,৩৭,৫০ ও ১,৪৮,৪৯ হাজার হেক্টার জমিতে মোট ৫১,৫৮ , ৫৭,৩৬ , ৬৯,৮২ ও ৮৫,৮৪ (অনুমিত) হাজার টন তৈলবীজ (বাদাম, রেড়ী, তিল, সর্ষপ ও তিসি) উৎপাদিত হয়।

চীনাবাদাম (Groundnut)—ভারত চীনাবাদাম উৎপাদনে পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করে। রন্ধনকার্যে, বনস্পতি তৈল, কেশ তৈল ও সাবান প্রস্তুত করিতে চীনাবাদাম ব্যবহৃত হয়। তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, অন্ধ্র এবং মহীশূর অঞ্চলে ইহার উৎপাদন সর্বাপেক্ষা অধিক। বর্তমানে মধ্যপ্রদেশ ও ছোটনাগপুর অঞ্চলেও চীনাবাদামের চাষ হইতেছে। ১৯৫০-৫১, ১৯৫৫-৫৬, ১৯৬০-৬১ ও ১৯৬৪-৬৫ সালে ভারতে যথাক্রমে ৪৪,৯৪ , ৫১,৩৩ , ৬৪,৪৩ ও ৭০,৭২ হাজার হেক্টার জমিতে ৩৪,৮১ , ৩৮,৬২ , ৪৮,১২ ও ৬১,৭৬ (অনুমিত) হাজার টন চীনাবাদাম জন্মে। মাদ্রাজ ও বোম্বাই বন্দর হইতে প্রচুর চীনাবাদাম প্রতিবৎসরই ফ্রান্স, বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, জার্মানী, ইতালী এবং যুক্তরাজ্যে রপ্তানী হইয়া যায়।

এরণ্ড বা রেড়ী (Castor seed)—পৃথিবীতে মোট এরণ্ড বীজের ৮০%-ই ভারতে উৎপন্ন হয়। এরণ্ড তৈল হইতে ঔষধ, সাবান, কেশ তৈল, পিচ্ছিলকারক তৈল প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। তামিলনাড়ু, মহীশূর, মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশের যে সমস্ত অঞ্চলে ভুট্টার চাষ হয় সেই সমস্ত অঞ্চলেই প্রচুর এরণ্ড বীজ উৎপাদিত হয়। ১৯৫০-৫১, ১৯৫৫-৫৬, ১৯৬০-৬১ ও ১৯৬৪ ৬৫ সালে ভারতে যথাক্রমে ৫,৫৫ , ৫,৭৪ , ৪,৬৬ ও ৪,৪৯ হাজার হেক্টার জমিতে ১,০৩ , ১,২৫ , ১,০৭ ও ১,০১ (অনুমিত) হাজার টন রেড়ী বীজ জন্মে। মাদ্রাজ ও বোম্বাই বন্দর দিয়া রেড়ীর তৈল যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, বেলজিয়াম, ইতালী, জার্মানী এবং স্পেনে রপ্তানী হইয়া যায়।

তিসি বা মসিনা (Linseed)—তিসি বীজ উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। তিসির তৈল দ্বারা উৎকৃষ্ট রং, বার্নিশ ও "অয়েল ক্লথ" প্রস্তুত হয়। মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট,

পশ্চিমবঙ্গ, মহীশূর, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, পাঞ্জাব এবং রাজস্থান অঞ্চলে প্রচুর তিসি বীজ উৎপাদিত হয়। ১৯৫০-৫১, ১৯৫৫-৫৬, ১৯৬০-৬১ ও ১৯৬৪-৬৫ সালে ভারতে যথাক্রমে ১৪,০৩, ১৫,২৯, ১৭,৮৯ ও ২০,১১ হাজার হেক্টার জমিতে ৩,৬৭, ৪,২০, ৩,৯৮ ও ৪,৬৬ (অনুমিত) হাজার টন তিসি বীজের চাষ হয়। উৎপাদিত তিসি বীজের অধিকাংশই প্রধানতঃ বোম্বাই বন্দর দিয়া যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইতালী এবং হল্যাণ্ডে রপ্তানী হইয়া যায়। বর্তমানে তিসি বীজের আন্তর্জাতিক বাজারে আর্জেন্টিনা ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী।

সর্ষপ (**Rape & Mustard**)—সর্ষপ বা সরিষা দুই শ্রেণীর—লাল ও সাদা এদেশে সরিষার তৈল শরীরে মাখিতে, রন্ধন কার্যে এবং সাবান তৈয়ারীর জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রধানতঃ উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যা অঞ্চলে প্রচুর সরিষা উৎপাদিত হয়। ভারতে মোট উৎপাদিত সরিষার প্রায় অর্ধেকই উত্তরপ্রদেশ হইতে পাওয়া যায়। ১৯৫০-৫১, ১৯৫৫-৫৬, ১৯৬০-৬১ ও ১৯৬৪-৬৫ সালে ভারতে যথাক্রমে ২০,৭১, ২৫,৫৬, ২৮,৮৩ ও ২৮,১৪ হাজার হেক্টার জমিতে ৭,৬২, ৮,৬০, ১৩,৪৭ ও ১৩,৭৫ (অনুমিত) হাজার টন সরিষা উৎপাদিত হয়। যুক্তরাজ্য, ইতালী, বেলজিয়াম ও ফ্রান্সে প্রচুর সরিষা কলিকাতা বন্দর হইতে রপ্তানী হইয়া যায়। উত্তরপ্রদেশের কানপুর ও পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা সরিষার তৈল উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র।

২২ নং চিত্র—প্রধান প্রধান তৈলবীজ উৎপাদক অঞ্চলসমূহ

তিল (**Sesamum**)—ভারত তিল উৎপাদনে পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করে। ভারতের প্রায় সর্বত্রই তিলের চাষ দেখা যায় তবে উত্তরপ্রদেশেই সর্বাধিক। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ এবং অন্যান্য অঞ্চলেও প্রচুর তিল জন্মে। ১৯৫০-৫১, ১৯৫৫-৫৬, ১৯৬০-৬১, ও ১৯৬৪-৬৫ সালে ভারতে যথাক্রমে ২২,০৪, ২২,৯৩, ২১,৬৯ ও ২৫,০৩ হাজার হেক্টার জমিতে ৪,৪৫, ৪,৬৭, ৩,১৮ ও ৪,৬৬ (অনুমিত) হাজার টন তিলের চাষ হয়। ভারতে উৎপাদিত তিলের প্রায় ২৫% বোম্বাই বন্দর দিয়া যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানী, ইতালী, মিশর প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হইয়া যায়। রন্ধনকার্যে তিলের তৈল ব্যবহৃত হয়।

নারিকেল (Cocoanut)—উষ্ণ-মণ্ডলের সামুদ্রিক জলবায়ু প্রভাবিত অঞ্চলে নারিকেল জন্মে। পলি-মিশ্রিত বালি মাটি, উচ্চ তাপ ও প্রচুর বৃষ্টিপাত নারিকেল চাষের পক্ষে অনুকূল। সমুদ্র উপকূলেই ইহার চাষ ও উৎপাদন সর্বাপেক্ষা অধিক। তামিলনাড়ু (মালাবার), অন্ধ্র (পূর্ব গোদাবরী অঞ্চল), কেরালা (পশ্চিম উপকূল অঞ্চল), মহীশূর (ক্যানাড়া, তানকুর, হাসান, চিতল-দ্রুগ, ও কাডুর অঞ্চল), পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামে প্রচুর নারিকেল জন্মে। ১৯৫০-৫১, ১৯৫৫-৫৬, ও ১৯৬০-৬১ সালে ভারতে যথাক্রমে ৬,২২, ৬,৪৭ ও ৭,১৭ হাজার হেক্টার জমিতে ৩৫৮, ৪৩২ ও ৪৬৪ কোটি নারিকেল উৎপন্ন হয়।

রন্ধনকার্যে এবং সাবান, মোমবাতি, কেশ তৈল, খৈল ও সার, দড়ি, পাপোষ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে নারিকেলের শাঁস ও ছোবড়া ব্যবহৃত হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত সমগ্র নারিকেল তৈলের ⅔ অংশ ভারত হইতে রপ্তানী হয়। কালিকট, অ্যালেপ্পী, আর্নাকুলাম ও পন্দিচেরীতে নারিকেল তৈল প্রস্তুতের কারখানা রহিয়াছে। ভারত হইতে নারিকেলের শুষ্ক শাঁস, ছোবড়া, পাপোষ প্রভৃতি ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হয়। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে নারিকেলের এই শুষ্ক শাঁস হইতে মার্গারিন প্রস্তুত হয়। কোচিন নারিকেলজাত দ্রব্যাদি রপ্তানীর প্রধান বন্দর।

কার্পাস বীজ—মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর এবং তামিলনাড়ু অঞ্চলে প্রচুর কার্পাস বীজ পাওয়া যায়। এই বীজ হইতে নিষ্কাশিত তৈল রন্ধনকার্যে, ঔষধ প্রস্তুত করিতে এবং জলপাই তৈলের পরিবর্ত সামগ্রী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কার্পাস বীজের খৈল উৎকৃষ্ট পশুখাদ্য। বোম্বাই বন্দর হইতে অতি সামান্য পরিমাণে কার্পাস বীজ বিদেশে রপ্তানী হয়।

(খ) **রবার**—[চাষের অনুকূল অবস্থা—২৬ পৃঃ দেখ] ভারতের করোমণ্ডল উপকূলে রবার চাষের সমস্ত অনুকূল অবস্থাই বিদ্যমান। এই অঞ্চলে মে হইতে নভেম্বর মাসের মধ্যে ১৫০' বৃষ্টিপাত, বৎসরের মধ্যে প্রায় অধিকাংশ সময় ৭০° হইতে ৮০° ফাঃ পর্যন্ত উত্তাপ এবং যানবাহনের সুব্যবস্থা থাকায় তামিলনাড়ুর দক্ষিণাংশ, কেরালা ও মহীশূর রাজ্যে রবার উৎপাদিত হয়। ১৯৫০-৫১, ১৯৫৫-৫৬, ১৯৬০-৬১, ১৯৬১-৬২ সালে ভারতে যথাক্রমে ১·৪, ১·৭, ৩·২ ও ৩·৫ লক্ষ একর জমিতে ৩২০, ৫০০, ৫৬০ ও ৬০০ লক্ষ পাঃ রবার উৎপাদিত হয়। ইহা সমগ্র পৃথিবীতে উৎপাদিত রবারের মাত্র ১%। রবার উৎপাদনে ভারত প্রায় আত্মনির্ভরশীল। "ভারতীয় রবার বোর্ড" (১৯৪৭) দেশাভ্যন্তরে রবার উৎপাদন ও বাণিজ্য সম্পর্কে নানাবিধ গবেষণায় ব্যাপৃত রহিয়াছে।

প্রশ্নোত্তর

1. Explain how agriculture is controlled by environmental factors. (কৃষির উপর পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর।) (পৃঃ ৬৫-৬৬)

2. Discuss the importance of irrigation in India. What geographical advantages does India possess for the development of irrigation works ? Explain the different systems of irrigation practised in the country. (ভারতে জলসেচ-ব্যবস্থার প্রবর্তনে কি কি ভৌগোলিক সুবিধা রহিয়াছে ? ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে বিভিন্ন প্রকারের জলসেচ-পদ্ধতি অনুসৃত হয় তাহার বর্ণনা কর।) (পৃঃ ৭০-৭৩)

3. What geographical and other conditions are necessary for the production of (a) wheat (P.U. '62 ; U E. '65), and (b) Rice (N.B.U. '63 , P.U. '67 ; H. S. '61, H.S. (c) '65) ? Give a brief account of their world distribution and internationa trade. (কিরূপ ভৌগোলিক ও অন্যান্য অনুকূল অবস্থায় (ক) গম, এবং (খ) ধান উৎপাদিত হয় ? উহাদের উৎপাদক অঞ্চল ও ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখ।) [(ক) গম পৃঃ ৭৬-৮০ ও (খ) ধান পৃঃ ৮০-৮২]

4. What physical and other conditions are necessary for the production of (a) Tea (U. E. '63 '65, P. U. '62, H. S. '64) and (b) Coffee (U. E. '65, P. U. '62, H. S. '63) ? State their areas of production and the nature of the world trade. (ক) চা এবং (খ) কফি উৎপাদনের জন্য কিরূপ প্রাকৃতিক ও অন্যান্য অবস্থার প্রয়োজন ? উহাদের উৎপাদক অঞ্চল ও বাণিজ্য সম্পর্কে লিখ] । [(ক) চা পৃঃ ৮১-৮৪, ও (খ) কফি পৃঃ ৮৪-৮৫]

5. State the geographical factors necessary for the production of (a) Sugar cane (U. E. '63, '66, H. S. (c) '65) and (b) Sugar beet (C. U. '49,'56). Name the principal countiies in which these are produced and state the world trade in each of these commodities. ((ক) ইক্ষু ও (খ) বীট উৎপাদনের অনুকূল অবস্থাগুলি লিখ। উহাদের উৎপাদক অঞ্চল ও বাণিজ্য সম্পর্কে লিখ।) ((ক) ইক্ষু পৃঃ ৮৫-৮৬, (খ) বীট পৃঃ ৮৬-৮৭)

6. Describe the conditions suitable for the cultivation of cotton. Name the principal producers of cotton and indicate the nature of world trade in cotton. (P. U. '65, U. E. '66, H. S. '61) (কার্পাস উৎপাদনের অনুকূল অবস্থাগুলি লিখ। উহার প্রধান প্রধান উৎপাদকের নাম লিখ এবং কার্পাসের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রকৃতি নির্দেশ কর।) (পৃঃ ৮৮-৯০)

7. Describe the conditions suitable for the production of Jute. Name the chief producers, exporters and importers of Jute. (P.U. '66, H.S. '64) (পাট চাষের অনুকূল অবস্থা বর্ণনা কর। পাটের প্রধান প্রধান উৎপাদক, আমদানী ও রপ্তানী কারক দেশগুলির নাম লিখ।) (পৃঃ ৯০-৯১)

8. Describe the conditions and areas of production of mulberry silk. (রেশম উৎপাদনের অনুকূল অবস্থার বর্ণনা কর এবং উৎপাদক অঞ্চলগুলি নিদেশ কর।) (পৃঃ ৯২-৯৩)

9. Indicate the conditions of growth and the areas of production of rubber. Indicate the nature of world trade in rubber. (P.U.''63, '65, U. E. '63) (রবার চাষের অনুকূল অবস্থা এবং রবার উৎপাদক অঞ্চলগুলি নির্দেশ কর। রবারের বাহির্বাণিজ্যের প্রকৃতি নির্দেশ কর।) (পৃঃ ৯৫, ৯৭)

10. What are the conditions favourable for the cultivation of

(a) wheat (P. U. ' 62), (b) rice (N. B. U. '63, P. U. '65, ' 67), (c) tea (U. E '65, P. U. '63), (d) cofee (U. E. '65. P. U. 62). (e) jute (P. U. ' 66 and (f) rubbers (P. U. ' 63) ?
Mention the regions in India where they are grown.

(ক) গম, (খ) ধান, (গ) চা, (ঘ) কফি, (ঙ) পাট, এবং (চ) রবার উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা গুলি লিখ। ভারতের যে সকল অঞ্চলে ঐ ফসলগুলি উৎপাদিত হয় তাহাদের উল্লেখ কর)
(পৃঃ ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০৩, ১০৭)

11. Name the principal oilseeds of India describing the areas where they are grown and the uses to which they are put. (ভারতের প্রধান প্রধান তৈলবীজসমূহের নাম লিখ এবং উহাদের আঞ্চলিক বণ্টন ও ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা কর।)
(পৃঃ ১০৪-১০৭)

12 Give an account of the cultivation of the principal plantation crops of Indi . (ভারতের প্রধান প্রধান আবাদী ফসল সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিখ।) (ইক্ষু, পাট, চা, কফি ও রবার সম্পর্কে লিখ। পৃঃ ১০১-১০২, ১০৩-১০৪, ৯৯-১০০, ১০০-১০১ ও ১০৭)

13. What are the principal bast fibres? Describe their uses and conditions of cultivation. (H. S. ,63) (প্রধান প্রধান বহিরাবরণ তন্তুগুলির নাম কর। উহাদের ব্যবহার ও উৎপাদনের অনুকূল অবস্থাসমূহের উল্লেখ কর।) [পৃঃ ৯০-৯১]

পঞ্চম অধ্যায়

পশুচারণ শিল্প

(Pastoral Industries)

পশুচারণ (Pastoralism)—পশুচারণ মানুষের আর্থিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আদিম অবস্থায় মানুষ অরণ্য হইতে ফলমূল সংগ্রহ করিয়া এবং বন্য পশুপক্ষী শিকার করিয়াই জীবিকা নির্বাহ করিত। পরবর্তী কালে মানুষ যখন জীবজন্তুকে পোষ মানাইয়া উহাদিগকে নিজ কাযে নিযুক্ত করিতে শিখিল, তখন হইতেই মানব সভ্যতার এক নূতন যুগের সূচনা হইল। বহু প্রাণী মানুষের **ভার বহনের** কাযে নিযুক্ত হইল, আবার বহু প্রাণী হইতে মানুষ মাংস ও দুগ্ধ প্রভৃতি **খাদ্য ও পানীয়** এবং চর্ম, চর্বি, অস্থি পশম প্রভৃতি **অত্যাবশ্যক দ্রব্য** আহরণ করিতে শিখিল।

যাযাবর অবস্থায় মানুষ জীবিকার উদ্দেশ্যে পশুপালন (primitive pastoralism) করিত। তবে বর্তমান কালে সভ্য মানুষ প্রধানতঃ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেই পশুপালন (commercial pastoralism) করিয়া থাকে। বাণিজ্য বা জীবিকা যে উদ্দেশ্যেই হউক না কেন পশুচারণের জন্য তৃণাচ্ছাদিত উন্মুক্ত প্রান্তরের প্রয়োজন। তাই পৃথিবীর সমতল ও জনবিরল তৃণক্ষেত্রসমূহেই পশুপালন ব্যবসায় লাভজনক।

গৃহপালিত পশুর মধ্যে গবাদি পশু, মেষ, ছাগ ও শূকরই প্রধান।

গবাদি পশু (Cattle)

ক্রান্তীয় ও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের জনবিরল ও সমৃদ্ধ তৃণভূমিসমূহে গবাদি পশু পালিত হইয়া থাকে। উত্তর আমেরিকার 'প্রেয়রী' অঞ্চল, দক্ষিণ আমেরিকার 'পম্পা', ইউরেশিয়ার 'স্তেপ' এবং অস্ট্রেলিয়ার 'ডাউন্স' অঞ্চল গোপালনের জন্য বিখ্যাত। ভারতে গবাদি পশুর সংখ্যা পৃথিবীর যে কোন দেশ হইতে অধিক। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, প্যারাগুয়ে, রুশিয়া, যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্রেও প্রচুর গবাদি পশু পালিত হইয়া থাকে।

মুখ্যতঃ মাংস ও দুগ্ধের জন্য ও গৌণতঃ ক্ষুর, চর্ম প্রভৃতি দ্রব্যাদির জন্য গবাদি পশু পালিত হইয়া থাকে। তবে মাংসপ্রদায়ী গবাদি পশু দুগ্ধপ্রদায়ী গবাদি পশু হইতে পৃথক।

মাংসপ্রদায়ী গবাদি পশুপালন (**Rearing of beef cattle**)— উৎকৃষ্ট মাংসপ্রদায়ী গবাদি পশু আকারে বৃহৎ ও মেদবহুল। ইহাদের

পালনের জন্য উন্মুক্ত ও বিস্তৃত তৃণভূমির প্রয়োজন। আনুমানিক দুই মণ মাংস পাইতে হইলে একটি গরুকে প্রতিদিন দুই হইতে পাঁচ সের পর্যন্ত পশুখাদ্য অন্ততঃ পক্ষে দুই বৎসর কাল যাবৎ খাওয়াইতে হয়। এই কারণে নিবিড় বসতিযুক্ত অঞ্চলসমূহে মাংসপ্রদায়ী গবাদি পশুর সংখ্যা অল্প।

গোমাংস (Beef)—ইউরোপীয় দেশসমূহে (স্পেন, পর্তুগাল, ইতালী, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, মধ্য ইউরোপের দেশসমূহ ও রুশিয়া) অতি উচ্চ শ্রেণীর মাংসপ্রদায়ী গবাদি পশু পালিত হইলেও গোমাংস উৎপাদনে এই সমস্ত দেশ স্বাবলম্বী নহে। এই কারণে এই দেশগুলি আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইবার জন্য বিদেশ হইতে প্রচুর **হিমায়িত গোমাংস** আমদানী করিয়া থাকে। **দক্ষিণ আমেরিকার** নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চলের অন্তর্গত আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে ও উরুগুয়ে রাজ্যে প্রচুর মাংসপ্রদায়ী গবাদি পশু পালিত হয়। গোমাংস রপ্তানীতে আর্জেন্টিনা সর্বাগ্রগণ্য। **উত্তর আমেরিকার** প্রেয়রী তৃণভূমির পশ্চিমাংশে গবাদি পশু পালিত হয় এবং উহাদিগকে চিকাগোর বধ্যাগারে পাঠাইবার পূর্বে মেদবৃদ্ধির জন্য কিছুকাল যাবৎ সেখানকার ভুট্টাবলয়ে চরান হয়। ভুট্টাবলয়ের পশ্চিমে, চিকাগো সন্নিহিত অঞ্চলসমূহেও মাংসপ্রদায়ী গবাদি পশু পালিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের চিকাগোতেই পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মাংস রপ্তানীর কেন্দ্রসমূহ গড়িয়া উঠিয়াছে। উত্তর **অস্ট্রেলিয়া** এবং কুইন্সল্যাণ্ডের ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় তৃণভূমি অঞ্চলসমূহেও মাংসপ্রদায়ী গবাদি পশু পালিত হইয়া থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভারতে গবাদি পশুর সংখ্যা সর্বাধিক হইলেও ধর্মীয় বাধানিষেধের দরুণ এদেশে গোমাংসের ব্যবসায় তাদৃশ প্রসার লাভ করে নাই। **রুশিয়া, পাকিস্তান** প্রভৃতি দেশেও গোমাংস উৎপন্ন হয়।

গোমাংসের বাণিজ্য (Trade in beef)—হিমায়িত গোমাংস রপ্তানীতে আর্জেন্টিনা পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। উরুগুয়ে, ব্রাজিল, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ড অন্যান্য **রপ্তানীকারক** দেশ। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানী, বেলজিয়াম এবং দক্ষিণ ইউরোপের দেশসমূহ প্রধান প্রধান **আমদানীকারক** দেশ।

দুগ্ধপ্রদায়ী গবাদি পশুপালন (Rearing of dairy cattle)—দুগ্ধপ্রদায়ী গবাদি পশু পালনের জন্য মৃদুশীত, মৃদুগ্রীষ্ম এবং আর্দ্র তৃণাঞ্চলই উপযুক্ত স্থান। দুগ্ধের পরিমাণ-বৃদ্ধির জন্য কোমল সতেজ তৃণই সর্বোৎকৃষ্ট। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের আর্দ্র জলবায়ু সেবিত অঞ্চলসমূহে এই শ্রেণীর তৃণ ও অন্যান্য পশুখাদ্য প্রচুর জন্মে বলিয়া ঐ সমস্ত অঞ্চলেই দুগ্ধপ্রদায়ী গবাদি পশুর পালন অধিক।

ডেয়ারী শিল্প (Dairy farming)—বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ডেয়ারী শিল্প দ্রুত উন্নতিলাভ করিয়াছে। এই শিল্পের গঠন ও প্রসারের জন্য নিম্নলিখিত প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাসমূহ বিশেষ অনুকূল :—(১) দীর্ঘ ও পরিমিত বৃষ্টিযুক্ত গ্রীষ্মকাল। এই অবস্থায় চারণক্ষেত্রে পুষ্টিকর তৃণের প্রাচুর্য দেখা যায়। (২) গ্রীষ্মকালীন উত্তাপ অপেক্ষাকৃত শীতল হওয়া প্রয়োজন, কারণ এইরূপ আবহাওয়ায় গবাদি পশুর দুগ্ধ উৎপাদনের হার অধিক এবং দুগ্ধের সংরক্ষণও সহজসাধ্য হয়। (৩) মৃদু শীতকাল। ইহাতে গবাদি পশু সারা বৎসরই উন্মুক্ত তৃণক্ষেত্রে চরিয়া বেড়াইতে পারে। (৪) ভূ-প্রকৃতি বন্ধুর হইলে সাধারণ কৃষিকার্য ব্যাহত হয় এবং এই কারণে অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশযুক্ত পার্বত্য অঞ্চল ডেয়ারী শিল্প গঠনে অনুপ্রেরণা যোগায়। (৫) তৃণ ও অন্যান্য পশুখাদ্য উৎপাদনের নিমিত্ত গভীর ও আর্দ্র দো-আঁশ মাটিই বিশেষ অনুকূল। (৬) দুগ্ধ দ্রুত পচনশীল বলিয়া বিভিন্ন বিক্রয়কেন্দ্রে দ্রুত প্রেরণের জন্য উন্নত ধরণের যানবাহন-ব্যবস্থা এই শিল্পের উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য। (৭) এই শিল্পে প্রচুর সুলভ শ্রমিকের প্রয়োজন। এই কারণে অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশযুক্ত ঘন লোকবসতিপূর্ণ অঞ্চলেই এই ব্যবসায় দ্রুত প্রসার লাভ করে। (৮) জনবহুল ও শিল্পসমৃদ্ধ ভোগকেন্দ্রের নৈকট্য এই শিল্প-গঠনের অনুপ্রেরক।

ডেয়ারী পশু (Dairy animals)—ডেয়ারী শিল্পে দুগ্ধ উৎপাদনের নিমিত্ত যে সমস্ত পশু সর্বাধিক ব্যবহৃত হয় তাহাদের মধ্যে গরু, মহিষ, ছাগল ও মেষই প্রধান। বিভিন্ন ডেয়ারী দ্রব্যের মধ্যে **দুগ্ধ, মাখন** ও **পনীর** বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য ডেয়ারী কেন্দ্রসমূহ (**Principal dairy regions of the world**)—পৃথিবীতে তিনটি উল্লেখযোগ্য ডেয়ারী অঞ্চল রহিয়াছে—

(ক) **উত্তর-পশ্চিম ইউরোপীয় অঞ্চল**—এই সকল অঞ্চল ডেয়ারী শিল্পে পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা উন্নত। সমৃদ্ধ শিল্পকেন্দ্রের নৈকট্য, ঘন লোকবসতি, অধিক বালিযুক্ত দো-আঁশ মাটি, নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, বন্ধুর ভূপ্রকৃতি এবং সাধারণ কৃষিকার্যের অপরিণত অবস্থা এই অঞ্চলে ডেয়ারী শিল্প সংগঠনে বিশেষ অনুপ্রেরণা দিয়া থাকে। ফ্রান্সের পশ্চিমাঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর ইউরোপের সমভূমি অঞ্চলের মধ্য দিয়া ডেনমার্ক, সুইডেন ও রুশিয়ার উত্তরাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে এই শিল্পের প্রসার ব্যাপক। এই অঞ্চলের অন্তর্গত ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, সুইডেন, আয়ার্ল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, ইতালী, জার্মানী, রুশিয়া ও ফিনল্যাণ্ড এই শিল্পে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। এই অঞ্চল ঘনীভূত ও শুষ্ক দুগ্ধ উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য অর্জন

করিয়াছে। (খ) **দক্ষিণ-পূর্ব ক্যানাডা ও উত্তর-পূর্ব যুক্তরাষ্ট্র অঞ্চল**—যুক্তরাষ্ট্রের পটোম্যাক ও ওহিও নদীর উত্তরে এবং মিশৌরী নদীর পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত রাষ্ট্রসমূহ এবং ক্যানাডার হ্রদ অঞ্চলের পূর্বদিকে অবস্থিত প্রদেশসমূহ ইহার অন্তর্গত। এই অঞ্চলের গ্রীষ্মকালীন মৃদু উত্তাপ (৬৭°-৭৩° ফাঃ), পরিমিত বৃষ্টিপাত (২২"-৫০"), বন্ধুর ভূপ্রকৃতি, ঘন লোকবসতি, উন্নত যানবাহনের ব্যবস্থা ও সরকারের সহযোগিতা এই শিল্পের প্রসারের কারণ। এই অঞ্চল **পনীর** উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে। (গ) **অস্ট্রেলিয়া**—পূর্ব অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজীল্যাণ্ড এই অঞ্চলের অন্তর্গত। আর্দ্র ও মৃদু জলবায়ু, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সহিত সমুদ্রপথে যোগাযোগ ও সরকারের তত্ত্বাবধান হেতু এই দুইটি স্থানই ডেয়ারী শিল্পে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই অঞ্চল **মাখন** উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে। নিউজীল্যাণ্ড পনীর রপ্তানীতে পৃথিবীতে প্রথম এবং মাখন রপ্তানীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। অস্ট্রেলিয়া হইতে মাখন, পনীর ও ঘনীভূত দুগ্ধ বিদেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হয়।
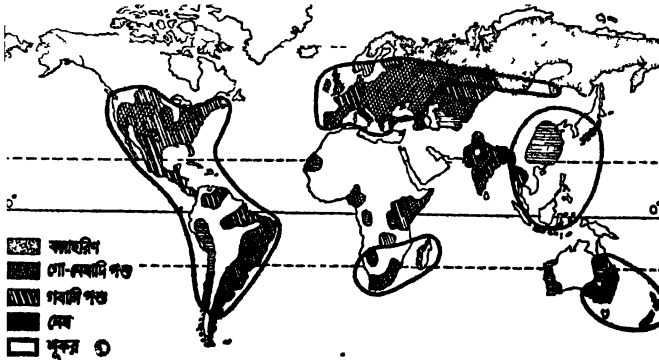
২৩ নং চিত্র—পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে পালিত পশু

উপরোক্ত প্রধান প্রধান অঞ্চলসমূহ ব্যতীতও আর্জেন্টিনায়, চিলির অপেক্ষাকৃত শীতল ও আর্দ্র অঞ্চলসমূহে, দক্ষিণ আফ্রিকার পার্বত্য অঞ্চলসমূহে, চীন, জাপান এবং ভারতেও বর্তমানে এই শিল্পের প্রসার পরিলক্ষিত হইতেছে।

ডেয়ারী দ্রব্যের বাণিজ্য (**Trade in dairy articles**)—ডেনমার্ক, অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, রুশিয়া, আয়র্ল্যাণ্ড, সুইডেন, আর্জেন্টিনা, এবং বাল্টিক রাজ্যসমূহ প্রধান মাখন রপ্তানীকারক এবং যুক্তরাজ্য, জার্মানী,

বেলজিয়াম এবং ফ্রান্স প্রধান আমদানীকারক দেশ। নিউজীল্যাণ্ড, নেদারল্যাণ্ড, ক্যানাডা, ইতালী, সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ডেনমার্ক এবং অস্ট্রেলিয়া প্রধান **পনীর** রপ্তানীকারক এবং যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়াম এবং আলজেরিয়া প্রধান আমদানীকারক দেশ। নেদারল্যাণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যাণ্ড, ক্যানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, নরওয়ে, অস্ট্রেলিয়া, আয়র্ল্যাণ্ড এবং নিউজীল্যাণ্ড প্রধান **দুগ্ধ** রপ্তানীকারক এবং যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, কিউবা, পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, সুইজারল্যাণ্ড, ফিলিপাইন, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং জাপান প্রধান আমদানীকারক দেশ

মেষ (Sheep)

মুখ্যতঃ মাংস ও পশমের জন্য এবং গৌণতঃ দুগ্ধের জন্য মেষ পালিত হয়। অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা, যুক্তরাষ্ট্র, রুশিয়া, এশিয়া মাইনর, দক্ষিণ আফ্রিকা, যুক্তরাজ্য, উরুগুয়ে এবং নিউজীল্যাণ্ডের তৃণভূমিতে অসংখ্য মেষ পালিত হয়। মেষ পালনের জন্য উষ্ণ আবহাওয়া, ১০"-৩০ পর্যন্ত বৃষ্টিপাত, বন্ধুর ভূপ্রকৃতি এবং অনুর্বর ভূখণ্ডই আদর্শস্থানীয়। পশমপ্রদায়ী মেষ সাধারণতঃ মাংসপ্রদায়ী মেষ হইতে পৃথক।

মাংসপ্রদায়ী মেষপালন (Rearing of mutton sheep)—মাংসের জন্য মেষ পালন করিতে হইলে তৃণসমৃদ্ধ চারণভূমির প্রয়োজন হয়। মাংস-প্রদায়ী মেষ সাধারণতঃ মেদবহুল হইয়া থাকে এবং ব্রিটেন ও নিউজীল্যাণ্ডের ন্যায় নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলেই পালিত হয়।

মেষ-মাংস (Mutton)—অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, উরুগুয়ে, চিলি, আর্জেন্টিনা, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশে প্রচুর মেষ মাংস উৎপন্ন হয়। মেষ শাবক ও মেষ মাংসের রপ্তানীতে নিউজীল্যাণ্ড পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে ও চিলি একত্রে দ্বিতীয় স্থান এবং অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় স্থান অধিকার করে। ব্রিটেন মেষ মাংস ও মেষ শাবকের প্রধান আমদানীকারক দেশ।

পশমপ্রদায়ী মেষপালন (Rearing of wool sheep)—পশম মেষলোম হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। রুক্ষ ও শীতল জলবায়ুর মধ্যে প্রতিপালিত মেষ হইতেই উৎকৃষ্ট পশম পাওয়া যায়। তবে অতিরিক্ত শীতল আবহাওয়া পশমপ্রদায়ী মেষপালনের পক্ষে অনুকূল নহে। দক্ষিণ গোলার্ধের নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমিসমূহ পশমপ্রদায়ী মেষপালনের বিশেষ উপযোগী; কিন্তু উত্তর গোলার্ধের অনুরূপ তৃণভূমিতে শীতকালে শৈত্য অধিক হওয়ায় উহা পশমপ্রদায়ী মেষপালনের বিশেষ অনুকূল নহে। পশমপ্রদায়ী মেষ পালনের জন্য সামান্য তৃণই যথেষ্ট। ৩০"-৪০" বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলসমূহে

সুসমৃদ্ধ তৃণক্ষেত্র দৃষ্ট হয় সত্য তবে ঐ সমস্ত তৃণভূমি পশমপ্রদায়ী মেষপালনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নহে। কারণ বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা হেতু পশমের অপকর্ষ ঘটে। আবার যে সমস্ত অঞ্চলে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১০"-র অনধিক তথায় পশমের উৎকর্ষ ঘটিলেও তৃণের অপ্রাচুর্য হেতু মেষকুলের সংখ্যাহ্রাস ঘটায় মেষ পালনের অনুপযোগী। অস্ট্রেলিয়ার বহু মেষচারণক্ষেত্রে বৃষ্টিপাত অত্যল্প হওয়ায় প্রতি বৎসরই আর্দ্র জলবায়ুসেবিত টাসমানিয়া দ্বীপ হইতে বলশালী মেষ আমদানী করিয়া মেষকুলের সংখ্যা ঠিক রাখিতে হয়।

মেষ-পশমের শ্রেণীবিভাগ (Classification of wool)—সূক্ষ্মতা, মসৃণতা এবং ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য অনুসারে মেষ-পশম সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে : (১) মেরিনো মেষ হইতে পাওয়া পশম সর্বোৎকৃষ্ট। দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে মেরিনো পশমেব উৎপাদন সর্বাধিক। (২) মিশ্রণজাত মেষ হইতে মাংস ও পশম উভয়ই পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর পশম দীর্ঘ-আঁশযুক্ত এবং অপেক্ষাকৃত স্থূল। ইংলণ্ড, দক্ষিণ আমেরিকা, নিউজীল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ায় এই শ্রেণীর পশম উৎপন্ন হয়। (৩) অত্যন্ত কর্কশ, স্থূল ও খর্বাকৃতি আঁশযুক্ত আর একপ্রকার পশম দক্ষিণ রুশিয়া, এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকায় পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা প্রধানতঃ গালিচা প্রস্তুত হয়।

বাণিজ্যিক পশমের উৎপাদন (Production of commercial wool)—বাণিজ্যে ব্যবহৃত পশমের উৎপাদনের জন্য প্রথমে পশমপ্রদায়ী মেষের গাত্র হইতে পশম কাটা (shearing) হয়। এই পশম চর্বিযুক্ত ও অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন থাকে। কখনও কখনও এই পশমকে অ্যামোনিয়া-মিশ্রিত জলে ধুইয়া (scouring) চর্বিবর্জিত করা হয়। পশম শোধনের ফলে উহা হইতে যে চর্বি পাওয়া যায় তাহা দিয়া অন্যান্য উপকরণ-সংযোগে সাবান, কেশ-তৈল প্রভৃতিও প্রস্তুত করা হয়। চর্বিবর্জিত পশমকে চিরুণী দিয়া আঁচড়াইলে (combing) অপেক্ষাকৃত ছোট আঁশের পশম (noils) থাকিয়া যায়। পরে এই আঁশের সাহায্যে পশমবস্ত্রের বয়ন (weaving) করা হয়।

মেষ পশম উৎপাদক অঞ্চল (Principal wool producing regions)—মেষ পশম উৎপাদক অঞ্চলসমূহকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় :—

(ক) উত্তর গোলার্ধের অপেক্ষাকৃত অনুর্বর ভূখণ্ডসমূহ—

ইউরোপ—স্পেন, ব্রিটেন ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহ প্রচুর পশম উৎপাদন করে। তবে উৎপাদিত পশমের পরিমাণ স্থানীয় চাহিদা মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে বলিয়া এই সমস্ত দেশ অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজীল্যাণ্ড হইতে পশম আমদানী করিয়া থাকে।

উত্তর আমেরিকা—ক্যানাডার লরেন্সীয় নিম্নভূমিতে ও সমুদ্রসেবিত অঞ্চলসমূহে পশমপ্রদায়ী মেষ পালিত হয়। **যুক্তরাষ্ট্র** পশমপ্রদায়ী মেষ পালনে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। পশ্চিমের শুষ্ক পার্বত্য অঞ্চলেই মেষ পালিত হইয়া থাকে। অস্ট্রেলিয়া, পশ্চিম এশিয়া, আর্জেন্টিনা ও নিউজীল্যাণ্ড হইতে যুক্তরাষ্ট্র অধিকাংশ পশম আমদানী করিয়া থাকে।

এশিয়া—এশিয়া মাইনর, ভারত ও চীনেও পশম উৎপন্ন হয়। তবে ভারত ও চীনের পশম নিকৃষ্ট শ্রেণীর।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের পশম উৎপাদনও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(খ) দক্ষিণ গোলার্ধের জনবিরল অঞ্চলসমূহ—

অস্ট্রেলিয়া—পশমপ্রদায়ী মেষ পালন **অস্ট্রেলিয়ার** একটি বহুবিস্তৃত ব্যবসা। গ্রেট ডিভাইডিং পর্বতমালার পশ্চিমাংশে অবস্থিত কুইন্সল্যাণ্ড-রাজ্যের মধ্যভাগ হইতে দক্ষিণে মারে নদীর অববাহিকা পর্যন্ত বিস্তৃত শুষ্ক অংশে এবং পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার অপেক্ষাকৃত শুষ্ক তৃণভূমি অঞ্চলে পশমের জন্য প্রধানতঃ মেরিনো মেষ এবং এই সমস্ত অংশের অন্তর্গত অপেক্ষাকৃত বৃষ্টিবহুল স্থানে মাংস ও পশমপ্রদায়ী মিশ্রণজাত মেষ পালিত হয়। পশম উৎপাদন ও রপ্তানীতে অস্ট্রেলিয়া পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। সিডনী ও মেলবোর্ন অস্ট্রেলিয়ার পশম ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র। অস্ট্রেলিয়ার পশমের প্রায় অর্ধেকাংশ যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী হইয়া যায়। ফ্রান্স, বেলজিয়াম, যুক্তরাষ্ট্র, ইতালী ও জাপান অস্ট্রেলীয় পশমের অন্যান্য প্রধান প্রধান আমদানীকারক দেশ।

নিউজীল্যাণ্ডের দক্ষিণ দ্বীপের পূর্বভাগের অপেক্ষাকৃত শুষ্ক ক্যাণ্টারবেরী সমভূমি ও তৎসন্নিহিত তৃণভূমি অঞ্চলসমূহেই পশমপ্রদায়ী মেষ পালিত হয় এবং এই দেশ হইতে প্রচুর পশম রপ্তানী হইয়া যায়। মৃদু জলবায়ু, বিস্তীর্ণ তৃণভূমি, হিমায়ন-যন্ত্র ও চারণ শিল্পোদ্ভব উপজাত দ্রব্য-সমূহের ব্যাপক ব্যবহার হেতু নিউজীল্যাণ্ডের মেষ পালন-শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে।

দক্ষিণ আমেরিকা—আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে ও চিলিতে পশম পাওয়া যায়। এতদঞ্চলের পশম উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নহে। এই পশম সাধারণতঃ মহাদেশীয় ইউরোপের বিভিন্ন অংশে রপ্তানী হইয়া যায়।

দক্ষিণ আফ্রিকা—দক্ষিণ আফ্রিকার ২০″-৪০′ বৃষ্টিপাতযুক্ত 'ভেল্ড' তৃণাঞ্চলেই মেষ পালিত হয়। পশম রপ্তানীকারক হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকার স্থান অস্ট্রেলিয়া ও আর্জেন্টিনার পরেই।

বাণিজ্য (Trade)—রপ্তানীর ক্ষেত্রে পৃথিবীর ৮০% পশম আসে দঃ গোলার্ধ হইতে। অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, আর্জেন্টিনা, নিউজীল্যাণ্ড এবং উরুগুয়ে পৃথিবীর প্রধান প্রধান মেষ-পশম **রপ্তানীকারক** দেশ। পৃথিবীর মোট

পশম রপ্তানীর ৭৫% আমদানী করে উঃ পঃ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ। গ্রেট ব্রিটেন মেষ-পশম আমদানীতে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। জার্মানী, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়াম, ইতালী এবং রুশিয়া উল্লেখযোগ্য পরিমাণে মেষ-পশম **আমদানী** করে। অস্ট্রেলিয়ার সিডনী বন্দর পৃথিবীর মেষ-পশম রপ্তানীর প্রধান বন্দর

শূকর (Pigs)

শূকর নানাপ্রকার জলবায়ুতে প্রতিপালিত হয়। তবে ওক ও বীচ গাছের ফল খাইয়া শূকর জীবন ধারণ করে বলিয়া ওক ও বীচের নিবিড় অরণ্যযুক্ত অঞ্চলেই শূকর অধিক। প্রধানতঃ মাংস, চর্বি ও কুঁচি উৎপাদনের জন্য শূকর পালিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ভুট্টা-বলয়ে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ শূকর চারণ ক্ষেত্র অবস্থিত। পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের দেশসমূহ, আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিলেও প্রচুর শূকর পালিত হয়। তবে পালিত শূকরের সংখ্যার দিক হইতে চীন দেশই সর্বাগ্রগণ্য।

যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, উত্তর পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের দেশসমূহে প্রচুর **শূকরমাংস** (pork, bacon, ham) উৎপন্ন হয়। শূকরমাংস রপ্তানীতে যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে প্রথম। ডেনমার্ক, ক্যানাডা, আয়র্ল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড ও আর্জেন্টিনা অন্যান্য **রপ্তানীকারক** দেশ। **আমদানীকারক** দেশ-সমূহের মধ্যে যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ফ্রান্স ও কিউবা প্রধান।

শূকরের চর্বি (lard) রপ্তানীতেও যুক্তরাষ্ট্রের স্থান প্রথম। শূকরের কুঁচি (bristles) নানা কার্যে ব্যবহৃত হয়।

ভারতের পশুচারণ শিল্প

পালিত পশু (Livestock)—ভারতের গৃহপালিত পশুর মধ্যে গবাদি পশু, ছাগ ও মেষ উল্লেখযোগ্য। **গবাদি পশুর** সংখ্যার দিক হইতে ১৯৫৬ সালের আদমসুমারী অনুসারে (১৫·৯ কোটি গরু—পৃথিবীর ১৯% এবং ৪·৫ কোটি মহিষ—পৃথিবীর ৫০%) ভারত পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, উত্তর প্রদেশ, মহীশূর ও মহারাষ্ট্র অঞ্চলেও গবাদি পশুর সংখ্যা অধিক। চারণক্ষেত্রের তুলনায় গবাদি পশুর সংখ্যাধিক্য, প্রজননক্ষম উৎকৃষ্ট ষাঁড়ের অভাব এবং ব্যাধির প্রকোপ হেতু এদেশের গবাদি পশু অত্যন্ত রুগ্ন ও নিকৃষ্ট শ্রেণীর। ১৯৫৬ সালে ভারতে ৩·৯ কোটি **মেষ** ছিল। ভারতীয় মেষের অধিকাংশই পাঞ্জাব, বিহার, পঃ বঙ্গ, উত্তর প্রদেশ, তামিলনাড়ু, মহীশূর, কাশ্মীর ও হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে দেখা যায়। তবে দক্ষিণ আফ্রিকা বা অস্ট্রেলিয়ার মেষ অপেক্ষা ভারতীয় মেষ নিকৃষ্ট শ্রেণীর। ১৯৫৬

সালে ভারতে ৫'৫ কোটি (পৃথিবীর ১৮%) **ছাগল** ছিল। গরু, মেষ ও ছাগল দুগ্ধ, চর্ম এবং মাংসের জন্য পালিত হয়।

ভারতের অন্যান্য গৃহপালিত পশুর মধ্যে **শূকর, গর্দভ, অশ্ব, উষ্ট্র** ও **অশ্বতর** প্রধান। **হাঁসমুরগীর** (poultry) পালন ভারতের প্রতি গ্রামেই রহিয়াছে। পুণা, গুরুদাসপুব ও মার্তণ্ডম্ (কেরালা)-এ হাঁসমুরগী পালনের সরকারী কেন্দ্র আছে। ১৯৫৬ সালে ভারতে ৯'৫ কোটি হাঁসমুরগী এবং ৮৩ লক্ষ অন্যান্য গৃহপালিত পশু ছিল। সুন্দরবন, মধ্যপ্রদেশের বনভূমি এবং আসামের পার্বত্যভূমি হইতে প্রচুর **মধু** সংগৃহীত হয়। কোয়েম্বাটোর, মহাবলেশ্বর, সোদপুব প্রভৃতি অঞ্চলে মধুমক্ষিকা পালনের কেন্দ্র রহিয়াছে।

১৯৬১ সালের আদমসুমারী অনুসারে ভারতের গবাদি পশুর সংখ্যা নিম্নের পরিসংখ্যান হইতে বুঝা যাইবে।

গরু	১৭'৬	কোটি	ছাগল	৬'১	কোটি
মহিষ	৫'১	"	হাঁসমুরগী	১১'৪	"
মেষ	৪'০	"	অন্যান্য পশু	৮৬	লক্ষ

জান্তব সম্পদ (Animal products)—ভারতের জান্তব সম্পদের মধ্যে পশম, দুগ্ধজাত দ্রব্য, চর্ম, অস্থি প্রভৃতিই প্রধান। পাঞ্জাব, উঃ প্রদেশ (গাড়োয়াল, আলমোড়া ও নৈনিতাল), রাজস্থান (বিকানীর), কাশ্মীর ও দঃ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে **পশম** পাওয়া যায়। ভারতীয় পশম নিকৃষ্ট শ্রেণীর। ভারতে গড়ে বার্ষিক প্রায় ৭'২ কোটি পাউণ্ড পশম উৎপন্ন হয়, তবে ইহার মাত্র ২'৪ কোটি পাঃ আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় এবং অবশিষ্টাংশ বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়। বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর গড়ে ১'৬ কোটি টন উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পশম আমদানী হইয়া আসে। দুগ্ধ উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে যুক্তরাষ্ট্রের পরই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ১৯৫০-৫১ ও ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতে যথাক্রমে ১'৭ ও ১'৯ কোটি টন দুগ্ধ উৎপাদিত হয়। ১৯৬০-৬১ সালে উৎপাদিত দুগ্ধের পরিমাণ দাঁড়ায় অনুমান ২'২ কোটি টন। ১৯৬৫-৬৬ সালে ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ২'৫ কোটি টন দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমিত হয়। উৎপাদিত দুগ্ধের মধ্যে ৩৮% তরল দুগ্ধ হিসাবে, ৪২% ঘি প্রস্তুতিতে এবং ২০% ক্ষীর, মাখন, দধি প্রভৃতি প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়। উৎপাদিত দুগ্ধের অল্পার্ধ গোজাত এবং অধিকার্ধ মহিষজাত। ১৯৫০-৫১ সালের হিসাবে দেখা যায় যে প্রতি ভারতবাসী দৈনিক গড়ে ৪'৭৬ আউন্স দুগ্ধ সেবন করে, তবে দৈহিক প্রয়োজনের দিক হইতে ইহার নিম্নতম পরিমাণ হওয়া উচিত ১০ আউন্স। ১৯৬০-৬১ সালে দৈনিক দুগ্ধ সেবনের পরিমাণ দাঁড়ায় গড়ে ৪'৯ আউন্স ; ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ ইহার পরিমাণ ৫'১ আউন্স দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমিত হয়। নিকৃষ্ট শ্রেণীর গবাদি পশু, গাভীপ্রতি দুগ্ধ

উৎপাদনের স্বল্পতা, বিস্তৃত তৃণভূমির অভাব ও ক্রান্তীয় জলবায়ু হেতু এদেশে **দুগ্ধজাত দ্রব্যের** শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। ভারতে দুগ্ধজাত দ্রব্যের মধ্যে **ঘি** (পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান) এবং **মাখন** (আগ্রা, আলিগড়, বোম্বাই ও কলিকাতা)-ই প্রধান। গড়ে প্রতি বৎসর ভারতে ১.৪ কোটি মণ ঘি প্রস্তুত হয়। সম্প্রতি বনস্পতি শিল্প প্রসার লাভ করায় এই শিল্প বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে বসিয়াছে। বোম্বাই, ব্যাঙ্গালোর, কলিকাতা, বরোদা, রাজকোট ও আলিগড়ে আধুনিক ডেয়ারী ফার্ম রহিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন বধ্যাগার হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ৫০,০০০ টন **চর্ম** সংগৃহীত হয়। যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে ভারতীয় চর্ম রপ্তানী হয়। কানপুর, আগ্রা, কলিকাতা, দিল্লী ও মাদ্রাজ চর্মশিল্পের কেন্দ্র।

সম্প্রতি ভারতীয় পশুচারণ ও ডেয়ারী শিল্পের উন্নতিকল্পে বহুবিধ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss the factors that account for the successful development of principal dairy regions of the world. (ডেয়ারী শিল্পের গঠন ও প্রসারের অনুকূল অবস্থাগুলি আলোচনা কর। বিভিন্ন ডেয়ারী দ্রব্যসমূহের নাম লিখ এবং পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য ডেয়ারী কেন্দ্রসমূহের বর্ণনা কর।) (পৃঃ ১১২-১১৩)

2. What are the conditions of success for the commercial production of wool? Name the principal wool producing countries of the world and indicate the nature of world trade in wool. (বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পশম উৎপাদনের অনুকূল অবস্থাগুলি লিখ। পৃথিবীর প্রধান প্রধান পশম উৎপাদক অঞ্চলসমূহের নাম লিখ এবং পশম বাণিজ্যের প্রকৃতি নির্দেশ কর।) (পৃঃ ১১৪-১১৭)

3. What are the principal wool and mutton producing countries of the world? What geographical factors have helped them to become so important? (H. S. '65) (পৃথিবীর প্রধান প্রধান পশম ও মেষমাংস উৎপাদক দেশগুলির নাম কর। কি কি ভৌগোলিক কারণবশতঃ ঐ দেশগুলি এরূপ প্রাধান্য পাইয়াছে?) (পৃঃ ১১৪-১১৬)

ষষ্ঠ অধ্যায়

মৎস্য চাষ

(Fishing)

মৎস্য মানবের অন্যতম প্রধান খাদ্য। পূর্বে কেবলমাত্র স্থানীয় চাহিদা মিটাইবার জন্যই মৎস্যের চাষ করা হইত, কিন্তু বর্তমানে যানবাহনের দ্রুত উন্নতি ও উন্নত ধরণের মৎস্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে মৎস্য অন্যতম আন্তর্জাতিক পণ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে এবং মৎস্যের চাষ একটি প্রধান বাণিজ্যিক শিল্পে পরিণত হইয়াছে।

শ্রেণীবিভাগ (Classification)—আহরণ ক্ষেত্রের তারতম্য অনুসারে মৎস্যগুলিকে সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। (১) নদী, হ্রদ, পুকুর, বিল প্রভৃতি হইতে যে সমস্ত মৎস্য ধৃত হয় তাহাদিগকে **স্বাদুজলের মৎস্য** (fresh water fish) এবং (২) সমুদ্র হইতে যে সমস্ত মৎস্য আহরণ করা হয় তাহাদিগকে **সামুদ্রিক মৎস্য** (sea fish) বলে। সামুদ্রিক মৎস্যক্ষেত্রগুলিকে আবার অবস্থানভেদে **উপকূলীয় মৎস্যক্ষেত্র** (Coastal fisheries) এবং অগভীর সমুদ্রের মৎস্যক্ষেত্র (Deep Sea fisheries) এই দুই ভাগে বিভক্ত করা চলে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মৎস্য ও মৎস্য চাষ বলিতে আমরা সাধারণতঃ সামুদ্রিক মৎস্যই বুঝিয়া থাকি। গভীর সমুদ্রে তিমি, হাঙ্গর প্রভৃতি জলজ প্রাণী শিকার এবং উপকূল হইতে কৃত্রিম মুক্তা, প্রবাল, শঙ্খ প্রভৃতি সংগ্রহও এই শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

মৎস্যক্ষেত্রসমূহের বৈশিষ্ট্য (**Physical characteristics of the major world fisheries**)—পৃথিবীর বৃহৎ বৃহৎ মৎস্যপালন ক্ষেত্রগুলি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, সামুদ্রিক মৎস্য চাষের পক্ষে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি বিশেষ অনুকূল—(১) সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ক্ষেত্রগুলি প্রধানতঃ **নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে** (Temperate Latitudes) সীমাবদ্ধ। কারণ, (ক) ক্রান্তীয় অঞ্চলে উষ্ণ জলবায়ুর প্রভাবে মৎস্য দ্রুত পচনশীল বলিয়া মৎস্য ব্যবসায় প্রচেষ্টা তেমন সংঘবদ্ধভাবে গড়িয়া উঠে নাই। (খ) ক্রান্তীয় অঞ্চলের মৎস্য প্রায়শঃই অখাদ্য এবং বিষাক্ত হয়। (গ) ক্রান্তীয় অঞ্চলের একই স্থান হইতে একই প্রকারের মৎস্য অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় না। কিন্তু নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের কোন নির্দিষ্ট স্থান হইতে একই প্রকারের বহুসংখ্যক মৎস্য পাওয়া যায় এবং উহাদের অধিকাংশই মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। (ঘ) মৎস্য শিল্পে প্রচুর সুলভ শিল্পশ্রমের প্রয়োজন। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের

ধীবরেরা কর্মঠ ও শ্রমনিপুণ বলিয়া এই অঞ্চলেই অধিক পরিমাণে মৎস্য চাষ হয়। কিন্তু ক্রান্তীয় অঞ্চলে লোকবসতি নিবিড় হইলেও প্রতিকূল জলবায়ু হেতু এতদঞ্চলের ধীবরেরা শ্রমনিপুণ ও কর্মঠ নহে। (ঙ) শীতল ও উষ্ণ সমুদ্রস্রোতের মিশ্রণস্থলগুলি মৎস্যপালনের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে শীতল ও উষ্ণ সমুদ্রস্রোতের মিশ্রণ অধিক হয় বলিয়া ঐ অঞ্চলেই প্রচুর পরিমাণে মৎস্য ধৃত হইয়া থাকে। (চ) নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের মৃদু জলবায়ু এই ব্যবসায়ের উন্নতির পক্ষে একটি প্রধান কারণ।

(২) মহাদেশ-সন্নিহিত **অগভীর সমুদ্র এবং মগ্নভূমি** (Shallow Seas) মৎস্য চাষের পক্ষে প্রকৃষ্ট। কারণ—(ক) অগভীর সমুদ্রে মৎস্যখাদ্য উদ্ভিদ্ ও জলকীট (plankton) প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। (খ) দেশাভ্যন্তরস্থ বহু নদনদী ও সমুদ্রস্রোতবাহিত আবর্জনা এবং জীবজন্তুর মৃতদেহ ভাসিয়া উপকূলীয় অগভীর সমুদ্রে সঞ্চিত হইলে বিভিন্ন প্রকার মৎস্য উহা হইতেই তাহাদের প্রিয় খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকে। (গ) মৎস্য সাধারণতঃ অগভীর জলে তীরের নিকট ডিম্ব প্রসব করে এবং এই সমস্ত মগ্নভূমিতে দলে দলে জমা হয়। (ঘ) ভগ্ন তটরেখা মৎস্য শিকার ও মৎস্য ব্যবসায়ের উপযোগী।

অতএব পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য মৎস্য-আহরণ ক্ষেত্রগুলির অবস্থান লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, উহারা সাধারণতঃ সমুদ্রতীর হইতে কয়েক শত মাইলের মধ্যে অগভীর জলে অবস্থিত, এবং ইহারা প্রধানতঃ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। তবে সামুদ্রিক মৎস্যশিল্প সংঘবদ্ধভাবে গড়িয়া তুলিতে হইলে উপরোক্ত প্রাকৃতিক অবস্থাগুলি ব্যতীতও কতকগুলি অনুকূল **অর্থনৈতিক অবস্থার** প্রয়োজন।—যেমন, (১) সমুদ্র-সন্নিহিত অঞ্চল-সমূহে কৃষি ও শ্রমশিল্পের অনুন্নত অবস্থা, (২) বন্দর ও পোতাশ্রয়ের প্রাচুর্য, (৩) যানবাহনের সুব্যবস্থা, (৪) মৎস্য সংরক্ষণের জন্য হিমায়ন যন্ত্র ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধা এবং (৫) উৎসাহী ও পরিশ্রমী ধীবরের পর্যাপ্ত সরবরাহ।

মৎস্য-আহরণ ক্ষেত্রসমূহ (Major world fisheries)—পৃথিবীতে চারিটি প্রধান প্রধান মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র রহিয়াছে। যথা—(১) **উত্তর সাগর** ও ইউরোপের পশ্চিম তীরসংলগ্ন সমুদ্র। এই অঞ্চল (ক) নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত, (খ) প্রায় সর্বত্রই অগভীর ও মৎস্যের বাসোপযোগী মগ্নভূমিতে (ডগার্স ব্যাংক) পরিপূর্ণ, (গ) শীতল আর্কটিক স্রোত ও উষ্ণ আটলান্টিক সমুদ্রস্রোতের মিশ্রণ-স্থল, (ঘ) গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানী, ফ্রান্স, ডেনমার্ ক, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, নরওয়ে প্রভৃতি জনবহুল দেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং (ঙ) ইউরোপীয় নদীসমূহ দ্বারা পরিবাহিত মৎস্যখাদ্য প্রচুর আবর্জনা-পুষ্ট। এই সমস্ত কারণে উত্তর সাগর পৃথিবীর একটি বৃহৎ মৎস্যপালন-ক্ষেত্রে পরিণত

হইয়াছে। **গ্রেট ব্রিটেন** এই অঞ্চলের মৎস্য ব্যবসায়ে শীর্ষস্থান অধিকার করে। স্কটল্যাণ্ডের উইক, লারউইক, ফ্রেজারবার্গ, পিটারহেড, স্ট্রেনওয়ে, লীথ ও এবারডীন এবং ইংলণ্ডের গ্রীমসবী, ইয়ারমাউথ এবং লোয়েস্টফট্ প্রভৃতি মৎস্য আহরণের প্রধান বন্দর। ইংল্যাণ্ডের বিলিংসগেট শহর একটি উল্লেখযোগ্য মৎস্য-ব্যবসায় কেন্দ্র। কড, হেরিং, ম্যাকেরেল, হ্যাডক, স্যামন প্রভৃতি এই অঞ্চলের প্রধান মৎস্য। **নরওয়ের** সমৃদ্ধি প্রধানতঃ এই উত্তর সাগরের মৎস্য-চাষের উপর নির্ভর করে। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, সন্নিহিত সমুদ্রে মৎস্যের ও উপকূল অঞ্চলে পোতাশ্রয়ের প্রাচুর্য, কৃষিজ ও খনিজ সম্পদের অপ্রতুলতা ইত্যাদি কারণে এই অঞ্চলের মৎস্য-শিল্প এত উন্নতিশীল। লাফোটন দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণ উপকূল সংলগ্ন সমুদ্র হইতে কড ও হেরিং মৎস্য অধিক ধৃত হয়। পৃথিবীতে উৎপন্ন তিমি মৎস্যের তৈলের অর্ধেকেরও অধিক নরওয়ে সরবরাহ করিয়া থাকে। **ফ্রান্সের** সন্নিহিত সমুদ্রে সার্ডিন, অ্যানকোভ ও শুক্তি শিকার বিশেষ উল্লেখযোগ্য।
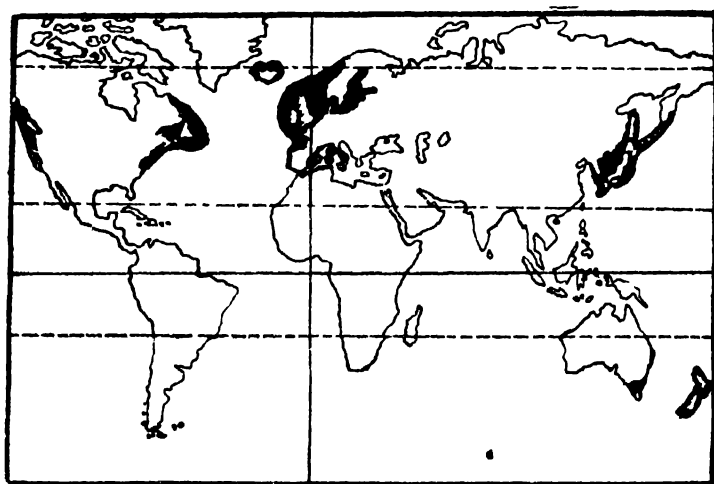
২৪ নং চিত্র—পৃথিবীর প্রধান প্রধান মৎস্যকেন্দ্রসমূহ

(২) ল্যাব্রাডোর, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, ক্যানাডা ও নিউ ইংল্যাণ্ডের উপকূল-সংলগ্ন **উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর**—এই অঞ্চল পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৎস্যপালন ক্ষেত্র। উপকূলসন্নিহিত স্থানে মৎস্য আহরণ বিভিন্ন দেশের মধ্যে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ। কিন্তু নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের দক্ষিণাঞ্চলে অবাধ মৎস্য শিকার চলে। এই সমস্ত স্থানের (ক) তীরবর্তী অঞ্চলসমূহে ও নদী-মোহানায় জল অগভীর এবং (খ) এখানে ল্যাব্রাডোরের শীতল জলস্রোত ও উষ্ণ উপসাগরীয়

স্রোতের মিশ্রণ মৎস্যবাসের পক্ষে অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। এই বৃহৎ মৎস্যপালন-ক্ষেত্রকে 'গ্রেট ব্যাংক' বলে। কড, ম্যাকেরেল, হেক, হেরিং, হ্যালিবুট প্রভৃতি এই অঞ্চলের প্রধান মৎস্য। সেণ্ট লরেন্স নদী হইতে চিংড়ি শিকার করা হয়। বোস্টন, হ্যালিফ্যাক্স, সেণ্টজন, মন্ট্রিল এবং পোর্টল্যাণ্ড এই অঞ্চলের প্রধান মৎস্যকেন্দ্র।

(৩) **জাপানের** তীরসংলগ্ন সমুদ্র—জাপানের মৎস্যপালন ক্ষেত্র উত্তর মেরু সাগর হইতে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। অগভীর সমুদ্র, বিস্তৃত মহীসোপানের অবস্থিতি এবং উষ্ণ কুরোসিও ও শীতল কিউরাইল স্রোতের মিশ্রণ হেতু এখানে এত বড় মৎস্যপালন-ক্ষেত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। সমগ্র মৎস্যের প্রায় ৮০ ভাগই হোক্কাইডো, কোরিয়া, কিউবাইল দ্বীপপুঞ্জ, হনসু এবং শাখালিন-এর নিকটবর্তী সমুদ্র হইতে ধৃত হয়, সার্ডিন, হেরিং বনিটো, চিংড়ি প্রভৃতি জাপানের প্রধান মৎস্য। পরিমাণের দিক হইতে জাপানের মৎস্য আহরণ পৃথিবীর যে কোন দেশ অপেক্ষা অধিক। কিন্তু ধৃত মৎস্যের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই স্থানীয় প্রয়োজনে ব্যয়িত হয়। খাদ্যের অনুপযোগী অনেক মৎস্য হইতে জমির জন্য সার তৈয়ারী করা হইতেছে। এই দেশের উপকূলে কৃত্রিম মুক্তা সংগ্রহের ব্যবসায় উল্লেখযোগ্য।

(৪) আলাস্কা, ব্রিটিশ কলম্বিয়া, ওয়াশিংটন ও অরিগনের নিকটবর্তী **উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর**—এই অঞ্চল স্যামন ও ট্রট মৎস্যের জন্য বিখ্যাত। হেরিং, কড ও হ্যালিবুট মৎস্যও এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। ভিক্টোরিয়া, সিট্কা, ভ্যান্কুভার, প্রিন্স রুপার্ট দ্বীপ এবং পোর্টল্যাণ্ড এই অঞ্চলের প্রধান মৎস্যকেন্দ্র।

উপরোক্ত চারিটি বৃহৎ মৎস্যক্ষেত্র ব্যতীত অন্যত্রও মৎস্যের চাষ হয়। পূর্ব গোলার্ধের বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জ, নিউগিনি, উত্তর-পূর্ব অস্ট্রেলিয়া, প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত ক্রান্তীয় দ্বীপপুঞ্জ, ভূমধ্যসাগরের পশ্চিমাংশ প্রভৃতি অঞ্চল সন্নিহিত সমুদ্র হইতে মৎস্য আহৃত হয়। পারস্য উপসাগরে, সিংহল ও ভেনেজুয়েলার সন্নিহিত সমুদ্রে, উত্তর অস্ট্রেলিয়ার নিকটবর্তী সাগরে এবং ক্যালিফোর্নিয়া উপসাগরে শুক্তি হইতে মুক্তা সংগ্রহ করা হয়। নরওয়ে ও নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড-এর অন্তর্বর্তী মেরু সমুদ্র হইতে প্রচুর পরিমাণে তিমি ও শীল শিকার করা হয়।

বাণিজ্য (Trade)—মৎস্যের বহির্বাণিজ্য অল্প। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড এবং নরওয়ে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য বিদেশে রপ্তানী করে। বাল্টিক রাজ্য, জার্মানী, দক্ষিণ আমেরিকা, স্পেন, পর্তুগাল এবং ইতালী প্রধান প্রধান মৎস্য আমদানীকারক দেশ।

ভারতের মৎস্যশিল্প

ভারতের মৎস্যশিল্প—ভারতের অধিবাসীদের প্রায় ৪০% মৎস্যাশী। বঙ্গদেশ, বিহার, উড়িষ্যা এবং আসামের অধিবাসীরাই অধিক পরিমাণে মৎস্য ভক্ষণ করে। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে প্রায় ৭৪ লক্ষ টন মৎস্য ধৃত হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালে ধৃত মৎস্যের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১০ লক্ষ টন। ইহার প্রায় ৭০% সামুদ্রিক ও সমুদ্রোপকূলের মৎস্য এবং অবশিষ্ট ৩০% স্বচ্ছ জলের মৎস্য। প্রতি ভারতবাসী বৎসরে গড়ে ৩·৭ পাউণ্ড মৎস্য ভক্ষণ করে। অথচ দৈহিক পুষ্টির জন্য প্রতি পূর্ণবয়স্ক ভারতবাসীর পক্ষে দৈনিক ৩ আউন্স হিসাবে ৫১ পাঃ মৎস্যের প্রয়োজন। অতএব দেখা যাইতেছে যে বর্তমানে চাহিদার তুলনায় অতি সামান্য পরিমাণ মৎস্যই ধৃত হইতেছে। ভারতীয় মৎস্য শিল্পের এই অনুন্নতির প্রধানতম কারণ এই যে, এই শিল্প সম্পূর্ণরূপে নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়াছে। ইহারা একদিকে যেরূপ কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অজ্ঞ ও সন্দেহপ্রবণ, অন্যদিকে তেমনি দরিদ্র। উপরন্তু সমুদ্রে মৎস্য ধরিবার উপযোগী বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাও এদেশে নাই বলিলেই চলে।

ভারতীয় মৎস্যের শ্রেণীবিভাগ—ভারতে যে সমস্ত মৎস্য ধৃত হয় তাহাদিগকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে: (১) **সমুদ্রের মৎস্য**—সাধারণতঃ তীর হইতে সমুদ্রের ৮-১০ কি. মি. দূর পর্যন্ত এই সকল মৎস্য পাওয়া যায়। (২) **সমুদ্রোপকূলের মৎস্য**—প্রধানতঃ গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মহানদীর মোহানায়, শাখা ও উপনদীর সঙ্গমস্থলে এবং মহীসোপান অঞ্চলে ইলিশ, চিংড়ি, কাতলা, রুই, ভেটকী, চাঁদা, পারসে, ভাঙন প্রভৃতি সমুদ্রোপকূলের মৎস্য ধৃত হয়। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, বোম্বাই ও তামিলনাড়ু অঞ্চলেই এই শ্রেণীর মৎস্য সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। অভগ্ন তটরেখা, মহীসোপানের সংকীর্ণতা, পোতাশ্রয়ের অপ্রতুলতা এবং মৎস্য শিকারের আদিম পদ্ধতি হেতু সামুদ্রিক ও সমুদ্রোপকূলের মৎস্য শিল্প ভারতে তাদৃশ উন্নতি লাভ করে নাই। সম্প্রতি সামুদ্রিক ও সমুদ্রোপকূলের মৎস্যশিল্পের উন্নতিকল্পে ভারত সরকার বিশেষ চেষ্টিত রহিয়াছেন। (৩) **দেশাভ্যন্তরের স্বচ্ছজলের মৎস্য**—আভ্যন্তরীণ জলভাগ হইতে যে সমস্ত মৎস্য ধরা হয় তাহাদিগকে দেশাভ্যন্তরের স্বচ্ছজলের মৎস্য বলে। কাতলা, ইলিশ, রুই, মৃগেল, গলদাচিংড়ি, কই, মাগুর, পুঁটি প্রভৃতি এই শ্রেণীর মৎস্য। দেশাভ্যন্তরের মৎস্য স্থানীয় চাহিদা মিটাইতেই ব্যয়িত হইয়া যায়। পরিকল্পনা কমিশন এইরূপ অনুমান করেন যে ১৫০ লক্ষ একর পরিমিত আভ্যন্তরীণ জলভাগ হইতে বর্তমানে মৎস্য ধরা হইতেছে। তবে জলাশয়সমূহে কচুরীপানার প্রাদুর্ভাব, বৃহদাকার সেচব্যবস্থার প্রবর্তন হেতু পুষ্করিণী, বিল প্রভৃতির অযত্ন, হাজামজা নদনদী ও খালবিলের সংখ্যা বৃদ্ধি, বিভিন্ন স্থানে বাঁধ দিবার ফলে মৎস্যের

চলাচল ও ডিম্ব প্রসবের অসুবিধা ইত্যাদি কারণে ধৃত মৎস্যের পরিমাণ ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে।

ভারতের উল্লেখযোগ্য মৎস্যশিল্প কেন্দ্রসমূহ—(ক) **পশ্চিমবঙ্গ**—পশ্চিমবঙ্গের **আভ্যন্তরীণ** জলভাগ হইতে প্রচুর রুই, কাতলা, মৃগেল, চিংড়ি, ইলিশ প্রভৃতি মৎস্য ধরা হয়। তবে এই শ্রেণীর মৎস্য আহরণের উন্নতির পথে কয়েকটি অন্তরায় রহিয়াছে। যথা—(১) স্থানীয় ধীবরেরা অত্যন্ত দরিদ্র হওয়ায় এই শিল্প সংঘবদ্ধভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। (২) বহু ক্ষেত্রে যানবাহনের সুযোগ-সুবিধা না থাকায় মৎস্য চালান দেওয়া হয় না। (৩) ধীবরেরা ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল প্রকার মৎস্য ধরিয়া অল্পকালের মধ্যেই জলভাগকে মৎস্যহীন করিয়া ফেলে। (৪) মৎস্য চাষের উন্নতি বা নূতন কোন প্রকার মৎস্য উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য ব্যাপক প্রচেষ্টা এযাবৎ কাল পর্যন্ত হয় নাই। (৫) বর্ষাকালে জলবৃদ্ধি হেতু বহু মৎস্যের ডিম্ব ধান্যক্ষেত্র প্রভৃতিতে ছড়াইয়া পড়ে এবং বর্ষা শেষে ঐ সমস্ত স্থানে জল শুষ্ক হইয়া গেলে ডিমগুলিও নষ্ট হইয়া যায়। (৬) পশ্চিম বঙ্গের মৎস্যশিল্প নিকারীদের দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় মৎস্য ব্যবসায়ে উহারাই অধিক লাভবান হয় এবং ধীবরেরা অল্প মুনাফা পাওয়ায় মৎস্য ধরার তাদৃশ অনুপ্রেরণা পায় না।

পশ্চিমবঙ্গের **সমুদ্রোপকূলের মৎস্যশিল্প** কেবলমাত্র সুন্দরবনাঞ্চলেই পরিদৃষ্ট হয়। এই অঞ্চলে প্রতি বৎসর প্রায় ৮০ হাজার মণ মৎস্য ধরা যাইতে পারে, কিন্তু ইহার অতি সামান্য অংশই বর্তমানে আহৃত হইতেছে। (১) যানবাহনের অসুবিধা, (২) বিক্রয়-কেন্দ্র হইতে দূরত্ব, (৩) মৎস্য-আহরণ-কেন্দ্রে বরফ, বাক্স প্রভৃতি সরঞ্জাম এবং দ্রুতগামী যানবাহনের অভাব, (৪) মৎস্য-আহরণ কেন্দ্রে খাদ্য, পানীয় জল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব ইত্যাদি নানাবিধ কারণে এই অঞ্চলের মৎস্যশিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। উপরন্তু ধীবরদের নৌকাসমূহ প্রসারিত সমুদ্রে অধিক-দূর যাতায়াতের উপযোগী না হওয়ায় তাহারা উপকূল-সন্নিহিত একটি নির্দিষ্ট এলাকা হইতে ক্রমাগত মৎস্য ধরে। ফলে ধৃত মৎস্যের পরিমাণ ক্রমশঃই হ্রাস পাইতে থাকে। এই সমস্ত অসুবিধা দূরীভূত হইলে সুন্দরবন অঞ্চলের মৎস্য-শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিবে বলিয়া আশা করা যায়। পশ্চিমবঙ্গে **গভীর সমুদ্রের মৎস্যশিল্প** বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। তবে সম্প্রতি 'ডিপার্টমেণ্ট অব্ ফিসারীজ'-এর সহযোগিতায় সামুদ্রিক মৎস্যশিল্প প্রসার লাভ করিতেছে।

(খ) **উড়িষ্যা**—উড়িষ্যায় সামুদ্রিক এবং আভ্যন্তরীণ মৎস্যশিল্প সংগঠনের প্রচুর সুযোগ রহিয়াছে ; কিন্তু যানবাহনের সুবিধা না থাকায় অনেক স্থানেই মৎস্য ধরা হয় না। চিল্কা হ্রদ হইতে প্রচুর মৎস্য ধরা হয় এবং পরে দঃ পুঃ

রেলপথে কলিকাতা, টাটানগর প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী করা হয়। পুরীর সমুদ্রোপকূল হইতেও মৎস্য ধরা হয়। উড়িষ্যা হইতে রেলপথে প্রায় ৫৫ হাজার মণ মৎস্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী করা হয়। সম্প্রতি উড়িষ্যার বহু একর পরিমিত আভ্যন্তরীণ জলভাগের পুনরুন্নয়ন করিয়া মৎস্য পালন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হইয়াছে।

(গ) **অন্ধ্র, তামিলনাডু ও কেরালা**—**সামুদ্রিক মৎস্যশিল্পের** ব্যাপক উন্নতির পক্ষে তামিলনাডু ও অন্ধ্রের ২৮০০ কিঃ মিঃ দীর্ঘ উপকূলাঞ্চল সন্নিহিত ১ লক্ষ বর্গ কি. মি. ব্যাপিয়া মহীসোপানের অবস্থিতি অত্যন্ত উপযোগী। অতি পুরাতন পদ্ধতিতে মৎস্য ধরা হয় বলিয়া এই বিস্তৃত মৎস্য-চারণভূমি একরূপ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। তামিলনাডুর এই সামুদ্রিক মৎস্য শিকার ক্ষেত্রটি উপকূল হইতে প্রায় ৫ কি.মি-র মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। **দেশাভ্যন্তরের মৎস্যশিল্প** তামিলনাডুতে বিশেষ বিস্তার লাভ করে নাই। পূর্ব উপকূলে অন্ধ্রের গঞ্জাম, গোপালপুর, বিশাখাপত্তনম্, কোকনদ, মসলিপত্তম, নেলোর; তামিলনাডুর মাদ্রাজ, পণ্ডিচেরী, নেগাপত্তম, কেরালার কোচিন, কালিকট ও মহীশূরের ম্যাঙ্গালোর মৎস্য ধরার বিখ্যাত কেন্দ্র। কেরালায় (আর্ণাকুলাম) সার্ডিন মৎস্যের তৈল ও "গুয়ানো" প্রস্তুত হয়। এই তৈল পাটের কলে এবং সাবান ও মোমবাতি তৈয়ারীর জন্য ব্যবহৃত হয়। "গুয়ানো" হইতে উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত হয়। এই সার দাক্ষিণাত্যের চা-বাগানসমূহে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং সিংহল, ইংলণ্ড, জার্মানী প্রভৃতি দেশেও রপ্তানী হইয়া যায়। মাদ্রাজ হইতে বহু শুষ্ক ও লবণাক্ত মৎস্য বিদেশে রপ্তানী হয়। কেরালার কোচিন ও কালিকট মৎস্য, তৈল ও "গুয়ানো" রপ্তানীর প্রধান বন্দর। মাদ্রাজে হাঙরের যকৃৎ হইতে তৈল নিষ্কাশনের সরকারী কারখানা রহিয়াছে।

(ঘ) **মহারাষ্ট্র ও গুজরাট**—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোতাশ্রয়ের প্রাচুর্য, মৎস্য ধরার উপযোগী বিস্তৃত মহীসোপান, প্রায় সাতমাস ব্যাপী অনুকূল আবহাওয়া, উন্নত শ্রেণীর ধীবরের প্রাচুর্য প্রভৃতি অনুকূল অবস্থাসমূহ এতদঞ্চলে **সামুদ্রিক মৎস্যশিল্পের** উন্নতির সহায়ক। কচ্ছ ও কাঠিয়াবাড় উপকূলের নির্ভীক ধীবরেরা প্রচুর সামুদ্রিক মৎস্য ধরে। **আভ্যন্তরীণ মৎস্যশিল্পের** উন্নতির জন্য মহারাষ্ট্র সরকার বিশেষ যত্নবান। মহারাষ্ট্রের ধীবর সমিতির উদ্যোগে ধীবরেরা মৎস্য ধরায়, মৎস্যের তৈল নিষ্কাশনে এবং মৎস্য টিনবন্দীকরণে বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিতেছে। কচ্ছ উপসাগর হইতে মুক্তা উত্তোলিত হয়।

সম্প্রতি ভারতীয় মৎস্যশিল্পের উন্নতিকল্পে নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ধীবর সমবায় সমিতির গঠন, মৎস্য শিকারের উপযোগী বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জামের ব্যবহার, মৎস্য সংরক্ষণের জন্য হিমঘর,

গুদামঘর প্রভৃতির স্থাপন, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতিসাধন, এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মৎস্য শিল্পের উন্নতি কল্পে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থাই হইল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রশ্নোত্তর

1. Examine the physical conditions that are characteristic of the great fishing grounds and describe the major fishing grounds of the world. Indicate briefly the world trade in fish. (P. U. '61, '63 '64, '65, '67, U E. '61, '63, '65) (পৃথিবীর প্রধান প্রধান মৎস্যক্ষেত্রগুলির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা কর এবং পৃথিবীর প্রধান প্রধান মৎস্য আহরণ ক্ষেত্রসমূহের বর্ণনা কর। সংক্ষেপে মৎস্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নির্দেশ কর।) (পৃঃ ১২০-১২৩)

2. Describe the development of fishing industry in India. (U E. '65) (ভারতের মৎস্য শিল্প সম্পর্কে যাহা জান লিখ।) (পৃঃ ১২৪-১২৭)

সপ্তম অধ্যায়

অরণ্য ও অরণ্য সম্পদ

(Forests and Forest Products)

অরণ্যের সুবিধা (Utility of forests):—অরণ্য হইতে সাধারণতঃ দুইশ্রেণীর সুবিধা পাওয়া যায়। যথা, (ক) **প্রত্যক্ষ সুবিধা** (Direct utilities)—(১) অরণ্য হইতে কাষ্ঠ ও জ্বালানী পাওয়া যায়; (২) আসবাব-পত্র নির্মাণ, যানবাহন, কাগজ প্রভৃতি শিল্পের কাঁচামাল অরণ্য হইতে আহৃত হয়; (৩) লাক্ষা, হরীতকী, চর্মবঞ্জক দ্রব্যাদি, তার্পিন তৈল, ধুনা, নানা প্রকার তৈল, রবার প্রভৃতি নানাবিধ উপজাত দ্রব্য অরণ্য হইতে আহৃত হয়, (৪) তৃণভূমি অঞ্চলে গবাদি পশু প্রতিপালিত হয়, এবং (৫) বনজ শিল্পে বহু লোক নিযুক্ত থাকিয়া জীবিকা অর্জন করিয়া থাকে। (খ) **পরোক্ষ সুবধিা** (Indirect utilities):—(১) অরণ্যাঞ্চলে বাতাসের আর্দ্রতা অপেক্ষাকৃত অধিক হয় এবং ভূমি সিক্ত থাকে; (২) অরণ্যাঞ্চলে বৃষ্টিপাত অধিক হয় এবং স্থলভাগে জলের সরবরাহ নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে; (৩) অরণ্যাঞ্চলসমূহ ঝড়ের গতিবেগ রোধ করে; (৪) বহুক্ষেত্রে অরণ্য নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহকে স্বাস্থ্যকর করিয়া তুলে; (৫) অরণ্য ভূমিক্ষয় নিবারণ করে ও মৃত্তিকার উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করে; এবং (৬) অরণ্য বন্যার গতিরোধ করে।

অরণ্যের শ্রেণীবিভাগ ও আঞ্চলিক বণ্টন (Classification and regional distribution of forests)—জলবায়ুর তারতম্য অনুসারে পৃথিবীর অরণ্যসমূহকে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—

(ক) উষ্ণমণ্ডলের **কঠিন কাষ্ঠযুক্ত চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য** (tropical hardwood evergreen forests)—উষ্ণমণ্ডলের যে সমস্ত অঞ্চলে সারাবৎসরই বৃষ্টিপাত প্রচুর ও উত্তাপ অধিক সেই সমস্ত অঞ্চলেই সাধারণতঃ কঠিন কাষ্ঠযুক্ত এই প্রকার বৃক্ষের অরণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। নিরক্ষীয় অঞ্চলের অরণ্যসমূহ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তবে নিরক্ষীয় অঞ্চলের বহির্ভূত ৮০"-র অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত মৌসুমী অঞ্চলের স্থানবিশেষেও এই জাতীয় বৃক্ষের অরণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর অরণ্যের বৃক্ষসমূহের মধ্যে সেগুন, মেহগিনি, আবলুস, গোলাপগন্ধ, সিডার, রবার ও তালজাতীয় বৃক্ষই মনুষ্যের নানাবিধ প্রয়োজনে, বিশেষতঃ আসবাব তৈয়ারীর কার্যে, ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

উষ্ণমণ্ডলের কাষ্ঠ শিল্প (Lumbering in tropical forests)—উষ্ণমণ্ডলের অরণ্যসমূহে মূল্যবান বৃক্ষের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও এই অঞ্চলের কাষ্ঠশিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করে নাই। কারণ—(১) এই অঞ্চলের ভূমিভাগ বৎসরের কোন সময়েই বরফাবৃত না থাকায় অল্পব্যয়ে শিল্পাগারে কাষ্ঠ প্রেরণ সম্ভব হয় না। (২) স্থলপথে পরিবহনের ব্যবস্থা করা কষ্টসাধ্য। (৩) এই অঞ্চলের কাষ্ঠসমূহ গুরুভার হওয়ায় নদীবক্ষে ভাসমান থাকে না এবং নদীবক্ষে কাষ্ঠ চালান দেওয়াও সম্ভবপর হইয়া উঠে না। (৪) এই অঞ্চলের অরণ্যে এক শ্রেণীর বৃক্ষ একই স্থানে প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয় না এবং অরণ্যাঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া বিভিন্ন স্থান হইতে একই শ্রেণীর কাষ্ঠ সংগ্রহ করা কষ্ট, ব্যয় ও সময় সাপেক্ষ। (৫) এই অঞ্চলে শক্তিসম্পদ ও শ্রমিকের অপ্রাচুর্য এবং সমৃদ্ধ ব্যবসায়কেন্দ্রের অভাব রহিয়াছে।

উষ্ণমণ্ডলের বনজ উঞ্ছবৃত্তি (Gathering and collecting in tropical forests)—উঞ্ছবৃত্তি উষ্ণমণ্ডলীয় অরণ্যাঞ্চলের অধিবাসীদের অন্যতম প্রধান উপজীবিকা। উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা আহৃত দ্রব্যসমূহের মধ্যে (১) দঃ মেক্সিকো হইতে ব্রাজিল পর্যন্ত বিস্তৃত অরণ্যাঞ্চল হইতে সংগৃহীত এবং চিউইংগাম প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত 'জাপোটে' বৃক্ষের রস হইতে **চিকল**, (২) বিভিন্ন অরণ্য অঞ্চল হইতে সংগৃহীত **বন্য রবার**, (৩) দঃ আমেরিকার অরণ্য হইতে সংগৃহীত ও 'কেব্‌ল্' নির্মাণে ব্যবহৃত **ব্যালাটা**, (৪) ব্রাজিলের অরণ্য অঞ্চল হইতে সংগৃহীত এবং খাদ্যরূপে ব্যবহৃত **ব্রাজিলনাট**, (৫) পানামা হইতে দঃ ইকুয়েডর পর্যন্ত বিস্তৃত অরণ্যাঞ্চল হইতে সংগৃহীত এবং খাদ্যরূপে ও বোতাম তৈয়ারীতে ব্যবহৃত **আইভরী নাট**, (৬) পশ্চিম আফ্রিকার অরণ্যাঞ্চল হইতে সংগৃহীত এবং তৈল উৎপাদনে ব্যবহৃত **পাম নাট**, (৭) ইকুয়েডর, কলম্বিয়া এবং পানামার অরণ্যাঞ্চল হইতে সংগৃহীত এবং সুদৃশ্য 'পানামাহ্যাট' নামক একশ্রেণীর টুপী প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত **টোকুইলা পাম** নামক বৃক্ষের তন্তু, (৮) জাপান, তাইওয়ান ও দঃ চীনের অরণ্য হইতে সংগৃহীত **কর্পূর কাষ্ঠ**, (৯) কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, পেরু ও বলিভিয়ার অরণ্য হইতে আহৃত **সিঙ্কোনা***, (১০) ভারত ও পাকিস্তানের অরণ্য হইতে সংগৃহীত **লাক্ষা**, **মোম**, এবং (১১) বিভিন্ন অরণ্যাঞ্চল হইতে সংগৃহীত নানাবিধ **রজন্‌রেজিন**, বহু প্রকারের **গঁদ** প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(খ) নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের দীর্ঘপত্রবিশিষ্ট এবং কঠিন কাষ্ঠযুক্ত পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য (temperate hardwood deciduous forests)—নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের আল্পস, পিরেনীজ, মরু-রুশিয়া, মধ্য-সাইবেরিয়া, জাপান,

*বর্তমানে অবশ্য পৃথিবীর ৯০% সিঙ্কোনা জাভার আবাদ হইতে পাওয়া যাইতেছে। সিংহল ও ভারতেও বর্তমানে সিঙ্কোনার চাষ আরম্ভ হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের আপালাচিয়ান অঞ্চল, প্যাটাগোনিয়া এবং দক্ষিণ চিলিতে ওক, বার্চ, মেপল্, অ্যাশ, আখরোট, এল্ম, চেস্টনাট প্রভৃতি দীর্ঘ পত্র ও কঠিন কাষ্ঠ যুক্ত পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য দৃষ্ট হয়। হিমশীতোষ্ণ সামুদ্রিক ও লরেন্সীয় জলবায়ুসেবিত অঞ্চলসমূহে এই শ্রেণীর অরণ্যভূমি সমধিক পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তবে উষ্ণ মণ্ডলের স্থানে স্থানেও এইরূপ অরণ্যভূমি দৃষ্ট হয়। এই সকল কাষ্ঠ ঈষৎ শক্ত এবং আসবাব তৈয়ারী করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর বনভূমি অপেক্ষাকৃত উর্বর ভূখণ্ডে দৃষ্ট হয় বলিয়া মানুষ নিজ নিজ প্রয়োজনের তাগিদে অধিকাংশ বনাঞ্চলকে পরিষ্কৃত করিয়া কৃষি অঞ্চলে পরিণত করিয়াছে।

(গ) নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের দীর্ঘপত্রবিশিষ্ট এবং কোমল কাষ্ঠযুক্ত **সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য** (temperate softwood coniferous forests)— তুন্দ্রা অঞ্চলের দক্ষিণাংশে সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য পরিলক্ষিত হয়। এই শ্রেণীর অরণ্যে পাইন, ফার, স্প্রুস, লার্চ, প্রভৃতি নরম কাষ্ঠের বৃক্ষ জন্মে। এই সমস্ত কাষ্ঠ লঘু, স্থায়ী অথচ দৃঢ়। জাহাজের মাস্তুল ও পাটাতন, এবং দিয়াশলাই-এর কাঠি, কাগজ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে এই কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়। (১) উত্তর আমেরিকার ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাংশে, (২) দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা ও চিলির দক্ষিণাংশে, (৩) ইউরোপীয় দেশসমূহের উত্তরাংশে ও হিমালয় পর্বতের উচ্চতর অংশে, এবং (৪) নিউজীল্যাণ্ডের অংশবিশেষে এই জাতীয় বৃক্ষের অরণ্য রহিয়াছে।
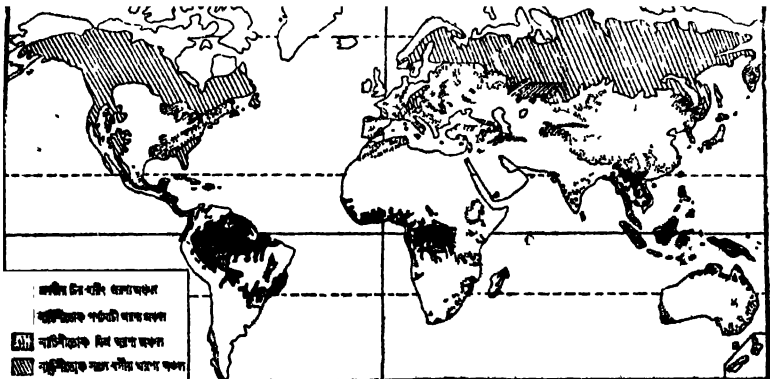
২৫নং চিত্র—পৃথিবীর প্রধান প্রধান অরণ্য অঞ্চল

কোমল কাষ্ঠযুক্ত সরলবর্গীয় বৃক্ষের বিস্তীর্ণ অরণ্যাঞ্চলসমূহ প্রধানতঃ উত্তর গোলার্ধেই সীমাবদ্ধ। **উত্তর আমেরিকার** পশ্চিমাঞ্চলের অন্তর্গত কোস্ট-রেঞ্জ, সিয়েরা নেভাডা, কাস্কেড ও রকি পর্বতাঞ্চলের আর্দ্র ও শীতল

অংশে সিডার, ডগলাস ফার, হোয়াইট পাইন, রেড উড প্রভৃতি সরলবর্গীয় বৃক্ষের নিবিড় বনভূমি রহিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডার পুর্বাংশের পার্বত্য অঞ্চলে এবং বালুকাময় ভূমিভাগেও সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি দৃষ্ট হয়। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণপুর্বে ভার্জিনিয়া হইতে টেক্সাস পযন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের বালুকাময় ভূমিভাগে পাইনবৃক্ষের নিবিড বনভূমি রহিয়াছে। **ইউরোপের** অন্তর্গত স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া ও বাল্টিক রাজ্যসমূহের সবলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি হইতে প্রচুর কোমলকাষ্ঠ প্রতিবৎসর ব্রিটেনে রপ্তানী হইয়া যায়। ফ্রান্স, দঃ জার্মানী ও মধ্য ইউরোপের পার্বত্য অঞ্চলে, বল্কান ও আপেনাইন পর্বতের উচ্চতর অংশেও এইরূপ বনভূমি রহিয়াছে। **রুশিয়ার** উত্তরস্থিত 'তৈগা' (Taiga) বনমণ্ডলটির বিস্তার সাইবেরিয়ার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। বর্তমানে ইহাই হইতেছে পৃথিবীর বৃহত্তম ও বিবিড়তম সরলবর্গীয় বনপ্রদেশ। ইহার আয়তন প্রায় ৫০ কোটি হেক্টার। তবে এই বনভূমি অতি দুর্গম বলিয়া এ অঞ্চল হইতে কাষ্ঠ ও অন্যান্য বনজ সম্পদের আহরণ অতি সামান্য। বিশেষজ্ঞদের অনুমান যে এই বনভূমির মাত্র ৩ কোটি হেক্টার পরিমিত স্থানের কাষ্ঠসম্পদ ব্যবহারের উপযোগী হইতে পারে। **এশিয়ার** অন্তর্গত জাপান ও চীনের উত্তরাংশে, মাঞ্চুরিয়ায় এবং ভারতে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি রহিয়াছে।

দক্ষিণ গোলার্ধের অন্তর্গত দঃ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ড দেশের ৩০° দঃ সমাক্ষরেখার দক্ষিণস্থিত অঞ্চলসমূহে সরলবর্গীয় ও পর্ণমোচী বৃক্ষের মিশ্র বনভূমি পরিলক্ষিত হয়।

নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের কাষ্ঠশিল্প (**Lumbering in temperate forests**)—পৃথিবীতে প্রতিবৎসর যত কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয় তাহার প্রায় ৭০% নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের পর্ণমোচী ও সরলবর্গীয় অরণ্যাঞ্চল হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের কাষ্ঠ শিল্প দ্রুত প্রসারলাভ করিবার কারণ—(১) এই অঞ্চলের অরণ্য নিরক্ষীয় অঞ্চলের ন্যায় নিবিড় না হওয়ায় কাষ্ঠ আহরণ করিতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। (২) এই অঞ্চলের কাষ্ঠসমূহ নদীবক্ষে ভাসমান থাকে বলিয়া বসন্তকালে তুষার গলিয়া গেলে ভূমির উপর দিয়া নদীপথে কাষ্ঠ চালান দেওয়া সহজসাধ্য। (৩) এই অঞ্চলের অরণ্যে একই স্থানে একই প্রকারের বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। (৪) এই অঞ্চলে জলবিদ্যুতের প্রাচুর্য কাষ্ঠশিল্পে শক্তি সরবরাহ করিয়া থাকে। (৫) এতদঞ্চলের কাষ্ঠ অপেক্ষাকৃত নরম হওয়ায় ইহাদের ছেদন করা বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে। (৬) নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের দেশসমূহ বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতায় উন্নত হওয়ায় ঐ সমস্ত দেশে নির্মাণ ও শিল্পকার্যে কাষ্ঠের চাহিদাও ব্যাপক। (৭) সমৃদ্ধ কাষ্ঠব্যবসায়-কেন্দ্রসমূহের নৈকট্য, শ্রমিক সরবরাহের প্রাচুর্য, এই

জাতীয় কাষ্ঠের ব্যাপক চাহিদা এবং যানবাহনের সুব্যবস্থা এই অঞ্চলের কাষ্ঠশিল্পের উন্নতির সহায়ক।

নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের বনজ উঞ্ছবৃত্তি (Gathering and collecting in temperate forests)—নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অরণ্যাঞ্চলে উঞ্ছবৃত্তি তাদৃশ ব্যাপক নহে। এই অঞ্চলে উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা আহৃত বাণিজ্যিক সামগ্রীর মধ্যে আর্জেন্টিনার অরণ্য হইতে সংগৃহীত কুয়েব্রাকো কষায়িন, স্পেন, পর্তুগাল, মরক্কো ও আলজেরিয়ার ওক বৃক্ষ হইতে সংগৃহীত কর্ক, পাইন বৃক্ষ হইতে সংগৃহীত পীচ, আলকাতরা, রজন, তার্পিন তৈল প্রভৃতি দ্রব্য এবং চামড়া ট্যান করিবার নানাবিধ দ্রব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কাষ্ঠের বাণিজ্য (World trade in timber)—কাষ্ঠ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান পণ্য। সরলবর্গীয় অরণ্যের নরম কাষ্ঠই এই ব্যবসায়ের শতকরা ৮০ ভাগ অধিকার করে। ক্যানাডা, রুশিয়া নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্র প্রধান কাষ্ঠ **রপ্তানীকারক** এবং যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানী, ও বেলজিয়াম প্রধান কাষ্ঠ **আমদানীকারক** দেশ। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, মধ্য আমেরিকা, ব্রহ্ম, শ্যাম, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি দেশ ইউরোপের দেশসমূহে কঠিন কাষ্ঠ রপ্তানী করিয়া থাকে।

ভারতের বনজ সম্পদ

ভারতের অরণ্য অঞ্চল (Forest regions of India)—মানুষের প্রভাবমুক্ত অবস্থায় দেশে যে উদ্ভিজ্জ জন্মে তাহাকে প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ বলে। বৃষ্টিপাতের সঙ্গে স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জের অতি নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে। ভারতের প্রাকৃতিক উদ্ভিদকে **প্রধানতঃ বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল** চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য, মৌসুমী পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য, গুল্ম ও তৃণভূমি এবং মরু ও মরুপ্রায় অঞ্চলের উদ্ভিদ, **প্রধানতঃ মৃত্তিকার গঠনের উপর নির্ভরশীল** জলাভূমির অরণ্য এবং **প্রধানতঃ ভূপৃষ্ঠের উচ্চতার উপর নির্ভরশীল** হিমালয়ের অরণ্য—এই ছয় ভাগে বিভক্ত করা যায়। নিম্নে ভারতের প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জ সংস্থান বিবৃত হইল—

(১) **চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য (Evergreen forests)**—পূর্ব অবহিমালয় অঞ্চল, আসাম, পশ্চিম উপকূলের পর্বতাঞ্চল, আন্দামান প্রভৃতি যে সমস্ত স্থানে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৮০"-র অধিক, গড় উত্তাপ প্রায় ৭৫° ফাঃ এবং বার্ষিক গড় আর্দ্রতা ৭০%-এর অধিক সে সমস্ত স্থানে চিরহরিৎ বৃক্ষের নিবিড় অরণ্য দৃষ্ট হয়। যানবাহনের অসুবিধা, নিবিড় জঙ্গল এবং একই স্থানে এক জাতীয় বৃক্ষের স্বল্পতা হেতু এই সমস্ত অঞ্চলের অরণ্যসম্পদ মানুষের প্রয়োজনে তাদৃশ ব্যয়িত হয় নাই। চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্যাঞ্চলে বহু মূল্যবান কাষ্ঠ

পাওয়া যায়। উহাদের মধ্যে চাপলাশ, চিকরাশি, গোলাপ, শিশু, গর্জন, তেলসুব, নাহার, পুন, তুন প্রভৃতি কাষ্ঠ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(২) **মৌসুমী পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য** (Monsoon deciduous forests)—মালভূমির উত্তর-পূর্বে, পশ্চিমে এবং উত্তরের সমভূমি ও অবহিমালয় অঞ্চলের যে সমস্ত স্থানে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সাধারণতঃ ৪০"-৮০"-র মধ্যে সেখানে মৌসুমী পর্ণমোচী বৃক্ষেব অবণ্য দৃষ্ট হয়। ইহাই ভাবতের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য স্বাভাবিক উদ্ভিদ্। তবে প্রয়োজনের তাগিদে সমভূমিব অন্তর্গত এই শ্রেণীর অবণ্যাঞ্চল পবিষ্কৃত করিয়া কৃষিকার্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই অঞ্চলেব বৃক্ষসমূহ অতি মূল্যবান। এই বনভূমি হইতে শাল, সেগুন, অর্জুন, জারুল, বহেড়া, গামারি, তুঁত, আবলুস, খয়ের, শিরিষ, শিমূল, হরীতকী, মহুয়া, পলাশ, কুসুম, অঞ্জন, পাদুয়াক, কিন্দল, লরেল প্রভৃতি মূল্যবান কাষ্ঠ ও বাঁশ পাওয়া যায়।

(৩) **গুল্ম ও তৃণভূমি** (Shrubland)—যে সমস্ত স্থানে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০"-৪০" পর্যন্ত এবং গ্রীষ্মে অসহ্য গরম ও শীতে অসহ্য শীত অনুভূত হয় সে সমস্ত স্থানে কাঁটাযুক্ত বাবলা জাতীয় গাছ বা গুল্মভূমি দেখা যায়। পাঞ্জাব, উত্তর-প্রদেশ, রাজস্থান এবং দক্ষিণ ভারতের অংশবিশেষে এই জাতীয় গুল্মলতা দৃষ্ট হয়। মধ্য ও দক্ষিণ ভাবতেব মালভূমিব একাংশে, পার্বত্য অরণ্যভূমির মধ্যে মধ্যে এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের স্থানে স্থানে "স্যাভানা" তৃণভূমির অনুরূপ বিস্তীর্ণ তৃণক্ষেত্রও দেখিতে পাওয়া যায়। সাবাই ঘাস এই সমস্ত তৃণভূমিতে প্রচুর জন্মে। ইহা হইতে কাগজ ও দড়ি প্রস্তুত হয়।
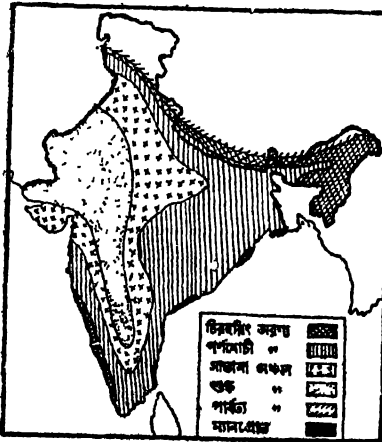
২৬ নং চিত্র—ভারতের স্বাভাবিক উদ্ভিদ্ অঞ্চল

(৪) **মরু ও মরুপ্রায় অঞ্চলের উদ্ভিদ্** (Desert and semi-desert vegetation)—পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান ও মালভূমির মধ্যাঞ্চলে যে সমস্ত স্থানে বৃষ্টিপাত ২০"-র অনধিক সেই সমস্ত স্থানে কাঁটা ও শাঁসালো ডাঁটাযুক্ত এবং দীর্ঘমূলবিশিষ্ট ছোট ছোট বৃক্ষ দেখা যায়। ইহাদিগকে মরু ও মরুপ্রায় অঞ্চলের উদ্ভিদ্ (xerophytes) বলে। বাবুল, ফণীমনসা, তেশিরা প্রভৃতি এই

অঞ্চলের বিখ্যাত বৃক্ষ। জ্বালানি হিসাবে এই সকল কাষ্ঠের ব্যবহার অত্যধিক। এই জাতীয় বৃক্ষ হইতে গঁদ প্রস্তুত হয় এবং ইহাদের ছাল রাসায়নিক শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

(৫) **জলাভূমির অরণ্য** (Mangrove swamps)—সমুদ্রোপকূলে ও বৃহৎ নদীর বদ্বীপে যেখানে সর্বত্রই লোনা জল প্রবাহিত হয় সেখানে জলাভূমির অরণ্য দৃষ্ট হয়। তালজাতীয় বৃক্ষ, নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষ এই শ্রেণীর অরণ্যে প্রচুর জন্মে। সুন্দরবনের অরণ্য এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই অঞ্চলের বৃক্ষসমূহ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। চর্মরঞ্জনদ্রব্য ও মধু এই অঞ্চলের অরণ্য হইতে প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হয়। সুন্দরবনের সুন্দরী ও পুশুর কাষ্ঠ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(৬) **হিমালয় পর্বতাঞ্চলের অরণ্য** (Himalayan forests)—এই অরণ্যাঞ্চলকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। (ক) পশ্চিম হিমালয়ের অরণ্য—পাদদেশ হইতে ৩০০০′ পর্যন্ত গুল্মভূমি, ৩০০০′-৬০০০′ পর্যন্ত চীর পাইন, ৬০০০′-১০,০০০′ পর্যন্ত স্প্রুস, ফার, সিডার প্রভৃতি সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য, এবং ১০,০০০′-১৫,০০০ পর্যন্ত আল্পীয় উদ্ভিদ্ অঞ্চলে রডোডেনড্রন জন্মে। ১৫,০০০ ফুটের ঊর্ধ্বে উদ্ভিজ্জ জন্মে না। (খ) পূর্ব হিমালয়ের অরণ্য—পাদদেশ হইতে ৪০০০′ পর্যন্ত শাল প্রভৃতি পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য, ৪০০০′ ৮০০০′ পর্যন্ত ওক, লরেল, মেপল, বার্চ, অল্ডার প্রভৃতি চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য, ৮০০০′-১২০০০′ পর্যন্ত শ্বেতফার, স্প্রুস এবং দেবদারু প্রভৃতি সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য, এবং ১২০০০′-১৬০০০′ পর্যন্ত রডোডেনড্রন, জুনিপার প্রভৃতি বৃক্ষের অরণ্য জন্মে। ১৬০০০ ফুটের ঊর্ধ্বে উদ্ভিজ্জ-বিস্তার নাই। এই অঞ্চলের বৃক্ষসমূহের মধ্যে বার্চ, সাইপ্রাস, পাইন, স্প্রুস, ফার, দেবদারু প্রভৃতি প্রধান।

ভারতের বনভূমির আয়তন—ভারতের সমগ্র আয়তনের মাত্র ২১·৮% অর্থাৎ ৬·৯৫ লক্ষ বর্গ কি. মি. বনভূমি—মাথাপ্রতি মাত্র ০·২ হেক্টার। তবে এই বনভূমির বণ্টন সর্বত্র সমান নহে। উত্তর পশ্চিম ভারতের ১১% ও মধ্যাঞ্চলের ৪৪% ভূমি বনময়। আবার নিবিড় বসতিপূর্ণ ও কৃষিসমৃদ্ধ গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলে বনভূমির পরিমাণ নিতান্তই সামান্য। ১৯৫২ সালে বন সংক্রান্ত যে সর্বভারতীয় নীতি গৃহীত হয় তাহাতে বলা হয় যে ভারতে বনভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ৩৩%-এ দাঁড় করাইতে হইবে। ইহার মধ্যে ৬০% বনভূমি পার্বত্য অঞ্চলে ও ২০% বনভূমি সমভূমি অঞ্চলে থাকিবে। ভারতে বনভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৫০ সাল হইতেই বিভিন্ন স্থানে বনমহোৎসব সুরু হয়, তদবধি ইহা একটি বার্ষিক উৎসবে পরিণত হইয়াছে। পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত পরিসংখ্যান হইতে ভারতের বনভূমির আয়তন বুঝা যাইবে।

ভারতের বনভূমির আয়তন (বর্গ কি. মি.)

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১	১৯৬১-৬২
(১) উৎপাদনের দিক হইতে	৫,৮৪,৫৯৯	৫,৬৪,৯৩৬	৫,০৯-৮০৭	৫,২৭,০৯১
(ক) বিপণনযোগ্য	১,৩৩,৪৩১	১,৩৮,৭২৫	১,৬৪,১৫৪	১,৫৯,৩৩৩
(খ) অনধিগম্য				
মোট	৭,১৮,০৩০	৭,০৩,৬৬১	৬,৮৯,৫৫০[২]	৬,৯৫,০১৩[২]
(২) আইনের দিক হইতে				
(ক) সঙ্কিত	৩,৪৪,৪০৫	৩,৫৯,৪৬৮	৩,১৬,০৯১	৩,১২,২৯২
(খ) সংরক্ষিত	১.১৭,৯২৮	১,৬৮,৫২৩	২,৪০,৫৭২	২,৩৭,২১৮
(গ) অন্যান্য	২,৫৫,৬৯৭	১,৭০,২৪১	১,১২,০৯৫	১,২৪,৫৫১
মোট	৭,১৮,০৩০	৭,০৩,৬৬১[১]	৬,৮৯,৫৫০[৩]	৬,৯৫,০১৩[৪]
(৩) গঠনের দিক হইতে				
(ক) সরলবর্গীয়	৩৬,৩০৪	২৫,২১৬	৪৩,০৫৬	৪৩,৪৮১
(খ) পর্ণমোচী				
(৴০) শাল	১,০৫ ৫৩৫	১,০৮,৩৮৯	১,১৩,৫০৯	১,০৪,৫৬১
(৵) সেগুন	৪৯,৪৭০	৫৮,১৩২	১,৮৭,৫০৩	৮১,৪৮৪
(৶) অন্যান্য	৫.৩২,৭২১	৫,০৬,৭৯৫	৪,৬৫,৪৮৭	৪,৬৫,৪৮৭
মোট	৭,১৮,০৩০	৭,০৩,৬১৬[১]	৬,৮৯,৫৫০	৬,৯৫,০১৩

১ ৫৪২৯ বর্গ কি. মি. পরিগিত বনভূমির বিবরণ অজ্ঞাত।

২ ১৫,৫৮৯ বর্গ কি. মি. পরিমিত বনভূমির বিবরণ অজ্ঞাত।

৩ ২০,৭৯২ বর্গ কি. মি. পবিমিত বনভূমির বিবরণ অজ্ঞাত।

৪ ২০,৯৫২ বর্গ কি. মি. পবিমিত বনভূমির বিববণ অজ্ঞাত।

ভারতের বনজ সম্পদ (Forest Products of India)—ভারতে অরণ্যাঞ্চলসমূহ হইতে আহৃত সম্পদকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—প্রধা বা মুখ্য বনজ সম্পদ এবং অপ্রধান বা গৌণ বনজ সম্পদ। **প্রধান বনজ সম্প** (Major products) বলিতে নির্মাণ কার্যে ব্যবহৃত নানাবিধ কাষ্ঠ ও জ্বালানীকে বুঝায়। নির্মাণ কার্যে ব্যবহৃত কাষ্ঠের বার্ষিক আভ্যন্তরীণ উৎপাদ ১৮ লক্ষ টন। আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও আমদানী দ্বারা লব্ধ এই শ্রেণীর কাষ্ঠে মোট সরবরাহ প্রতি বৎসর ২১ লক্ষ টন। ইহার মধ্যে ৭ লক্ষ টন নরম ও ১৪ লক্ষ টন কঠিন কাষ্ঠ। এই ২১ লক্ষ টন কাষ্ঠের প্রায় ৩০%* (৫'৮ লক্ষ টন) বিভিন্ন সরকারী কার্যে, যেরূপ রেলপথের পাটাতন নির্মাণ এবং নানাবি সামরিক ও বেসামরিক কার্যে ব্যয়িত হয় এবং অবশিষ্ট ৭০% বিভি বে-সরকারী কার্যে, যেরূপ দিয়াশলাই, প্যাকিং বাক্স, প্লাইউড, চায়ের বা প্রভৃতি শিল্পে (৩'৩৫ লক্ষ টন) এবং গৃহাদি নির্মাণে (১১'৯৫ লক্ষ টন) ব্যবহৃত হয়। আসবাবপত্র নির্মাণে গোলাপ গন্ধ, চিকরাশি, চাপলাশ, তুন শাল, সেগুন, গামারি, আবলুস, শিরিষ, বার্চ, প্রভৃতি ; গৃহাদি নির্মাণে চি

রাঁশি, গর্জন, পুন, শাল, জারুল, সাইপ্রাস প্রভৃতি, প্যাকিং বাক্স ও দিয়াশলাই প্রস্তুত করিতে চাপলাশ, বহেড়া, শিমূল, পাইন, স্প্রুস, ফার, দেবদারু, পুশুর প্রভৃতি, রেলপথের পাটাতন, জাহাজ, নৌকা প্রভৃতি নির্মাণে সুন্দরী, চাপলাশ, গোলাপ গন্ধ, গর্জন, তেলসুর, নাহার, শাল, সেগুন, অর্জুন, জারুল, গামারি, পাইন, স্প্রুস প্রভৃতি, হকি, ক্রিকেট ও টেনিস খেলার ব্যাট নির্মাণে তুঁত, ছড়ি ও ছড়ির বাঁট নির্মাণে আবলুস, ও কাগজের মণ্ড নির্মাণে দেবদারু, পাইন প্রভৃতি বৃক্ষের কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়।

ভারতে জ্বালানী কাষ্ঠের বার্ষিক উৎপাদনের হার প্রায় ৫৭ লক্ষ টন অর্থাৎ মাথাপিছু প্রায় ০'০২ টন। অথচ প্রতি বৎসর পৃথিবীতে গড়ে মাথাপ্রতি ০'৩৪ টন জ্বালানী কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়। জ্বালানী হিসাবে এদেশে বাবুল, ফণী মনসা, তেশিরা, সুন্দরী প্রভৃতি কাষ্ঠের ব্যবহার অধিক।

নিম্নের পরিসংখ্যান হইতে ভারতে নানাবিধ কার্যে ব্যবহৃত কাষ্ঠ ও জ্বালানী কাষ্ঠের উৎপাদন বুঝা যাইবে :—

ভারতে কাষ্ঠ ও জ্বালানী কাষ্ঠের উৎপাদন

বৎসর	পরিমাণ (হাজার ঘন মিটার)						মোট মূল্য (হাজার টাকা)
	নির্মাণ কার্যে ব্যবহৃত কাষ্ঠ	অন্যান্য কার্যে ব্যবহৃত কাষ্ঠ	মণ্ড ও দিয়াশলাই প্রস্তুতির কাষ্ঠ	জ্বালানী কাষ্ঠ	কাঠ কয়লা উৎপাদনের উপযোগী কাষ্ঠ	মোট উৎপাদন	
১৯৫০-৫১	২৯,৯২	৮,৩৭	১৩	১,১১,৬৬	৭,৮১	১,৫৭,৮৯	১৯,০৮,০৭
১৯৫৫-৫৬	৩৩,৯৪	৭,২০	৭২	৯২,৩	১৫,৭৬	১,৪৯,৬৫	২৭,৬৮,৮২
১৯৬০-৬১	৪৫,২৬	৭,৫৩	৪৭	১,১৩ ৩৫	২,৮১	১,৬৯,৪৪	৪৯,১৭,০৭
১৯৬১-৬২	৪২,০০	১০,২১	২,১৫	১ ০৩ ৪৮	৪,০৩	১,৬১,৮৭	৫০,১৩,৭৫

উপরোক্ত প্রধান বনজ সম্পদ ব্যতীত ভারতীয় অরণ্যাঞ্চল হইতে প্রচুর **অপ্রধান বনজ সম্পদ** (Minor products)-ও আহৃত হয়। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, উড়িষ্যা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলের অরণ্য হইতে **লাক্ষা** পাওয়া যায়। লাক্ষা উৎপাদনে ভারতের প্রাধান্য খুব বেশী। বার্নিশ, ছাপাখানার কাজ, গ্রামোফোনের রেকর্ড প্রভৃতিতে ইহার ব্যবহার প্রচুর। দেশাভ্যন্তরে ইহার চাহিদা অল্প থাকায় প্রায় সমুদয় লাক্ষাই কলিকাতা

বন্দর হইতে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী ও জাপানে রপ্তানী হইয়া যায়। হিমালয় ও আসামের পর্বতাঞ্চলে চীরপাইন বৃক্ষ হইতে **ধুনা** উৎপাদিত হয়। ইহা হইতে **তার্পিন** তৈলও পাওয়া যায়। কাচের সহিত মিশাইবার জন্য এবং কাগজ, ঔষধ, বার্নিশ ও সাবান প্রস্তুতিতে ধুনা ব্যবহৃত হয়। তামিলনাড়ু মহারাষ্ট্র, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে **হরীতকী** জন্মে। ঔষধ ও রঞ্জনদ্রব্য প্রস্তুতিতে এবং চামড়া পাকা করিতে হরীতকী প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। যুক্তরাজ্য, জার্মানী, বেলজিয়াম, চীন, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে প্রচুর হরীতকী ভারত হইতে রপ্তানী হয়। দার্জিলিং ও নীলগিরি পর্বতাঞ্চলের বৃষ্টিবহুল অংশে **সিঙ্কোনা** বৃক্ষের চাষ হয়। ইহার ছাল হইতে কুইনাইন পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গ ও মালাবার উপকূলে প্রচুর **সুপারি** জন্মিয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গ ও পাঞ্জাবে প্রচুর **তালবৃক্ষ** জন্মে। তালের রস হইতে গুড় প্রস্তুত হয়। মরু অঞ্চলে **খেজুর** বৃক্ষ জন্মে। ইহা হইতে খেজুর পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গ ও উপদ্বীপের বিভিন্ন স্থানে যে খেজুর গাছ জন্মে তাহার রস হইতে গুড়, চিনি ও তাড়ি প্রস্তুত হয়। উড়িষ্যা, ত্রিপুরা, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর **বাঁশ** জন্মে। বাঁশ হইতে কাগজের মণ্ড প্রস্তুত করা হয়। চন্দন (মহীশূর), নানাবিধ তৈল এবং মূল্যবান ভেষজ দ্রব্য, বেত, খস, সোলা, হোগলা, মাদুর কাঠি, সাবাই ঘাস প্রভৃতিও অরণ্যাঞ্চল হইতে সংগৃহীত হয়।

নিম্নের পরিসংখ্যান হইতে ভারতে উৎপাদিত অপ্রধান বনজ সম্পদের মূল্যগত পরিমাণ বুঝা যাইবে।

ভারতের অপ্রধান বনজ সম্পদের মূল্যগত পরিমাণ

(হাজার টাকা)

সাল	বাঁশ ও বেত	তন্তু ও রেশম সদৃশ বস্তু	গঁদ ও ধুনা	অন্যান্য অপ্রধান বনজ সম্পদ	মোট মূল্য
১৯৫০-৫১	১,৫২,২৭	৫২	৪১,৯৩	৪,৯৮,০৩	৬ ৯২,৪৮
১৯৫৫-৫৬	১,৩৬,৭৮	৪৩	১,০১,৪১	৫,৬৩,১১	৮,০১ ৭৪
১৯৬০-৬১	২,১৬,৯৯	৪১	২ ০৪,৭৮	৬,৯০,৭৫	১১,১২,৯৫
১৯৬১-৬২	২,৪১,৮৬	৫৫	২,০৫ ৯৩	৭,৬২,২৭	১২,১০ ৬১

ভারতের বনজ শিল্পের অনুন্নতির কারণ (**Causes of backwardness of Indian forestry**)—বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও নিম্নলিখিত কারণ বশতঃ ভারতের বনজশিল্প দ্রুত উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছে

না। (১) ভারতের বনাঞ্চলসমূহ সাধারণতঃ দুর্গম, যাতায়াতের সুব্যবস্থা নাই; (২) বন হইতে কাষ্ঠ আহরণ করিবার উপযোগী যানবাহনের অভাব; (৩) কাষ্ঠের ব্যাপক চাহিদার অভাব; (৪) এক জাতীয় বহুসংখ্যক বৃক্ষের একত্র সমাবেশের অভাব; (৫) উপযুক্ত বনসংরক্ষণ ব্যবস্থার অভাব এবং (৬) কাগজ প্রস্তুত করিতে মণ্ড তৈয়ারীর জন্য নরম কাষ্ঠ প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহের অসুবিধা। ভারতে বনজ সম্পদসমূহের যথাযথ ব্যবহার, শিল্পে ইহাদের প্রয়োগ বৃদ্ধি, এই সম্পদের সুষ্ঠু সংরক্ষণ এবং ইহাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি দৃঢ় করিবার জন্য দেরাদুনে ভারতীয় **বনবিজ্ঞান গবেষণাগার** (Forest Research Institute) গবেষণা কার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে।

প্রশ্নোত্তর

1. What are the direct and indirect utilities of forests? (U. E. '66) Describe the different forest regions of the world and discuss the nature of their economic exploitations. (P. U. '64) (অরণ্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকারিতা কি কি? পৃথিবীর অরণ্যসমূহের শ্রেণী বিভাগ সাধন ও উহাদের প্রত্যেকটি বিভাগের বর্ণনা কর এবং উহাদের ব্যবহার সম্পর্কে যাহা জান লিখ।) (পৃঃ ১২৮-১৩২)

2. Indicate the regions of soft wood coniferous forests in the world and examine the nature of exploitation of these forests. (U. E. '66) (পৃথিবীর যে সমস্ত অঞ্চলে কোমল কাষ্ঠ যুক্ত বৃক্ষের অরণ্য রহিয়াছে তাহাদের নাম লিখ এবং এই অরণ্যাঞ্চল সমূহের ব্যবহার সম্পর্কে বিশদ আলোচনা কর।) (পৃঃ ১৩০-১৩২)

3. Describe the principal types of forests in India stating their geographical location. Give an account of the forest products of India. Discuss the problems of proper use of forest products of India. (U. E. '66, '67, H. S, '65). (আঞ্চলিক অবস্থান সহ ভারতের প্রধান প্রধান অরণ্য সংস্থানের বর্ণনা কর। ভারতের বনজ সম্পদের বিবরণ লিখ।) (পৃঃ ১৩২-১৩৪, ১৩৫-১৩৮)

4. Name the countries where timber industry has developed, giving reasons for such development. Also indicate the present state of the industry in India. (পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে কাষ্ঠ শিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে তাহাদের নাম লিখ এবং ঐ সমস্ত দেশে এই শিল্প প্রসারের কারণসমূহ উল্লেখ কর। এই শিল্প সম্পর্কে ভারতের বর্তমান অবস্থাও নির্দেশ কর।) (H. S. '61) (পৃঃ ১২৯, ১৩১-১৩২, ১৩৫-১৩৬)

5. Give the characteristics of equatorial forests and mention their important products. (P. U. '66) (নিরক্ষীয় অরণ্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখ এবং ঐ অরণ্যে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যাদির উল্লেখ কর।) (পৃঃ ১৩১, ১২৮-১২৯)

অষ্টম অধ্যায়

খনিজদ্রব্য ও শক্তি সম্পদ

(Minerals and Power Resources)

খনিজ (Minerals)—স্বভাবতঃ একই উপাদানে গঠিত বা সামান্য পরিবর্তিত যে সকল রাসায়নিক প্রক্রিয়াজাত যৌগিক পদার্থ শিলাস্তরে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদিগকে খনিজ বলে। যেমন—কয়লা, খনিজ তৈল ইত্যাদি। খনিজ মাত্রই যে খনি হইতে খনন করিয়া বাহির করিতে হয় এমন নহে, কখন কখন ইহা ভূমির উপরিভাগেও পাওয়া যায়—যেমন, স্বর্ণ, লৌহ প্রভৃতি।

খনিজ দ্রব্য ও খনিজ শিল্পের বৈশিষ্ট্য (Features of minerals and mining)—খনিজ শিল্পের কতকগুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। **প্রথমতঃ,** খনিজ পদার্থের জন্ম অতীতের ভূসংস্থানের উপর নির্ভরশীল, মানুষের আয়ত্তাধীন নহে। অতীতের ভূসংস্থানের উপর নির্ভরশীল বলিয়া খনিজ সম্পদ পৃথিবীর সর্বত্র সমভাবে বণ্টিত নহে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে পৃথিবীর ৯০% নিকেল আসে ক্যানাডার অন্টেরিও রাজ্য হইতে এবং পটাশের প্রায় সমস্ত অংশই আসে ফ্রান্স ও জার্মানী হইতে। অন্যান্য খনিজ দ্রব্যের ক্ষেত্রেও অনুরূপ অবস্থাই পরিলক্ষিত হয়। **দ্বিতীয়তঃ,** খনিজ সম্পদের পরিমাণ একান্ত সীমাবদ্ধ এবং ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে ইহা দ্রুত নিঃশেষ হইয়া যায়। ইহার পরিমাণ সীমাবদ্ধ বলিয়া প্রত্যেক দেশই আর্থিক দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদের জন্য অধিকসংখ্যক খনির উপর অধিকার স্থাপনে সচেষ্ট হয়। **তৃতীয়তঃ,** ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে খনিজ সম্পদের নিঃশেষ এবং অঞ্চলবিশেষের সহিত ইহার অবিচ্ছেদ্য সংযোগ হেতু খনিজ দ্রব্যের ন্যায় অপর কোন সম্পদই বিশ্বের রাজনীতিকে এত অধিক প্রভাবান্বিত করিতে পারে নাই। উদাহরণস্বরূপ মধ্যপ্রাচ্যের তৈল-সম্পদ এবং লোরেনের লৌহ আকরিক সম্পদের অধিকার লইয়া জাতিতে জাতিতে বিরোধের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। **চতুর্থতঃ,** খনি যতই নিঃশেষ হইতে থাকে উহা হইতে খনিজ দ্রব্যের উত্তোলন-ব্যয়ও ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ক্রমক্ষীয়মাণ উৎপাদনের বিধি (Law of Diminishing Returns) কৃষিকার্যের পক্ষে যেরূপ প্রযোজ্য খনিজ শিল্পের পক্ষেও তদ্রূপ প্রযোজ্য হইয়া থাকে। **পঞ্চমতঃ,** একবার ব্যবহারেই অধিকাংশ খনিজ সম্পদ নিঃশেষ হইয়া যায়, যেরূপ কয়লা, খনিজ তৈল প্রভৃতি ; তবে কয়েকটি খনিজ সম্পদ, যেরূপ তাম্র, স্বর্ণ একবার

ব্যবহারেই নিঃশেষিত হয় না বলিয়া ইহাদিগকে একাধিকবার ব্যবহার করা যাইতে পারে। **ষষ্ঠতঃ,** খনিজ সম্পদের প্রলোভন এবং উহাদের আঞ্চলিক অবস্থিতি মানুষকে প্রতিকূল পরিবেশযুক্ত অঞ্চলেও উপনিবেশ স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করে। নাইট্রেট সম্পদের জন্য চিলির আটাকামা মরু অঞ্চলে এবং স্বর্ণের জন্য অস্ট্রেলিয়ার মরু অঞ্চলে লোকবসতি ইহারই উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্তস্বরূপ, এবং **সপ্তমতঃ,** প্রতিকূল পরিবেশযুক্ত অঞ্চলে খনিসমূহ একবার নিঃশেষ হইয়া গেলে খনির শ্রমিকেরা অপর কোন খনির সন্ধানে অন্যস্থানে চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়; ফলে খনিজ সম্পদের আহরণ বহুক্ষেত্রে মানুষকে যাযাবর-বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য করে।

খনিজ দ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ (Classification of minerals)—শিল্প ও বাণিজ্যে যে সমস্ত খনিজ দ্রব্য প্রতিনিয়তই ব্যবহৃত হইতেছে তাহাদিগকে সাধারণতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়:—(১) **ধাতব খনিজ** (metallic minerals)—ইহাদের আবার চারিটি উপবিভাগ রহিয়াছে:—(ক) মূল্যবান ধাতব খনিজ (precious metals)—স্বর্ণ, রৌপ্য, প্লাটিনাম, (খ) লৌহবর্গীয় ধাতব খনিজ (ferrous metals)—লৌহ, (গ) অলৌহবর্গীয় (nonferrous metals) ধাতব খনিজ—তাম্র, দস্তা, সীসক, রাং, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি, (ঘ) লৌহসংকর ধাতব খনিজ (ferro-alloys)—ম্যাঙ্গানীজ, টাংস্টেন, ক্রোমিয়াম, নিকেল, মলিবডেনাম, ভ্যানেডিয়াম প্রভৃতি। (২) **অধাতব খনিজ** (non-metallic minerals)—ইহাদের আবার তিনটি উপবিভাগ রহিয়াছে:—(ক) স্থাপত্য-শিল্পে ব্যবহৃত খনিজ (structural minerals), যেমন, অ্যাস্‌বেস্‌টস্, অ্যাসফাল্ট, জিপসাম প্রভৃতি, (খ) রসায়ন শিল্পে ব্যবহৃত খনিজ (chemical minerals), যেমন গন্ধক, লবণ, পটাশ প্রভৃতি, এবং (গ) বিবিধ কার্যে ব্যবহৃত খনিজ (miscellaneous minerals), যেমন অভ্র, গ্রাফাইট, বক্স প্রভৃতি; (৩) **খনিজ জ্বালানী** (fuel minerals) —কয়লা, খনিজ তৈল ইত্যাদি।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য খনিজসম্পদ

(১) লৌহবর্গীয় খনিজ

লৌহ (Iron)

লৌহ আকরিক (Iron ore)—নানাবিধ আকরিক হইতে লৌহ পাওয়া যায়। উহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত চারিটি আকরিকই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (১) **ম্যাগনেটাইট** (কৃষ্ণবর্ণ), ইহাতে প্রায় ৭২% লৌহ থাকে। (২) **হেমাটাইট** (রক্তবর্ণ), ইহাতে প্রায় ৭০% লৌহ থাকে। (৩) **লিমোনাইট**

(পীতাভ বাদামীবর্ণ), ইহাতে প্রায় ৬০% লৌহ থাকে। (৪) **সিডেরাইট** (বাদামী ও ধূসর বর্ণ) ইহাতে প্রায় ৪৮%লৌহ থাকে। লৌহের সহিত যে সমস্ত বস্তুর মিশ্রণ থাকে উহাদের প্রভাবেও অনেক ক্ষেত্রে লৌহের গুণাগুণ নির্ধারিত হয়। ফসফরাসের সহযোগে যেমন লৌহ ভঙ্গুর হইয়া উঠে, তেমনই সামান্য ম্যাঙ্গানীজ বা ক্রোমিয়ামের সহযোগে লৌহের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। পৃথিবীর কোন অঞ্চলে উৎপাদিত লৌহ আকরিকের গুরুত্ব নির্ভর করে ইহার অন্তর্গত লৌহ ভাগের পরিমাণের আধিক্য, খননের সহজসাধ্যতা ও সুলভতা, পরিবহন ব্যবস্থার সুবিধা এবং সংকর ধাতু ও শক্তি সম্পদ সরবরাহের প্রাচুর্যের উপর।

লৌহের ব্যবহার (Uses of iron ore)—লৌহ আকর হইতে প্রস্তুত ইস্পাতের যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, রেলএঞ্জিন, রেললাইন, রেলের বগী, রেলের চাকা, জাহাজ, মোটর গাড়ী, দেশরক্ষার প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি নানাবিধ কার্যে ব্যবহৃত হয়। বস্তুতঃ, আধুনিক শিল্প, কৃষি, পরিবহন ও দেশরক্ষার ব্যবস্থা লৌহ ও ইস্পাতের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল।

প্রধান প্রধান লৌহ আকরিক উৎপাদক অঞ্চল (Principal iron ore producing countries)—(ক) **উত্তর আমেরিকা—যুক্তরাষ্ট্র** পৃথিবীর ৩০%-এরও অধিক লৌহ উৎপাদন করে। যুক্তরাষ্ট্রের **হ্রদ অঞ্চলেই** সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ লৌহক্ষেত্রসমূহ অবস্থিত। এতদঞ্চলের আকরিক লৌহ প্রধানতঃ (১) মিনেসোটার (৭০%) অন্তর্গত মেসাবি, ভারমিলিয়ন ও কুইনা খনিসমূহ এবং (২) মিচিগানের (৩০%) অন্তর্গত মারকোয়েট, মেনোমিনি ও গোগোবিক অঞ্চল—এই দুইটি অঞ্চল হইতেই পাওয়া যায়। এতদঞ্চলের আকরিক প্রধানতঃ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হেমাটাইট বর্গীয়। হ্রদ অঞ্চলের আকরিক-লৌহ হ্রদ-পথে মিচিগান ও ইরি হ্রদ-সংলগ্ন লৌহ ও ইস্পাত কেন্দ্রসমূহে এবং পিটস্‌বার্গের লৌহ ও ইস্পাত কেন্দ্রে ব্যবহৃত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে দক্ষিণ আপালাচিয়ান কয়লাখনির অন্তর্গত **আলাবামা** রাজ্যেও লৌহ আকরিত হয়। আলাবামার লৌহ আকরিক উচ্চশ্রেণীর না হইলেও উহা হইতে সস্তায় ইস্পাত প্রস্তুত করা যায়। উইসকনসিন, নিউইয়র্ক, পেনসিলভ্যানিয়া এবং রকি পর্বতাঞ্চলেও সামান্য পরিমাণ লৌহ আকরিত হয়। যথেষ্ট উৎপাদন সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র সুইডেন, স্পেন প্রভৃতি দেশ হইতে আকরিক আমদানী করিয়া থাকে। **ক্যানাডা** (অন্টেরিও, আলবার্টা, স্যাসকাচুয়ান, রকি পর্বতাঞ্চল, নোভাস্কোসিয়া ও নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড) ও **মেক্সিকোতে** সামান্য পরিমাণে লৌহ আকরিক পাওয়া যায়।

(খ) **ইউরোপ**—ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে লৌহ আকরিক উৎপাদনে প্রথম এবং সমগ্র পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে **ফ্রান্স**। ফ্রান্সের

লোরেন, নর্মাণ্ডি, ব্রিটানী এবং পীরেনীজ পর্বতাঞ্চলে প্রচুর লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। তবে ইহাদের মধ্যে লোরেনের লৌহখনিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লোরেনের লৌহ আকরিক নিকৃষ্ট শ্রেণীর লিমোনাইট বর্গীয়। **জার্মানীর** সিজারল্যাণ্ড, ভোজেলস্বার্গ, পাইন ও স্যালজিটার খনিতে লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। জার্মানীর লৌহ আকরিক নিম্নশ্রেণীর এবং উৎপাদনের পরিমাণ স্থানীয় চাহিদা মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। সেই কারণে ফ্রান্স ও সুইডেন হইতে জার্মানী তাহার প্রয়োজনীয় লৌহ আকরিকের অধিকাংশই আমদানী করিয়া থাকে। **যুক্তরাজ্যের** অধিকাংশ লৌহ প্রধানতঃ দুইটি অঞ্চল হইতেই আকরিত হয়—(১) নর্দাম্পটনশায়ার, লিংকনশায়ার ও উত্তর ইয়র্কশায়ারের অন্তর্ভুক্ত ক্লীভল্যাণ্ড অঞ্চলের খনিসমূহ হইতে—এতদঞ্চলের লৌহ আকরিক নিকৃষ্ট শ্রেণীর ; এবং (২) কাম্বারল্যাণ্ড ও উত্তর ল্যাঙ্কাশায়ারের খনিসমূহ হইতে। এতদঞ্চলের আকরিক উচ্চশ্রেণীর হেমাটাইট বর্গীয়। দেশাভ্যন্তরে আকরিকের উৎপাদন যথেষ্ট নহে বলিয়া স্পেন, আলজেরিয়া, সিয়েরা লিওন, সুইডেন প্রভৃতি দেশ হইতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লৌহ আকরিক আমদানী করিতে হয়। **সুইডেনের** উত্তর ও মধ্যাঞ্চলে প্রচুর উচ্চশ্রেণীর (ম্যাগনেটাইট) লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। উত্তরাঞ্চলে কিরুনাভারা ও গেলিভারা লৌহখনি এবং মধ্যাঞ্চলের ডেনেমোরা লৌহখনি জগদ্বিখ্যাত। কয়লার অভাব হেতু সুইডেনের আকরিক লৌহের অধিকাংশই নার্ভিক বন্দর দিয়া বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়। দঃ সুইডেনের কোপাবার্গ অঞ্চলেও লৌহ আকরিত হয়। **নরওয়ের** উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চলে প্রচুর লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। **স্পেনের** বিস্কে উপসাগর সন্নিহিত স্যানটানডার এবং বিলবাও প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। দক্ষিণে আলমেরিয়ার চতুর্দিকেও লৌহ আকরিকের খনি রহিয়াছে। স্পেনের অধিকাংশ লৌহ আকরিক গ্রেটব্রিটেন, ইতালী ও জার্মানীতে রপ্তানী হইয়া থাকে। পৃথিবীর মোট লৌহ আকরিক উৎপাদনের মাত্র ২ ভাগ **ইতালী** উৎপাদন করে। এলবা দ্বীপেই ইতালীর অধিকাংশ লৌহ আকরিক উৎপন্ন হয়। **বেলজিয়াম ও লুক্সেমবুর্গ** প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লৌহ আকরিক উৎপাদন ও রপ্তানী করে। চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, সুইজারল্যাণ্ড এবং যুগোস্লাভিয়া লৌহ আকরিকের অন্যান্য উৎপাদক অঞ্চল।

(গ) **সোভিয়েট রাষ্ট্র**—বর্তমানে লৌহ আকরিক উৎপাদনে সোভিয়েট রাষ্ট্র পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। ইউরোপীয় রুশিয়ার অন্তর্গত (১) ইউক্রেনের ক্রিভয়রগ, (২) ইউরালের ম্যাগনিটোগর্স্ক, (৩) কোলা উপদ্বীপ, (৪) মার্মানস্ক উপদ্বীপ, এবং (৫) দক্ষিণ ইউরালের ওর্স্ক অঞ্চলে

আকরিক লৌহ উত্তোলিত হয়। এশীয় রুশিয়ার অন্তর্গত (১) কুর্স্ক ও (২) কুজবাজ অঞ্চলেও আকরিক লৌহ পাওয়া যায়।

(ঘ) **এশিয়া**—সমগ্র এশিয়া মহাদেশ পৃথিবীর ৭% লৌহ উৎপাদন করে। **ভারতের** অন্তর্গত উড়িষ্যার বোনাই, কেওনঝড়, এবং ময়ুরভঞ্জের লৌহখনি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু ও মহীশূরে লৌহখনি রহিয়াছে। ভারতের লৌহ আকরিক উৎকৃষ্ট হেমাটাইট বর্গীয় এবং সঞ্চিত লৌহ আকরিকের পরিমাণের দিক হইতে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বী। উত্তর ও দক্ষিণ **চীনের** বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বহু লৌহখনি রহিয়াছে। ইয়াংসি উপত্যকা এবং সাংটাং উপদ্বীপই প্রধান লৌহ উৎপাদন কেন্দ্র। হনসুর পুর্ব উপকূলের সেনিন খনি এবং হোক্কাইডোর মোরোরান খনি হইতে **জাপানের** অধিকাংশ লৌহ আকরিক সংগৃহীত হয়। জাপানের লৌহ অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর। **কোরিয়া ও ফরমোসাতেও** সামান্য লৌহ পাওয়া যায়। **মাঞ্চুরিয়ার** লৌহ-ক্ষেত্রসমূহ মুকদেনের দক্ষিণাংশে অবস্থিত। মালয় ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জেও লৌহ উত্তোলিত হয়। পাকিস্তানে লৌহের খনি নাই বলিলেই চলে।

(ঙ) **আফ্রিকা**—উত্তর আফ্রিকার মরক্কো, আলজেরিয়া এবং টিউনিস অঞ্চলে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সম্মেলনে খনিজ লৌহ পাওয়া যায়। এই সমস্ত খনিজ লৌহ ইউরোপীয় দেশসমূহে রপ্তানী হয়। পশ্চিম আফ্রিকার অন্তর্গত সিয়েরালিওন-এ লৌহ আকরিক উৎপাদনের পরিমাণ দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে।

(চ) **অস্ট্রেলিয়া**—সিডনীর সন্নিহিত প্রদেশে সামান্য পরিমাণে লৌহ পাওয়া যায়। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার আইরন নব (Iron Knob) নামক অঞ্চলের লৌহ আকরিক অতিশয় উচ্চশ্রেণীর।

(ছ) **দক্ষিণ আমেরিকা**—ব্রাজিল ও চিলিতে অনেক লৌহখনি রহিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। চিলির টফো খনি হইতে মার্কিন কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে যথেষ্ট খনিজ লৌহ উত্তোলিত হইতেছে।

বাণিজ্য—খনিজ লৌহের বহির্বাণিজ্য ব্যাপক। ফ্রান্স, সুইডেন, লুক্সেমবুর্গ, স্পেন, উত্তর আফ্রিকা, মালয়, চীন, মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ এবং চিলি প্রচুর পরিমাণে খনিজ লৌহ রপ্তানী করে এবং যুক্তরাজ্য, জার্মানী, বেলজিয়াম, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র অধিক পরিমাণে আকরিক লৌহ আমদানী করে

(২) অলৌহবর্গীয় খনিজ

তাম্র (Copper)

তাম্র আকরিক (Copper Ore)—আকরিক তাম্র সাধারণতঃ আগ্নেয় এবং রূপান্তরিত শিলাস্তরে নানাবিধ দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। রাসায়নিক দ্রব্যাদি মিশ্রিত জলের মধ্যে আকরিক তাম্রচূর্ণকে ঢালিয়া দিয়া আকরিকের সহিত মিশ্রিত অন্যান্য দ্রব্যাদি ভাসাইয়া পৃথক করা হয়। এইভাবে তাম্র আকরিকের মধ্যে ধাতব তাম্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে উহাকে 'রিভারবিরেটরী'-চুল্লীতে (Reverberatory furnace) উত্তপ্ত করিয়া এবং পরে নানাবিধ প্রক্রিয়ায় শোধন করিয়া তাম্রে পরিণত করা হয়।

তাম্রের ব্যবহার (Uses of copper)—উত্তম বিদ্যুৎবাহী বলিয়া বর্তমানে বৈদ্যুতিক শিল্পেই তাম্র সর্বাধিক ব্যবহৃত হইতেছে। অলঙ্করণে, মুদ্রণ শিল্পে, চোলাই করিবার যন্ত্রপাতি নির্মাণে, রং ও পতঙ্গ-বিধ্বংসী ঔষধ তৈয়ারীর জন্যও যথেষ্ট তাম্র ব্যবহৃত হয়। তাম্রের সহিত দস্তা মিশাইয়া পিতল; নিকেল মিশাইয়া জার্মান সিলভার, রাং মিশাইয়া ব্রোঞ্জ এবং পিতলের সহিত রাং মিশাইয়া কাঁসা প্রস্তুত হয়।

আঞ্চলিক বণ্টন (Regional distribution)—উত্তর আমেরিকা—তাম্র উৎপাদনে **যুক্তরাষ্ট্র** পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। এতদঞ্চলে পৃথিবীর প্রায় $\frac{1}{8}$ অংশ তাম্র আকরিত হইয়া থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের পুরাতন তাম্রক্ষেত্রগুলি মিচিগান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, তবে খনিগুলি স্থানে স্থানে অতিশয় গভীর হওয়ায় উহা হইতে আকরিক উত্তোলনের ব্যয় অধিক। বর্তমানে রকি পর্বতাঞ্চলের—(১) আরিজোনা (বিসবি, জেরোম এবং গ্লোব-মিয়ামি খনি) (২) উটাহ্ (বিংহাম খনি) (৩) মণ্টানা (বাট অঞ্চলের খনি) এবং (৪) নেভাডা (এলি খনি)—এই চারিটি স্থানেই প্রধানতঃ তাম্র আকরিত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে আবার আরিজোনার উৎপাদন সর্বাধিক। **ক্যানাডার** আকরিক তাম্রের উৎপাদনও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্টেরিও প্রদেশের সাডবেরী অঞ্চল, কুইবেক প্রদেশের নোরাণ্ডা অঞ্চল, ব্রিটিশ কলম্বিয়ার স্কীনা, টেলক্রীক ও ভ্যানকুভার অঞ্চল এবং রকিপর্বতান্তর্গত আলবেনি অঞ্চলে তাম্র আকরিত হয়। ক্যানাডায় পৃথিবীর প্রায় $\frac{1}{8}$ অংশ তাম্র উৎপন্ন হয়। **মেক্সিকোর** ক্যানানীয়া ও সোনারা অঞ্চলেও সামান্য পরিমাণে তাম্র আকরিত হয়।

দক্ষিণ আমেরিকা—চিলি তাম্র উৎপাদনে পৃথিবীতে দ্বিতীয় (পৃথিবীর প্রায় ২০%) এবং তাম্র রপ্তানীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। চিলির তাম্র মধ্যভাগের মরু অঞ্চলের অন্তর্গত চুকুইকামাটা ও পেট্রোরিলৌস্ খনিসমূহ হইতেই আকরিত হয়। তবে এতদঞ্চলের তাম্র আকরিক নিকৃষ্ট শ্রেণীর এবং

মরু অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত হওয়ায় আকরিক উত্তোলনও কষ্টসাধ্য। চিলির দক্ষিণাংশে অবস্থিত ব্র্যাডেন খনি হইতেও তাম্র আকরিত হয়।

আফ্রিকা—আফ্রিকার কঙ্গো রাজ্য হইতে উঃ রোডেশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত অতিবৃহৎ তাম্র বলয়টিতে প্রচুর তাম্র আকরিক সঞ্চিত রহিয়াছে বলিয়া ভূতত্ত্ববিদ্‌রা অনুমান করেন। কাটাঙ্গা অঞ্চলের তাম্র উৎকৃষ্ট এবং উঃ রোডেশিয়ার তাম্র নিকৃষ্ট শ্রেণীর। কাটাঙ্গা অঞ্চলের পাওয়ায় এবং উঃ রোডেশিয়ার রোয়ান এ্যান্টিলোপ ও ন্‌কানা অঞ্চলে তাম্র শোধনাগার রহিয়াছে। এতদঞ্চল হইতে অধিকাংশ তাম্র ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হইয়া যায়।

রুশিয়া—রুশিয়ার ইউরাল পর্বতাঞ্চলে প্রচুর তাম্র আকরিত হয়। সম্প্রতি কাজাকস্তান, বলখাস হ্রদ অঞ্চল, উজবেকিস্তান এবং আর্মেনিয়াতেও প্রচুর তাম্র আকরিত হইতেছে। আরল সাগরের উত্তর উপকূলাঞ্চল ব্যাপিয়া পৃথিবীর একটি অতি সমৃদ্ধ তাম্রখনি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।
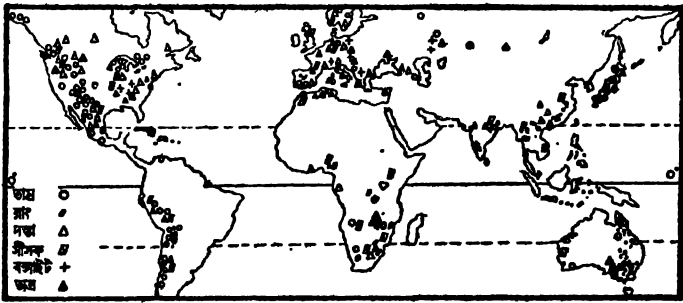
২৭ নং চিত্র—কয়েকটি উল্লেখযোগ্য খনিজ সম্পদের বণ্টন

এশিয়া—এশিয়ার অন্তর্গত **জাপান** তাম্র উৎপাদনে পৃথিবীতে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। জাপানের এসিও, বেসি, কোসাকো, হিতাচী ও সাগানোসাকি অঞ্চলে প্রচুর তাম্র পাওয়া যায়। ওসাকা জাপানের শ্রেষ্ঠ তাম্রশোধন কেন্দ্র। **ভারতের** ছোটনাগপুরের অন্তর্গত মোসাবানিতে তাম্র আকরিত হয় এবং মৌভাণ্ডারে পরিশোধিত হয়।

অস্ট্রেলিয়া—কুইন্সল্যাণ্ডের ক্লনকারী ও মর্গান পর্বতাঞ্চলে তাম্র আকরিত হয়।

ইউরোপ—ইউরোপ তাম্রসম্পদে অতি দরিদ্র, তবে বেলজিয়াম, জার্মানী ও ব্রিটেনে সামান্য পরিমাণে তাম্র আকরিত হয়।

বাণিজ্য (Trade)—যুক্তরাজ্য পৃথিবীর প্রধান তাম্র আমদানীকারক দেশ। জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালী, জাপান প্রভৃতি দেশও তাম্র আমদানী করে। রপ্তানী কার্যে আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রাং (Tin)

রাং আকরিক (Tin ore)—পৃথিবীর অধিকাংশ রাং-ই ক্যাসিটেরাইট (Casseterite), স্ট্যানাইট (Stannite), সিলিনড্রাইট (Cylindrite) এবং ফ্র্যাঙ্কাইট (Franckeite) আকরিক হইতে নিষ্কাশিত হয়। রাং মৌলিক শিলা হইতে অতি অল্প পরিমাণেই আকরিত হইয়া থাকে।

রাং-এর ব্যবহার (Uses of tin)—সহজে কলঙ্ক ধরে না বলিয়া লৌহের পাতে রাং-এর প্রলেপ দিয়া গৃহের ছাদের 'টিন', পেট্রোল তৈলের টিন ও প্যাকিং বাক্স নির্মিত হয়। সীসকের পাতলা পাতের উপর রাং-এর প্রলেপ দিয়া সিগারেট ও চকোলেট মুড়িবার রূপালি কাগজ প্রস্তুত হয়। রাং-এর সহিত তাম্র মিশ্রিত করিয়া ব্রোঞ্জ, ও পিতল মিশ্রিত করিয়া কাঁসা প্রস্তুত হয়।

আঞ্চলিক বণ্টন (Regional distribution)—পৃথিবীর অধিকাংশ রাং (প্রায় ৭০ ভাগ) **দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার** অন্তর্গত মালয় (পেরাক, সেলাঙ্গার, পাহাঙ্গ, নেগ্রিসেম্বিলন, জোহোর, কেডা, কেলাণ্টান, পেরলিস, ও ত্রেঙ্গনু অঞ্চল), ব্রহ্মদেশ (মৌচি, ট্যাভয় ও কারাবুবি অঞ্চল), ইন্দোনেশিয়া (বাংকা, বিলিটন, সুমাত্রা ও সিংকেপ অঞ্চল), শ্যাম (পাকেট-দ্বীপ অঞ্চল) ও **চীন** (ইউনান মালভূমি ও কোয়াংসি অঞ্চল) দেশে পাওয়া যায়। মালয় উপদ্বীপ হইতে পৃথিবীর অর্ধেকেরও অধিক রাং সরবরাহ হয়। ইহা ছাড়া **দঃ আমেরিকার** বলিভিয়া ও পেরু, **আফ্রিকার** নাইজেরিয়া ও কঙ্গো, **অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য** (কর্ণওয়াল), **জার্মানী, পর্তুগাল, রুশিয়া** (লেনিনোগর্স্ক ও ওলোভায়ানায়া অঞ্চল) প্রভৃতি দেশেও রাং উৎপন্ন হয়। যাতায়াতের অসুবিধার জন্য বলিভিয়ার রাং সম্পদকে ঠিকমত কার্যে নিযুক্ত করা যাইতেছে না, কারণ বলিভিয়ার রাং-এর খনিগুলি প্রায় ১৬০০০ ফিটের উর্ধ্বে পর্বতাঞ্চলে অবস্থিত।

বাণিজ্য (Trade)—যুক্তরাষ্ট্র সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে রাং আমদানী করে। ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী ও জার্মানী অন্যান্য রাং আমদানীকারক দেশ। মালয়, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম ও ইন্দোনেশিয়া প্রধান প্রধান রপ্তানীকারক দেশ।

সীসক (Lead)

সীসক আকরিক (Lead ore)—সীসকের প্রধান আকরিক হইল গ্যালেনা (Galena) বা লেড সালফাইড (Lead Sulphide)। ইহা সাধারণতঃ দস্তা ও রৌপ্যের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়।

সীসকের ব্যবহার (Uses of lead)—গ্যাস, জল ও নর্দমা প্রভৃতির নল নির্মাণ, মুদ্রণ শিল্প, মুদ্রলেখ যন্ত্র, মোটর শিল্প, বিমান শিল্প, তড়িৎকোষ নির্মাণ প্রভৃতি কার্যে সীসক বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। রং তৈয়ারী, কাচ শিল্প, বন্দুকের গুলি তৈয়ারী, সঙ্গীতের যন্ত্রপাতি নির্মাণ প্রভৃতি কার্যে ও মৃৎপাত্র উজ্জ্বল করিবার জন্য সীসকের ব্যবহার দিনদিনই বৃদ্ধি পাইতেছে।

আঞ্চলিক বণ্টন (Regional distribution)—**যুক্তরাষ্ট্র** পৃথিবীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ সীসক উৎপাদন করে। যুক্তরাষ্ট্রে সীসক আকরিত হয় প্রধানতঃ তিনটি অঞ্চলে—দক্ষিণ-পশ্চিম মিশৌরী, জোপলিন অঞ্চল এবং মণ্টানার সীমান্তে অবস্থিত ইডাহোতে। **মেক্সিকো** (চিহুয়াহুয়া ও শান লুই পোটোসি অঞ্চল), **ক্যানাডা** (ব্রিটিশ কলম্বিয়ার কুটেনে অঞ্চল, অণ্টেরিও, কুইবেক, নোভাস্কোশিয়া ও ইয়ুকন রাজ্য), **অস্ট্রেলিয়ার** নিউ সাউথ ওয়েলস ও কুইনস্ল্যাণ্ড, **যুগোশ্লাভিয়া, পঃ জার্মানী, রুশিয়া** (ককেশাস, কাজাকস্তান ও পূর্বসাইবেরিয়া), **ইতালী, স্পেন, সুইডেন, যুক্তরাজ্য, জাপান, ব্রহ্মদেশ** (শান রাজ্যের বড়ুইন খনিসমূহ) প্রভৃতি অঞ্চলেও সীসক পাওয়া যায়।

অ্যালুমিনিয়াম (Aluminium)

অ্যালুমিনিয়াম আকরিক (Aluminium ore)—প্রধানতঃ বক্সাইট (Bauxite) ও ক্রায়োলাইট (Cryolite) আকরিক হইতে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশিত হইয়া থাকে। বক্সাইটকে চূর্ণ করিয়া উহার সহিত কিঞ্চিৎ ক্রায়োলাইট মিশ্রিত করিয়া পরে ঐ মিশ্রিত খনিজের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ পরিচালিত করিলে অ্যালুমিনিয়াম পৃথক হইয়া তরল অবস্থায় ঋণাত্মক দণ্ডে সঞ্চিত হয়। পরিশেষে ঐ তরল অ্যালুমিনিয়াম হইতে পিণ্ড, পাত, তার প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। আকরিক হইতে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন করিতে হইলে প্রচুর উত্তাপের প্রয়োজন হয়। সেই কারণে যে সমস্ত দেশে পর্যাপ্ত ও সুলভ জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় সেই সমস্ত দেশেই আকরিক হইতে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশিত হইয়া থাকে।

বক্সাইট উৎপাদনে ফ্রান্স (আল্প্স্ পর্বতান্তর্গত স্তাভয় অঞ্চলের খনিসমূহই প্রধান), হাঙ্গেরী, যুগোশ্লাভিয়া, সুরিনাম, গিয়ানা, রুশিয়া (ইউরাল এবং লেনিনগ্রাদ সন্নিহিত বক্সিটোগর্স্ক অঞ্চল) এবং যুক্তরাষ্ট্র উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। ক্রায়োলাইট উৎপাদনে গ্রীনল্যাণ্ডের স্থান সর্বোচ্চে।

অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার (Uses of Aluminium)—শক্ত অথচ হাল্কা হওয়ায় বিমানপোত, মোটর গাড়ী, জাহাজ, রেলগাড়ীর কামরা প্রভৃতি নির্মাণ করিবার জন্য অ্যালুমিনিয়াম প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। গৃহের আসবাবপত্র, তৈজসপত্র, বৈজ্ঞানিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র, রং, আতসবাজী প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে।

আঞ্চলিক বণ্টন (Rigional distribution)—যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, ক্যানাডা, ফ্রান্স, নরওয়ে, রুশিয়া, ইতালী, সুইজারল্যাণ্ড, যুক্তরাজ্য, এবং অন্যান্য দেশে আকরিক হইতে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশিত হয়। ভারতের দাক্ষিণাত্য ও ছোটনাগপুর অঞ্চলে প্রচুর বক্সাইট ভূগর্ভে নিহিত রহিয়াছে।

ভারতের জলবিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বাণিজ্য (Trade)—অ্যালুমিনিয়াম (আকরিক বা নিষ্কাশিত) আমদানীকারক দেশগুলির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানী ও জাপান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(৩) অধাতব খনিজ

অভ্র (Mica)—ইহা স্থিতিস্থাপক, তড়িতের অপরিবাহী, তাপসহ এবং তাপের বিকিরণরোধক। বৈদ্যুতিক শিল্পে, বিমানপোত ও মোটর শিল্পে অভ্র প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। প্রতিমার সাজ এবং নানা প্রকার অলঙ্করণে, চুল্লীর জানালা নির্মাণে, ম্যাগনেশিয়ার সহিত মিশ্রিত করিয়া বয়লারের উপরের তাপরক্ষক প্রলেপ নির্মাণে, রং তৈয়ারীতে, এবং অন্যান্য নানাপ্রকার কার্যে অভ্র ব্যবহৃত হয়।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of production)—ভারত (বিহার, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, কেরালা ও রাজস্থান) অভ্র উৎপাদনে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান (পৃথিবীর প্রায় ৭৫%) অধিকার করে। ভারতের অভ্র অতি উচ্চ শ্রেণীর। যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, জার্মানী, নরওয়ে, স্পেন, পর্তুগাল, রুশিয়া, জাপান, ক্যানাডা, আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিল অতি সামান্য পরিমাণে অভ্র উৎপাদন করে।

বাণিজ্য (Trade)—অভ্র রপ্তানীতে ভারত প্রথম স্থান অধিকার করে। যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র প্রধান প্রধান আমদানীকারক দেশ।

লবণ (Salt)—সমুদ্র বা হ্রদের লবণাক্ত জল শুষ্ক করিয়া গুঁড়া লবণ এবং লবণের খনি হইতে সৈন্ধব লবণ পাওয়া যায়। খাদ্য হিসাবে, নানাপ্রকার ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিতে, চর্মশিল্পে, পচন-নিবারক দ্রব্য হিসাবে, সার তৈয়ারী প্রভৃতি নানাবিধ কার্যে লবণ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of production)—যুক্তরাষ্ট্র (পশ্চিম মিচিগান এবং মেক্সিকো উপসাগর সন্নিহিত অঞ্চলসমূহ), রুশিয়া, জার্মানী, নিউইয়র্ক, উত্তর-পূর্ব ওহিও, দঃ পূঃ অষ্ট্রিয়া, চীন, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ভারত, পাকিস্তান, এডেন, ইতালী, স্পেন, জাপান, পোল্যাণ্ড, মাঞ্চুরিয়া, ব্রাজিল, ক্যানাডা, রুমেনিয়া প্রভৃতি প্রধান প্রধান লবণ-উৎপাদক দেশ।

স্থাপত্য শিল্পের প্রস্তর (Building materials)—পৃথিবীর সর্বত্রই গৃহ-নির্মাণের নানা প্রকার প্রস্তর অল্পবিস্তর পাওয়া যায়। তবে ইহাদের মধ্যে বেলেপাথর, চুনাপাথর, গ্রানাইট, মর্মর ও স্লেট বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বেলে-পাথর ও চুনাপাথর ইউরোপ, এশিয়া ও আমেরিকা মহাদেশের ভঙ্গিল পর্বত-

ঞ্চলেই আকরিত হয়। ব্রিটেনের **চুনাপাথর** বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইংল্যাণ্ড, সুইডেন, ফ্রান্স ও ক্যানাডার **গ্রানাইট** প্রসিদ্ধ। ইতালীর ক্যারারা **মর্মর** সর্বোৎকৃষ্ট। ভারত, ফ্রান্স, স্পেন, যুক্তরাজ্য, এবং যুক্তরাষ্ট্রেও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মর্মর পাওয়া যায়। ইংল্যাণ্ড, আয়ার্ল্যাণ্ড, ইতালী, পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের **শ্লেট** বিখ্যাত।

শক্তিসম্পদ (Sources of Power)

পৃথিবীতে ব্যবহৃত শক্তিসম্পদসমূহকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে: (১) জ্বালানী শক্তি (fuels) এবং (২) জলবিদ্যুৎ শক্তি (hydroelectric power)। জ্বালানী শক্তিকে আবার তিনটি উপশ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়:—(ক) খনিজ জ্বালানী (mineral fuels)—কয়লা, খনিজ তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস (খ) কাষ্ঠ জ্বালানী (wood fuels)—কাষ্ঠ, (গ) সংযোগাত্মক জ্বালানী (synthetic fuels)—সুরাসারিক শক্তি।

কয়লা (Coal)

কয়লার উৎপত্তি (**Formation of Coal**)—জলাভূমিতে যে গহন অরণ্য জন্মে উহা কখনও কখনও ভূপৃষ্ঠের আলোড়নের ফলে ভূগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া যায় এবং উহার উপর স্তরে স্তরে কর্দম ও বালি সঞ্চিত হইতে থাকে। এই ভাবে উদ্ভিদ্-অবশেষ সুদীর্ঘকাল ভূত্বকের নীচে থাকিয়া ভূগর্ভের তাপ, ভূত্বকের চাপ এবং অন্যান্য রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে কয়লায় রূপান্তরিত হইয়া যায়।

পৃথিবীর কয়লা সম্পদ (**Coal resources of the world**)—পৃথিবীর কয়লা সম্পদ সর্বত্র সমভাবে বণ্টিত নহে। অস্ট্রেলিয়া ও দঃ আফ্রিকার খনিসমূহ বাদ দিলে বলা যায় যে দক্ষিণ গোলার্ধ কয়লা সম্পদে অতিশয় দরিদ্র। উত্তর আমেরিকার অন্তর্গত যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডায় সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ সুপ্রচুর। ইউরোপ মহাদেশের অন্তর্গত যুক্তরাজ্য, জার্মানী ও পোল্যাণ্ড কয়লা সম্পদে অতিশয় সমৃদ্ধ; তবে ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও নেদারল্যাণ্ড ততটা সমৃদ্ধ নহে। ইউরোপের অন্যান্য দেশে কয়লা একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। ক্রমাগত অনুসন্ধান কার্য চালাইবার ফলে রুশিয়ায় পর্যাপ্ত সঞ্চিত কয়লার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত ভারত কয়লা সম্পদে একরূপ সমৃদ্ধই বলা যাইতে পারে, তবে জাপানে কয়লা সম্পদ অতি সামান্য। চীন দেশও কয়লা সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ।

কয়লার শ্রেণীবিভাগ (**Classification of coal**)—অঙ্গার ও গ্যাসের পরিমাণ এবং কাঠিন্যের তারতম্য হিসাবে কয়লাকে সাধারণতঃ পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যথা,—(১) **অ্যানথ্রাসাইট** (**Anthracite**)

কয়লা—ইহা অত্যন্ত কঠিন, উজ্জ্বল এবং ভারী। ইহাতে ৯০-৯৫% অঙ্গার থাকে। ইহা সহজদাহ্য নহে, কিন্তু জ্বলিলে অল্প ধূম্র ও প্রচুর উত্তাপ সৃষ্টি করিয়া থাকে। ইহা সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা। তবে ইহা হইতে কোক উৎপন্ন হয় না এবং ইহার খনন কার্য অত্যন্ত ব্যয় ও কষ্ট সাধ্য। পৃথিবীতে উৎপন্ন এ্যানথ্রাসাইট কয়লা সমগ্র উৎপাদনের ৫%-এর অধিক হইবে না এবং ইহার প্রায় সমগ্র অংশই যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভ্যানিয়া এবং যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ ওয়েলস্ কয়লা খনি অঞ্চল হইতে আসে। (২) **বিটুমিনাস** (Bituminous) কয়লা—ইহাতে প্রায় ৮০-৮৫% অঙ্গার থাকে। ইহা অপেক্ষাকৃত সহজদাহ্য এবং জ্বলিলে ধূম্র উদ্গত হয়। পৃথিবীতে উৎপন্ন মোট কয়লার প্রায় ৮০%-ই বিটুমিনাস শ্রেণীর। বিটুমিনাস কয়লা পোড়াইয়া কোক কয়লা উৎপন্ন হয়। কোক কয়লার দাহিকা শক্তি অত্যধিক। আকরিক হইতে ধাতু নিষ্কাশনে কোক কয়লা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। (৩) **লিগ্‌নাইট** বা **বাদামী** (Lignite বা Brown) কয়লা—ইহা নিকৃষ্টশ্রেণীর। পৃথিবীতে উৎপন্ন কয়লার প্রায় ১০%-ই লিগ্‌নাইট। ইহাতে প্রায় ৪৫% অঙ্গার থাকে এবং উদ্বায়ী দ্রব্যেরই আধিক্য বর্তমান। (৪) **গ্যাস** (Gas) কয়লা—ইহাতে ৪০% অঙ্গার বিদ্যমান। ইহা সর্বনিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা। (৫) **পীট** (Peat)—উদ্ভিদ্ হইতে কয়লা জন্মিবার ইহাই প্রথম স্তর। ইহা অল্প অঙ্গারযুক্ত দাহ্য পদার্থ। আয়ারল্যাণ্ড প্রভৃতি কয়লাহীন দেশে ইহা রন্ধনাদি কার্যে ব্যবহৃত হয়।

পৃথিবীর প্রধান প্রধান কয়লা ক্ষেত্রসমূহ (Principal coal fields of the world)—

(ক) **উত্তর আমেরিকা**—উত্তর আমেরিকার **যুক্তরাষ্ট্রেই** পৃথিবীর মোট কয়লার ৩০%-৪০% উত্তোলিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের খনিসমূহে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ অন্যান্য দেশের মোট সঞ্চিত কয়লার প্রায় সমান হইবে বলিয়া অনেকে মনে করেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান কয়লার খনিগুলি হইল—(.) পেনসিল্‌ভ্যানিয়ার এ্যানথ্রাসাইট কয়লাখনি। ইহা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ এ্যানথ্রাসাইট কয়লাক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রটির বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ ৪০-৭০ মিঃ টনের মধ্যে। (২) পিটস্‌বার্গ হইতে আলাবামা পর্যন্ত বিস্তৃত আপালাচিয়ান অঞ্চলের বিটুমিনাস কয়লাখনি। এই খনি অঞ্চল হইতেই যুক্তরাষ্ট্রের ৬০-৭০% কয়লা উত্তোলিত হয়। আপালাচিয়ান কয়লাখনিটি আবার তিনটি অংশে বিভক্ত :—(ক) উত্তর আপালাচিয়ান অঞ্চলের কয়লাখনি—পিটস্‌বার্গ সন্নিহিত পেনসিলভ্যানিয়ার বিটুমিনাস কয়লাখনি, এবং পশ্চিম ভার্জিনিয়ার উত্তরাংশের কয়লাখনি ইহার অন্তর্গত। (খ) মধ্য আপালাচিয়ান অঞ্চলের কয়লাখনি—কেণ্টাকী ও ভার্জিনিয়া

রাজ্যের কয়লাখনি ইহার অন্তর্গত। (গ) দক্ষিণ আপালাচিয়ান অঞ্চলের কয়লাখনি—আলাবামা ও টিনিসি রাজ্যের কয়লাখনি ইহার অন্তর্গত। (৩) ইলিনয় হইতে ইণ্ডিয়ানা হইয়া কেণ্টাকী পর্যন্ত বিস্তৃত পূর্ব-মধ্য কয়লাখনি। (৪) আয়োয়া হইতে পূর্ব কানসাস, পশ্চিম মিশৌরী এবং ওকলাহামা হইয়া আরকানসাস্ পর্যন্ত বিস্তৃত পশ্চিম-মধ্য কয়লাখনি। (৫) রকি পর্বত অঞ্চলের কয়লাখনি। এই অঞ্চল হইতে নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা উত্তোলিত হইয়া থাকে, তবে কলরাডো রাজ্যে প্রচুর উচ্চশ্রেণীর বিটুমিনাস কয়লাও রহিয়াছে। (৬) প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের কয়লাখনিসমূহ। এতদঞ্চলের
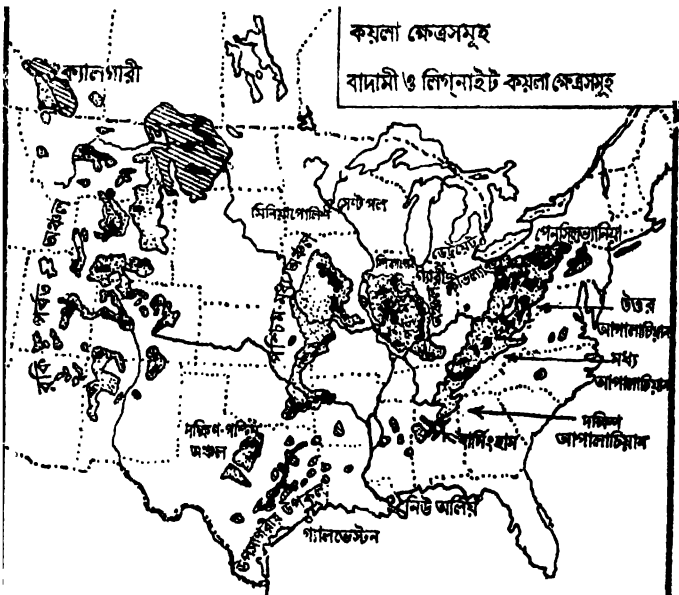
২৮নং চিত্র—যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান কয়লাক্ষেত্রসমূহ

কয়লা নিকৃষ্ট শ্রেণীর। (৭) উপসাগরীয় উপকূলে অবস্থিত কয়লাখনিসমূহ। বর্তমানে আলাস্কাতে অতি বৃহৎ কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু যান-বাহন ব্যবস্থার অসুবিধার দরুণ এই অঞ্চল হইতে আশানুরূপ পরিমাণে কয়লা উত্তোলিত হইতেছে না। মিচিগান রাজ্যের অন্তর্গত উত্তর-মধ্য কয়লার খনি এবং টেকসাস, ওকলাহামা ও আরকানসাস রাজ্যের অন্তর্গত দক্ষিণ-পশ্চিম কয়লার খনি এখনও তাদৃশ উন্নতি লাভ করে নাই।

ক্যানাডায় তিনটি উল্লেখযোগ্য কয়লার খনি রহিয়াছে—(১) ক্যানাডার অন্তর্গত আপালাচিয়ান কয়লাখনি। এই কয়লাখনিসমূহ নোভাস্কোশিয়া ও

নিউব্রান্সউইক রাজ্যের অন্তর্গত। (২) রকি পর্বত ও তাহার পুর্ব প্রান্তের কয়লাখনি। প্রেয়রী অঞ্চলের অন্তর্গত আলবার্টার কয়লাখনি এবং রকি পর্বতের পুর্ব ঢালের অন্তর্গত ক্রোস্ নেস্ট কয়লাখনি ইহাব অন্তর্ভুক্ত। (৩) পশ্চিম উপকূলের কয়লাখনি। ভ্যানকুভাব দ্বীপ ও ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার খনি-সমূহ ইহার অন্তর্গত। খনি হইতে কয়লা উত্তোলনেব এবং শিল্পাঞ্চলে কয়লা চালান দেওয়ার খরচ অত্যন্ত অধিক হওয়ায় এবং সস্তায় প্রচুর জলবিদ্যুৎ শক্তি পাওয়া যায় বলিয়া ক্যানাডার কয়লার অতি সামান্য অংশই শিল্পকাযে ব্যবহৃত হইতেছে। ক্যানাডার কয়লা প্রধানতঃ লিগনাইট শ্রেণীব। তবে বিটুমিনাস কয়লারও অপ্রতুলতা নাই। কয়লাখনিসমূহ শিল্পাঞ্চলসমূহ হইতে দূববর্তী স্থানে অবস্থিত হওয়ায় ক্যানাডা যুক্তরাষ্ট্র হইতে কয়লা আমদানী করিয়া থাকে।

(খ) **ইউরোপ**—কয়লা উৎপাদনে **যুক্তরাজ্য** পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। যুক্তরাজ্যের (ক) পিনাইন পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত—(১) নর্দাম্বারল্যাণ্ড ও ডারহাম, (২) ইয়র্ক-ডার্বি-নটিংহামশায়ার, (৩) কাম্বারল্যাণ্ড, (৪) দক্ষিণ ল্যাংকাশায়ার ও (৫) উত্তর স্টাফর্ডশায়ার, (খ) ওয়েলস্ পর্বতমালাব পাদদেশে অবস্থিত —(৬) উত্তর ওয়েলস্, (৭) দক্ষিণ ওয়েলস্, ও (৮) ডীনের অরণ্য, (গ) মধ্যদেশের সমভূমিতে অবস্থিত—(৯) পুর্বস্রফশায়ার, (১০) দক্ষিণ স্টাফর্ডশায়ার, (১১) ওয়ারউইকশায়ার ও (১২) লিস্টারশায়ার, এবং (ঘ) স্কটল্যাণ্ডের মধ্যবর্তী উপত্যকায় অবস্থিত—(১৩) আয়ারশায়াব, (১৪) গ্লাসগো
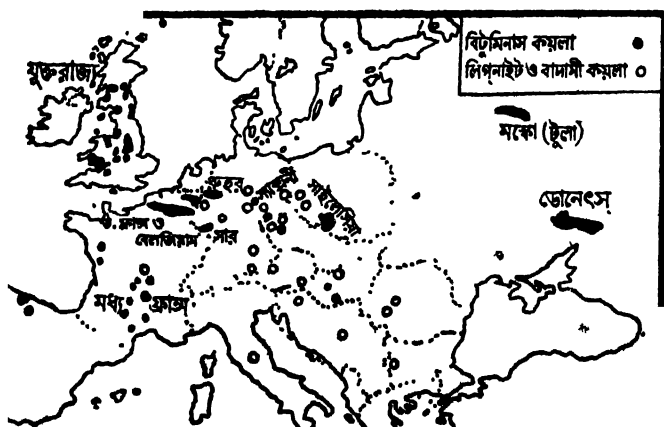
২৯ নং চিত্র—ইউরোপের কয়লাক্ষেত্র সমূহ

বা ক্লাইড, (১৫) ফাইফশায়ার ও (১৬) মিডলোথিয়ান খনি হইতে অধিকাংশ কয়লা উত্তোলিত হয়। কয়লা শিল্পের উন্নতির জন্য ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে

"কোল ইণ্ডাষ্ট্রিজ ন্যাশনালাইজেশন এ্যাক্ট" (Coal Industries Nationalisation Act) নামক একটি আইন প্রণয়নের দ্বারা গ্রেটব্রিটেনের কয়লা সম্পদকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হইয়াছে। এতদনুসারে ১৯৪৭ সালের ১লা জানুয়ারীতে স্থাপিত "ন্যাশনাল কোল বোর্ড" (National Coal Board) নামক সংঘের উপর দেশের কয়লা সম্পদের সম্যক সংরক্ষণ, রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে কয়লা উৎপাদনের সুব্যবস্থা করান এবং ক্রমক্ষীয়মাণ উৎপাদনের নিরাকরণের ভার অর্পিত হইয়াছে। এই সংঘ আশা করে যে ১৯৭০ সাল নাগাদ ব্রিটেনের কয়লা উত্তোলনের পরিমাণ দাঁড়াইবে বার্ষিক ২৫ কোটি টন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে **জার্মানীর** প্রধান প্রধান কয়লাখনি ছিল ওয়েস্টফ্যালিয়া, স্যাক্সনী আর সাইলেসিয়া এই তিনটি অঞ্চলে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পোল্যাণ্ড সাইলেসিয়ার কয়লাক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়াছে। স্যাক্সনীর কয়লাক্ষেত্রটি বর্তমানে পড়িয়াছে জার্মানীর রুশীয় পরিমণ্ডলে আর ওয়েস্টফ্যালিয়ার কয়লাক্ষেত্রটি রহিয়াছে পশ্চিম-জার্মান সাধারণতন্ত্রের এলাকার মধ্যে। এইটিই জার্মানীর সুবিখ্যাত রুহ্‌র অঞ্চল। সার-অববাহিকার কয়লাক্ষেত্রটিও পশ্চিম জার্মানীতে; তবে ইহার গুরুত্ব অনেক কম। যুদ্ধের পর জার্মানীতে কয়লা উত্তোলনের কাজে মন্দা পড়িয়াছে। জার্মানীর অধিকাংশ কয়লাই লিগ্‌নাইট শ্রেণীর।

ফ্রান্সের কয়লা সম্পদ অতি সামান্য। (১) উঃ ফ্রান্সের ডোভার প্রণালী হইতে জার্মানীর সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত খনি ও (২) মধ্যভাগের মালভূমির নিকটবর্তী খনি অঞ্চল হইতে ফ্রান্সের অধিকাংশ কয়লা পাওয়া যায়। ফ্রান্সের কয়লা মধ্যম শ্রেণীর এবং খনি হইতে কয়লা উত্তোলন অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। যুক্তরাজ্য, ওয়েস্টফ্যালিয়া এবং সার অঞ্চল হইতে ফ্রান্স কয়লা আমদানী করে।

সেম্বার-মিউজ অঞ্চলে **বেলজিয়ামের** প্রধান ও উচ্চশ্রেণীর কয়লাখনিসমূহ অবস্থিত। মধ্য ও উত্তর বেলজিয়ামেও সামান্য কয়লা পাওয়া যায়। ওয়েস্টফ্যালিয়া, সার ও যুক্তরাজ্য হইতে বেলজিয়াম প্রচুর কয়লা আমদানী করে। বেলজিয়াম হইতে উচ্চশ্রেণীর কয়লা বিভিন্ন দেশে রপ্তানীও হয়।

পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, স্পেন, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, ইতালী ও সুইডেনেও সামান্য পরিমাণে কয়লা পাওয়া যায়।

সোভিয়েট রাষ্ট্র—কয়লা উৎপাদনে রুশিয়া পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। রুশিয়ার উল্লেখযোগ্য কয়লাক্ষেত্রসমূহ হইল **ইউরোপীয় রুশিয়ার** অন্তর্গত—(১) আজভ সাগরের উত্তরে ডনেৎস্‌ ক্ষেত্র (মোট উৎপাদনের ৬০%)—ইহাই রুশিয়ার সর্বপ্রধান কয়লাক্ষেত্র, (২) মস্কোর দক্ষিণে টুলা ক্ষেত্র, (৩) ইউরাল পর্বতের দক্ষিণাংশের কয়লাক্ষেত্র, (৪) পেচোরা

অববাহিকার কয়লাক্ষেত্র, ও (৫) ট্রান্স-ককেশিয়া অঞ্চলের বাটুম শহরের নিকটবর্তী কয়লাক্ষেত্র। **এশীয় রুশিয়ার** অন্তর্গত কয়লাক্ষেত্রগুলি হইল—(ক) পশ্চিম সাইবেরিয়ার (৬) কুজনেৎস্ক পর্বতের কয়লাক্ষেত্র; মধ্য সাইবেরিয়ার (৭) টুঙ্গুজ, (৮) লেনস্ক, (৯) মিনুসিনস্ক, (১০) ইর্খুটস্ক (১১) কানস্ক, ও (১২) লেনা পর্বতের কয়লাক্ষেত্র; (খ) সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার (১৩) ফার্গানা ও (১৪) কারাগাণ্ডা অঞ্চলের কয়লাক্ষেত্র এবং (গ) সুদূর প্রাচ্যের (১৫) বেরিনস্ক অঞ্চলের কয়লাক্ষেত্রই সমধিক প্রসিদ্ধ। রুশিয়ার কয়লা অধিকাংশই বিটুমিনাস শ্রেণীর। রুশিয়ায় প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ৯৩ কোটি টন কয়লা উত্তোলিত হয়।

(ঘ) **এশিয়া**—পৃথিবীর কয়লা উৎপাদক দেশগুলির মধ্যে **চীন** অন্যতম। চীনদেশে উৎপন্ন কয়লা উৎকৃষ্ট বিটুমিনাস শ্রেণীর। বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস চীনদেশ প্রচ্ছন্ন কয়লা সম্পদে পৃথিবীর মধ্যে অগ্রগণ্য। প্রায় সমগ্র শান্সি (এ্যানথ্রাসাইট ও বিটুমিনাস কয়লা) ও শেন্সি প্রদেশের একাংশ জুড়িয়া যে সুবৃহৎ কয়লাক্ষেত্র অবস্থিত তাহা শুধু নাকি যুক্তরাষ্ট্রের পেন্সিল্ভ্যানিয়ার বিরাট কয়লাক্ষেত্রের সহিত তুলনীয়। এই ক্ষেত্রটিতেই সম্ভবতঃ চীনের ৮০% কয়লা রহিয়াছে। ইহা ছাড়া সাংটাং, জেচুয়ান ও ইউনান প্রদেশেও প্রচুর কয়লার খনি আছে। তিয়েন্সিনের ৭৫ মাইল উত্তর-পূর্বে একটি কয়লার খনি হইতে বহুকাল যাবৎ আধুনিক প্রথায় কয়লা উত্তোলন করা হইতেছে।
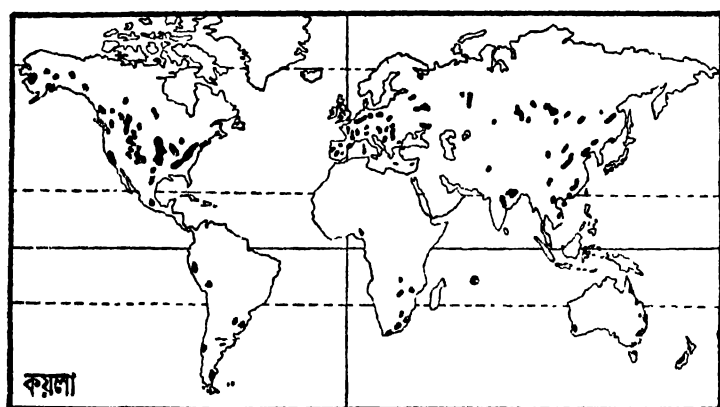
৩০ নং চিত্র—পৃথিবীর কয়লা উৎপাদক অঞ্চলসমূহ

পিপিং শহরের কাছাকাছিও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়লার খনি আছে। চীনের প্রায় প্রত্যেকটি প্রদেশেই কিছু কিছু কয়লা আছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু চীনের কয়লা আহরণের কাজ এখনও অপরিণত অবস্থায় রহিয়াছে,—বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ মাত্র ৩ কোটি টনের মত। **জাপানের** কয়লা-

খনিসমূহ সমস্ত দেশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। শাখালিন হইতে ফরমোজা পর্যন্ত প্রায় সর্বত্রই কয়লা পাওয়া যায়। তবে মোট উৎপাদনের প্রায় ½ ভাগ উত্তর কিউসিউ এবং অবশিষ্টাংশ হোক্কাইডোর কয়লা খনি হইতে আসে। উৎপাদিত কয়লা দেশের প্রয়োজনের পক্ষে মোটেই পর্যাপ্ত নহে। জাপানের কয়লা নিম্নশ্রেণীর বিটুমিনাস জাতীয়। কয়লা উৎপাদনে **ভারত** পৃথিবীতে অষ্টম স্থান অধিকার করে। ভারতের মোট উৎপাদনের প্রায় ৮৫% কয়লাই রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়ার কয়লাক্ষেত্রসমূহ হইতে সরবরাহ হয়। মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র, এবং রাজস্থানেও কয়লা পাওয়া যায়। ভারতীয় কয়লা ইউরোপীয় ও মার্কিনী কয়লার ন্যায় উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নহে। মাঞ্চুরিয়া, ব্রহ্মদেশ, পঃ পাকিস্তান, মালয়, ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়াতেও সামান্য কয়লা পাওয়া যায়।

(ঙ) **দক্ষিণ আমেরিকা**—দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা, পেরু, কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, ব্রাজিল ও চিলিতে সামান্য পরিমাণে কয়লা পাওয়া যায়।

(চ) **আফ্রিকা**—দক্ষিণ আফ্রিকার সম্মেলনের অন্তর্গত ট্রান্সভাল, অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট এবং নাটালে প্রচুর বিটুমিনাস কয়লা পাওয়া যায়। নাটালের নিউক্যাসল এবং ট্রান্সভালের মিডলবার্গ প্রধান প্রধান কয়লা উত্তোলন কেন্দ্র। নাটালের কয়লা ডারবান বন্দর দিয়া বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায় এবং ট্রান্সভালের কয়লা জোহানেসবার্গ ও 'র‍্যাণ্ড' অঞ্চলের শিল্পসমূহে ব্যবহৃত হয়।

আফ্রিকার রোডেশিয়া রাজ্যেও কতকগুলি কয়লার খনি রহিয়াছে। এতদঞ্চলের খনিসমূহের মধ্যে ওয়াংকি কয়লা খনি হইতে স্থানীয় চাহিদা মিটাইবার জন্য এবং কঙ্গো রাজ্যের কাটাঙ্গা প্রদেশের শিল্পকেন্দ্রসমূহে কয়লা সরবরাহ করা হয়। পশ্চিম আফ্রিকার নাইজেরিয়া ও অন্যান্য অঞ্চলে সম্প্রতি কয়লাখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

(ছ) **অস্ট্রেলিয়া**—কয়লাই বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার সর্বপ্রধান খনিজ সম্পদ। নিউ সাউথ ওয়েলস হইতে অস্ট্রেলিয়ার ৭০% কয়লা সংগৃহীত হয়। এতদঞ্চলের সিডনী কয়লাক্ষেত্রটি সর্ববৃহৎ। অবশ্য উত্তরে নিউক্যাসল, পশ্চিমে লিথগো এবং দক্ষিণে ইল্লাওয়ারা কয়লাক্ষেত্র হইতেও কয়লা সংগৃহীত হইয়া থাকে। কুইন্সল্যাণ্ড রাজ্যের ডসন অববাহিকা ও ইপস্যুইচ অঞ্চল হইতেও কয়লা উত্তোলিত হয়। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া, ভিক্টোরিয়া ও টাসমানিয়া অঞ্চলেও কয়লা পাওয়া যায়। অস্ট্রেলিয়াতে পৃথিবীর মোট কয়লা উৎপাদনের মাত্র ১% উত্তোলিত হয়। অস্ট্রেলিয়ার কয়লা বিটুমিনাস ও লিগ্নাইট জাতীয়।

নিউজীল্যাণ্ডের দক্ষিণ দ্বীপের পশ্চিম উপকূল সংলগ্ন ওয়েস্টপোর্ট ও গ্রেমাউথ ক্ষেত্র হইতেই ঐ রাজ্যের অধিকাংশ কয়লা উত্তোলিত হয়।

কয়লার বাণিজ্য (Coal trade)—অতি সামান্য পরিমাণ কয়লাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত হয়। কয়লা **রপ্তানী**তে যুক্তরাজ্য পৃথিবীতে প্রথম। যুক্তরাষ্ট্র, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, মাঞ্চুরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার সম্মেলন এবং অস্ট্রেলিয়াও কয়লা রপ্তানী করিয়া থাকে। ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, ইতালী, সুইডেন, বাল্টিক রাজ্যসমূহ, ক্যানাডা এবং জাপান প্রচুর কয়লা **আমদানী** করিয়া থাকে।

কয়লার ব্যবহার (Uses of coal)—কয়লা প্রধানতঃ শক্তির উৎস হিসাবেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কয়লা হইতে প্রস্তুত কোক বিভিন্ন ধাতুশিল্পে ব্যবহৃত হয়। রাসায়নিক শিল্পে, সিমেণ্ট শিল্পে, বিভিন্ন উপজাত দ্রব্য-প্রস্তুতিতে, রেল এঞ্জিন চালনায় ও গৃহস্থালীর কার্যে কয়লা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিভিন্ন তাপযুক্ত অঙ্গারীকরণের ফলে কয়লা হইতে কোক ও নানাবিধ প্রয়োজনীয় **উপজাত দ্রব্যাদি** (by-products) পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে (১) আলকাতরা ও তজ্জাত দ্রব্যাদি ; (২) এ্যামোনিয়া ও উহার যৌগিক পদার্থ ; (৩) গ্যাস (coal gas) ; (৪) তৈল ও তজ্জাত দ্রব্যাদি, যথা—(ক) অপরিস্রুত তৈল ; (খ) বেনজিন বা বেনজল—ইহা দ্বারা রঞ্জক দ্রব্য প্রস্তুত হয়, (গ) ন্যাপথলিন—গৃহস্থালীতে ও সংযোগাত্মক নীল প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয় ; (ঘ) টলুয়েন—ট্রাই-নাইট্রো-টলুয়েন (টি-এন-টি) বিস্ফোরক ও মিষ্ট দ্রব্য স্যাকারিন (চিনি হইতে ৫১১ গুণ অধিক মিষ্ট) প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয় ; (ঙ) ফেনল বা কার্বলিক এ্যাসিড ; (চ) বিবিধ দ্রব্যাদি—যথা, গন্ধক প্রভৃতি প্রধান। বর্তমানে ১৬০০০এরও অধিক সংখ্যক উপজাত দ্রব্যাদি কয়লা হইতে প্রস্তুত ও নানাবিধ কার্যে ব্যবহৃত হইতেছে।

খনিজ তৈল (Mineral Oil বা Petroleum)

ভূগর্ভে শিলায় সঞ্চিত সুপ্রাচীন জীবাশ্ম হইতে এই তৈল উদ্ভূত। খনিজ তৈল শিলাস্তরের মধ্য হইতে সংগৃহীত হয় বলিয়া ইহাকে শিলা তৈলও (rock oil) বলা হয়। তৈলযুক্ত অঞ্চলে কূপ খনন করিয়া তৈল উত্তোলনের ব্যবস্থা করা হয়। উত্তোলিত তৈলকে অপরিস্রুত তৈল (crude oil) বলে। তৈলকূপসমূহের আর্থিক গুরুত্ব নির্ভর করে ইহাদের গভীরতার উপর। তৈলখনি অঞ্চলসমূহ হইতে নলপথে (pipeline) অপরিস্রুত তৈল পরিস্রাবণ কেন্দ্রে (refining centre) অথবা রপ্তানীর জন্য বন্দরসমূহে প্রেরণ করা হয়।
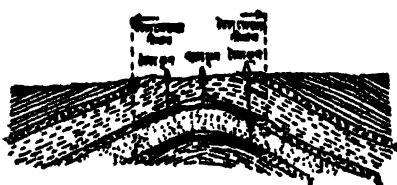
৩১নং চিত্র—তৈলক্ষেত্র হইতে তৈল উত্তোলন

জ্বালানী হিসাবে খনিজ তৈল ও কয়লার তুলনা (**Comparison between oil and coal as fuels**)—নলের সাহায্যে তৈল এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রেরণের সুবিধা থাকায় খনিজ তৈলের আমদানী রপ্তানী ব্যয় কয়লার আমদানী-রপ্তানী ব্যয় অপেক্ষা অনেক অল্প। কয়লা অপেক্ষা তৈলেব সঞ্চয় সহজতব। তৈলকে পুর্ণ মাত্রায় দহন করিয়া উহার সমস্ত শক্তিকে কার্যে প্রয়োগ করা যায় কিন্তু কয়লাব ক্ষেত্রে সেরূপ সম্ভব হয় না। কাবণ বহু ক্ষেত্রে কয়লাকে অর্ধদগ্ধ অবস্থায় ফেলিয়া দিতে হয়। আবার কয়লা অপেক্ষা খনিজ তৈলের দাহিকাশক্তি অধিক ও আয়তন অল্প। ইহা কয়লা অপেক্ষা পরিচ্ছন্নও বটে। তবে আজও পর্যন্ত খনিজ তৈল পৃথিবীর কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ বহিয়াছে। আবার ইহা সহজদাহ্য বলিয়া ইহাব সুষ্ঠু সংরক্ষণও কষ্ট ও ব্যয় সাধ্য এবং লৌহ ও ইস্পাত প্রভৃতি ভারী শিল্পে ইহার ব্যবহার অতি সামান্য। বহুক্ষেত্রে তৈলখনি কয়লাখনি অপেক্ষা দ্রুত (কখনও কখনও ৩।৪ বৎসরেব মধ্যেই) নিঃশেষিত হইয়া যায় বলিয়া তৈলকূপ-সন্নিহিত অঞ্চলে আধুনিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে নাই। কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ কয়লাক্ষেত্রের নিকটেই বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানের পত্তন হইয়াছে।

খনিজ তৈলের ব্যবহার (**Uses of mineral oil**)—খনিজ তৈল একটি মিশ্র রাসায়নিক পদার্থ। ইহাব রাসায়নিক উপাদানসমূহ সর্বত্র একপ্রকার নহে কিংবা সর্বত্র সমপরিমাণেও থাকে না। তৈলকূপ হইতে উত্তোলিত অপরিশ্রুত খনিজ তৈলকে পরিশ্রুত করিয়া যে বিভিন্ন উপজাত দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা নানাবিধ কার্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ১ ব্যারেল (প্রায় ৪২ গ্যালন) অপবিশ্রুত খনিজ তৈলকে পাতনযন্ত্রে চুয়াইয়া এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শোধন করিয়া নিম্নলিখিত অতি প্রয়োজনীয় **উপজাত দ্রব্যগুলি** (by-products) পাওয়া যায় :—গ্যাসোলিন অথবা পেট্রোল (৪২%), গ্যাস তৈল ও জ্বালানী তৈল (৪০%), কেরোসিন (৫.৬%), পিচ্ছিলকারক পদার্থ (৩.৭%), পীচ বা কৃত্রিম অ্যাসফাল্ট (২%), কোক (১%), অন্যান্য পদার্থ (ভেসেলিন, প্যারাফিন ইত্যাদি—৬%)। যে খনিজ তৈলের পরিশোধনে প্যারাফিন বা মোম অবশিষ্ট থাকে তাহা হইতে হাল্কা গ্যাসোলিন (ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট) পাওয়া যায়।

গৃহাদি আলোকিত করিতে ও রেলগাড়ী চালাইতে কেরোসিন তৈল, জাহাজের জ্বালানী হিসাবে কেরোসিন তৈল ও পেট্রোল এবং মোটর গাড়ী, বিমানপোত প্রভৃতি চালাইবার উপযোগী নানাপ্রকার দাহ্য পদার্থ খনিজ তৈল হইতে পাওয়া যায়। শিল্পকার্যে শক্তি উৎপাদন করিতেও খনিজ তৈলের নানাবিধ উপজাত দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

খনিজ তৈলের উৎপাদন (World oil production)—পৃথিবীতে উৎপাদিত সমগ্র খনিজ তৈলের প্রায় ৯০% যুক্তরাষ্ট্র, রুশিয়া, ভেনেজুয়েলা, পারস্য, ইন্দোনেশিয়া ও রুমেনিয়া—এই ছয়টি দেশেই উৎপাদিত হইয়া থাকে। আবার ইহাদের মধ্যে প্রথোমক্ত তিনটি দেশই একযোগে ৮০% উৎপাদন করিয়া থাকে। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে পশ্চিম ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলিতে খনিজ তৈলের একান্ত অভাব রহিয়াছে। পৃথিবীর প্রধান প্রধান তৈলক্ষেত্রগুলি কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত থাকায় এইগুলির উপর অধিকার বিস্তারের জন্য পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশসমূহ সর্বদাই সচেষ্ট। বর্তমানে কেবলমাত্র রুশিয়া ও জাপানের তৈলক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত পৃথিবীর অধিকাংশ তৈলক্ষেত্রের উপর মার্কিন, ব্রিটিশ, ওলন্দাজ ও ফরাসী প্রভুত্ব বিদ্যমান।

তৈল বলয় (Oil belts)—পৃথিবীতে তিনটি প্রধান খনিজ তৈল উৎপাদক বলয় রহিয়াছে, যথা, (১) **মার্কিন বলয়** (American belt)—এই বলয় উত্তর আমেরিকার পূর্বদিকে অবস্থিত আপালাচিয়ান পর্বতমালা হইতে আরম্ভ করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যাঞ্চলের রাজ্যগুলি এবং মেক্সিকোর মধ্য দিয়া দক্ষিণ আমেরিকার ভেনেজুয়েলা ও কলম্বিয়া হইয়া পেরু পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বলয়ের একটি শাখা যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত রকি পর্বতমালার মধ্য দিয়া ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। মার্কিন বলয়েই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে খনিজ তৈল পাওয়া যায়। (২) **মধ্য-প্রাচ্য বলয়** (Middle-East belt)—এই বলয় পারস্য দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ইরাকের মধ্য দিয়া রুশিয়া এবং রুমেনিয়ার অন্তর্গত কাস্পিয়ান ও কৃষ্ণ সাগর অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। বেহেরিন দ্বীপপুঞ্জ এবং সৌদী আরবের তৈলাঞ্চলগুলিও এই বলয়ের অন্তর্গত। এই বলয়ের তৈল উৎপাদন ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। (৩) **দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বলয়** (South-East Asiatic belt)—এই বলয় উত্তরে আসাম হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মদেশের মধ্য দিয়া দক্ষিণে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত।

পৃথিবীর প্রধান প্রধান তৈলখনিসমূহ (Principal oil-fields of the world)—(ক) **উত্তর আমেরিকার** অন্তর্গত নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে তৈল পাওয়া যায়—

(১) **যুক্তরাষ্ট্র**—বর্তমান পৃথিবীর প্রায় ৬০% খনিজ তৈল যুক্তরাষ্ট্রে উত্তোলিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য তৈলখনি অঞ্চলগুলির মধ্যে (১) উত্তর-পূর্ব নিউইয়র্ক হইতে টিনিস রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত আপালাচিয়ান খনি অঞ্চল, (২) ইলিনয় ও দক্ষিণ-পূর্ব ইণ্ডিয়ানা খনি অঞ্চল, (৩) হ্রদ অঞ্চলের দক্ষিণাংশে ইণ্ডিয়ানা ও ওহিও রাজ্যের অন্তর্গত লিমা-ইণ্ডিয়ানা খনি অঞ্চল, (৪) উত্তর টেক্সাস, ওকলাহামা ও কান্সাস রাজ্যের

অন্তর্গত মধ্য-মহাদেশীয় খনি অঞ্চল, (৫) মেক্সিকো উপসাগরের তীরবর্তী টেক্সাস্ ও লুইসিয়ানা রাজ্যের অন্তর্গত উপসাগরীয় খনি অঞ্চল, (৬) মিচিগান

৩২ নং চিত্র—যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডার খনিজ তৈল অঞ্চলসমূহ

রাজ্যের খনি অঞ্চল, (৭) প্রধানতঃ ওয়াইওমিং রাজ্যের অন্তর্গত রকি পর্বতের খনি অঞ্চল ও (৮) ক্যালিফোর্নিয়ার খনি অঞ্চলই উল্লেখযোগ্য। অবশ্য বর্তমানে টেক্সাস্, ওকলাহামা ও ক্যালিফোর্নিয়ার তৈলখনিগুলি হইতেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে তৈল পাওয়া যাইতেছে। যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত তৈলের প্রায় ৮০% আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইতেই ব্যয়িত হইয়া যায়

(২) **মেক্সিকোর** উপসাগরীয় অঞ্চলে প্রচুর খনিজ তৈল পাওয়া যায় এবং এই অঞ্চলে অবস্থিত ট্যাম্পিকো ও টুক্সপান বন্দর দিয়া প্রচুর খনিজ তৈল বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়। বর্তমানে মেক্সিকো পৃথিবীর মোট উৎপাদনের ২% খনিজ তৈল উৎপাদন করে।

(৩) **ক্যানাডার** অন্তর্গত আলবার্টা এবং অন্টেরিও প্রদেশ হইতে বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে খনিজ তৈল পাওয়া যাইতেছে।

(খ) **দক্ষিণ আমেরিকার** উল্লেখযোগ্য তৈলখনিগুলি আণ্ডিজ পর্বতাঞ্চলে অবস্থিত। এই খনিগুলির মধ্যে (১) ভেনেজুয়েলার ম্যারাকাইবো অঞ্চল;

(২) কলম্বিয়ার ম্যাগডালিনা-স্যানট্যানডার অঞ্চল এবং (৩) পেরুর উত্তর-পূর্বাঞ্চলে খনিজ তৈলের উৎপাদন অধিক। আর্জেন্টিনার খনিজ তৈলের সমগ্র
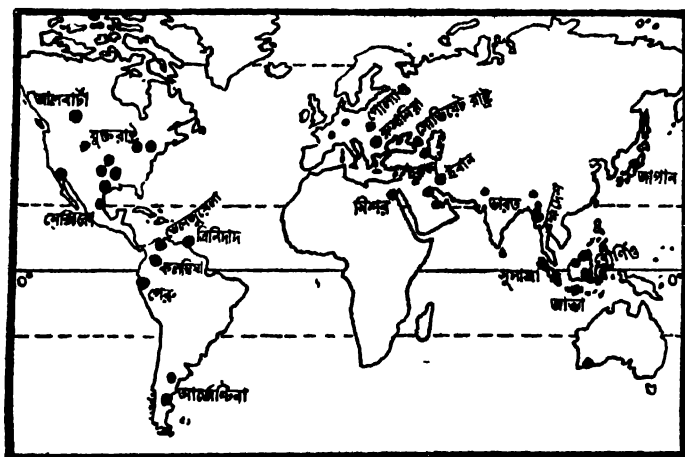
৩৩নং চিত্র—পৃথিবীর খনিজ তৈল উৎপাদক অঞ্চলসমূহ

চাহিদার প্রায় ৪০% (১) উত্তর প্যাটাগোনিয়া ও (২) উত্তর-পশ্চিম আর্জেন্টিনা —এই দুইটি খনি অঞ্চল হইতে মিটান হয়। উত্তরে ত্রিনিদাদ অঞ্চলে, চিলির উত্তরাংশে এবং বলিভিয়া রাজ্যেও সামান্য পরিমাণে তৈল পাওয়া যায়। সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকা পৃথিবীর মোট তৈল উৎপাদনের প্রায় ১২% সরবাহ করে।

(গ) **ইউরোপীয় রুশিয়ার** অন্তর্গত (১) কাস্পিয়ান উপকূলে অবস্থিত বাকু (রুশিয়ার ৭৫%), ককেসাস পর্বতের উত্তরস্থ গ্রজনী ও মাইকপ এবং (২) উরাল পর্বতাঞ্চল (উখ্‌টা হইতে স্টারলিটামাক পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল) তৈল খনির জন্য বিখ্যাত। ইউরাল অঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত উফা বর্তমানে তৈল উৎপাদনে এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে যে ইহাকে 'দ্বিতীয় বাকু' বলা হয়। নলের সাহায্যে (১) বাকু হইতে বাটুম, (২) মাখাচ্‌কালা হইতে গ্রজনী ও আরমাভির হইয়া কৃষ্ণাসাগর তীরস্থিত তুয়াপসে এবং (৩) আরমাভির হইতে রস্টভ-অন-ডন হইয়া ক্রদোভায়া পর্যন্ত তৈল প্রেরিত হয়। **এশীয় রুশিয়ার** অন্তর্গত (১) সুদূর প্রাচ্যের শাখালিন ও কামসাটকা এবং (২) সোভিয়েট মধ্য এশিয়ায় তৈল খনি রহিয়াছে। সম্প্রতি কারাগাণ্ডা ও বুখারায় এবং তুর্কমেন ও কিরঘিজ রাষ্ট্রে তৈলখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

(ঘ) **মধ্যপ্রাচ্য—(১) পারস্যের** মসজিদ-ই-সুলেমান, আঘা-জারি, লালি, গাচ-সরণ, নাফ্‌ৎ-ই-সাফিদ ও হাফ্‌ৎ-কেল অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য তৈল-

খনিসমূহ অবস্থিত। এই অঞ্চলসমূহ হইতে পরিস্রাবণের জন্য খনিজ তৈল নলযোগে আবাদান বন্দরে আনীত হয়।

(২) **ইরাকের** কারকুক ও খাঙ্কে অঞ্চলে তৈলখনিগুলি অবস্থিত। কারকুকের তৈলখনি পৃথিবীবিখ্যাত। এই অঞ্চল হইতে খনিজ তৈল নলযোগে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী ত্রিপলি ও হাইফা বন্দরে নীত হয়। পৃথিবীর মোট খনিজ তৈল উৎপাদনের প্রায় ১৫% ইরাকে পাওয়া যায়।

(৩) **সৌদী আরবের** হাসা প্রদেশ, **বেহরিন দ্বীপপুঞ্জ** এবং **কাটের** উপদ্বীপেও খনিজ তৈল পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের তৈলখনিগুলি মার্কিন শক্তিব তত্ত্বাবধানে বহিয়াছে। মিশর, প্যালেস্টাইন এবং আফগানিস্তানেও অল্পবিস্তব তৈল পাওয়া যায়।

(ঙ) **ইউরোপ**—রুশিয়া ব্যতীত সমগ্র ইউরোপ মহাদেশে খনিজ তৈলের উৎপাদন অতি সামান্য। রুমেনিয়া ও পোল্যাণ্ড (বর্তমানে ইহা রুশিয়ার অন্তর্ভুক্ত) ইউরোপের প্রধান তৈল-উৎপাদক দেশ। রুমেনিয়ার তৈলখনিগুলি কার্পাথিয়ান পর্বতমালার পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত। **প্লোস্টি** এই স্থানের প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র। জার্মানীর হ্যানোভার অঞ্চল, ফ্রান্সের পেচেলব্রন অঞ্চল এবং ব্রিটেনের নটিংহামশায়ারে কয়েকটি ছোট ছোট তৈলখনি রহিয়াছে।

(চ) **এশিয়া**—এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত নিম্নলিখিত দেশগুলিতে তৈল পাওয়া যায়। (১) **ভারতে** (সর্বপ্রধান খনি ডিগবয়) খনিজ তৈলের উৎপাদন অতি সামান্য। (২) **পাকিস্তান** (পঃ পাঞ্জাব ও বেলুচিস্তান) প্রতি বৎসর গড়ে ১৫ মিঃ গ্যালন খনিজ তৈল উৎপাদন করে। (৩) **ব্রহ্মদেশের** ইরাবতী নদীর উপত্যকায় এবং রামরীতে বহু তৈলখনি রহিয়াছে। (৪) জাভা, সুমাত্রা, বোর্নিও, ব্রুন্সি, সারাবাক্, বালিকপাপান ও তারাকান **ইন্দোনেশিয়ার** প্রধান প্রধান খনিজ তৈলাঞ্চল। (৫) **জাপানে** অতি সামান্য পরিমাণে খনিজ তৈল পাওয়া যায়। উত্তর হন্‌সুর পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত আকিটা ও নিগাটা খনি হইতে জাপানের সমগ্র উৎপাদনের ৯৫% তৈল উৎপন্ন হয়।

উপরোক্ত অঞ্চলগুলি ব্যতীত চীন, নিউজীল্যাণ্ড, ঘানা, নাইজেরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলেও সামান্য পরিমাণে খনিজ তৈল পাওয়া যায়।

খনিজ তৈলের বাণিজ্য (Trade in mineral oil)—যুক্তরাষ্ট্র, ভেনেজুয়েলা, ইরান, রুশিয়া, রুমেনিয়া, ইরাক, কলম্বিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্মদেশ, মেক্সিকো, পেরু, ত্রিনিদাদ, বেহ্‌রিন দ্বীপ প্রভৃতি দেশ খনিজ তৈল রপ্তানী করিয়া থাকে। যুক্তরাজ্য, ক্যানাডা, ফ্রান্স, জার্মানী, জাপান, ইতালী, হল্যাণ্ড ও আর্জেন্টিনা প্রচুর পরিমাণে খনিজ তৈল আমদানী করে।

জলবিদ্যুৎ (Water Power বা Hydro-electric Power বা White Coal)

খনিজ জ্বালানী ও জলবিদ্যুতের তুলনা (Comparison between mineral fuels and water power)—জলপ্রপাত বা নিম্নগামী বেগবতী নদীর জলস্রোত দ্বারা ডায়নামো চালাইয়া যে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করা হয় তাহাকে জলবিদ্যুৎ বলে। খনিজ তৈল বা কয়লা অপেক্ষা জলবিদ্যুৎ **সস্তা** এবং প্রাকৃতিক সম্পদ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার **যোগান অফুরন্ত**। আবার আকরিক হইতে অ্যালুমিনিয়ম নিষ্কাশন, কাষ্ঠমণ্ড শিল্প, কৃত্রিম সার তৈয়ারী, কয়েকপ্রকার রাসায়নিক শিল্প প্রভৃতি শিল্পকার্যে এত অধিক উত্তাপের প্রয়োজন হয় যে জলবিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার একান্ত **অপরিহার্য**। বর্তমানে জলবিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন ও ব্যবহারের ফলে ইতালী, সুইজারল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি কয়লা ও খনিজ তৈল-হীন অঞ্চলেও **শিল্পের প্রসারলাভ** ঘটিতেছে। আবার জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন-কেন্দ্র হইতে সহজে ও অল্পব্যয়ে বহুদূরবর্তী অঞ্চলসমূহে বিদ্যুৎবাহী তারের সাহায্যে প্রেরণ করা যায় বলিয়া বর্তমান কালে এই বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহারের ফলে যন্ত্রশিল্পের **বিকেন্দ্রীকরণের** সম্ভাবনাও পরিলক্ষিত হইতেছে।

উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা (Factors favouarble for generation)—জলবিদ্যুৎ উৎপাদন নিম্নলিখিত ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে।

(ক) **ভৌগোলিক অবস্থা** (Geographical বা Physical factors) —(১) বন্ধুর ভূপ্রকৃতির উপর দিয়া প্রবাহিত জলস্রোত অত্যন্ত প্রবল হয় বলিয়া পার্বত্য নদনদী ও জলপ্রপাত জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সহায়ক। স্বাভাবিক জলপ্রপাতের অভাবে নদীতে বাঁধ বাঁধিয়া কৃত্রিম প্রপাত তৈয়ারী করিতে হয়। বাঁধ নির্মাণের পক্ষে পাহাড়ের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ স্থানই প্রশস্ত। কারণ ইহাতে প্রথমতঃ, বাঁধ বাঁধিতে ব্যয়সংক্ষেপ হয় এবং দ্বিতীয়তঃ, উচ্চস্থান হইতে জলধারার পতনের ফলে যে বেগ সঞ্চারিত হয় তাহাতে সহজেই জলবিদ্যুৎ আহরণ করা যায়। (২) সারাবৎসর ধরিয়া নিয়মিত, প্রচুর ও সমবেগসম্পন্ন পলিবিহীন জলপ্রবাহের প্রয়োজন। সারা বৎসর ধরিয়া জলপ্রবাহের সমতা রক্ষার জন্য তুষারাবৃত পর্বত, বৃষ্টিপাত এবং তুষারপুষ্ট নদনদী ও পর্বতের উপর জলপূর্ণ স্বাভাবিক বা কৃত্রিম হ্রদ থাকা প্রয়োজন। (৩) নাতিতীব্র শীতকাল। কারণ শীতকালীন উত্তাপ যদি হিমাঙ্ক পর্যন্ত নামিয়া আসে তাহা হইলে জলরাশি জমিয়া বরফে পরিণত হয় এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হয় না।

(খ) **অর্থনৈতিক অবস্থা** (Economic Factors)—অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশযুক্ত অঞ্চলে নিম্নলিখিত অর্থনৈতিক অবস্থাগুলির বিদ্যমানতা জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রেরণা যোগায়। (১) জনবহুল ও শিল্পসমৃদ্ধ ভোগকেন্দ্রের নিকটবর্তিতা। উৎপাদনকেন্দ্র হইতে ভোগকেন্দ্রসমূহ ৩০০-৪০০ মাইলের অধিক দূরবর্তী হইলে বিদ্যুৎ সরবরাহের মূল্য অস্বাভাবিক রূপে বৃদ্ধি পায়। জলবিদ্যুতের ব্যবহারকেন্দ্রেসমূহ জনবহুল ও শিল্পসমৃদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। (২) যানবাহনের সুব্যবস্থা। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানাটি নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহের সহিত উপযুক্ত যানবাহন ব্যবস্থা দ্বারা সংযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। (৩) অনুকূল ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশযুক্ত অঞ্চলসমূহে কয়লা ও খনিজ তৈলের অপ্রতুলতা জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুপ্রেরণা দেয়।

দঃ আমেরিকার আমাজন ও আফ্রিকার কঙ্গো নদী হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ভৌগোলিক পরিবেশ অনুকূল হওয়া সত্ত্বেও প্রতিকূল অর্থনৈতিক পরিবেশের দরুণ এই সমস্ত অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হয় নাই। অপর পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলে ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ অনুকূল হওয়ায় তথায় প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে জলবিদ্যুৎশক্তি প্রকৃতিপ্রদত্ত সম্পদ (gift of nature) নহে, ইহা মনুষ্যকৃত শ্রমসাধ্য সম্পদ।

উৎপাদক অঞ্চল (Area of Production)—

(১) **উত্তর আমেরিকা**—এই মহাদেশের অন্তর্গত যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডার জলবিদ্যুতের উৎপাদন ও ব্যবহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ক্যানাডার অন্তর্গত দক্ষিণ অণ্টেরিও ও কুইবেক প্রদেশের শিল্পাঞ্চলসমূহ এবং যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বাফেলো, রচেষ্টার ও নিউইয়র্ক রাজ্যের অধিকাংশ শিল্পকেন্দ্রেই **নায়াগ্রা প্রপাত** হইতে উদ্ভূত জলবিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে **যুক্তরাষ্ট্রের** (ক) উত্তরে নিউইয়র্ক এবং নিউইংলণ্ড রাজ্যে, (খ) দক্ষিণাঞ্চলের আটলাণ্টিক উপকূলসন্নিহিত রাজ্যসমূহে, এবং (গ) পশ্চিমের রকি পর্বতাঞ্চলে জলবিদ্যুতের ব্যাপক উৎপাদন ও ব্যবহার হইতেছে। **ক্যানাডার** মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত প্রেয়রী প্রদেশ ব্যতীত অন্যান্য প্রায় সমস্ত অঞ্চলেই জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন ও ব্যবহৃত হয়। তবে পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলিতে জলবিদ্যুতের উৎপাদন ও ব্যবহার সর্বাপেক্ষা অধিক।

(২) **ইউরোপ**—বর্তমানে ইউরোপ মহাদেশের অন্তর্গত অনেক দেশেই প্রচুর পরিমাণে জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত ও ব্যবহৃত হইতেছে। **ইতালীতে** বর্তমানে জলবিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন ও ব্যাপক ব্যবহারের দ্বারা কয়লার অভাব

বহুলাংশে মোচন করা হইয়াছে। আল্পস্ ও আপেনাইন পর্বত হইতে নির্গত নদীসমূহ হইতেই জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। আল্পস্ পর্বতাঞ্চলের নদীসমূহ হইতে উৎপাদিত জলবিদ্যুৎ **সুইজারল্যাণ্ডের** শিল্প ও রেলপথ সমূহে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। **নরওয়ের** শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ জলবিদ্যুৎ শক্তির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। নরওয়ের দক্ষিণ এবং পশ্চিম অঞ্চলেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। ভেনার হ্রদ হইতে উৎপন্ন গোটা নদীর উপর ট্রলহাট্টা **সুইডেনের** বিখ্যাত জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনকেন্দ্র। জলবিদ্যুতের উৎপাদন ও ব্যাপক ব্যবহারের দ্বারা **ফ্রান্স** কয়লার অপ্রতুলতা ও খনিজ তৈলের অভাব মোচন করিবার চেষ্টা করিতেছে। **জার্মানীর** জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ সামান্য হইলেও উৎপাদিত জলবিদ্যুতের ব্যবহার ব্যাপক।

(৩) **এশিয়া**—এশিয়া মহাদেশের মধ্যে জলবিদ্যুতের উৎপাদন ও ব্যবহারে জাপান ও **ভারত**-ই প্রধান। অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ **জাপানে** জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সহায়তা করে। হনসুর পার্বত্য অঞ্চলেই জলবিদ্যুতের উৎপাদন অধিক। **ব্রহ্মদেশে** উত্তরের পর্বতাঞ্চলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে।

(৪) **রুশিয়া**—ইউরোপীয় রুশিয়ার (১) নীপার নদীর উপর (নীপ্রোগ্রেস কেন্দ্র), (২) লেনিনগ্রাদের নিকট স্বীর ও ভলকভ নদীর উপর, (৩) শ্বেত সাগরের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত নিভা নদীর উপর, (৪) ককেশাস পর্বতাঞ্চলের বিভিন্ন নদীর উপর এবং (৫) ভল্গা অববাহিকা অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহ রহিয়াছে। এশীয় রুশিয়াতেও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার সম্মেলনে এবং **অস্ট্রেলিয়া** ও **নিউজীল্যাণ্ডে** সামান্য পরিমাণে জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হইতেছে।

ভারতের প্রধান প্রধান খনিজ সম্পদ

ভারতের খনিজ সম্পদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান।

লৌহ আকরিক (Iron ore)—আকরিক লৌহ উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। ভারতের লৌহ আকরিক অতি উচ্চশ্রেণীর বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। আবার ভারতের অধিকাংশ লৌহখনিরই বিশেষ সুবিধা এই যে, এই খনিগুলির নিকটেই কয়লা এবং লৌহ গলাইবার উপযোগী ম্যাঙ্গানীজ, চুনাপাথর, ডলোমাইট প্রভৃতি পাওয়া যায়। অধিকন্তু খনি হইতে কারখানা এবং সেখান হইতে বড় বড় শহরকে যুক্ত করিবার উপযোগী যানবাহনের সুযোগ-সুবিধাও যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে।

ভারতে সঞ্চিত আকরিক লৌহের পরিমাণ ২,২৪০ কোটি টনেরও উপর। উত্তম শ্রেণীর লৌহ আকরিক ভারতের নানাস্থানে পাওয়া গেলেও নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে উহা সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে উত্তোলিত হয়।
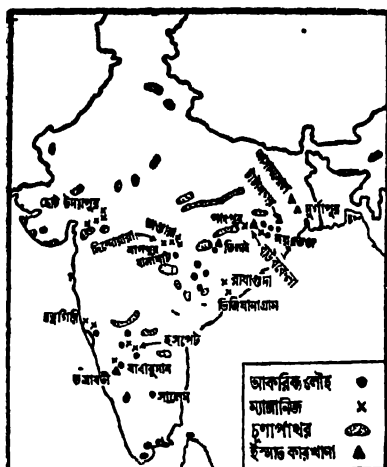
৩৪ নং চিত্র—ভারতের খনিজ সম্পদ

ছোটনাগপুরের **সিংভূম** জেলার কলহান মহকুমার অন্তর্গত পানশিরাবুরু, বুদাবুরু, গুয়া এবং নোয়ামুণ্ডি খনি হইতে প্রচুর পরিমাণে উচ্চশ্রেণীর হেমাটাইট লৌহ আকরিক উত্তোলিত হয়। এই খনিগুলি দঃ পুঃ রেলপথের দ্বারা টাটা-নগরের লৌহ ও ইস্পাতের কারখানার সহিত সংযুক্ত।

উড়িষ্যা—(ক) **কেওনঝাড়** অঞ্চলের দুইটি খনি প্রধান—(১) বাগিয়াবুরু এবং (২) উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সিংভূমের নোয়ামুণ্ডি খনির এই জেলার অন্তর্গত অংশ। এই খনিগুলির নিকটেই ম্যাঙ্গানীজ ও ডলোমাইট পাওয়া যায়। (খ) **বোনাই অঞ্চল**। (গ) **ময়ূরভঞ্জ** জেলার গুরুমহিষাণী, ওকাম্পাদ (শুলাইপাদ) ও বাদামপাহাড় খনি অঞ্চল হইতে প্রচুর উচ্চশ্রেণীর আকরিক উত্তোলিত হয়। এই সমুদয় খনি পূঃ ও দঃ পূঃ রেলপথের দ্বারা টাটানগর ও আসানসোলের সহিত সংযুক্ত। এই খনিগুলির নিকটে প্রচুর কয়লা ও ডলোমাইট পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে ময়ূরভঞ্জ জেলার এই তিনটি খনি হইতেই ভারতে উত্তোলিত মোট লৌহ আকরিকের $\frac{3}{4}$ অংশ পাওয়া যায়। উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জেলা, বোনাই ও কেওনঝাড় হইতে সিংভূম জেলার কলহান মহকুমা পর্যন্ত এই অতিবিস্তৃত লৌহ-প্রস্তরের বিরাট পর্বত পৃথিবীর মধ্যে আয়তনে ও গুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। সম্প্রতি উড়িষ্যার কিরিবুরু অঞ্চলে একটি লৌহ খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই খনিটি জাপানী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইতেছে।

মহীশূর রাজ্যের বাবাবুদান পর্বতে অবস্থিত কেমাণ্ডগুণ্ডি খনি হইতে অতি উচ্চশ্রেণীর হেমাটাইট লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। এই রাজ্যের তিপ্তুর ও চিতলদ্রুগ অঞ্চলেও লৌহ পাওয়া যায়। এই রাজ্যে কয়লার অভাব থাকায় কাঠের কয়লায় লৌহ গলান হয়। **মধ্যপ্রদেশের** চান্দা জেলায়

লোহারা ও পিপলগাঁও এবং দ্রুগ জেলার ঢালি ও রাজহারা পর্বতাঞ্চলে অবস্থিত খনিগুলি হইতে উচ্চশ্রেণীর আকরিক পাওয়া যায়। এই প্রদেশের বস্তার অঞ্চলেও লৌহখনি আছে। মধ্যপ্রদেশের লৌহ আকর ভিলাই-এর ইস্পাত কেন্দ্রে ব্যবহৃত হয়। **অন্ধ্রের** নেলোর, কুডাপ্পা ও কুর্নুল এবং **তামিলনাড়ুর** ত্রিচিনপল্লী ও সালেম জেলায় লৌহখনি রহিয়াছে। এই খনি-গুলি হইতে উচ্চশ্রেণীর ম্যাগনেটাইট আকরিক পাওয়া যায়। লৌহখনির নিকট কয়লা না থাকায় আকরিক হইতে লৌহ নিষ্কাশিত হইতেছে না। **মহারাষ্ট্রের** রত্নগিরি অঞ্চলে এবং গোয়ায় লৌহখনি আছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। উত্তর প্রদেশ (আলমোড়া), পাঞ্জাব এবং পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের কয়লা-খনি-অঞ্চলসমূহেও সামান্য পরিমাণে আকরিক লৌহ ("আয়রন স্টোন শেল") পাওয়া যায়। ১৯৫০, ১৯৫৫, ১৯৬০ ও ১৯৬৫ সালে ভারতে যথাক্রমে ২৯·৭, ৪৬·৭, ১০৫·২, ১৬৭·১৮ (অনুমিত) লক্ষ টন লৌহ আকরিত হয়।

ভারতের আভ্যন্তরীণ চাহিদা (বর্তমানে ৮০ লক্ষ টন) মিটাইবার পরেও প্রতি বৎসর যে রপ্তানীযোগ্য উদ্বৃত্ত থাকে তাহা জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং সিংহলে **রপ্তানী** হয়। ১৯৫০ সালের পর হইতেই রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৫৫-৫৬ সালে ১·৪ মিঃ টন লৌহ আকর ভারত হইতে রপ্তানী হয়। ১৯৬০-৬১ সাল নাগাদ এই রপ্তানীর পরিমাণ দাঁড়ায় অনুমান প্রায় ২ মিঃ টন।

ম্যাঙ্গানীজ (Manganese)—ম্যাঙ্গানীজ প্রধানতঃ লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে, ফেরোম্যাঙ্গানীজ নামক সংকর ধাতু ও ম্যাঙ্গানীজ ষ্টীল নামক ইস্পাত নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। রাসায়নিক, বৈদ্যুতিক এবং কাঁচ শিল্পে ও দিয়াশলাই-এর উপকরণরূপে ম্যাঙ্গানীজ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

একমাত্র রুশিয়া ব্যতীত ভারতই ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদনে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। ভারতের মোট ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদনের প্রায় ৬০% **মধ্যপ্রদেশের** বালাঘাট, ছিন্দোয়ারা, জব্বলপুর এবং ঝাবুয়া অঞ্চলে অবস্থিত খনিসমূহ হইতে পাওয়া যায়। বিশাখাপত্তনমে বন্দর নির্মাণের পর হইতে মধ্যপ্রদেশের ম্যাঙ্গানীজ শিল্পের উন্নতি দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্তমানে দঃ পূঃ রেলপথের বিশাখাপত্তনম-রায়পুর শাখাপথে প্রচুর পরিমাণে ম্যাঙ্গানীজ বিশাখাপত্তনম বন্দরে নীত হয় এবং সেখান হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়। ভারতের মোট ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদনের ১৫% **অন্ধ্র** রাজ্যে উৎপাদিত হয়। এই রাজ্যের বিশাখাপত্তনম, কুর্নুল ও বেলারী জেলায় এবং সান্দুর অঞ্চলে অবস্থিত খনিসমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত অঞ্চলের অধিকাংশ ম্যাঙ্গানীজই বিশাখাপত্তনম বন্দর হইতে বিদেশে রপ্তানী হয়। **মহারাষ্ট্রের**

পাঁচমহল জেলায়, রত্নগিরি, ভাণ্ডারা, নাগপুর এবং ছোট উদয়পুরে ম্যাঙ্গানীজ পাওয়া যায়। মোট উৎপাদনের ৬% ম্যাঙ্গানীজ'এ অঞ্চল হইতে আসে। **মহীশূরের** কাডুর, সিমোগা, তুমকুর ও চিতলদ্রুগ অঞ্চলে ম্যাঙ্গানীজ পাওয়া যায়। মহীশূরের ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদন অতি সামান্য—মোট উৎপাদনের প্রায় ৪%। **বিহারের** মানভূম, হাজারীবাগ ও **উড়িষ্যার** ময়ূরভঞ্জ, কালাহাণ্ডি, কেওনঝাড় এবং গাংপুর অঞ্চলে ম্যাঙ্গানীজ পাওয়া যায়। এই অঞ্চল ভারতের মোট উৎপাদনের ৪% ম্যাঙ্গানীজ উত্তোলন করে। **রাজস্থানের** বান্‌স্‌ওয়াবা অঞ্চলেও ম্যাঙ্গানীজ আকরিত হয়।

ভারতে প্রায় ১৮ কোটি টন ম্যাঙ্গানীজ আকরিক সঞ্চিত রহিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার প্রায় ১০ কোটি টনই রহিয়াছে মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র রাজ্যে। ১৯৫০, ১৯৫৫, ১৯৬০ ও ১৯৬৫ সালে ভারতে যথাক্রমে ৮·৮, ১৫·৮, ১১·৬ ও ১৪·৭৩ (অনুমিত) লক্ষ টন ম্যাঙ্গানীজ উত্তোলিত হয়। উৎপাদিত ম্যাঙ্গানীজের মাত্র ১০% ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গ্রহণ করে এবং অতি সামান্য অংশ কাঁচশিল্প, রাসায়নিক শিল্প এবং বিদ্যুৎশিল্পে ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্ট প্রায় ৮৮% গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান, বেলজিয়াম, জার্মানী এবং যুক্তরাষ্ট্রে **রপ্তানী** হইয়া যায়।

মোনাজাইট (Monazite)—মোনাজাইট আকরিক হইতে থোরিয়াম ও ইউরেনিয়াম ধাতু নিষ্কাশিত হয়। গ্যাসের আলোর ম্যাণ্ট্‌ল্‌ প্রস্তুতিতে ও আণবিক শক্তি উৎপাদনে ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীতে উৎপাদিত মোনাজাইটের প্রায় ৮৩ ভাগই ভারতের কেরালা রাজ্য, উড়িষ্যা (চিল্কা), অন্ধ্র (গোদাবরীর বদ্বীপাঞ্চল) এবং তামিলনাড়ুতে (তিনেভেলি) পাওয়া যায়। সম্প্রতি ভারত হইতে মোনাজাইটের রপ্তানী নিষিদ্ধ হইয়াছে।

ইলমেনাইট (Ilmenite)—ইলমেনাইট আকরিক হইতে নিষ্কাশিত টাইটানিয়াম ধাতু দ্বারা অতি শুভ্র রং প্রস্তুত হয়। পৃথিবীর সমগ্র চাহিদার প্রায় ৭৫ ভাগ ইলমেন্যাইট যোগায় ভারতের কেরালা রাজ্য। ১৯৫০, ১৯৫৫, ১৯৬০ ও ১৯৬৫ সালে ভারতে যথাক্রমে ২·১৩, ২·৫১, ২·৪৬ ও ৩·১ (অনুমিত) লক্ষ টন ইলমেনাইট আকরিত হয়। ভারতে প্রায় ৩০ কোটি টন ইলমেনাইট সঞ্চিত রহিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। বর্তমানে প্রতিবৎসর ভারতে প্রায় ০·১ লক্ষ টন ইলমেনাইট বিভিন্ন শিল্পকার্যে ব্যবহৃত হইতেছে।

তাম্র (Copper)—[ব্যবহার—পৃঃ ১৪৪ দেখ] ভারতে অতি সামান্য পরিমাণে তাম্র উৎপাদিত হয়। ১৯৫০, ১৯৫৫, ১৯৬০ ও ১৯৬৫ সালে ভারতে যথাক্রমে ৩·৬০, ৩·৫৩, ৪·৪১ ও ৪·৬৮ (অনুমিত) লক্ষ টন তাম্র আকরিত হয়। **বিহারের** সিংভূম, হাজারীবাগ ও সাঁওতাল পরগণায় তাম্র পাওয়া যায়। সিংভূম

জেলায় ৮০ মাইল বিস্তৃত অঞ্চল লইয়া একটি বিশাল তাম্রবলয় রহিয়াছে। এই বলয়ের অন্তর্গত মোসাবানী, ঘাটশীলা ও ধোবানী অঞ্চলের খনিসমূহ হইতে তাম্র উত্তোলিত হয়। **অন্ধ্রের** নেলোর জেলা, **মহীশূর, উত্তর প্রদেশের** গাড়োয়াল এবং কুমায়ুন অঞ্চল, **রাজস্থানের** আজমীঢ, আলোয়ার ও উদয়পুর, **পাঞ্জাবের** কুলু অঞ্চল, **সিকিম, মধ্যপ্রদেশ, জম্মু** ও **কাশ্মীর** অঞ্চলেও সামান্য পরিমাণে তাম্র আকরিক পাওয়া যায়। বহির্হিমালয় ব্যাপিয়া কুলু উপত্যকা হইতে আরম্ভ করিয়া কাংড়া, নেপাল ও ভুটানের মধ্য দিয়া সিকিম পর্যন্ত বিস্তৃত একটি বিরাট তাম্রবলয় রহিয়াছে। দুর্গম অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া এবং যানবাহনেব অসুবিধা থাকায় ঐ অঞ্চল হইতে উত্তোলনকায চলে না। সিংভূম জেলার ঘাটশিলায় অবস্থিত "ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন" ভারতে উৎপাদিত প্রায় সমগ্র তাম্রই গ্রহণ করিয়া থাকে। ভারত প্রতি বৎসরই বিদেশ হইতে তাম্র আমদানী করে। তাম্রেব সহিত দস্তা মিশ্রিত করিয়া এদেশে পিত্তল প্রস্তুত হয়।

৩৫ নং চিত্র—ভারতের খনিজ সম্পদ

ভারতে প্রায় ১২'৯ কোটি টন তাম্র আকরিক সঞ্চিত রহিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। বর্তমানে প্রতিবৎসর ভারতে বিভিন্ন শিল্প কার্যে প্রায় ০'৭ লক্ষ টন তাম্র (ধাতু) ব্যবহৃত হইতেছে।
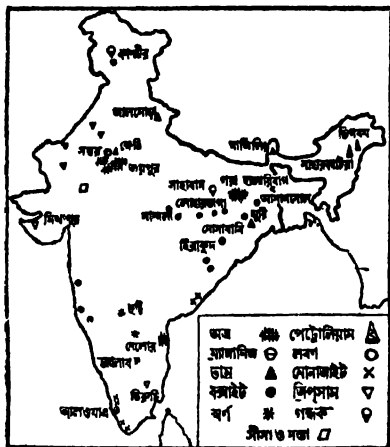
ম্যাগনেসাইট (Magnesite)—এই আকরিক হইতে নিষ্কাশিত ম্যাগনেসিয়াম ধাতু কাঁচ, সিমেণ্ট, কাগজ, রং প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। বিহার, মহীশূর, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান এবং তামিলনাড়ুর সালেম জেলায় প্রচুর ম্যাগনেসাইট সঞ্চিত রহিয়াছে। এদেশে উত্তোলিত প্রায় সমগ্র ম্যাগনেসাইট ইউরোপীয় দেশসমূহে রপ্তানী হয়। ১৯৫০, ১৯৫৫, ১৯৬০ ও ১৯৬৫ সালে ভারতে যথাক্রমে ০'৫৩, ০'৫৮, ১'৫৪ ও ২'৩৫ (অনুমিত) লক্ষ টন ম্যাগনেসাইট আকরিত হয়। ভারতে প্রায় ৫'৮ কোটি টন ম্যাগনেসাইট আকরিক সঞ্চিত রহিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। বর্তমানে ভারতে প্রতি বৎসর প্রায় ১'৪ লক্ষ টন ম্যাগনেসাইট আকরিক নানাবিধ শিল্পকার্যে ব্যবহৃত হইতেছে।

বক্সাইট (Bauxite)—[ব্যবহার—পৃঃ ১৪৭ দেখ] ভারতে প্রচুর বক্সাইট

সঞ্চিত রহিয়াছে। বিশেষজ্ঞদের মতে সমস্ত শ্রেণীর সঞ্চিত বক্সাইটের পরিমাণ ১৩'১৪ কোটি টন। ইহার মধ্যে উচ্চশ্রেণীর বক্সাইটের পরিমাণ ৭'৯ কোটি টন। ইহার প্রায় ⅓ অংশ বিহারেই রহিয়াছে। ১৯৫০, ১৯৫৫, ১৯৬০ ও ১৯৬৫ সালে ভারতে যথাক্রমে ০'৬৪, ০'৯০, ৩'৭৭ ও ৭'০৩ (অনুমিত) লক্ষ টন বক্সাইট আকরিত হয়। মধ্যপ্রদেশ, বিহার, অন্ধ্র, তামিলনাডু, উড়িষ্যা, কাশ্মীর ও জম্মু এবং মহারাষ্ট্র রাজ্যের স্থানে স্থানে প্রচুর বক্সাইট পাওয়া যায়। তবে এদেশে অ্যালুমিনিয়মের উৎপাদন অতি সামান্য। "ইণ্ডিয়ান অ্যালুমিনিয়ম কোং" তামিলনাডুতে এবং "অ্যালুমিনিয়ম কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া" আসানসোলে নিষ্কাশনের কারখানা স্থাপন করিয়াছে। বিহারের মুরীতেও অ্যালুমিনিয়ম প্রস্তুতির একটি বৃহৎ কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমানে ভারতে প্রতিবৎসর প্রায় ১ লক্ষ টন বক্সাইট আকরিক বিভিন্ন শিল্পকার্যে ব্যবহৃত হইতেছে। সম্প্রতি ১৯৬৫ সালে স্থাপিত 'ভারত অ্যালুমিনিয়াম কোং (প্রাঃ) লিঃ' নামক সরকারী প্রতিষ্ঠানটির তত্ত্বাবধানে দুইটি অ্যালুমিনিয়ম নিষ্কাশন কারখানা গড়িয়া উঠিতেছে। ইহাদের মধ্যে একটি স্থাপিত হইবে মহারাষ্ট্রের কয়না অঞ্চলে এবং অপরটি স্থাপিত হইবে মধ্যপ্রদেশের কববা অঞ্চলে। প্রথমটির উৎপাদন ক্ষমতা হইবে বার্ষিক ৫০,০০০ টন এবং দ্বিতীয়টির উৎপাদন ক্ষমতা হইবে বার্ষিক ১ লক্ষ টন।

স্বর্ণ (Gold)—আগ্নেয় শিলাস্তরের মধ্যে মৌলিক অবস্থায় স্বর্ণ পাওয়া যায়। এই শিলাস্তরকে চূর্ণ করিয়া স্বর্ণ বাহির করা হয়। কোন কোন অঞ্চলে নদীবাহিত বালুকার সহিত স্বর্ণকণা মিশ্রিত অবস্থায় থাকে এবং বালুকা ধৌত করিয়া স্বর্ণ সংগৃহীত করা হয়। তবে এই প্রকারে সংগৃহীত স্বর্ণের পরিমাণ অতি সামান্য। অলংকার ও মুদ্রা তৈয়ারীর জন্যই স্বর্ণ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। নানাবিধ শিল্পে এবং ঔষধ প্রস্তুত করিতেও স্বর্ণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পৃথিবীতে উৎপাদিত মোট স্বর্ণের প্রায় ২% ভারতে পাওয়া যায়। মহীশূরের কোলার স্বর্ণখনিগুলি হইতে প্রায় ৯৯% স্বর্ণ পাওয়া যায়। মহীশূরের বেল্লারী ও ধারওয়ারে স্বর্ণ উত্তোলিত হইতেছে। মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি জেলায়, কাশ্মীরে, প্রাক্তন হায়দরাবাদের হুট্টি অঞ্চলে, অন্ধ্রের অনন্তপুর ও তামিলনাডুর সালেম জেলাতেও স্বর্ণের আকর পাওয়া যায়। পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, আসাম, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা এবং কাশ্মীরের স্বর্ণরেণুবাহী নদীর বালুকা ধৌত করিয়াও সামান্য পরিমাণ পাললিক স্বর্ণ উৎপাদিত হয়। স্বর্ণের উৎপাদন ভারতে ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সালে মোট উৎপাদন দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪৬১৯ ও ৪০৬২ কিঃ গ্রাঃ। ভারত সামান্য পরিমাণ স্বর্ণ বিদেশ হইতে আমদানী করে।

রৌপ্য (Silver)—রৌপ্য প্রধানতঃ সীসক, স্বর্ণ ও তাম্র আকরিকের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় থাকে, তবে অনেক সময় খনিতে মৌলিক অবস্থাতেও সামান্য পরিমাণ রৌপ্য পাওয়া যায়। ইহা অলঙ্কার ও মুদ্রা তৈয়ারীর জন্য, তৈজসপত্র নির্মাণে, ঔষধ প্রস্তুত করিতে ও গিল্টি করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভারতে অতি সামান্য পরিমাণ রৌপ্য স্বর্ণ ও তাম্রের খনি হইতে উপজাত দ্রব্য হিসাবে উৎপাদিত হয়। ভারত প্রতি বৎসর প্রচুর রৌপ্য বিদেশ হইতে আমদানী করে।

দস্তা ও সীসক ভারতে (রাজস্থান) খুব সামান্যই পাওয়া যায়। ভারতে প্রায় ১'০৭ কোটি টন দস্তা-সীসক আকরিক সঞ্চিত রহিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। ১৯৬৫ সালে ৫৫৮২ (অনুমিত) টন সীসক (ধাতু) ও ৯৭০৬ (অনুমিত) টন দস্তা (ধাতু) উৎপাদিত হয়। বর্তমানে ভারতে প্রতি বৎসর প্রায় ০'৩ লক্ষ টন সীসক (ধাতু) ও ০'৬ লক্ষ টন দস্তা (ধাতু) বিভিন্ন শিল্পকার্যে ব্যবহৃত হইতেছে। বিশাখাপত্তনম অঞ্চলে পোল্যাণ্ড ও ভারত সরকারের যৌথ-সহযোগিতায় বার্ষিক ৩০,০০০ টন দস্তা নিষ্কাশনের ক্ষমতা যুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান এবং ১৯৬৬ সালে গঠিত ও বার্ষিক ১৮,০০০ টন দস্তা নিষ্কাশনের ক্ষমতাযুক্ত 'হিন্দুস্থান জিংক (প্রাঃ) লিঃ' নামক একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে স্থাপিত হইয়াছে।

অভ্র (Mica)—[ব্যবহার—পৃঃ ১৪৮ দেখ] ভারত অভ্র উৎপাদনে বহুকাল যাবৎ পৃথিবীর মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় ৭৫% অভ্র ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। ১৯৫১-৫২ ও ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতে যথাক্রমে ৫ ও ৪'১৯ লক্ষ হন্দর অভ্র উত্তোলিত হয়। উৎকৃষ্ট অভ্র ভারতে যত আছে তত আর কোথাও নাই। ভারতীয় অভ্র সাধারণতঃ নিম্নোক্ত স্থানসমূহে পাওয়া যায়। **বিহারের** অভ্রবলয় হাজারী-বাগ, গয়া, মুঙ্গের ও মানভূম জেলার মধ্য দিয়া ৬০ মাইল দীর্ঘ ও ১৪ মাইল প্রশস্ত এক বিস্তৃত ভূখণ্ড অধিকার করিয়া আছে। কোডার্মা বনাঞ্চলের নিকটবর্তী স্থানে এই বলয়ের উল্লেখযোগ্য খনিসমূহ অবস্থিত। বিহারের অভ্রবলয় সমগ্র ভারতীয় উৎপাদনের প্রায় ৮০% সরবরাহ করে। ভারতের অভ্রশিল্পে ২ লক্ষের অধিক শ্রমিক নিযুক্ত রহিয়াছে। উহার মধ্যে প্রায় ১½ লক্ষ শ্রমিকই বিহারের অভ্রশিল্পে নিযুক্ত রহিয়াছে। বিহারের অভ্রের উৎকর্ষ এবং তৎস্থানের শিল্পে নিযুক্ত জনগণের দক্ষতা ভারতীয় অভ্রশিল্পকে জগতের মধ্যে একটি বিশিষ্ট আসন দিয়াছে। বিহারের অভ্র স্বচ্ছ; ইহা "চুণী অভ্র" নামে পরিচিত। ইহার মূল্যও অধিক। অন্ধ্র রাজ্যের নেলোর জেলায় ৬০ মাইল দীর্ঘ ও ১০ মাইল প্রশস্ত একটি বিস্তৃত অভ্রবলয় রহিয়াছে। আট-মাকুর, রায়পুর, গুড়ুর ও কাভালী অঞ্চলে খনিসমূহ অবস্থিত। নেলোরের

অভ্র ঈষৎ হরিদ্রাভ এবং বিহারের অভ্র অপেক্ষা নিকৃষ্ট। নীলগিরি অঞ্চলেও সামান্য পরিমাণ অভ্র পাওয়া যায়। বিহার ও অন্ধ্রের খনিসমূহ হইতে প্রায় ৭০% অভ্রের চাদর পাওয়া যায়। **মহীশূরের** হাসান জেলা, **কেরালার** ইরানিয়াল তালুক এবং **রাজস্থানের** আজমীঢ ও জয়পুর অঞ্চলেও সামান্য পরিমাণে অভ্র পাওয়া যায়।

ভারতের বৈদ্যুতিক শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করে নাই বলিয়া অভ্রের আভ্যন্তরীণ চাহিদা অত্যন্ত অল্প। এই কারণে ভারতীয় অভ্রের অধিকাংশই বিদেশে **রপ্তানী** হয়। যুক্তরাষ্ট্র (৪৫%), যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ও ফ্রান্স ভারতীয় অভ্রের প্রধান ক্রেতা। বন্দরসমূহের মধ্যে কলিকাতা (৮৫%), মাদ্রাজ (১৪%) ও বোম্বাই (১%) অভ্র রপ্তানী করে। ব্রাজিল হইতে সামান্য পরিমাণ অভ্রের চাপড়া পাত খোলাইবার জন্য এদেশে আসে। আন্তর্জাতিক অভ্রের বাজারে ব্রাজিল ভারতের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। "মাইকা এ্যাডভাইসারী কমিটি" (১৯৫০) এবং "মাইকা এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল" (১৯৫৬) ভারতীয় অভ্র শিল্পের উন্নতিকল্পে বিশেষ বিশেষ কার্যধারার অনুমোদন করেন। ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সালে ভারতে যথাক্রমে ২২,৮০৬ ও ২২,১৩৪ টন অভ্র উত্তোলিত হয়।

লবণ (Salt)—ভারতে উৎপাদিত লবণকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—(১) সামুদ্রিক লবণ, (২) ভৌম লবণ ও (৩) আকরিক লবণ। ভারতে মোট উৎপাদিত লবণের প্রায় ৬৬% বোম্বাই, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, পশ্চিম বঙ্গ, কচ্ছ উপসাগরের নিকটবর্তী অঞ্চল এবং মালাবার উপকূল অঞ্চলের সমুদ্রজল বাষ্পীভূত করিয়া সংগৃহীত হয়। ভারতে উৎপাদিত লবণের প্রায় ২০% রাজস্থানের সম্বর হ্রদ, যোধপুর রাজ্যের ডিডোয়ানা ও ফলোদি হ্রদ এবং বিকানীর রাজ্যের লুনকরণসার হ্রদ হইতে পাওয়া যায়। ভারতে মোট লবণ উৎপাদনের প্রায় ১২% পাঞ্জাবের মণ্ডী রাজ্যের লবণ-খনি হইতে পাওয়া যায়। ১৯৫০ ও ১৯৫৫ সালে ভারতে যথাক্রমে—৩ ও ২·৫২ কোটি টন লবণ প্রস্তুত হয়। খাদ্য হিসাবে এদেশে লবণের চাহিদা বার্ষিক প্রায় ২ লক্ষ টন।

জিপ্‌সাম্ (Gypsum)—কাগজ শিল্পে, সিমেণ্ট ও সার নির্মাণে ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। রাজস্থান (বিকানীর, যোধপুর, জৈসলমীর) কাশ্মীর, তামিলনাড়ু ও গুজরাট (কাঠিয়াবাড়) প্রদেশে ইহা পাওয়া যায়। ১৯৫০, ১৯৫৫, ১৯৬০ ও ১৯৬৫ সালে ভারতে যথাক্রমে ২·০৬, ৬·৯, ৯·৮২ ও ১১·৫ (অনুমিত) লক্ষ টন জিপ্‌সাম আকরিত হয়। ভারতে সঞ্চিত জিপ্‌সাম আকরিকের পরিমাণ প্রায় ১১১·৭ কোটি টন বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

ভারতে উৎপাদিত জিপ্‌সামের সমগ্র অংশই আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে ব্যয়িত হইয়া যায়।

সোরা (Saltpetre)—কাঁচ তৈয়ারী, খাদ্য সংরক্ষণ, বারুদ নির্মাণ ও জমিতে সার দিবার জন্য সোরা প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। উত্তর প্রদেশে ও বিহারে প্রচুর সোরা পাওয়া যায়। মোট উৎপাদনের অতি সামান্য অংশই আসামের চা-বাগানে সার দিবার কার্যে ব্যবহৃত হয় এবং অধিকাংশই যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, সিংহল, প্রণালী উপনিবেশ, ও মরিসাসে রপ্তানী করা হয়।

হীরক (Diamond)—অন্ধ্র (অনন্তপুর, বেলারী, কৃষ্ণা, গুণ্টুর এবং গোদাবরী জেলা), উড়িষ্যা (সম্বলপুর জেলা), মধ্যপ্রদেশ (চান্দা জেলা, পান্না, চারখারী ও বুন্দেলখণ্ড) প্রভৃতি স্থানে অতি সামান্য পরিমাণে হীরক পাওয়া যায়। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের পান্না খনির ১২ মাইল দূরে মাজগাওয়ান অঞ্চলে একটি নূতন হীরকখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারত সরকার এই খনিটি রুশ বৈজ্ঞানিকদের সহযোগিতায় চালাইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ১৯৫৫ ও ১৯৬৫ সালে ভারতে যথাক্রমে ১৭৮৭ ও ৪১৩৬ (অনুমিত) ক্যারাট হীরক উত্তোলিত হয়।

ভারতের শক্তি-সম্পদ

ভারতে প্রধানতঃ কয়লা, খনিজ তৈল ও জলবিদ্যুৎ হইতে শিল্পকার্যে ব্যবহৃত শক্তি উৎপাদন করা হয়। গৃহস্থালীর কার্যে, বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে, গোময় এবং কাষ্ঠও জ্বালানীরূপে ব্যবহৃত হয়।

৩৬ নং চিত্র—ভারতের উল্লেখযোগ্য কয়লাখনিসমূহ

কয়লা (Coal)—বর্তমান জগতে কয়লাই শ্রেষ্ঠ শক্তি-সম্পদ। কয়লা উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে অষ্টম স্থান অধিকার করে। ভারতে উত্তোলিত সমগ্র কয়লার পরিমাণ পৃথিবীর মাত্র ২%। ১৯৫১ সালে ভারতে ৩৪৪.৩ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলিত হয়। উৎপাদনের পরিমাণ ও মূল্য হিসাবে ভারতের খনিজ সম্পদগুলির মধ্যে কয়লাই শ্রেষ্ঠ।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of production)—ভারতের কয়লা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর। (ক) ভারতের [illegible] লে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ,

বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্র রাজ্যের খনিসমূহ হইতে যে কয়লা উত্তোলিত হয় তাহা **গণ্ডোয়ানা** (Gondwana) কয়লা এবং (খ) অন্যান্য স্থান হইতে যে কয়লা উত্তোলিত হয় তাহা **টার্শিয়ারী** (Tertiary) কয়লা। গণ্ডোয়ানা কয়লা টার্শিয়ারী কয়লা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

(ক) গণ্ডোয়ানা কয়লা খনিগুলির নিম্নোক্ত স্থানসমূহ হইতেই অধিকতর কয়লা উত্তোলন কায চলে।

(১) **পশ্চিমবঙ্গ**—পশ্চিমবঙ্গের রাণীগঞ্জ ও আসানসোলের কয়লার খনিই সমধিক উল্লেখযোগ্য। **রাণীগঞ্জের** কয়লার খনি প্রায় ৬০০ বর্গ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এই অঞ্চল হইতে ভারতের সমগ্র কয়লার প্রায় ⅓ অংশ পাওয়া যায়। এই খনি পূঃ ও দঃ পূঃ রেলপথে কলিকাতা ও অন্যান্য শিল্পাঞ্চলের সহিত সংযুক্ত। এই কয়লার খনিকে ভিত্তি করিয়াই কলিকাতা ও বর্ধমান অঞ্চলের বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে।

(২) **বিহার**—কলিকাতা হইতে ১৪০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ১৭৫ বর্গমাইল পযন্ত বিস্তৃত **ঝরিয়ার** কয়লা খনি পূঃ ও দঃ পূঃ রেলপথের দ্বারা বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলের সহিত সংযুক্ত। ভারতে উত্তোলিত সমগ্র কয়লার প্রায় ৫০% এই খনি হইতে উত্তোলিত হয়। ঝরিয়ার কয়লার খনির পশ্চিমে অবস্থিত **বোকারো** খনি ২২০ বর্গ মাইল বিস্তৃত; **উত্তর করণপুরা** খনির আয়তন ৪৫০ বর্গমাইল। ইহা ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় পূর্ণ। **দক্ষিণ করণপুরা** খনি হইতেও কয়লা পাওয়া যায়। উত্তরের **গিরিডি** খনি হইতে উৎকৃষ্ট কয়লা পাওয়া যায় এবং উহা লৌহ গালাইবার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। দামোদর অববাহিকা অঞ্চলের অন্তর্গত পঃ বঙ্গ ও বিহারের উপরোক্ত কয়লার খনিসমূহ ঐ সমগ্র অঞ্চলের শিল্পোন্নয়নের সহায়তা করে। বিহারের শোণ-পালামৌ অববাহিকার অন্তর্গত ডালটনগঞ্জ, পালামৌ, হুটার, ঔরাঙ্গা, প্রভৃতি খনি হইতেও কয়লার উত্তোলন কার্য চলে।

(৩) **উড়িষ্যার** মহানদী অববাহিকার অন্তর্গত **তালচের, রামপুর** ও **হিমগির** খনি হইতে কয়লা উত্তোলনের পরিমাণ ঐ অববাহিকা অঞ্চলের শিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে।

(৪) **মধ্যপ্রদেশে** ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত অনেকগুলি কয়লার খনি রহিয়াছে। তন্মধ্যে সাতপুরা অঞ্চলে অবস্থিত **কান্‌হান্‌** এবং **পেঞ্চ উপত্যকা ও মোহ-পানী**, এবং রেওয়া-ছত্রিশগড় অববাহিকার অন্তর্গত **উমেরিয়া, সোহাগপুর, জোহিলা, সিংগ্রৌলী, তাতপানি, ঝিলিমিলি, বিশ্রামপুর, লক্ষণপুর, কুরবা** ও **রায়গড়** খনিসমূহই প্রধান। রেলপথ দ্বারা অন্যান্য স্থানের সহিত উপযুক্ত যোগাযোগের ব্যবস্থা স্থাপিত না হওয়ায় মধ্যপ্রদেশের খনিসমূহ হইতে ভাল উত্তোলন কার্য চলে না। তবে অন্যান্য শক্তি-সম্পদ না থাকায় সাতপুরা

ও রেওয়া-ছত্রিশগড অববাহিকা অঞ্চলের সমস্ত শিল্পই এতদঞ্চলের কয়লা খনি-সমূহকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে

(৫) **মহারাষ্ট্র** রাজ্যের ওয়ার্ধা উপত্যকার অন্তর্গত **বল্লারপুর, ওয়ারোরা, উন, ভাণ্ডার, ঘুষঘুষ্, চন্দা, ওয়ামনপল্লী, সাহ্পুর** ও **ইয়োট্মল** অঞ্চলেও কয়লা পাওয়া যায়। ওয়ার্ধা অববাহিকা অঞ্চলের সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানই এই সমস্ত কয়লার খনিকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

(৬) **অন্ধ্রের সিঙ্গারেনী** ও **বেল্লাদানল** খনিতে কয়লা পাওয়া যায়। এই খনিগুলির কয়লা সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর। দক্ষিণ ভারতের রেলপথসমূহে এবং কলকারখানায় এই স্থানের কয়লা ব্যবহৃত হয়। এই রাজ্যের **তান্দুর** খনি হইতেও কয়লা উত্তোলিত হয়।

(খ) টার্শিয়ারী কয়লা **আসামের** নাজিরা ও মাকুম, **রাজস্থানের** বিকানীর, **জম্মু** ও **কাশ্মীর** এবং **পশ্চিমবঙ্গের** দার্জিলিং অঞ্চল হইতে পাওয়া যায়। ভারতের মোট উৎপাদিত কয়লার মাত্র ২% টার্শিয়ারী কয়লা; ইহার মধ্যে আবার অর্ধেকাংশই আসামেব খনিসমূহ হইতে উত্তোলিত হয়। আসামের কয়লা আসাম রেলপথে এবং ব্রহ্মপুত্র নদ দিয়া যাতায়াতকারী ষ্টীমার-সমূহে অধিক ব্যবহৃত হয়। সম্প্রতি ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করিয়াছেন যে আসামের গারো পর্বতাঞ্চলে অতি উচ্চশ্রেণীর কয়লা প্রচুর সঞ্চিত রহিয়াছে। আবার মধ্যপ্রদেশ ও বিহার অঞ্চলেও নূতন নূতন কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্প্রতি তামিলনাড়ুর দক্ষিণ আর্কট অঞ্চলেও একটি অতি বিস্তৃত লিগনাইট কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এই কয়লার সুষ্ঠু ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তামিলনাড়ুর নিভেলিতে একটি বিরাট কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এই কারখানাটি হইতে গুঁড়া কয়লার ইঁট (briquettes), ইউরিয়া ও সালফেট নাইট্রেট (সারের জন্য) উৎপাদিত হইতেছে।

উৎপাদন, আভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও বাণিজ্য (Production, consumption and trade)—ভারতীয় কয়লার খনিসমূহ সমগ্র ভারতে সমভাবে বণ্টিত নহে। মোট উৎপাদনের প্রায় ৮২% পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে পাওয়া যায়। উত্তর ভারতে কয়লার সরবরাহ অতি সামান্য এবং উহাও অতি নিকৃষ্ট স্তরের। উত্তরপ্রদেশে কয়লা একেবারেই নাই। ভারতের কয়লার খনিসমূহ সমুদ্রোপকূলে কিংবা জলপথের সন্নিকটে অবস্থিত না থাকায় সুলভ পরিবহনের সুযোগ নাই। বর্তমানে উন্নত ধরণের পরিবহন ও বিকেন্দ্রীভূত উৎপাদনের সাহায্যে দেশাভ্যন্তরে কয়লা বণ্টনের সুব্যবস্থা করার চেষ্টা চলিতেছে।

ভারতে **সঞ্চিত (Reserve)** কয়লার পরিমাণ সম্পর্কিত কোনরূপ সুষ্ঠু

সমীক্ষা এতাবৎকাল পর্যন্ত হয় নাই। বৈদেশিক ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে ভারতে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ প্রায় ৮৭০০ কোটি টন। আবার ভারতীয় ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে ভারতে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ প্রায় ৮০০০ কোটি টন। বর্তমান হারে উত্তোলিত হইলে এই কয়লা মাত্র দুইশত বৎসরকাল মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। ভারতের নিম্নশ্রেণীর কয়লার মধ্যে ৩০০ কোটি টন টার্শিয়ারী কয়লা ও ২০০ কোটি টন লিগ্‌নাইট ভূগর্ভে সঞ্চিত রহিয়াছে বলিয়া অনুমতি হয়।

ব্যবহারেব দিক হইতে বিচার করিলে ভারতীয় কয়লাকে পাচ **শ্রেণীতে** (Classification) বিভক্ত করা যায় :—(১) ধাতব শিল্পে ব্যবহাবোপযোগী কয়লা—ইহা ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ, বোকারো ও গিরিডির খনি হইতে পাওয়া যায়। (২) উচ্চ শ্রেণীব ষ্টীম কয়লা—ইহা বাণীগঞ্জ, বোকারো, করণপুরা, তালচের ও মধ্যপ্রদেশেব বিভিন্ন খনি হইতে পাওয়া যায়। (৩) টার্শিয়ারী কয়লা—ইহা আসাম, রাজস্থান ও পাঞ্জাবে পাওয়া যায়। (৪) নিম্নশ্রেণীর ষ্টীম কয়লা ও (৫) লিগ্‌নাইট।

কয়লা অতি মূল্যবান জাতীয় সম্পদ। এই সম্পদেব পরিমাণ সীমাবদ্ধ হওয়ায় ইহার অপচয় জাতীয় স্বার্থেব পরিপন্থী। সেইজন্য এদেশে কয়লার সদ্ব্যবহাব ও **সংরক্ষণের** (Conservation) নিমিত্ত নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে অবহিত হওয়া আশু কর্তব্য। (১) উন্নত প্রণালীতে কয়লার উত্তোলন, (২) কয়লার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, (৩) কয়লা হইতে উপজাত দ্রব্যের উৎপাদন, (৪) গুঁড়া কয়লার দ্বারা ইট প্রস্তুতকরণ এবং জ্বালানি হিসাবে ইহাদের ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ, (৫) কয়লাব ধৌতকরণ ও বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লার বিমিশ্রণ, (৬) কয়লার পরিবর্তে অন্য শক্তি-সম্পদের (বিশেষতঃ জলবিদ্যুতের) উৎপাদন ও ব্যবহার, এবং (৭) খনি হইতে কয়লা কাটা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বালির দ্বারা শূন্যস্থান পুরণ। সম্প্রতি কয়লা খনি সমূহের নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ তদারকির জন্য একটি ‘কোল বোর্ড’ স্থাপিত হইয়াছে এবং কয়লার অঙ্গারীকরণ, কোক উৎপাদন, বিমিশ্রণ প্রভৃতি বিষয়ে নানাবিধ গবেষণামূলক কার্য ধানবাদের ‘ফুয়েল রিসার্চ ইনষ্টিট্যুট’ কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে। কয়লার সুষ্ঠু সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে খনি সমূহের অভ্যন্তরস্থ শূন্য স্থান পুরণ, কয়লার শ্রেণী বিভাজন ও ধৌত করণ কারখানারও স্থাপন করা হইয়াছে।

খনি হইতে কয়লা উত্তোলন কার্যে প্রায় ৬·৫ লক্ষ **শ্রমিক** (Labour) নিযুক্ত রহিয়াছে। এই শ্রমিকদের অধিকাংশই মধ্যপ্রদেশ ও বিহারের অধিবাসী। ইহাদের অধিকাংশই কৃষিজীবী বলিয়া ইহারা সারা বৎসর সমভাবে খনির কার্যে নিযুক্ত থাকিতে পারে না। অধিকন্তু, এই সমস্ত শ্রমিক খনি হইতে কয়লা উত্তোলনকার্যেও দক্ষ নহে। বর্তমানে অবশ্য শ্রমিকদের আধুনিক

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন কার্যে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা চলিতেছে। আবার ভারতের ৮২৮টি কয়লার খনির মধ্যে ৬৫১টি এত ক্ষুদ্রায়তনের যে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই সমস্ত খনি হইতে কয়লা উত্তোলন করাও অসম্ভব। এই সমস্ত কারণে ভারতীয় কয়লার মূল্য অধিক হইয়া পড়ে। সম্প্রতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়লা খনির সংযোজন সাধন করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করা হইতেছে।

ভারতে উত্তোলিত সমগ্র কয়লার ৩৩% রেলপথসমূহে, ১০% লৌহ ও ইস্পাতের কারখানাসমূহে, ১০% বয়ন শিল্পাগারসমূহে, ৭% বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যে, ৭% ষ্টীমারসমূহে রপ্তানীর কার্যে এবং অবশিষ্টাংশ অন্যান্য নানাবিধ শিল্প ও গৃহস্থালীর কার্যে **ব্যয়িত** (uses) হয়। ভারতীয় কয়লা হংকং, সিংহল, প্রণালী উপনিবেশ, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, মালয় উপদ্বীপ, পাকিস্তান, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ব্রহ্মদেশ ও সিঙ্গাপুরে **রপ্তানী** হয়। ১৯৫১ সালে ২৭·৩ টন কয়লা রপ্তানী করা হয়।

১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সালে মোট কয়লা উত্তোলনের পরিমাণ দাঁড়ায় নিম্নরূপ :

—	'০০০ টন	
	১৯৬৪	(১৯৬৫ অনুমিত)
কয়লা	৬,২৪,৪০	৬,৬৬,৭০
লিগনাইট	১৫,৬৯	২৩,৩১

খনিজ তৈল (Petroleum)—খনিজ তৈল উৎপাদনে ভারতের স্থান আশানুরূপ নহে।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of production)—হিমালয়ের উত্তর-পূর্ব প্রান্তস্থিত এক প্রকার ভঙ্গিল শিলাস্তর হইতে এই খনিজ তৈল পাওয়া যায়। হিমালয়ের পূর্ব প্রান্তের তৈলক্ষেত্রটি আসামের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে লখিমপুর জেলার ডিগবয়ে ২½ বর্গ মাইল স্থান ব্যাপিয়া বর্তমান। ইহাই ভারতের সর্বপ্রধান তৈলখনি। এই তৈল ডিগবয়ের পরিশোধনাগারে পরিশোধিত হয়। আসামের দক্ষিণ-পূর্বাংশে কাছাড় জেলার বদরপুরে নিঃশেষিতপ্রায় একটি তৈলখনি রহিয়াছে। সম্প্রতি নাহারকাটিয়া ও রুদ্রসাগরে তৈলখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। আসামের ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা অঞ্চলেও দুইটি তৈল-কূপের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। আবার ত্রিপুরা রাজ্যেও তৈলখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। গুজরাট রাজ্যের অন্তর্গত অ্যাংক্লেশ্বর, কলোল ও ক্যাম্বে অঞ্চলে তৈলখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। হিমাচল প্রদেশের জ্বালামুখী ও রাজস্থানের জৈসলমীরে তৈলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পঃ বঙ্গের উপকূলাঞ্চলে, কচ্ছ, কাঠিয়াবাড় ও পাঞ্জাবে তৈল পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া অনেকে মনে

করেন। এইরূপ অনুমিত হইয়াছে যে ভারতের প্রায় ৪ লক্ষ বর্গ মাইল পরিমিত স্থান হইতে খনিজ তৈল পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ১৯৫৫ সালে স্থাপিত 'অয়েল অ্যাণ্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশন' ভারতে তৈল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রশংসনীয় কার্য করিতেছেন।

উৎপাদন, আভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও বাণিজ্য (Production, consumption and trade)—১৯৫০ সালে ভারতে খনিজ তৈলের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন দাঁড়ায় মাত্র ৬৬০ লক্ষ গ্যালন। প্রতি বৎসর প্রায় ৩০০০ লক্ষ গ্যালন খনিজ তৈল এদেশে ইরান, যুক্তরাষ্ট্র, বোর্নিও, ব্রহ্মদেশ এবং রুশিয়া হইতে আমদানী হইয়া আসে। সম্প্রতি বোম্বাই-এর অনতিদূরে ট্রম্বে অঞ্চলে 'বার্মা-শেল' (১৯৫৫) কর্তৃক একটি এবং 'স্টানভ্যাক' (১৯৫৪) কর্তৃক একটি—এই দুইটি পরিশোধনাগার স্থাপিত হইয়াছে। 'ক্যালটেক্স কোং' কর্তৃক বিশাখাপত্তনমেও একটি তৈল শোধনাগার স্থাপিত হইয়াছে। আসামের নাহারকাটিয়া তৈলখনি হইতে তৈল উত্তোলনের জন্য সম্প্রতি "অয়েল ইণ্ডিয়া (১৯৫৯)" নামক একটি সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে। এতদঞ্চল হইতে উত্তোলিত তৈল সরকারী অংশে স্থাপিত গৌহাটির নূনমাটি এবং বিহারের বারাউনি এই দুইটি নূতন তৈল পরিস্রাবণ কেন্দ্রে নলপথে প্রেরিত হইতেছে। নাহারকাটিয়া অঞ্চলে তৈল ব্যতীতও যে স্বাভাবিক গ্যাস পাওয়া যাইবে তাহা বিদ্যুৎ ও কৃত্রিম সার উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হইবে। আসামের ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা অঞ্চলের নব আবিষ্কৃত তৈলকূপ দুইটি 'অয়েল ইণ্ডিয়া' সংস্থাটি ইজারা লইয়াছেন। সরকারী মালিকানায় আর একটি নূতন তৈল পরিস্রাবণ কেন্দ্র গুজরাটের ক্যাম্বে অঞ্চলে স্থাপিত হইয়াছে।

পরিস্রাবণ ও বিপণনের সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে 'দি ইণ্ডিয়ান রিফাইনারিজ লিঃ' (১৯৫৯) এবং 'দি ইণ্ডিয়ান অয়েল কোং লিঃ' (১৯৫৯) নামক সরকারী সংস্থা দুইটি ১৯৬৪ সালে মিলিত হইয়া 'দি ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন' নাম ধারণ করে। এই কর্পোরেশনটি বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে পরিশোধিত তৈল ও তৎসংশ্লিষ্ট সামগ্রী আমদানী করিয়া দেশাভ্যন্তরে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে গঠিত পরিস্রাবণ কেন্দ্রসমূহে সরবরাহ করে।

ভারতে প্রচুর বিটুমিনাস ও লিগ্‌নাইট জাতীয় কয়লা রহিয়াছে। ইংল্যাণ্ড ও জার্মানীর ন্যায় ভারতেও এই কয়লা হইতে বিশ্লেষিত তৈল প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

জলবিদ্যুৎ (Water Power)—ক্রমক্ষীয়মাণ কয়লা সম্পদের সংরক্ষণ, শ্রম-শিল্পের অধিকতর প্রসার, গ্রামাঞ্চলের কুটির শিল্পে প্রাণ সঞ্চার এবং শ্রম-শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের জন্য ভারতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের বিশেষ

প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। বৃষ্টিপাতের প্রাচুর্য, ভূপ্রকৃতির বন্ধুরতা, নদীর খরপ্রবাহ, নিয়মিত ও অবিরাম জলস্রোত—এই সমস্ত প্রাকৃতিক অবস্থা এবং কয়লা ও খনিজতৈলের অপ্রতুলতা, জনবহুল ও শিল্পসমৃদ্ধ ভোগকেন্দ্রের নিকটবর্তিতা, যানবাহনের সুব্যবস্থা প্রভৃতি অনুকূল অর্থনৈতিক অবস্থা জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের **সহায়ক**। কিন্তু ঋতুভেদে বৃষ্টিপাতের তারতম্য ও অনিশ্চয়তা হেতু ভারতায় নদীসমূহের জলপ্রবাহ অবিরাম ও সুনিয়ন্ত্রিত নহে। সুতরাং অনাবৃষ্টিকালে ও গ্রীষ্মকালে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কৃত্রিম জলাধার নির্মাণ করিয়া জল সঞ্চয় করা প্রয়োজন হয়।

জলবিদ্যুতের উৎপাদন উত্তর ভারত অপেক্ষা **দক্ষিণ ভারতেই** অধিক। দক্ষিণ ভারতের মালভূমি অঞ্চলে প্রচুর খরস্রোতা নদী ও জলপ্রপাত রহিয়াছে। পঃ ঘাট পর্বত অঞ্চলের প্রচুর বৃষ্টিপাত ও দাক্ষিণাত্যে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সহায়তা করে। আবার ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল এবং দক্ষিণ প্রান্ত হইতে কয়লার খনিসমূহ অনেক দূরে অবস্থিত। অথচ সমগ্র দক্ষিণ ভারতে শিল্প সংগঠন দ্রুত প্রসারলাভ করিতেছে এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের চাহিদাও রহিয়াছে ব্যাপক। এই সমস্ত কারণে দাক্ষিণাত্যের অনেক শিল্পই সম্পূর্ণরূপে জলবিদ্যুতের সাহায্যে পরিচালিত হইতেছে।

উত্তর ভারতের নদীসমূহ হিমালয়ের হিমবাহ হইতে উদ্ভূত। প্রত্যেকটি নদী নিত্যবহ, প্রত্যেকটির ঢাল সুস্পষ্ট, কিন্তু জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ অতি সামান্য। কারণ উত্তর ভারতের প্রকাণ্ড সমভূমিতে কৃত্রিম জলাশয় ও জলপ্রপাত সৃষ্টি করা দুরূহ ও ব্যয়সাধ্য। স্বাভাবিক জল-প্রপাতযুক্ত হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের রাস্তাঘাট অতিশয় দুর্গম, নদনদীর স্রোতবেগও ভীষণ, এবং সেখানকার জলশক্তিকে বাঁধিয়া ফেলা নানাবিধ সমস্যাযুক্ত। আবার উত্তর ভারতের যান্ত্রিক শ্রমশিল্পের বড় বড় কেন্দ্রগুলি উত্তর ভারতের কয়লা ও তৈল ক্ষেত্র হইতেই প্রয়োজনীয় শক্তি সম্পদের সরবরাহ পাইয়া থাকে। তবে কয়লাসম্পদ রহিত উত্তরপ্রদেশ, কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে জলবিদ্যুতের উৎপাদন একটু বেশী। হিমাচল প্রদেশ হইতে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র হিমালয় অঞ্চলটিই জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনায় পূর্ণ।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of production)—দক্ষিণ ভারতের **মহারাষ্ট্র** রাজ্যের পশ্চিম ঘাট পর্বতাঞ্চলে চারিটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে —(১) "দি টাটা হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার সাপ্লাই কোং" **লোনাভলার** নিকট তিনটি হ্রদে (লোনাভলা, ওয়াল ওয়ান, এবং সিরাওয়াটা) মৌসুমী বৃষ্টির জল সঞ্চিত রাখিয়া খোপোলির বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানায় প্রেরণ করে। (২) "দি **অন্ধ্রভ্যালী** পাওয়ার সাপ্লাই কোং" **অন্ধ্রনদীতে** বাঁধ বাঁধিয়া একটি কৃত্রিম জলাশয়ে জল সঞ্চিত করিয়া

বাধে। পরে এই জল বিভপুরীর বিদ্যুৎ-উৎপাদনকেন্দ্রে চালান দেওয়া হয়। (৩) "দি টাটা পাওয়ার কোং" **নিলামূলা** নদীর জলস্রোত দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ভীরা নামক স্থানে প্রকাণ্ড জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছে। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই তিনটি কোম্পানী একত্রীভূত হইয়া "টাটা হাইড্রোইলেকট্রিক এজেন্সী" নামে অভিহিত হয়। (৪) **চোলা** (কল্যাণ) জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানাটি ৫৪,০০০ কিঃ ওঃ পরিমিত বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করে।

অন্ধ্রপ্রদেশের (১) **মাচকুন্দ** পরিকল্পনাই শ্রেষ্ঠ। অন্ধ্র ও উড়িষ্যা রাজ্যের সীমা নির্দেশকারী মাচকুন্দ নদীর দক্ষিণতটে ডুডুমা জলপ্রপাতের নিকট নির্মিত জলাধার হইতে নির্গত জলরাশির সাহায্যে ১১৫ লক্ষ কি. ও. জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হইতেছে। (২) **শ্রীসেলাম** জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বাধের দ্বারা সঞ্চিত কৃষ্ণা নদীর জলরাশি হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করিতেছে। (৩) নিম্ন **সিলেরু** জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনার বিদ্যুৎকেন্দ্রটি এই রাজ্যের গোদাবরী অঞ্চলে অবস্থিত।

মহীশূরের (১) **"শিবসমুদ্রম্** ওয়ার্কস" ভারতের উল্লেখযোগ্য জল-বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র। কাবেরী নদীর জলপ্রপাত হইতে শিবসমুদ্রম কেন্দ্রে ৪২,০০০ কি. ও. পরিমিত বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদিত হইতেছে। (২) **সীমসা** (১৭,২০০ কিঃ ওঃ) ও (৩) **যোগপ্রপাত** অঞ্চলে (৭২,০০০ কিঃ ওঃ) আরও দুইটি বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। বিদ্যুৎবাহী তারের সাহায্যে এই তিনটি কেন্দ্র পরস্পর সংযুক্ত। রেশম শিল্পে, স্বর্ণখনিতে ও রাজ্যের অপরাপর শিল্পে এই জলবিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। শেষোক্ত পরিকল্পনাটির নূতন নাম দেওয়া হইয়াছে "দি মহাত্মা গান্ধী হাইড্রো-ইলেকট্রিক ওয়ার্কস্"। এই বিদ্যুৎকেন্দ্রে উৎপাদিত জলবিদ্যুৎ বর্তমানে তামিলনাডু ও মহারাষ্ট্র রাজ্যেও সরবরাহ করা হইতেছে। এই রাজ্যে সম্প্রতি (৪) **সরাবতী** জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা নামে আর একটি পরিকল্পনা গৃহীত ও আংশিকভাবে সম্পূর্ণ হইয়াছে।

তামিলনাডুতে চারিটি প্রধান জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র রহিয়াছে।—(১) এই প্রদেশের নীলগিরি জেলার অন্তর্গত পাইকারা নদীর গতিপথের অন্তর্বর্তী একটি জলপ্রপাত হইতে "দি **পাইকারা** (৩৮,৭৫০ কিঃ ওঃ) হাইড্রোইলেকট্রিক স্কীম" নামক পরিকল্পনাটি কোয়েম্বাটোর, ইরোদ, ত্রিচিনাপল্লী, নেগাপত্তম ও বিরুধনগরে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করে। সাধারণতঃ বয়নশিল্প কারখানায় এবং গৃহ আলোকিত করিবার জন্য এই বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। (২) "দি **মেতুর** (৪০,০০০ কিঃ ওঃ) হাইড্রো-ইলেকট্রিক স্কীম" (১৯৩৭) নামক পরিকল্পনাটি মেতুর বাঁধের জল হইতে বিদ্যুৎউৎপাদন করিয়া সালেম, ত্রিচিনাপল্লী, তাঞ্জোর,

আর্কট, চিতুর প্রভৃতি শিল্পকেন্দ্রে সরববাহ করে। সম্প্রতি **'মেতুর টানেল** হাইড্রো-ইলেকট্রিক স্কীম' নামক একটি নূতন জলবিদ্যুৎ পবিকল্পনা গৃহীত ও সম্পূর্ণ হইয়াছে। (৩) তাম্রপর্ণী নদীব গতিপথেব অন্তর্বর্তী একটি জলপ্রপাত হইতে "দি **পাপনাশম্** (২৩,০০০ কিঃ ওঃ) হাইড্রো-ইলেকট্রিক স্কীম" পবিকল্পনাটি তিনেভেলী, কয়লাপটি, মাদুরা, তেনকাশী ও বাজপালম প্রভৃতি শিল্পকেন্দ্রে জলবিদ্যুৎ সববরাহ কবে। এই তিনটি পরিকল্পনাব উৎপাদন-কেন্দ্রসমূহ যথাক্রমে কোয়েম্বাটোব, মেতুব এবং অগস্ত্য মন্দিবেব নিকটবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। (৪) পাইকাবা নদীব জলেব সাহায্যে পবিচালিত **ময়ার** বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি

৩৭ নং চিত্র—ভাবতের প্রধান প্রধান জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র

৩৬০০০ কি ও পবিমিত বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করিতেছে তামিলনাড়ু বাজ্যের সমস্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলিই বিদ্যুৎবাহী তারেব সাহায্যে পবস্পব সংযুক্ত।

কেরালা রাজ্যের (১) **'পল্লীভাসাল** হাইড্রো-ইলেকট্রিক সিস্টেম', মুদিবাপুঝা নদীব জলপ্রপাত হইতে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৩৬,০০০ ঃ) করে, উহা দ্বারা এই রাজ্যের 'অ্যালুমিনিয়াম প্রোডাকশন কোম্পানী'র এবং অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানেব বিদ্যুতেব চাহিদা মিটিয়া থাকে। (২) **সেঙ্গুলাম** জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানাটি ৪৮,০০০ কিঃ ওঃ পরিমিত বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করিতেছে। এই রাজ্যে সম্প্রতি (৩) **ইডিক্কী** জলবিদ্যুৎ পবিকল্পনা নামক একটি নূতন পবিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে এনাকুলাম হইতে ১৬০ কি. মি. দক্ষিণ-পূর্বে পেরিয়ার নদীতে ইডিক্কী গিরি-খাতের নিকট একটি বাঁধ এবং পেরিয়াবের উপনদী চেরুতোনীর উপর আর একটি বাঁধ বাঁধিয়া প্রথম পর্যায়ে ৩৯০ মেঃ ওঃ এবং শেষ পযায়ে আরও ৩৯০ মেঃ ওঃ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইবে। কেরালার সমস্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রই তারের সাহায্যে পবস্পর সংযুক্ত। মহীশূব, তামিলনাড়ু ও কেরালা বাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলিকেও আবার বিদ্যুৎবাহী তারের সাহায্যে সংযুক্ত করিয়া "চক্র প্রথায়" (grid system) বিদ্যুৎ সববরাহেব পবিকল্পনা সম্পূর্ণ করা হইয়াছে।

উত্তর ভারতের কাশ্মীরে শ্রীনগর হইতে ৩৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত (১) **বরামুলার 'ঝেলাম** পাওয়ার ইনস্টলেশন' শ্রীনগরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত কাশ্মীরে আরও দুইটি জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা রহিয়াছে—(২) 'দি **মুজাফরাবাদ** হাইড্রো-ইলেকট্রিক ইন্‌স্টলেশন' (কিষেণগঙ্গার একটি শাখা হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে) এবং (৩) '**জম্মু** হাইড্রো-ইলেকট্রিক ইন্‌স্টলেশান'। জম্মু এবং কাশ্মীরের ব্যাপক শিল্পোন্নয়নের উদ্দেশ্যে নূতন নূতন সরববাহ কেন্দ্রেব পরিকল্পনা চলিতেছে।

পাঞ্জাব রাজ্যের সিমলা পর্বতাঞ্চলের অন্তর্গত যোগেন্দ্রনগরের নিকটবর্তী উল নদীর স্রোত হইতে (১) "দি **উল রিভার** হাইড্রো-ইলেকট্রিক স্কীম" (১৯৩৩) অথবা **মন্ডি** পরিকল্পনা (৪৮,০০০ কিঃ ওঃ) হিমালয়ের পাদদেশস্থ পাঞ্জাবেব বহু শহবে আলোক এবং অন্যান্য নানাবিধ গৃহস্থালী কার্যের উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিয়া থাকে। অমৃতসর, লুধিয়ানা, জলন্ধর, ধাবিওয়াল প্রভৃতি স্থানের শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহে এবং রেলপথে এই বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহৃত হয়। (২) **নাঙ্গাল** বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি ১৫৪,০০০ কিঃ ওঃ পরিমিত বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করিতেছে। ইহা অংশতঃ সম্পূর্ণ ও কাযকবী হইয়াছে।

উত্তর প্রদেশের "দি **গ্যাঞ্জেস ক্যানাল** হাইড্রো-ইলেকট্রিক গ্রীড্" (১৯২৬) হইতে এই রাজ্যের প্রায় ১৪টি জেলায় এবং দিল্লীর সাহাদারা অঞ্চলে বহুবিধ গহস্থালীর কার্যে, শিল্পে এবং কৃষিকার্যেব উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ (১৯,০০০ কিঃ ওঃ) সরবরাহ করা হয়। গঙ্গার খালের ১১টি জলপ্রপাতের মধ্যে ৪টি জলপ্রপাত হইতে এই শক্তি উৎপাদিত হইয়া থাকে। বাহাদুরাবাদ, মহম্মদপুর, চিতোরা, শালাওয়া, ভোলা, পালরা এবং সুমেরায় এই শক্তিকেন্দ্রসমূহ অবস্থিত। কিন্তু প্রধান শক্তিকেন্দ্র কেবলমাত্র **বাহাদুরাবাদে**। প্রথম পরিকল্পনার কাযকালে হরিদ্বারের নিকট **পাথরী** (২০,৪০০০ কিঃ ওঃ) ও **সার্দা** (৪১,৪০০ কিঃ ওঃ) জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র দুইটি সম্পূর্ণ ও কার্যকরী হইয়াছে। এই রাজ্যে সম্প্রতি "দি **যমুনা** হাইডেল স্কীম' নামক আরও একটি জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে।

নেপাল, আসাম এবং দার্জিলিং-এ স্থানীয় প্রয়োজনমত জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। ইহা ব্যতীত ভারতের নানাস্থানে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনেরও বহু কারখানা রহিয়াছে।

বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন যে ভারত মোট ৪ কোটি কিঃ ওঃ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করিতে সমর্থ। ১৯৫০, ১৯৫৫ ও ১৯৬০-৬১ সালে ভারতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা এবং প্রকৃত উৎপাদন দাঁড়ায় যথাক্রমে

০.৫৬, ০.৯৪ ও ১.৯৩ (অনুমিত) মিঃ কিঃ ওঃ এবং ২৫১.৯৩, ৩৭৪.২২ ও ৭৫৮ (অনুমিত) কোটি কিঃ ওঃ ঘণ্টা।

বহুমুখী নদী পরিকল্পনা (Multipurpose river projects)—ভারতের জলপ্রবাহের ৬% সেচকার্যে এবং মাত্র ১.৫% বিদ্যুৎ উৎপাদনের কার্যে ব্যবহৃত হয়। বাকী অংশ অব্যবহৃত অবস্থায় নষ্ট হয় এবং সময়ে সময়ে সর্বনাশা বন্যার সৃষ্টি করে। বর্তমানে এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে যে কেবলমাত্র সেচকার্য ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যই নহে, পরন্তু বন্যা নিবারণ, নৌ চলাচল, মৎস্য চাষ, জলসেচ, ম্যালেরিয়া নিবারণ, জমির ক্ষয় নিবারণ, বন উৎপাদন, পরিস্রুত জলের সরবরাহ, অবসর বিনোদন প্রভৃতি নানাবিধ কার্যে জলপ্রবাহের ব্যবহার করা হউক। যে সমস্ত পরিকল্পনার দ্বারা নদীর অববাহিকা অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মানের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য জলপ্রবাহকে এই প্রকার নানাবিধ কার্যে ব্যবহার করা হয় তাহাদিগকে জলপ্রবাহ ব্যবহারের **বহুমুখী পরিকল্পনা** বলে। ভারত সরকার টি ভি এ. (টিনিসি ভ্যালী অথরিটি) পরিকল্পনাটির অনুকরণে ভারতের কয়েকটি নদী প্রবাহ বহুবিধ ব্যবহারের উপযোগী করিবার উদ্দেশ্যে সমগ্র ভারতকে শতদ্রু, মধ্যগঙ্গা, পূর্বগঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, হুগলী, সুবর্ণরেখা, মহানদী, কৃষ্ণা, কাবেরী, তাপ্তী, নর্মদা ও চম্বল এই কয়টি নদী অববাহিকা অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটি অঞ্চলে এক বা একাধিক "বহুমুখী পরিকল্পনা'র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। নিম্নে কয়েকটি প্রধান প্রধান বহুমুখী নদী পরিকল্পনা বিবৃত হইল।

দামোদর পরিকল্পনা (Damodar Project)—৫৩৮ কি. মি দীর্ঘ দামোদর নদ ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চলে পালামৌ জেলার অন্তর্গত খামারপাত পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া বিহারের মধ্যে প্রায় ২৯০ কি মি. প্রবাহিত হইবার পর পশ্চিমবঙ্গে হুগলী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। দামোদর অববাহিকার উত্তরাংশে বিহারের হাজারীবাগ, পালামৌ, রাঁচি, মানভূম এবং সাঁওতাল পরগণা অবস্থিত। এই অঞ্চলের বার্ষিক গড়-বৃষ্টিপাত প্রায় ৪৭"। অধিকাংশ বৃষ্টি গ্রীষ্মকালে পতিত হয়।' প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে পর্বতগাত্র বাহিয়া প্রচণ্ড জলস্রোত নিম্নভূমিতে পতিত হয় এবং অববাহিকার দক্ষিণ অংশে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে সর্বনাশা বন্যার সৃষ্টি করে।

দামোদর ও ইহার বিভিন্ন উপনদের উচ্চ উপত্যকায় ৮টি বাঁধ বাঁধিয়া জল সঞ্চয় ও তৎসংশ্লিষ্ট বহুবিধ কার্যাদির ব্যবস্থা "দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন" (১৯৪৮) নামক প্রতিষ্ঠানটির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। এই বাঁধগুলি বিহার প্রদেশে নির্মিত হইবে এবং ইহাদের মধ্যে বরাকর নদের উপর তিলাইয়া, বলপাহাড়ী ও মাইথনে, দামোদর নদের উপর বারমো, আয়ার ও পাঞ্চেৎ পাহাড় অঞ্চলে, এবং কোনার ও বোকারোতে একটি করিয়া

বাঁধ দেওয়া হইবে। এই পরিকল্পনাটি দুইটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ে পাঞ্চেৎ, কোনার, তিলাইয়া ও মাইথন বাঁধ ও তৎসংলগ্ন (কেবল মাত্র কোনার ব্যতীত) বিদ্যুৎকেন্দ্র (মোট উৎপাদন ক্ষমতা ১'০৪ লক্ষ কিঃ ওঃ), বোকারোর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র (১'৫ লক্ষ কিঃ ওঃ) ও দুর্গাপুরের জলাধার এবং তৎসংলগ্ন সেচ ও নাব্য খালের কার্য সম্পূর্ণ হইবে। প্রথম পর্যায়ের কার্য ফলপ্রসূ হইলে দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্য গ্রহণ করা হইবে। এই পর্যায়ে আয়ার, বলপাহাড়ী, বোকারো ও বার্মো অঞ্চলে বাঁধ ও বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হইবে। বোকারো তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা ২'২৫ লক্ষ কিঃ ওঃ পর্যন্ত বর্ধিত করা হইবে এবং দুর্গাপুরে ১'৫ লক্ষ কিঃ ওঃ উৎপাদন ক্ষমতাযুক্ত আর একটি তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে। বিহার রাজ্যের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা মিটাইবার জন্য চন্দ্রপুরে ২'৫ লক্ষ কিঃ ওঃ উৎপাদন ক্ষমতাযুক্ত একটি নূতন তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে। ৩৬৫'৮ মিঃ দীর্ঘ ও ৩০'৫ মিঃ উচ্চ তিলাইয়া বাঁধ এবং বোকারোর তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদন (১'৫ লক্ষ কিঃ ওঃ) কেন্দ্রটির কার্য ১৯৫৩ সালে সম্পূর্ণ হয়। বোকারো, দুর্গাপুর ও চন্দ্রপুর-এর তাপবিদ্যুৎ সংক্রান্ত সম্প্রসারণ কার্যসূচীও সম্পূর্ণ হইয়াছে। তিলাইয়া বিদ্যুৎ-কেন্দ্র হইতে উৎপাদিত (৪০০০ কিঃ ওঃ) বিদ্যুৎ হাজারীবাগ জেলার কোডারমা অভ্রখনি অঞ্চলসমূহে ব্যবহৃত হইতেছে। কোনার বাঁধটির কার্য ১৯৫৫ সালে সম্পূর্ণ হয় এবং মাইথন বাঁধ ও তৎসংলগ্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির (৬০,০০০ কিঃ ওঃ) কার্য এবং পাঞ্চেৎ বাঁধ ও তৎসংলগ্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির (৪০,০০০ কিঃ ওঃ) কার্যও শেষ হইয়াছে।

৩৮ নং চিত্র—দামোদর পরিকল্পনা

৬৯২ মিঃ দীর্ঘ ও ১১.৬ মিঃ উচ্চ দুর্গাপুরের বাঁধটির কার্য ১৯৫৫ সালে শেষ হইয়াছে। বহু খালের সাহায্যে (মোট দৈর্ঘ্য ২৪৮০ কিঃ মিঃ) এই বাঁধের জল লইয়া পঃ বঙ্গের প্রায় ৪ লক্ষ হেক্টার পরিমিত কৃষি জমিতে জলসেচ করা হইবে। ১৩৭ কিঃ মিঃ দীর্ঘ সুনাব্য খালপথেরও সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই কর্পোরেশনটির সহিত চুক্তি অনুসারে 'দি হিন্দুস্থান সিপিং কোং লিঃ-'এর জলপোতসমূহ এই পথে দুর্গাপুর ও কলিকাতার মধ্যে সপ্তাহে দুইবার পণ্য পরিবহন কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইলে ইহা দ্বারা বন্যা ও মৃত্তিকার ক্ষয় নিবারণ, জলসেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, নৌ-চলাচল, ম্যালেরিয়া দূরীকরণ, কৃত্রিম হ্রদসমূহে মৎস্যচাষের সুবন্দোবস্ত এবং অববাহিকা অঞ্চলের অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন সাধিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।
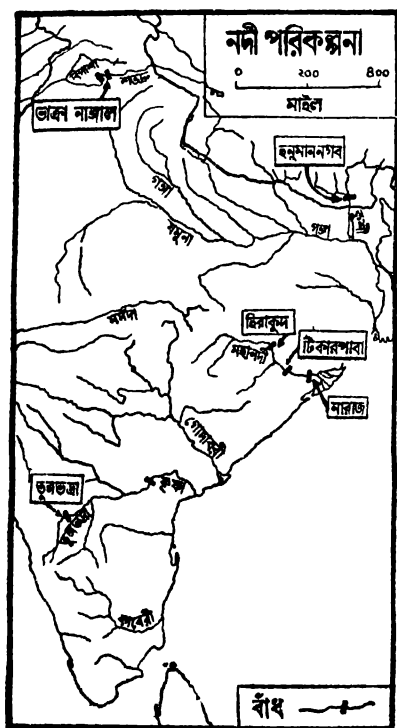
৩৯ নং চিত্র—ভারতের উল্লেখযোগ্য নদীপরিকল্পনার কেন্দ্রসমূহ

দামোদর অববাহিকার উত্তরাঞ্চলে কাষ্ঠ, লাক্ষা এবং তসর প্রচুর পরিমাণে জন্মে। সমগ্র অববাহিকা অঞ্চলই কয়লা, বক্সাইট, চীনামাটি, অভ্র, চুনাপাথর, অ্যান্টিমনি প্রভৃতি খনিজদ্রব্যে সমৃদ্ধ। সুলভ জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হইলে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক সম্পতি বৃদ্ধি পাইবে সন্দেহ নাই।

(২) **মহানদী পরিকল্পনা (Mahanadi Project)**—উড়িষ্যার হিরাকুদ, টিকারপারা এবং নারাজ অঞ্চলে মহানদীর উপর তিনটি বাঁধ বাঁধিবার পরিকল্পনা করিয়াছে। এই তিনটি বাঁধ নির্মিত হইলে মহানদী অববাহিকা অঞ্চলের বহু লক্ষ হেক্টার জমিতে জলসেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, নৌ-চলাচলের সুবিধা, উড়িষ্যার বদ্বীপাঞ্চলের বন্যা নিবারণ এবং অরণ্য ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চলের দ্রুত উন্নতি সাধিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। সম্বলপুর হইতে ১৪ কিঃ মিঃ পশ্চিমে **হিরাকুদে** ৪,৮০০ মিঃ দীর্ঘ

প্রধান বাঁধের কার্য ১৯৫৭ সালে সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই বাঁধের পশ্চাতের সুবিস্তৃত জলাধারে ৮১ কোটি ঘন মিঃ জলরাশি বাঁধা পড়িবে। ইহাতে মহানদীর বদ্বীপাঞ্চলের বন্যানিরোধ, ১.২৩ লক্ষ কিঃ ওঃ বিদ্যুতের উৎপাদন এবং সম্বলপুর, বলংগির, কটক ও পুরী জেলার ৯ লক্ষ হেক্টার জমিতে জলসেচ করা হইবে। এ স্থান হইতে রাউরকেলার ইস্পাত শিল্পকেন্দ্রে, রাজগাঙ্গপুরের সিমেণ্ট শিল্পকেন্দ্রে, জোডার ফেরোম্যাঙ্গানীজ কারখানায়, ব্রজরাজনগরের কাগজ শিল্পকেন্দ্রে, চৌদ্বার অঞ্চলের বয়ন ও অন্যান্য শিল্পকেন্দ্র-সমূহে, হিরাকুদে যে অ্যালুমিনিয়াম কেন্দ্র স্থাপিত হইবে তাহাতে ও পুরী, সম্বলপুর, কটক প্রভৃতি শহরাঞ্চলে এবং উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইবে। এই পরিকল্পনাটির কার্য প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ সরবরাহের চাহিদা মিটাইবার জন্য সম্প্রতি এই পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায়ের বিদ্যুৎ উৎপাদনের কার্যের অনুমোদন করা হইয়াছে। এই পর্যায়ে, হিরাকুদ বাঁধ হইতে ২৪ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত চিপলিমা অঞ্চলে ৭২,০০০ মেঃ ওঃ এবং হিরাকুদ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে অতিরিক্ত ৭৫,০০০ মেঃ ওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হইবে। চিপলিমার বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ১৯৬২-৬৩ সালের মধ্যে এবং হিরাকুদ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের কার্য ১৯৬১-৬২ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়। এই পরিকল্পনাটি উড়িষ্যার শিল্পসমৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

(৩) **কুশীবাঁধ পরিকল্পনা** (Kosi River Project)—এই পরিকল্পনায় বিহার রাজ্য ও নেপাল রাজ্যের তরাই অঞ্চল বিশেষভাবে উপকৃত হইবে। ভারত-নেপাল সীমান্তে হনুমাননগরের নিকট কুশী নদীতে বাঁধ নির্মাণ করিয়া বিহারের (পূর্ণিয়া, দ্বারভাঙ্গা ও মজঃফরপুর জেলায়) ৫.৭ লক্ষ হেক্টার জমিতে জলসেচনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা কুশী নদীর বন্যা নিবারিত হইবে, কলিকাতা হইতে প্রায় কাঠমাণ্ডু পর্যন্ত নৌ-চলাচলের সুবিধা হইবে, মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে এবং মৎস্য চাষও বৃদ্ধি পাইবে। এই পরিকল্পনাটি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ে ভারত-নেপাল সীমান্তে হনুমাননগরের নিকট কুশী নদীতে বাঁধ নির্মাণ করা হইবে (১৯৬২ সালে এই কার্য সম্পূর্ণ হয়), দ্বিতীয় পর্যায়ে কুশী নদীর উভয় তীরে ২৪০ কি. মি. দীর্ঘ অঞ্চলে বাঁধ দেওয়া হইবে (এই কার্য সম্পূর্ণ হইয়াছে); এবং তৃতীয় পর্যায়ে হনুমাননগরের বাঁধ হইতে পূর্বকুশী খাল খনন করা হইবে (এই কার্য চলিতেছে)। এই খাল হইতে মুরলীগঞ্জ, জানকীনগর, বনমনখী এবং আরারিয়া এই চারিটি শাখা খালও প্রসারিত হইবে। ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে নেপালের সহিত একটি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় এই পরিকল্পনার কার্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

সম্প্রতি এই পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যাবলীও অনুমোদিত হইয়াছে। এই পর্যায়ে :—(ক) পূর্ব কুশী খালের সন্নিকটে ২·৭৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০,০০০ কিঃ ওঃ পরিমিত বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন, (খ) বিহারের দ্বারভাঙ্গা জেলার ৩·১২ লক্ষ হেক্টার ও নেপালের ১২, ১২০ হেক্টার পরিমিত কৃষি জমিতে জলসেচের জন্য ১৮·৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১১২ কি. মি. দীর্ঘ পশ্চিম কুশী খালের খনন এবং (গ) সহর্ষ ও মুঙ্গের জেলার ১·৬০ লক্ষ হেক্টার পরিমিত কৃষি জমিতে জলসেচের জন্য ৪·৬৭ কোটি টাকা ব্যয়ে পূর্ব কুশী খালের সম্প্রসারণ—এই তিনটি কার্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

(৪) **তুঙ্গভদ্রা পরিকল্পনা** (Tungabhadra Project)—কৃষ্ণা নদীর একটি উল্লেখযোগ্য শাখানদী তুঙ্গভদ্রার উপর মল্লপুরম্ অঞ্চলে ২৪৫০ মিঃ দীর্ঘ ও ৪৯·৩০ মিঃ উচ্চতাবিশিষ্ট একটি বাঁধ নির্মাণ করিয়া ২০৩ কি. মি., ৩৪৭ কি. মি. ও ১৯৫ কি মি দীর্ঘ তিনটি খালের সাহায্যে অন্ধ্র ও মহীশূর রাজ্যের ৭·২ লক্ষ হেক্টার পরিমিত জমিতে জলসেচ এবং প্রায় ৭২,০০০ কিঃ ওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইবে। মূল বাঁধটির কায ১৯৫৮ সালে সম্পূর্ণ হয়। এই পরিকল্পনাটি দ্রুত সমাপ্তির পথে চলিয়াছে।

(৫) **রিহাণ্ড পরিকল্পনা** (Rihand Valley Project)—উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর জেলার পিপরি গ্রামের নিকট শোনের উপনদী রিহাণ্ড নদীতে ৯৯৪ মি. দীর্ঘ এবং ৯১·৫ মি. উচ্চ বাঁধ বাঁধিয়া উত্তর প্রদেশ ও বিহারের ৭৭ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের সুবিধা, মৎস্যচাষ, শিল্পোন্নতি, ৩ লক্ষ কিঃ ওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন, বন্যা নিবারণ, কৃষিব্যবস্থার উন্নতি প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে (১৯৫৪)। এই পরিকল্পনাটির কার্য প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

(৬) **কাক্রাপারা (তাপ্তী) পরিকল্পনা** (Kakrapara Project) —১৯৪৯ সালে গৃহীত গুজরাটের এই পরিকল্পনাটি দুইটি স্তরে বিভক্ত। প্রথম স্তরে সুরাট হইতে ৮০ কি. মি. দূরে কাক্রাপারার নিকট তাপ্তী নদী-বক্ষে ৬২১ মি. দীর্ঘ ও ১৪ মি. উচ্চ সিমেন্টের বাঁধ ও নদীতীরে মাটির বাঁধ নির্মাণ করিয়া সঞ্চিত জলরাশির সাহায্যে সুরাট জেলার ২·২৭ লক্ষ হেক্টার জমিতে জলসেচ ও ২৪ হাজার কিঃ ওঃ জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় স্তরে বাঁধের উচ্চতা বৃদ্ধি করিয়া অধিকতর জল সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা হইবে এবং ২ লক্ষ কিঃ ওঃ জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হইবে। প্রথম স্তরের বাঁধ নির্মাণের কার্য ১৯৫৩ সালে সমাপ্ত হইয়াছে এবং অন্যান্য কার্য দ্রুতসমাপ্তির পথে চলিয়াছে।

(৭) **কয়না পরিকল্পনা** (Koyna River Project)—এই পরিকল্পনায় মহারাষ্ট্র রাজ্যের সাতারা জেলার কয়না নদীর উপর ৬৩·৪ মি· উচ্চ একটি

বাঁধ বাঁধিয়া জল সঞ্চয় করা হইবে এবং সঞ্চিত জলের ⅔ অংশ মহীশূরের বিজাপুর জেলায় সেচকার্যে ব্যবহৃত হইবে। চিপলান হইতে ১০ কি. মি. দূরে অবস্থিত খাদাওয়াডী জলবিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্র হইতে ২.৪ লক্ষ কিঃ ওঃ জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হইবে এবং বোম্বাই, সোলাপুর, সাতারা ও মহীশূরের বেলগাঁও অঞ্চলের শিল্পকেন্দ্রে ব্যবহৃত হইবে। ১৯৫৪ সালে এই পরিকল্পনার কার্য আরম্ভ হয় এবং ইহার প্রথম পর্যায়ের কার্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই পরিকল্পনাটির দ্বিতীয় পর্যায়ে অতিরিক্ত ৩০০ মে. ও. বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন করা হইবে।

৮) **চম্বল পরিকল্পনা** (Chambal Valley Project)—রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশ সরকার কর্তৃক যৌথভাবে গৃহীত এই পরিকল্পনাটি উভয় রাজ্যকেই উপকৃত করিবে। এই পরিকল্পনাটির প্রথম পর্যায়ে যমুনার উপনদী চম্বলের উপর গান্ধীসাগর বাঁধ, গান্ধীসাগর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, কোটা বাঁধ ও তৎসংলগ্ন খাল খননের কার্যাবলী গৃহীত হয়। গান্ধীসাগর বাঁধের সাহায্যে ৭৭,৪৬০ লক্ষ ঘন মি. জল সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। খালের সাহায্যে মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের ৪.৪৬ লক্ষ হেক্টার জমিতে জলসেচ করা হইবে এবং গান্ধীসাগর বিদ্যুৎকেন্দ্র হইতে ৮০,০০০ কি. ও. পরিমিত বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে। গান্ধীসাগর বাঁধ ও বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং কোটা বাঁধ ও তৎসংলগ্ন সেচখালের কার্যাবলী ১৯৬০ সালে সম্পূর্ণ হয়। এই পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্য হিসাবে রাণা প্রতাপ সাগর বাঁধ ও তৎসংলগ্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি গ্রহণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্য সম্পূর্ণ হইলে ১.২২ লক্ষ হেক্টার জমিতে জলসেচ ও ৯০,০০০ কি. ও. পরিমিত জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হইবে। পরিকল্পনাটির তৃতীয় পর্যায়ের কার্যাবলীও সম্প্রতি গৃহীত হইয়াছে। এই পর্যায়ে জওহর সাগর বাঁধ (কোটা) ও তৎসংলগ্ন বিদ্যুৎকেন্দ্রটি স্থাপিত হইবে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি সম্পূর্ণ হইলে ৬০,০০০ কি. ও. পরিমিত বিদ্যুৎ উৎপাদিত হইবে।

(৯) **কৃষ্ণা বাঁধ বা নাগার্জুনসাগর পরিকল্পনা** (Nagarjunsagar Project)—এই পরিকল্পনা অনুসারে অন্ধ্ররাজ্যের হায়দরাবাদ হইতে ১৬১ কি. মি দূরে নন্দীকোণ্ডা অঞ্চলে কৃষ্ণা নদীতে ১৪৫০ মি. দীর্ঘ বাঁধ বাঁধিয়া ২০৪.৪ কি. মি. ও ১৭৮ কি. মি. দীর্ঘ দুইটি খালের সাহায্যে অন্ধ্র রাজ্যের ৮.১ লক্ষ হেক্টার পরিমিত কৃষিজমিতে জলসেচ ও ৭৫,০০০ কিঃ ওঃ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইবে। এই পরিকল্পনাটি ১৯৭০-৭১ সাল নাগাদ সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

(১০) **ময়ুরাক্ষী পরিকল্পনা** (Mor Project)—দেওঘরের ত্রিকূট পর্বত হইতে উৎপন্ন ময়ূরাক্ষী নদী সাঁওতাল পরগণা ও বীরভূমের মধ্য দিয়া

প্রবাহিত হইয়া ভাগীরথীতে পতিত হইতেছে। এই পরিকল্পনায় সাঁওতাল পরগণার মেসানজোরে ৬১২'৬ মি. দীর্ঘ ও ৪৭'২৪ মি. উচ্চ একটি বাঁধ (ক্যানাডা বাঁধ) এবং তিলপাড়া, কোপাই, ব্রাহ্মণী ও দ্বারকাতে জলাধার নির্মাণ করিয়া ২'৪৭ লক্ষ হেক্টার জমিতে জলসেচের এবং ৪ হাজার কিঃ ওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিদ্যুতের সাহায্যে কুটিরশিল্প ও সেচকার্য পরিচালিত হইবে। এই সমগ্র পরিকল্পনাটির কায ১৯৫৭ সালে সম্পূর্ণ হয়। এই পরিকল্পনায় পঃ বঙ্গের বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার বহু অংশ উপকৃত হইবে।
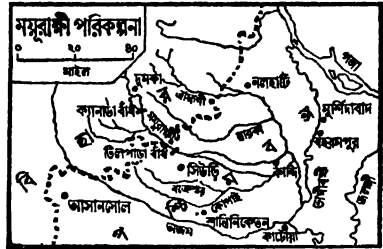
নং চিত্র—ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা

(১১) **গঙ্গা বাঁধ পরিকল্পনা** (Ganga Barrage Project)—নদীগর্ভে ক্রমাগত পলি সঞ্চয়ের ফলে ভাগীরথী অগভীর ও লবণাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে কলিকাতা—ভাগীরথী পথে উত্তর ভারতের সহিত সংযোগ সাধন ক্ষুণ্ণ হইয়াছে এবং কলিকাতা বন্দরের সংরক্ষণ-ব্যয় ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইতেছে। ভাগীরথীর সংস্কার সাধন কল্পে—(১) মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কায় গঙ্গার উপর একটি বাঁধ নির্মাণ করা হইবে; (২) ভাগীরথীর উপর জঙ্গীপুরের নিকট অপর একটি বাঁধ নির্মাণ করা হইবে, এবং (৩) ফরাক্কা বাঁধ হইতে জঙ্গীপুর বাঁধ পযন্ত ৪২'৬ কি. মি. দীর্ঘ একটি খালও খনন করা হইবে। ইহাতে ভাগীরথী ও তাহার পূর্বতীরবর্তী শাখানদীগুলির গতিবেগ বৃদ্ধি পাইবে, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার বহু অংশে সম্বৎসরব্যাপী জলসেচের ব্যবস্থা হইবে, হুগলী নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি পাওয়ায় কলিকাতা বন্দরের উন্নতি সাধিত হইবে এবং কলিকাতা হইতে পাটনা পযন্ত সম্বৎসরব্যাপী নৌচলাচলের সুব্যবস্থা হইবে।

(১২) **ভাক্রা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা** (Vakra-Nangal Project)—পাঞ্জাবের ভাক্রা গিরিখাতের নিকট রূপার হইতে ৮০ কি. মি. দূরে শতদ্রু নদীতে ৫১৮ মি. দীর্ঘ এবং ২২৬ মি. উচ্চতাবিশিষ্ট একটি বাঁধ বাঁধিয়া ২ লক্ষ ঘন মি. জল সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সঞ্চিত জল হইতে পাঞ্জাব ও রাজস্থানের বর্ষণ-বঞ্চিত প্রায় ২৭'৪ লক্ষ হেক্টার জমিতে জলসেচ এবং ৪'৫ লক্ষ কিঃ ওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হইবে। ভাক্রা গিরিখাত হইতে ১৩ কি. মি. দূরে নাঙ্গাল নদীর উপর ৩১৩'৬ মি. দীর্ঘ, ২৯ মি. উচ্চ এবং ১২২ মি. প্রশস্ত একটি বাঁধ বাঁধিয়া আরও ১'৪৪ লক্ষ কিঃ ওঃ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইবে। ভাক্রা বাঁধের জলের সমতা রক্ষার জন্যই এই নাঙ্গাল

পরিকল্পনার সৃষ্টি হইয়াছে। পরিকল্পনা দুইটি দ্বারা পাঞ্জাবের খাদ্যশস্য ও কার্পাস উৎপাদন এবং শিল্পসংগঠন বৃদ্ধি পাইবে এবং নৌ চলাচলের সুবিধাও হইবে। নাঙ্গাল বাঁধটির কায শেষ হইয়াছে এবং পরিকল্পনার অন্তর্গত গাংগুয়াল শক্তি সরবরাহ কেন্দ্র (৭৭,০০০ কিঃ ওঃ) এবং কোটলা বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৭৭,০০০ কিঃ ওঃ) হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইতেছে। পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ হইলে ইহা ভারতের বৃহত্তম বাঁধ হইবে। উৎপাদিত শক্তির সাহায্যে এ অঞ্চলে আণবিক শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত "ভারী জল" (heavy water) ও সার উৎপাদনের কারখানা স্থাপিত হইবে।

প্রশ্নোত্তর

1 Examine the important features of mineral and mining industry. (খনিজ দ্রব্য ও খনিজ শিল্পের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর।) (U E '61) (পৃঃ ১৩৯-৪০)

2 Examine the world distribution of iron ore (প্রধান প্রধান লৌহ আকরিক উৎপাদক অঞ্চলসমূহের নাম লেখ।) (P.U 66.) (পৃঃ ১৪০-৪৩)

3. State the commercial and industrial uses of the following minerals indicating the countries where each may be found (a) Copper (P U. '62, 67, U F '66), (b) Tin, (c) Lead, (d) Aluminium. (U.E 65) (নিম্নলিখিত খনিজ সম্পদগুলির ব্যবহার এবং উহারা কোন্ কোন্ দেশে পাওয়া যায় তাহা নির্দেশ কর।— (ক) তাম্র, (খ) রাং, (গ) সীসক, (ঘ) অ্যালুমিনিয়াম।) (ক) পৃঃ ১৪৪-৪৫ (খ) পৃঃ ১৪৬ (গ) পৃঃ ১৪৬-৪৭ (ঘ) পৃঃ ১৪৭-৪৮

4 State the commercial and industrial uses of mica and name the countries where it is found (অভ্রের ব্যবহার নির্দেশ কর এবং যে যে দেশে অভ্র পাওয়া যায় তাহাদের নাম লিখ)। (পৃঃ ১৪৮)

5 Enumerate the principal coal fields of the world. (P.U. '61, '65, '67, U.E. '62) (পৃথিবীর প্রধান প্রধান কয়লাক্ষেত্রসমূহের নাম লিখ।) (পৃঃ ১৫০-৫৫)

6 Examine the distribution of coal fields in Europe (ইউরোপের কয়লা খনি সমূহের বণ্টন সম্পর্কে যাহা জান লিখ।) (পৃঃ ১৫২ ৫৪)

7. What is mineral oil? What are its by-products? Give an account of the world distribution of mineral oil. (P.U '64, H S. '65, U E. '64, '67) (খনিজ তৈল কাহাকে বলে? ইহার উপজাত দ্রব্যাদি কি কি? পৃথিবীর প্রধান প্রধান তৈলখনি অঞ্চল সমূহের বিবরণ লিখ।) (পৃঃ ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮-৬১)

8 Describe the principal petroleum belts of the world পৃথিবীর তৈল-বলয়সমূহের বর্ণনা কর।) পৃঃ ১৫৮)

9 State how hydroelectricity is a superior power resour . What geographical and economic factors favour the development of water power? (জলবিদ্যুৎ কেন শ্রেষ্ঠ শক্তি সম্পদ তাহা বর্ণনা কর। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুকূল ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সমূহের নির্দেশ কর।) (U.E. '66, P.U. '65) (পৃঃ ১৬২-৬৩)

10. Examine the position of India regarding the supply of the following minerals (a) iron ore (P.U '66), (b) copper (P.U. '62, '64 U.E '66), (c) aluminium (U.E. '65) (নিম্নলিখিত খনিজ দ্রব্যগুলি সম্পর্কে ভারতের অবস্থা কিরূপ আলোচনা কর (ক) লৌহ আকর, (খ) তাম্র, (গ) অ্যালুমিনিয়াম)
(পৃ ১৬৪-১৬৭, ১৬৭-১৬৮, ১৬৮-১৬৯)

11. Examine the nature of distribution, consumption and reserves of coal in India. (ভারতীয় কয়লার আঞ্চলিক বণ্টন, আভ্যন্তরীণ ব্যবহার এবং সঞ্চিত পরিমাণ সম্পর্কে আলোচনা কর।) (P U 61, 65, '67, U.E 62) (পৃ ১৭২-১৭৬)

12. Give an account of petroleum resources of India. (ভারতের খনিজ তৈল সম্পদ সম্পর্কে যাহা জান লিখ।) (P U. 63, U.E. 65, H.S. '65) (পৃ: ১৭৬-১৭৭)

13. Examine the distribution of hydel power plants in India and explain why most of the plants have been developed in South India rather than in North India (ভারতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানাসমূহের আঞ্চলিক বণ্টন সম্পর্কে আলোচনা কর এবং উত্তর ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ ভারতে জলবিদ্যুৎ কারখানার প্রসার এত ব্যাপক কেন তাহার কারণ নির্দেশ কর।) (P U. '65 U E 64 H S. '61)
(পৃ: ১৭৭-১৮২)

14. What are the multipurpose river projects? Describe any one of such projects of India. (বহুমুখী নদী পরিকল্পনা বলিতে কি বুঝ? ভারতের যে কোন একটি বহুমুখী নদী পরিকল্পনা বর্ণনা কর।) (P U '61, 65 U.E. 61, '63, H S. '64)
(পৃ: ১৮২-১৮৪)

15 Describe the Damodar Valley Project (দামোদর পরিকল্পনাটির বর্ণনা কর।)
(P U '62 61, 66 '67 H. S. '64) (পৃ ১৮২-১৮৪)

16. Describe the Bhakra Nangal Project and the benefits to be derived from it. (ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনাটি এবং উহা হইতে যে যে সুবিধা পাওয়া যাইবে তাহা বর্ণনা কর।) (P.U. '67, U E '64) (পৃ: ১৮৮-১৮৯)

17 Describe the Ganga barrage Project and discuss the benefits which are likely to come out of it (গঙ্গা-বাঁধ পরিকল্পনাটি বর্ণনা কর এবং উহা হইতে কি কি সুবিধা পাওয়া যাইবে সে সম্বন্ধে লিখ।) (U.E. '6) (পৃ ১৮৮)

18. Describe the iron ore resources of India (ভারতের লৌহ আকরিক সম্পদের বর্ণনা কর।) (H. S '65) (পৃ: ১৬৪-১৬৬)

তৃতীয় খণ্ড

পরিবহন ব্যবস্থা

নবম অধ্যায়

পরিবহন ব্যবস্থা—স্থলপথ

অর্থনৈতিক ভূগোল অনুশীলনের চারিটি ক্ষেত্রের মধ্যে প্রাথমিক উৎপাদনের পরেই পরিবহনের স্থান। কারণ উৎপাদন ও ভোগকেন্দ্র সমূহের মধ্যে স্থানগত ব্যবধান হেতু প্রাথমিকভাবে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী প্রায়শঃই উৎপাদনকেন্দ্রে ভোগ করা সম্ভব হয় না। আবার বহুক্ষেত্রে এই সমস্ত দ্রব্য শিল্পকেন্দ্রসমূহে শিল্পীত পণ্য হিসাবে রূপান্তরিত হইয়াও ভোগকার্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সেই কারণে উৎপাদনকেন্দ্র হইতে ভোগকেন্দ্রে বা শিল্পকেন্দ্রে এবং তথা হইতে ভোগকেন্দ্রে এই সমস্ত দ্রব্যাদি পরিবহন করা একান্ত প্রয়োজন।

পরিবহন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা (Importance of transport system)—যে কোন স্থানের বৈষয়িক উন্নতি তথাকার পরিবহন-ব্যবস্থার উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। কারণ **প্রথমতঃ,** প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদনে পৃথিবীর কোন অঞ্চলই স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে অথচ বর্তমান কালে মানুষের চাহিদা ব্যাপক। সেই কারণে প্রত্যেক অঞ্চলই পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল হইতে ভোগ্য পণ্য অল্পাধিক আহরণ করিয়া আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইবার চেষ্টা করে এইজন্য বিভিন্ন স্থানের মধ্যে পণ্য বিনিময়ের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। আর এই পণ্য বিনিময়ের জন্য প্রয়োজন হয় পণ্য পরিবহন ব্যবস্থার। **দ্বিতীয়তঃ,** পরিবহন যেরূপ একদিকে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে অন্যদিকে তেমন ইহা উৎপাদনে গতিবেগও সঞ্চার করিয়া থাকে। কারণ কোন দেশ হইতে যদি এক বা একাধিক পণ্যের রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে সম্ভবপর ক্ষেত্রে ঐ দেশে ঐ সমস্ত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করার প্রয়াসও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। **তৃতীয়তঃ, অর্থনীতির** দৃষ্টিতে পরিবহন **উৎপাদনেরই একটি অঙ্গ,** কারণ যেখানে দ্রব্যসম্ভার মানুষের ভোগে লাগিতে পারে কেবলমাত্র সেখানে নীত হইলেই উহা উৎপন্ন দ্রব্যের পর্যায়ভুক্ত হয়। **চতুর্থতঃ,** পরিবহন ব্যবস্থা যতই প্রসার লাভ করে আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ এবং

উৎপাদন-বৈশিষ্ট্যও ততই স্পষ্ট হইয়া উঠে। আবার এই আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ এবং উৎপাদন-বৈশিষ্ট্যের স্বাভাবিক পরিণতি হইতেছে বিভিন্ন দেশের বা অঞ্চলের মধ্যে বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপের সহযোগ ও সহশৃঙ্খল স্থাপন এবং ইহাই হইল ব্যবসা-বাণিজ্যের মূল ভিত্তি। **পঞ্চমতঃ,** বাণিজ্য ও পরিবহন-ব্যবস্থা পরস্পরের পরিপূরক। বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন পরিবহন-ব্যবস্থার প্রসারলাভ ঘটে অন্যদিকে তেমনই পরিবহন-ব্যবস্থার প্রসারলাভ ঘটায় বাণিজ্যের পরিমাণও বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে ইউরোপের সহিত এশিয়া মহাদেশের বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় বাণিজ্যিক পণ্যের দ্রুত পরিবহনের সুবিধার জন্য সুয়েজ খাল খনন করা হয় কিন্তু সুয়েজখাল খননের পর হইতেই ঐ দুইটি মহাদেশের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। **ষষ্ঠতঃ,** সুষ্ঠু পরিবহন ব্যবস্থা প্রাকৃতিক সম্পদ হইতে উপার্জিত আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করে, কারণ পরিবহন ব্যবস্থার প্রসারের ফলে দুরধিগম্য স্থানের সম্পদও মানুষের অধিগত হইয়া প্রাকৃতিক সম্পদের পর্যায়ভুক্ত হয়। চিলির নাইট্রেট, পঃ অস্ট্রেলিয়ার স্বর্ণ, কিম্বালির হীরক এই নিয়মেরই উদাহরণস্থল।

পরিবহনের প্রকারভেদ (Modes of transport)—পণ্য-পরিবহন ও গমনাগমন বর্তমান কালে মানুষ, পশু, মোটর গাড়ী ও রেলগাড়ী প্রভৃতি যানবাহনের সাহায্যে **স্থলপথে**; নৌকা, স্টীমার, জাহাজ প্রভৃতি যান বাহনের সাহায্যে আন্তর্দেশিক ও আন্তর্জাতিক **জলপথে** এবং বিমানপোতের সাহায্যে **আকাশপথে** সাধিত হইয়া থাকে।

স্থলপথে পরিবহন ব্যবস্থা (Land transport system)—স্থলপথে **মানুষ** আদিম অবস্থায় নিজেই পণ্য বহন করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইত। আজও পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত অনুন্নত এবং প্রতিকূল পরিবেশযুক্ত অংশের লোকেরা পণ্য-পরিবহন এবং গমনাগমনের জন্য প্রধানতঃ মানুষের বহনক্ষমতার উপরেই নির্ভরশীল।

পশু—পরিবহন-কার্যে ভারবাহী পশু যন্ত্রসভ্যতায় উন্নত ইউরোপেও যথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অন্যান্য স্থানের কথা বলাই বাহুল্য। ইউরোপের অধিকাংশ দেশে অশ্ব প্রধান ভারবাহী জন্তু। মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে বৃষ, দক্ষিণ ইউরোপের সমভূমি অঞ্চলে গর্দভ এবং পার্বত্য অঞ্চলে অশ্বতর, হিমমরু অঞ্চলে বল্গা হরিণ ও কুকুর; মধ্য-এশিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে চমরী গরু, ছাগল ও ভেড়া; দক্ষিণ-আমেরিকার আন্দিজ পর্বতের দিকে লামা; এশিয়ায় হস্তী ও উষ্ণ মরু অঞ্চলে উট মানুষের প্রধান সহায়।

পাকা রাস্তা—মানুষ এবং পশু যে যুগে পণ্য পরিবহন কার্যে ব্যাপকভাবে

নিযুক্ত থাকিত সে যুগে পাকারাস্তার বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না, কিন্তু শকটের প্রচলন আরম্ভ হইবার পর হইতেই পাকারাস্তা নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়।

স্থানীয় রাস্তাঘাট নির্মাণ ব্যবস্থা সাধারণতঃ ভৌগোলিক ও আর্থিক পরিবেশের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। কারণ, **প্রথমতঃ**, পার্বত্য অঞ্চল, জলাভূমি, মরুভূমি, কোমল শিলাস্তরে গঠিত বৃষ্টিবহুল অঞ্চল প্রভৃতি স্থানে ভাল রাস্তা নির্মাণ ও উহার সংরক্ষণ অত্যন্ত কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য এবং **দ্বিতীয়তঃ**, ভূমির ঢাল অপেক্ষাকৃত মৃদু হইলে উত্তম মোটর পথ ও রেলপথ নির্মাণ করা সম্ভব হয়, কিন্তু ভূমির ঢাল তীব্র হইলে ভাল রাস্তা নির্মাণ করা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশযুক্ত অঞ্চলসমূহে যদি বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা, নিবিড় লোকবসতি, অধিবাসীদের উন্নত জীবনমান, রাস্তা নির্মাণের উপযোগী উপকরণসমূহের সুলভতা, এবং যান্ত্রিক শকট চালনার উপযোগী শক্তি সম্পদের পর্যাপ্ত ও সুলভ সরবরাহ থাকে তবেই ঐ সমস্ত অঞ্চলে রাস্তাঘাট বিশেষ প্রসার লাভ করিয়া থাকে।

উত্তর আমেরিকার পূর্বার্ধে ক্যানাডার দক্ষিণাংশ হইতে মেক্সিকো উপসাগরীয় উপকূলাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত সমভূমি অঞ্চলেই রাস্তাঘাটের প্রসারণ ব্যাপক। একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই পৃথিবীর ⅓ অংশ রাস্তা বিদ্যমান। শিল্পপ্রধান **পশ্চিম ইউরোপের** বিভিন্ন দেশে রাস্তাঘাট বিশেষ উন্নত ধরণের। তবে পূর্ব ও দক্ষিণ ইউরোপে রাস্তাঘাট বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই। **সোভিয়েট রাষ্ট্রে** মোটর পথ দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। **এশিয়া** মহাদেশের চীন ও ভারতেই রাস্তার পরিমাণ সমধিক।

ভারতের রাস্তা ও সীমান্ত পথসমূহ

ভারতের রাস্তা (Indian road transport system)—১৯৫০-৫১ সালে ভারতে ১,৫৬,১০৭ কি. মি.[১] পাকা রাস্তা এবং ২,৪১,৫১২ কি. মি. কাঁচা রাস্তা ছিল। প্রথমপরিকল্পনার শেষবর্ষ (৩১-৩-৫৬) পর্যন্ত অতিরিক্ত ২৫,৮৫৩ কি.মি. পাকা রাস্তা ও ৭১,৯৭৮ কি.মি. কাঁচা রাস্তা নির্মিত হয়।[২] দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ বর্ষে (৩১.৩.৬১) ভারতে মোট রাস্তার পরিমাণ দাঁড়ায় ২,৩৪,৪১৯ কি.মি. পাকা রাস্তা ও ৪,৭০,৫৮১ কি. মি. কাঁচা রাস্তা।

আয়তন এবং প্রয়োজনের তুলনায় ভারতে রাস্তার পরিমাণ অতি অল্প এবং গ্রামাঞ্চলে ভাল রাস্তার অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ভারতের

১। ১ কি. মি.=০.৬২১৩৭ মাইল।
২। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ কেন্দ্রসমূহের অন্তর্গত রাস্তাসমূহ (১০,৮১৫ কি. মি.) লইয়া।

ন্যায় কৃষিপ্রধান দেশে ভাল রাস্তার অধিকতর প্রসারের বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। যে সমস্ত স্থানে রেলপথ নাই বা রেলপথ নির্মাণের অসুবিধা রহিয়াছে সেই সমস্ত স্থানে রাস্তা নির্মাণ করিয়া পণ্য চলাচলের সুব্যবস্থা করা আশু কর্তব্য। এক্ষেত্রে রাস্তাসমূহ রেলপথের প্রতিদ্বন্দ্বী না হইয়া উহার পরিপূরক হইলেই দেশের মঙ্গল।

ভারতের রাস্তাসমূহ **ত্রুটি** (**defects**)-বহুল—কারণ (১) পার্বত্য অঞ্চলে প্রশস্ত রাস্তা নাই বলিলেই চলে, (২) অধিকাংশ রাস্তাই অতি সঙ্কীর্ণ; (৩) বহু রাস্তার অন্তর্বর্তী নদীর উপর এখনও সেতু প্রস্তুত হয় নাই, আর যেগুলি রহিয়াছে সেগুলিও অতি সঙ্কীর্ণ, আবার (৪) বহুক্ষেত্রে রাস্তাগুলি সংস্কারের অভাবে অব্যবহার্য হইয়া পড়িয়াছে।

পথের বিস্তার যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে গৃহীত হয়। **নাগপুর পরিকল্পনা** (১৯৪৩) অনুসারে ভারতের রাস্তাসমূহকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। (১) জাতীয় রাজপথ (২৬,৫৬০ কি. মি.) ও জাতীয় রাজপথ সংযোগকারী পথ (৬,৬৪০ কি. মি.)—এই পথসমূহ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্মিত ও রক্ষিত হইবে। (২) প্রাদেশিক রাজপথ (৮৩,৩২০ কি. মি.)—এই পথসমূহ প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক নির্মিত ও রক্ষিত হইবে। ইহারা প্রাদেশিক শহর ও বাণিজ্য কেন্দ্রসমূহকে সংযুক্ত করিবে এবং রাজ্যান্তর্গত জাতীয় রাজপথের সহিত সংযোগ রক্ষা করিবে। (৩) জেলান্তর্গত ও গ্রাম্য পথ (৪১০,০৮০ কি. মি.)—জেলাবোর্ড কর্তৃক এই পথসমূহ নির্মিত ও রক্ষিত হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ বর্ষে ভারত নাগপুর পরিকল্পনা কর্তৃক নির্ধারিত রাস্তা নির্মাণের ভাগ অতিক্রম করিয়া যায়। রাস্তা সংক্রান্ত নানাবিধ গবেষণার জন্য ১৯৫২ সালে দিল্লীতে একটি কেন্দ্রীয় গবেষণাগার স্থাপিত হয়।

তৃতীয় পরিকল্পনায় রাস্তা উন্নয়নমূলক কার্যসূচী একটি নূতন দীর্ঘমেয়াদী (১৯৬১-৮১) পরিকল্পনার অঙ্গহিসাবে গৃহীত হইয়াছে। এই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ হইলে ভারতের প্রতি ১০০ বর্গ কি.মি.[১] পরিমিত স্থানে গড়ে ৫৫ কি.মি. রাস্তা থাকিবে (বর্তমানে প্রতি ১০০ বর্গ কি.মি. পরিমিত স্থানে রাস্তার পরিমাণ প্রায় ২৯·৭ কি. মি.)।

ভারতের সীমান্ত-পথ (**India's land frontier routes**)—ভারতের স্থল-সীমান্ত ১৫,১৬৮ কি.মি. দীর্ঘ। চমরী গাই, অশ্বতর, উট এবং টাট্টু ঘোড়ার সাহায্যে মধ্য এশিয়া, তিব্বত ও নেপালের সহিত সীমান্ত-পথে পরিবহন কার্য নিষ্পন্ন হয়। ভারতের সীমান্তপথসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—(১) শ্রীনগর হইতে বন্দীপুর হইয়া এবং বরজিল

১। ১ বর্গ মাইল=২·৫৯ বর্গ কি. মি.; ১ বর্গ কি. মি.=০·৩৮৬১ বর্গ মাইল।

গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া **গিলগিট পর্যন্ত** বিস্তৃত পথ। এই পথ গিলগিট হইতে পামির পর্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে। (২) শ্রীনগর ও সোনমার্গ হইতে জোজিলা গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া উত্তর দিকে বিস্তৃত পথ। (৩) লেহ্ হইতে কারাকোরাম গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া **সিনকিয়াং পর্যন্ত** বিস্তৃত পথ। (৪) কুলু উপত্যকার যোগীন্দ্রনগর হইতে রোটাঙ্গ ও বড়লাচা লা গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া **লেহ্ পর্যন্ত** বিস্তৃত পথ। (৫) সিমলা হইতে সিপ্‌কি গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া **মানস-সরোবর পর্যন্ত** বিস্তৃত পথ। (৬) সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক হইতে জেলেপ্‌লা ও নাথুলা গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া **লেহ্ পর্যন্ত** বিস্তৃত পথ। (৭) আকিয়াব হইতে প্রসারিত একটি পথ

৪১ নং চিত্র—ভারতের সীমান্তপথ

টোনগুপ গিরিবর্ত্ম এবং আরাকান-ইয়োমা অতিক্রম করিয়া **প্রোম** অঞ্চলে ব্রহ্ম রেলপথের সহিত মিশিয়াছে। (৮) ডিমাপুর হইতে কোহিমা, মণিপুর ও ব্রহ্ম সীমান্তের **তামু পর্যন্ত** বিস্তৃত একটি পথ রহিয়াছে। তামু হইতে আর একটি পথ ইয়ে-উ ও মান্দালয় অঞ্চলে ব্রহ্মদেশের রেলপথসমূহের সহিত সংযোগ সাধন করিতেছে। (৯) লুসাই পর্বতাঞ্চলের আইজাল হইতে **কালাম ও পাকোকু** পর্যন্ত বিস্তৃত পথ। (১০) **আসাম-চুংকিং পথ**—এই পথ উত্তর-পূর্ব আসামের লেডো অঞ্চল হইতে ব্রহ্মদেশের মিতকিইনা হইয়া ভামো এবং সেখান হইতে পাওসান হইয়া কুনমিং পর্যন্ত গিয়াছে। কুনমিং হইতে এই পথ আবার চীনদেশের চুংকিং পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সমগ্র পথটিকে **ষ্টীলওয়েল বা বার্মা রোড** বলা হয়। লেডো হইতে কুনমিং পর্যন্ত

এই পথের দৈর্ঘ্য ১৬৭২ কি. মি. এবং কুনমিং হইতে চুংকিং প্রায় ১৬০০ কি. মি.। সীমান্তপথে ভারতের সহিত পাকিস্তানের বাণিজ্যিক সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রেলপথ (Railway)

বাষ্প-চালিত এঞ্জিন আবিষ্কারের পর হইতেই পৃথিবীর সর্বত্র রেলপথের বিস্তার ঘটিতে থাকে। বর্তমানে আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের ন্যায় পশ্চাৎপদ বা বিরলবসতি ভূখণ্ড ব্যতীত পৃথিবীর সমস্ত উন্নতিশীল দেশেই রেলপথের প্রসার সবিশেষ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। গুরুভার পণ্যসম্ভারের দ্রুত ও দীর্ঘপথ পরিবহনের জন্য রেলপথই শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা।

রেলপথ বনাম **মোটর পথ** (**Rail transport** *versus* **Motor transport**)—বৃহদায়তন ও গুরুভার পণ্যসম্ভার দীর্ঘপথ পরিবহনে রেলপথ মোটরপথ অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী। কিন্তু রেলপথ অপেক্ষা **মোটর-পথের** কয়েকটি বিষয়ে **সুবিধা** রহিয়াছে। যেমন—(১) পণ্যসম্ভারের অল্পদূর ও দ্রুত পরিবহনে রেলপথ অপেক্ষা মোটরপথ বিশেষ উপযোগী এবং অল্পব্যয়-সাপেক্ষ ; (২) রেলপথসমূহকে দেশের অভ্যন্তরে সর্বত্র বিস্তার করা সম্ভব নহে, কিন্তু মোটর পথে অধিকাংশ স্থানের সহিত যোগাযোগ স্থাপন সম্ভবপর, (৩) মোটরপথে মোটরগাড়ী যদৃচ্ছ ভ্রমণ করিতে পারে, কিন্তু রেলপথে রেলগাড়ী নির্দিষ্ট পথ ও সময় ব্যতীত যাতায়াত করিতে পারে না ; (৪) মোটরপথে পণ্য-সম্ভারের সংগ্রহ ও বণ্টন ব্যাপারে সরাসরিভাবে প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব, কিন্তু রেলপথে ইহা সম্ভব নহে ; (৫) রেলপথ অপেক্ষা মোটরপথ নির্মাণের প্রাথমিক ব্যয় অল্প।

বর্তমান আর্থিক ব্যবস্থায় রেলপথ এবং মোটরপথ কেবলমাত্র পরস্পরের প্রতিযোগীই নহে, পরিপূরকও বটে। কারণ মোটর গাড়ী সুদূর গ্রামাঞ্চল হইতে পণ্যসংগ্রহ করিয়া রেলগাড়ীর পণ্য সরবরাহ করে এবং রেলপথে পরিবাহিত পণ্যসম্ভারও মোটর গাড়ীর সাহায্যে দেশাভ্যন্তরে বণ্টন করা হইয়া থাকে। এই ভাবে মোটরপথ ও রেলপথ পরস্পরের পরিপূরক হইয়া কার্য করে।

রেলপথ নির্বাচনে পরিবেশের প্রভাব (Influence of environment on the laying of railway lines)—কয়েকটি ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব রেলপথের নির্মাণ ও প্রসারকে নিয়ন্ত্রণ করে।

ভৌগোলিক পরিবেশ—(১) বিস্তৃত সমভূমি অঞ্চলেই রেলপথের ব্যাপক প্রসার সম্ভব। কারণ বন্ধুর পার্বত্যভূমিতে রেলপথ স্থাপন অত্যন্ত

কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য। (২) অত্যন্ত আর্দ্র নিম্নভূমি বা জলাভূমিতে, এবং তুষারাবৃত ও মরু অঞ্চলে রেলপথ নির্মাণ কষ্টসাধ্য। এই কারণে মন্দোষ্ণ জলবায়ু ও মধ্যম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলসমূহই রেলপথ স্থাপনের পক্ষে উৎকৃষ্ট। (৩) নদী-খাল-হ্রদবহুল অঞ্চলে রেলপথ নির্মাণ কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য। এই কারণে পুর্ববঙ্গের সর্বত্র রেলপথ স্থাপন কবা সম্ভব হয় নাই।

অর্থনৈতিক পরিবেশ—যুক্তরাষ্ট্র ও পঃ ইউরোপের দেশগুলির ন্যায় যে সমস্ত অঞ্চল ঘনবসতিপুর্ণ, সমৃদ্ধ ও বাণিজ্যোন্নত সেই সমস্ত অঞ্চল রেলপথ নির্মাণে অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা অগ্রণী। অপর পক্ষে আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ক্যানাডা, সাইবেরিয়া, এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরল লোকবসতি ও পরিবহনযোগ্য পণ্যের অপ্রতুলতা রেলপথের প্রসারকে ব্যাহত করিয়াছে। তবে একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে বেলপথের প্রসারের উপরেও দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে।

বিভিন্ন 'গেজে'র (মাপের) রেলপথ (Different railway gauges)—রেলপথের দুইটি লৌহবর্ত্মের মধ্যবর্তী দূরত্বকে রেলের 'গেজ' বলা হয়। রেলপথের প্রকৃতি, রেলগাডীর গতি এবং পণ্য পরিবহনের ক্ষমতা বেলের 'গেজের' উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। পৃথিবীর রেলপথসমূহকে 'গেজ' হিসাবে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—(১) প্রশস্ত বা 'ব্রড গেজ' (broad gauge) (১·৭ মি, ১·৬ মি., ১·৫ মি.), (২) প্রমাণ বা 'স্ট্যাণ্ডার্ড গেজ' (standard gauge) (১·৪ মি.) এবং (৩) সংকীর্ণ বা 'ন্যারো গেজ' (narrow gauge) (১·২ মি., ১ মিটার, ·৭৬ মি. ইত্যাদি)। স্থানীয় ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাভেদে রেলের 'গেজ' নির্ধারিত হয়। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে পার্বত্য ও নদীবহুল অঞ্চলে 'ন্যারো গেজের' রেলপথ নির্মিত হয়। এই শ্রেণীর রেলপথ নির্মাণের ব্যয় অপেক্ষাকৃত অল্প তবে এই মাপের রেলপথসমূহের উপর দিয়া যে সমস্ত গাডী চলাচল করে তাহাদের গতি খুব মন্থর হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার অধিকাংশ রেলপথই এই মাপের। অপর পক্ষে আর্থিক সঙ্গতি-সম্পন্ন কঠিন ও বিস্তৃত সমভূমির উপর দিয়া 'ব্রড' ও 'স্ট্যাণ্ডার্ড গেজ' রেলপথ নির্মিত হইয়া থাকে। সমগ্র উত্তর আমেরিকার এবং ইউরোপের অধিকাংশ (স্পেন, পর্তুগাল ও রুশিয়া ব্যতীত) রেলপথের মাপই ১·৪ মি.। পৃথিবীতে ব্রড গেজ অপেক্ষা স্ট্যাণ্ডার্ড গেজ রেলপথেরই প্রসার সমধিক। এই পথে গাড়ী-সমূহের গতিও বিশেষ দ্রুত হইয়া থাকে।

মহাদেশীয় রেলপথ (Trans-continental railways)—বিভিন্ন মহাদেশের এক মহাসাগরীয় উপকূল হইতে অপর মহাসাগরীয় উপকূলে দ্রুত পণ্য পরিবহনের নিমিত্ত যে সমস্ত রেলপথ নির্মিত ও ব্যবহৃত হয় সেগুলিকে

মহাদেশীয় রেলপথ বলে। উত্তর গোলার্ধের মহাদেশগুলি আয়তনে বৃহৎ বলিয়া এই জাতীয় রেলপথের প্রয়োজনীয়তা উত্তর গোলার্ধে অধিক কিন্তু দক্ষিণ গোলার্ধে মহাদেশসমূহ সংকীর্ণ এবং লোকবসতি অত্যন্ত বিরল থাকায় তথায় মহাদেশীয় রেলপথের সংখ্যা অতি অল্প।

উল্লেখযোগ্য মহাদেশীয় রেলপথসমূহ (Important transcontinental railway lines)—উত্তর আমেরিকা—পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশসমূহের তুলনামূলক আলোচনা করিলে দেখা যায় যে রেলপথে পরিবহন ব্যবস্থাব প্রবর্তনে উত্তব আমেরিকার পুর্বার্ধ বিশেষ উন্নতিশীল। এই মহাদেশের ১০০° দেশান্তর রেখার পুর্বে অবস্থিত খনিজ, কৃষিজ ও শিল্প-সম্পদে সমৃদ্ধ বিস্তৃত সমভূমি অঞ্চলে রেলপথসমূহ অত্যন্ত ঘনসন্নিবিষ্ট। সমগ্র অঞ্চলটির মধ্যে আবার যুক্তরাষ্ট্রেই রেলপথের প্রসার সর্বাপেক্ষা অধিক।
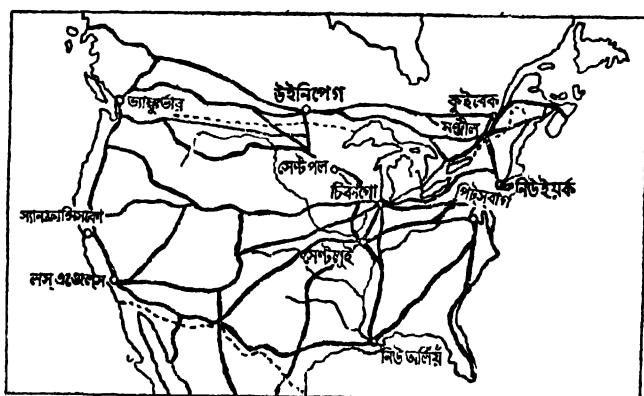
৪২ নং চিত্র—উত্তর আমেরিকার মহাদেশীয় রেলপথসমূহ

রেলপথে পরিবহন ব্যবস্থাই **ক্যানাডার** ব্যবসা-বাণিজ্যের একমাত্র নির্ভরযোগ্য অবলম্বন। প্রকৃত পক্ষে ক্যানাডার সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক উন্নতির মূলে রহিয়াছে দুইটি **মহাদেশীয় রেলপথ।**

(১) **ক্যানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলপথ** (৫,৬০০ কি. মি.)—ইহা ক্যানাডার পুর্ব উপকূলের সেণ্ট জন ও হ্যালিফ্যাক্স হইতে মণ্ট্রীল, অটাওয়া, সাডবেরি, পোর্ট আর্থার, ফোর্ট উইলিয়াম, উইনিপেগ, রেজিনা ও মেডিসিন হ্যাট হইয়া ক্যালগারী পর্যন্ত বিস্তৃত। তথা হইতে ইহার একটি শাখা দক্ষিণে ক্রোসনেস্ট গিরিবর্ত্ম হইয়া এবং অপর শাখা উত্তরে কিকিং হর্স গিরিবর্ত্ম এবং কলম্বিয়া ও ফ্রেজার নদীর উপত্যকা বাহিয়া পশ্চিম উপকূলের ভ্যানকুভার

বন্দরে গিয়া পৌঁছিয়াছে। ক্যানাডার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির মূলে এই রেলপথের গুরুত্ব অপরিসীম। ইহা ক্যানাডার গম বলয়ের মধ্য দিয়া পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। তবে ইহা হ্রদ অঞ্চলের খনিজ ও শিল্প সম্পদে সমৃদ্ধ স্থানগুলির সহিত বন্দরসমূহেরও সংযোগ স্থাপন করে। এই রেলপথ নির্মিত হইবার পর হইতে পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা সম্ভব হইয়াছে এবং পশ্চিমাঞ্চলের লোকবসতিও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(২) **ক্যানাডিয়ান ন্যাশনাল রেলপথ** (কিঞ্চিদধিক ৩,২০০ কি.মি.)—ইহা প্রকৃতপক্ষে অনেকগুলি রেলপথের সমষ্টি, এবং অংশতঃ ক্যানাডা ও অংশতঃ যুক্তরাষ্ট্রের গমবলয়ের মধ্য দিয়া ইহার গতি। ইহা সাণ্ডে উপসাগরের তীরস্থিত মঙ্কটন শহর হইতে কুইবেক, উইনিপেগ, সাসকাটুন ও এডমণ্টন হইয়া ইওলোহেড গিরিবর্ত্ম পর্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে। তথা হইতে ইহার এক শাখা পশ্চিম উপকূলের প্রিন্স রুপার্ট বন্দর পর্যন্ত এবং অপর শাখা ভ্যানকুভার বন্দর পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। সাসকাটুন হইতে প্রসারিত হাডসন বে রেলপথ (৯৬০ কি. মি.)-এর সাহায্যে ইহা হাডসন উপসাগর তীরস্থিত চার্চিল বন্দরের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো, বাফেলো প্রভৃতি বিবিধ শ্রমশিল্প-প্রধান শহরও এই পথে পরস্পর সংযুক্ত। এই রেলপথে বাসন্তিক গম, পশুজাত সামগ্রী, কাষ্ঠ ও মৎস্য প্রচুর পরিমাণে পরিবাহিত হইয়া থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের স্কাগোয়ে বন্দর হইতে ইউকন নদীর তীরে অবস্থিত হোয়াইট হর্স পর্যন্ত বিস্তৃত ইউকন রেলপথটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমগ্র ক্যানাডায় বর্তমানে প্রায় ৯৬,০০০ কি. মি. রেলপথ রহিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রে ছয়টি উল্লেখযোগ্য মহাদেশীয় রেলপথ রহিয়াছে। (১) **নর্দার্ন প্যাসিফিক রেলপথ** (৩০৫৬ কি. মি.)—ইহা শিকাগো হইতে সেণ্টপল, উইনিপেগ, মণ্ট্রীল এবং পাগেটসাউণ্ড হইয়া পশ্চিম উপকূলের সীটল ও পোর্টল্যাণ্ড বন্দর পর্যন্ত বিস্তৃত। তথা হইতে একটি রেলপথ স্যানফ্রান্সিসকো বন্দর পর্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে। শাখাপথে নিউইয়র্ক ও ফিলাডেলফিয়া শহর দুইটিও ইহার সহিত সংযুক্ত। এই পথে গম, লৌহ আকরিক ও ইস্পাতজাত দ্রব্যাদি পরিবাহিত হয়। (২) **ইউনিয়ান অ্যাণ্ড সেণ্ট্রাল প্যাসিফিক রেলপথ** (৩৫২০ কি. মি.)—ইহার মারফৎ পূর্বদিকের শিকাগো ও নিউইয়র্ক শহর দুইটির সঙ্গে পশ্চিমে স্যানফ্রান্সিসকো শহরের যোগ সাধিত হইয়াছে। এই রেলপথটি কৃষিজ ও খনিজ দ্রব্যে সমৃদ্ধ অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রসারিত রহিয়াছে। (৩) **সাদার্ন প্যাসিফিক রেলপথ**—ইহা বাল্টিমোর ও ওয়াশিংটন হইয়া প্রথমে নিউ অরলিন্স এবং পরে উপসাগরীয় সমভূমি ও মেক্সিকোর প্রান্ত সীমা অতিক্রম করিয়া লস্ এঞ্জেলস্ পর্যন্ত বিস্তৃত। তথা হইতে একটি রেলপথ স্যানফ্রান্সিসকো শহর পর্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে। এই

রেলপথে প্রচুর গম, তুলা, ভুট্টা, ফল ও বহুবিধ খনিজ দ্রব্য পরিবাহিত হয়। (৪) **ওয়েস্টার্ণ প্যাসিফিক রেলপথ**—পূর্ব-পশ্চিম প্রান্তদ্বয়ের সংযোগকারী এই রেলপথটি প্রধানতঃ পণ্য পরিবহন কার্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (৫) **গ্রেট নর্দার্ণ রেলপথ**—এই রেলপথটি পূর্বদিকের সেণ্টপল শহর হইতে পশ্চিমের সীটল শহর পর্যন্ত বিস্তৃত। একটি শাখা পথে সেণ্টপল নিউইয়র্কের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। (৬) **আচিসন, টোপেকা ও সান্তা ফে রেলপথ**—ইহা সেণ্ট লুই শহরের মাধ্যমে নিউইয়র্ক ও স্যানফ্রান্সিসকোকে
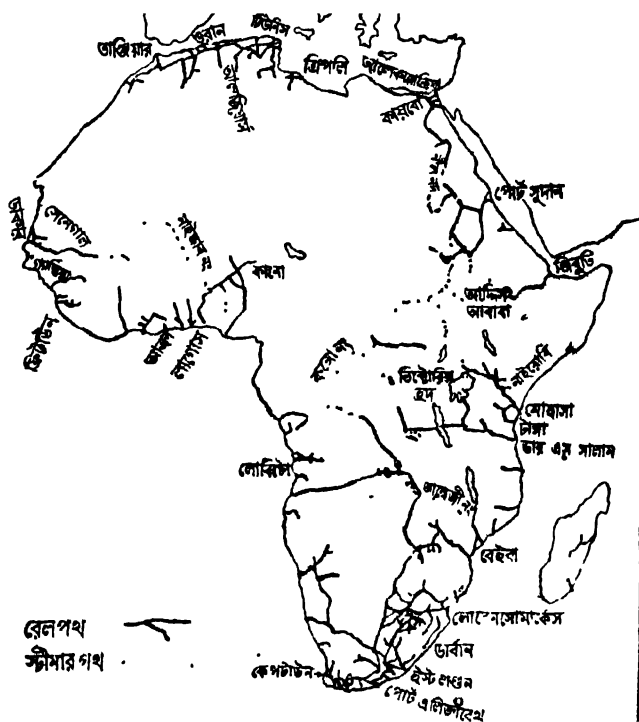
৪৩নং চিত্র—আফ্রিকার রেলপথ ও নদীপথসমূহ

সংযুক্ত করিতেছে। এই ছয়টি মহাদেশীয় রেলপথের সাহায্যে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরস্থিত রাষ্ট্রসমূহের ও মধ্যাঞ্চলের সমভূমিতে উৎপন্ন পণ্য আটলান্টিক বন্দরসমূহে এবং উত্তর-পূর্বের ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে নীত হয়।

দক্ষিণ আমেরিকা—এই মহাদেশের মহাদেশীয় রেলপথটির নাম **চিলি-আর্জেন্টাইন রেলপথ** (১৪৩২ কি. মি.)। এই পথটি আর্জেন্টিনার রাজধানী

ও বন্দর বুয়েনস আয়ার্স শহর হইতে প্রসারিত হইয়া 'পম্পা' অঞ্চলের মধ্য দিয়া ও আন্দিজ পর্বতাঞ্চল ভেদ করিয়া চিলির ভ্যাল্‌পারাইজো বন্দর পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। ইহা পারানা-পারাগুয়ে পর্যঙ্কের গম ও বীট বলয়ের সহিত চিলি ও আন্দিজ পর্বতাঞ্চলের কৃষি ও খনিজদ্রব্যে সমৃদ্ধ অঞ্চলসমূহের সংযোগ সাধন করে।

আফ্রিকা—আফ্রিকা মহাদেশের তথাকথিত **কেপ-টু-কায়রো** নামক মহাদেশীয় রেলপথটি রেলপথ, জলপথ ও হাঁটাপথের সমষ্টি মাত্র। বর্তমানে রেলপথ আছে কেপটাউন হইতে কঙ্গো প্রদেশের বুকামা পর্যন্ত। বুকামা
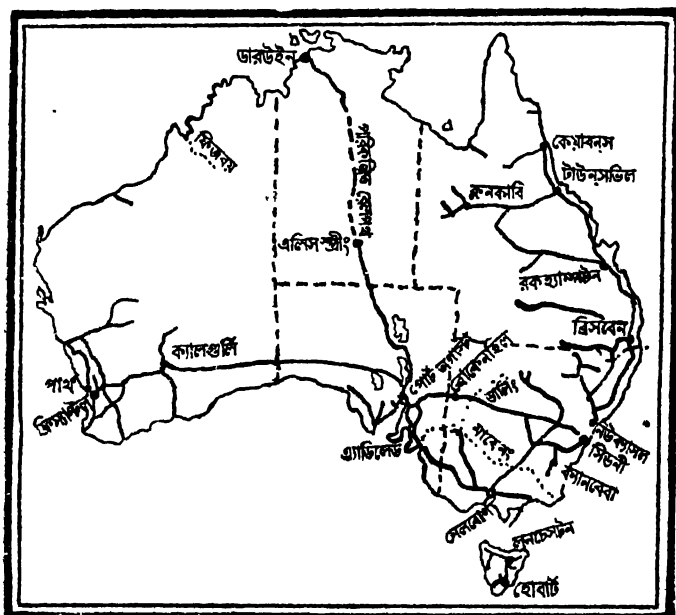
৪৪নং চিত্র—অস্ট্রেলিয়ার রেলপথসমূহ

হইতে নদী ও স্থল পথে খার্টুম এবং খার্টুম হইতে রেলপথে ওয়াদি হায়ফা পর্যন্ত যাওয়া যায়। হায়ফা হইতে পুনরায় নদীপথে সেলাল পৌছিতে হয়। সেলাল হইতে আবার রেলপথ কায়রো পর্যন্ত বিস্তৃত। কেপ টাউন হইতে কায়রোর দূরত্ব প্রায় ১৪,৪০০ কি. মি.।

অস্ট্রেলিয়া—অস্ট্রেলিয়ায় একটি মহাদেশীয় রেলপথ রহিয়াছে। **এই মহাদেশীয় রেলপথটি দঃ-পূঃ অস্ট্রেলিয়াকে পঃ অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী পার্থ-এর সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। এই রেলপথটি ভিক্টোরিয়া রাজ্যের রাজধানী মেলবোর্ন হইতে প্রসারিত হইয়া দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী এডিলেড**

হইয়া পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার স্বর্ণখনি কেন্দ্র ক্যালগুর্লি ও কুলগার্ডির মধ্য দিয়া পশ্চিম উপকূলের পার্থ-বন্দর পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। এই রেলপথে গম, পশম, মাংস, দুগ্ধজাত দ্রব্য, খনিজ দ্রব্য প্রভৃতি পণ্য পরিবাহিত হয়। অস্ট্রেলিয়াতে আর একটি মহাদেশীয় রেলপথ নির্মাণের প্রস্তাব চলিতেছে। এই পথ উত্তর-অস্ট্রেলিয়ার ডারউইন বন্দব হইতে দক্ষিণ-অস্ট্রেলিয়ার এ্যাডিলেড বন্দর পযন্ত বিস্তৃত হইবে।

ইউরোপ—শিল্পসমৃদ্ধ পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের রেলপথসমূহ অত্যন্ত ঘনসন্নিবিষ্ট। কিন্তু বিরল লোকবসতি হেতু পূর্ব ইউরোপের রেলপথসমূহ ঘনসন্নিবিষ্ট নহে। প্যারী হইল পশ্চিম ইউরোপীয় রেলপথ সমূহের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রস্থল। এস্থান হইতে ওরিয়েণ্ট এক্সপ্রেস রেলপথটি প্রসারিত রহিয়াছে।

ওরিয়েণ্ট এক্সপ্রেস রেলপথটিকে একটি মহাদেশীয় রেলপথ বলা যাইতে পারে, তবে ইহা ঠিক একটিমাত্র রেলপথ নহে, কয়েকটি পৃথক পৃথক রেলপথের সমষ্টি মাত্র। এই পথটি প্যারী হইতে মিউনিক, ভিয়েনা, ব্রাতিশ্লাভা, বুদাপেস্ত, বেলগ্রেড প্রভৃতি শহরের মধ্যে দিয়া তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহর পর্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে। তথা হইতে ইহা একটি শাখাপথের সাহায্যে সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাস পর্যন্ত এবং তথা হইতে আর একটি শাখাপথের সাহায্যে মিশরের এল কান্তারার সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে।

রুশিয়া—রুশিয়ার মোট পরিবাহিত পণ্যের ৮০% রেলপথে পরিবাহিত হয়। এই দেশে বর্তমানে প্রায় ১১২,০০০ কি. মি. রেলপথ রহিয়াছে। মস্কো এই রেলপথসমূহের কেন্দ্রস্থল। মহাদেশীয় রেলপথসমূহের মধ্যে ট্রান্স-সাইবেরিয়ান এবং ট্রান্স-কাস্পিয়ান রেলপথ দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(১) **ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ** (৯,২৪০ কি. মি.)—ইহা উত্তর পশ্চিমে লেনিনগ্রাদ হইতে মস্কো, রিয়াজান, কুইবিশেভ (সামারা), উফা, চেলিয়াবিন্স্ক, ওমস্ক, নোভোসাইবিরিস্ক, ক্রাসনোইয়াস্ক, তাইসেৎ, ইর্খুটস্ক, চিতা এবং খার্বারোভস্ক হইয়া পুর্বে ভ্লাডিভস্টক পর্যন্ত বিস্তৃত। লেনিনগ্রাদ হইতে একটি রেলপথ ভোলোগদা, মলটোভ ও স্বার্দলোভস্ক হইয়া ওমস্ক পর্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে। রেলপথে স্বার্দলোভস্ক চেলিয়াবিন্স্কের সহিত সংযুক্ত। লেনিনগ্রাদ-স্বার্দলোভস্ক-চেলিয়াবিন্স্ক-ভ্লাডিভস্টক—এই হ্রস্বতর পথে লেনিনগ্রাদ হইতে ভ্লাডিভস্টকের দূরত্ব ৮৬৪০ কি.মি.। সোভিয়েট রাষ্ট্রের পক্ষে এই রেলপথের রাজনৈতিক গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। এই পথ সাইবেরিয়ার পুর্ব অঞ্চলের সহিত মস্কোকে সংযুক্ত করে। কুজবাস অঞ্চলের কয়লা, ইউরাল অঞ্চলের লৌহ ও অন্যান্য নানাবিধ খনিজ পদার্থ, সাই-বেরিয়ার 'তৈগা' বনাঞ্চলের বিপুল কাষ্ঠ সম্পদ ও পশুলোম এবং অন্যান্য

অঞ্চলের নানাবিধ কৃষিজ ও খনিজ সম্পদ এই রেলপথেই রুশিয়ার নানা স্থানে পরিবাহিত হয়। এই পথে দুইটি গাড়ী পাশাপাশি যাতায়াত করিতে পারে। এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে পৌছিতে প্রায় ৯½ দিন সময় লাগে। ইহাই পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলপথ।

(২) **ট্রান্স-কাস্পিয়ান বা তুর্কিস্থান রেলপথ**—এই পথ কাস্পিয়ান সাগরের তীরে ক্রাসনোভোডস্ক হইতে তুর্কিস্তানের কার্পাস উৎপাদক অঞ্চলের মধ্য দিয়া মার্ভ, সমরখন্দ, ফারগানা ও তাসখন্দ পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। তথা হইতে রেলপথটি উত্তর দিকে প্রসারিত হইয়া আরল হ্রদের পূর্ব প্রান্ত দিয়া চ্কালাভ (ওরেনবার্গ) ও কুইবিশেভ (সামারা) হইয়া মস্কো পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। এই পথে কার্পাস, গম, বীট, শিল্পজাত দ্রব্য প্রভৃতি পরিবাহিত হয়। মার্ভ হইতে এই পথের একটি শাখা আফগানিস্তানের প্রান্তসীমায় কুস্থ পর্যন্ত গিয়াছে। এই পথ ভবিষ্যতে ভারত ও রুশিয়া তথা ইউরোপের সহিত পশ্চিম পাকিস্তান হইয়া সংযোগ রক্ষা করিবার উপায় হইবে বলিয়া অনুমিত হয়।

সাইবেরিয়ার সহিত মধ্য এশিয়ার সংযোগকারী **তুর্ক-শিব** রেলপথটিও গুরুত্বপূর্ণ। এই রেলপথটি নোভোসাইবিরিস্ক হইতে দক্ষিণে সেমিপালাটিনস্ক ও আলমা আতা হইয়া টাসখেণ্ট পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পথে প্রধানতঃ সাইবেরিয়ার গম ও কাঠ এবং মধ্য এশিয়ার কার্পাস ও রেশম পরিবাহিত হয়।

এশিয়া—এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত জাপান, পাকিস্তান, চীন ও ভারতেই রেলপথের প্রসার সমধিক। তবে, এই মহাদেশে কোন মহাদেশীয় রেলপথের বিস্তার নাই। তিয়েনসিন হইতে পিপিং ও হ্যাংকাউ পর্যন্ত বিস্তৃত রেলপথই **চীনের** সর্বপ্রধান রেলপথ। তিয়েনসিন রেলপথে মুকদেনের সহিত সংযুক্ত। দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলপথ মুকদেনকে ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথের সহিত সংযুক্ত করে। তিয়েনসিন সাংহাই-এর সহিত রেলপথে সংযুক্ত। **মালয়ের** রেলপথসমূহ সংকীর্ণ মাপের এবং ইহারা শ্যামদেশের রেলপথসমূহের সহিত সংযুক্ত। **ইন্দোচীনের** রেলপথসমূহও চীনের রেলপথের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে।

ভারতের রেলপথসমূহ (Indian Railways)

স্থলপথে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রধান অবলম্বন রেলপথ। তবে ভারতীয় রেল-চলাচল-ব্যবস্থা ত্রুটি (defects)-বহুল, কারণ :—(১) ১৯৬০-৬১ সালে ভারতে মাত্র ৫৬,৯৬২ কি. মি. রেলপথ ছিল। রেলপথের প্রসারণে ভারত এশিয়া মহাদেশে প্রথম ও পৃথিবীতে চতুর্থ স্থান অধিকার করিলেও

ভারতের ন্যায় বহুদূরবিস্তৃত ও ঘনবসতিপূর্ণ দেশের পক্ষে ইহা অতি সামান্য। ১৯৬৪-৬৫ সালে ভারতে রেলপথের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৮,২৭৩ কি. মি.। প্রতি ১০০ বর্গ কি. মি.-এ যুক্তরাজ্যে ১১ কি. মি., কিন্তু ভারতে মাত্র ১.৫ কি. মি. রেলপথ রহিয়াছে। (২) আবার, ভারতে "চওড়া" (১.৭ মি.), "মিটার" (১ মি.) ও "সংকীর্ণ" (০.৭৬ ও ০.৬১ মি.) এই তিন মাপের রেলপথ থাকায় অনেক সময় এক মাপের গাড়ী হইতে অন্য মাপের গাড়ীতে পণ্য বোঝাই করিতে বহু সময় ও ব্যয় লাগিয়া যায়। (৩) এদেশের রেলপথসমূহ দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নির্মিত হয় নাই এবং দেশের বহু প্রয়োজনীয় স্থানেও ইহারা বিস্তৃত হয় নাই। (৪) গভীর অরণ্য এবং পার্বত্য ভূপ্রকৃতি হেতু আসাম, হিমালয়ের তরাই অঞ্চল, মধ্যভারত ও পশ্চিম ঘাট অঞ্চলে রেলপথ একেবারেই বিস্তার লাভ করে নাই।

ভারতের রেলপথসমূহ—১৯৫১-৫২ সালে ভারত সরকার ব্যবস্থাপনার সুবিধা, ব্যয়সংকোচ, আয়বৃদ্ধি ও দ্রুত পণ্য পরিবহনের সুবিধার জন্য রেলপথ-সমূহের পুনর্বিন্যাস করেন। নিম্নে ভারতের রেলাঞ্চলসমূহ বিবৃত হইল।

(১) **উত্তর রেলপথ** (Northern Railway) (১০,৩৭০.৪০ কি. মি.) —পাঞ্জাব, দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ, উত্তর ও পূর্ব রাজস্থান এবং বারাণসী পর্যন্ত উত্তর প্রদেশের সমগ্র উত্তরাংশের মধ্য দিয়া উত্তর রেলপথ প্রসারিত। সদর কার্যালয় দিল্লী। এই রেলপথে পরিবাহিত পণ্যের মধ্যে কার্পাস, চিনি, গম, জোয়ার, বাজরা, পশম, তৈলবীজ, লবণ, পশুচর্ম প্রভৃতি প্রধান। পাঞ্জাব (অমৃতসর, লুধিয়ানা), দিল্লী ও উত্তর প্রদেশের (কানপুর) কার্পাস ও পশম বয়ন শিল্পাঞ্চল, উত্তর প্রদেশের কাচ, চর্ম ও শর্করা শিল্পাঞ্চলসমূহ এই রেলপথেই পরস্পর সংযুক্ত।

(২) **উত্তর-পূর্ব রেলপথ** (North-Eastern Railway) (৪৯৫৯.৮২ কি.মি.)—সদর কার্যালয় গোরক্ষপুর। এই রেলপথ উত্তর-প্রদেশের উত্তর ভাগ এবং উত্তর বিহারের মধ্য দিয়া প্রসারিত। এই রেলপথে প্রচুর ইক্ষু, তামাক, চা, পাট, খনিজ তৈল, বেত, কমলা, আনারস, চুন, সিমেন্ট, কয়লা, কাষ্ঠ ও ধান পরিবাহিত হয়। এই রেলপথ এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ ও বারাণসীতে উত্তর রেলপথের সহিত মিলিত হইয়াছে। উত্তর বিহার ও উত্তরপ্রদেশের উত্তর-পূর্বাংশের শর্করা ও পাট শিল্পাঞ্চলসমূহ এই পথে পরস্পর সংযুক্ত।

(৩) **উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ** (**North-East Frontier Railway**) (৩,২০৬.৯৩ কি. মি.)—সদর কার্যালয় পাণ্ডু। এই রেলপথ পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ এবং আসামের মধ্য দিয়া প্রসারিত। এই পথে চা,

পাট, খনিজ তৈল, কমলা, আনারস, ইক্ষু, তামাক, ধান, বেত, চুন, সিমেণ্ট, কয়লা ও কাষ্ঠ পরিবাহিত হয়। এই রেলপথ কাটিহারে উত্তর-পূর্ব রেলপথের সহিত এবং সাহেবগঞ্জে পূর্ব রেলপথের সহিত মিলিত হইয়াছে। উত্তরবঙ্গ ও আসামের চা শিল্প এবং আসামের খনিজ তৈল শিল্পের ক্ষেত্রে এই রেল-পথের দান অতুলনীয়।

[পূর্ব-রেলপথে কলিকাতা হইতে বর্ধমান ও সাহেবগঞ্জ হইয়া সকরিগলি-ঘাট/ফারাক্কা পর্যন্ত পৌঁছান যায়। তথা হইতে গঙ্গা অতিক্রম করিয়া উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথের মণিহারীঘাট-সাইখোয়াঘাট শাখাপথে আসাম পৌঁছান চলে। ইহাই **আসাম লিঙ্ক (Assam Link) পথ**। এই পথের বাণিজ্যিক গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক, কারণ এই পথেই আসাম ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলসমূহ হইতে চা, কাষ্ঠ, তৈল, সিমেণ্ট ও পাট কলিকাতা বন্দরে আসে এবং কলিকাতা হইতে আসাম ও তৎসন্নিহিত স্থানসমূহে পণ্যদ্রব্য প্রেরিত হয়।]

(৪) **পূর্ব রেলপথ (Eastern Railway)** (৪,০৩৭·৮৬ কি. মি.)—সদর কার্যালয় কলিকাতা। এই পথের শাখাপ্রশাখাসমূহ গঙ্গার দক্ষিণে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের কিয়দংশ ও উত্তরপ্রদেশের কিয়দংশের মধ্য দিয়া প্রসারিত। পরিবাহিত পণ্যের মধ্যে কয়লা, লৌহ আকরিক, চাউল, পাট, সার, ইক্ষু, চা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ছোটনাগপুরের খনি ও তৎসংক্রান্ত শিল্পাঞ্চল, কলিকাতা শিল্পাঞ্চল ব্যতীত রাণীগঞ্জ, আসানসোল, কুলটি, ধানবাদ, চিত্তরঞ্জন, ডালমিয়ানগর প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলসমূহ এই পথে পরস্পর সংযুক্ত। এই পথ মোগলসরাইতে উত্তর রেলপথের সহিত মিলিত হইয়াছে।

(৫) **দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ (South-Eastern Railway)** (৬,২৫৪·৫৯ কি. মি.)—এই রেলাঞ্চলটি পঃ বঙ্গ, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ এবং বিহার ও অন্ধ্র রাজ্যের কিয়দংশের মধ্য দিয়া প্রসারিত। সদর দপ্তর কলিকাতা। নাগপুর হইতে জব্বলপুর হইয়া কাটনি এবং খনি অঞ্চলসমূহের মধ্য দিয়া প্রসারিত রেলপথসমূহ ইহার অন্তর্গত। এই রেলপথ আসানসোলে পূঃ রেলপথের সহিত, কাটনি ও জব্বলপুরে মধ্য রেলপথের সহিত এবং ওয়ালটেয়ারে দঃ রেলপথের সহিত সংযুক্ত। কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, চুনাপাথর, চাউল, কাষ্ঠ, লাক্ষা প্রভৃতি এই পথে পরিবাহিত হয়। টাটানগর, রাউরকেলা ও ভিলাইএর ইস্পাত কেন্দ্র ও বহুবিধ খনিজ শিল্পাঞ্চলের মধ্য দিয়া এই পথ প্রসারিত।

(৬) **পশ্চিম রেলপথ (Western Railway)** (১০,০৬৮·২৩ কি. মি.)—সদর দপ্তরখানা বোম্বাই। এই পথের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা গুজরাট ও উত্তর মহারাষ্ট্র, রাজস্থানের দক্ষিণাংশ ও মধ্যপ্রদেশের মধ্য দিয়া প্রসারিত। বোম্বাই, আমেদাবাদ ও বরোদার কার্পাস এবং কাঠিয়াবাড়ের লবণ ও

রাসায়নিক শিল্পাঞ্চলসমূহের মধ্য দিয়া প্রসারিত হওয়ায় এই রেলপথ প্রচুর কার্পাস ও কার্পাসজাত দ্রব্য এবং খই, চীনাবাদাম, চিনি, লবণ, খনিজ ও রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি পরিবহন করে। ২৭২ কি. মি. দীর্ঘ নব-নির্মিত
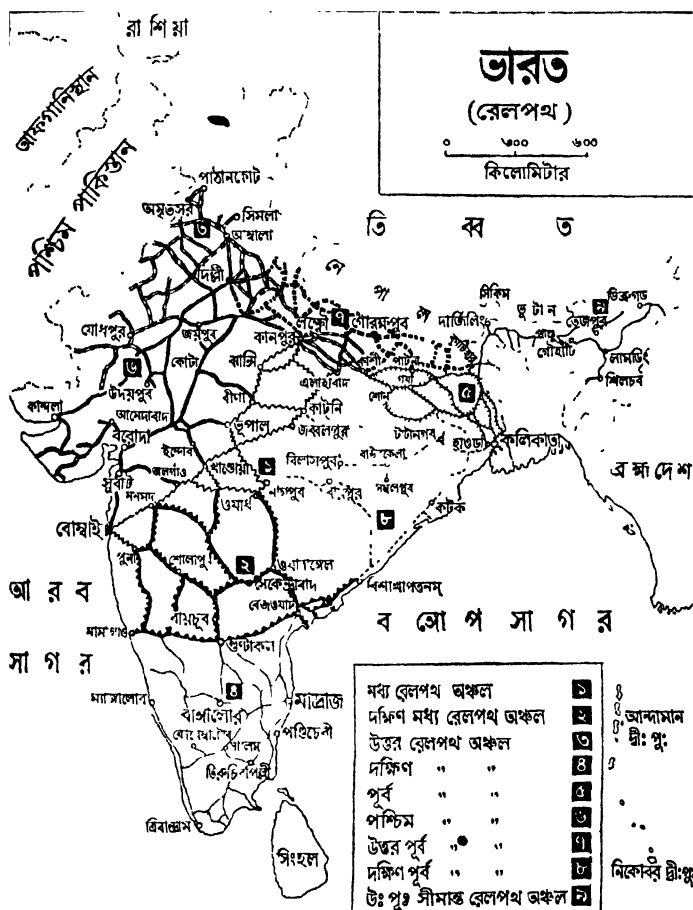
৪৫ নং চিত্র—ভারতের রেলপথ অঞ্চলসমূহ

দিশা-গান্ধীধাম শাখাপথটি ১৯৫৪-৫৫ সালে নির্মিত গান্ধীধাম-কাণ্ডলা (১০ কি. মি.) শাখাপথটির সাহায্যে কাণ্ডলা বন্দরকে ইহার পশ্চাদ্ভূমির সহিত সংযুক্ত করিতেছে। বেয়ানা হইতে আগ্রা হইয়া কানপুর এবং সুরাট

হইতে ভুষওয়াল হইয়া নাগপুর পর্যন্ত বিস্তৃত রেলপথসমূহও এই রেলাঞ্চলের অন্তর্গত।

(৭) **মধ্য রেলপথ (Central Railway)** (৮,৮৭২·২১ কি. মি.)—সদর দপ্তরখানা বোম্বাই। এই রেলপথের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র, মহীশূরের উত্তরাংশ, মহারাষ্ট্রের মধ্যাংশ এবং তামিলনাড়ুর পশ্চিমাংশের মধ্য দিয়া প্রসারিত। কার্পাস, ম্যাঙ্গানীজ, কাষ্ঠ, গম, চিনি, তৈলবীজ, জোয়ার, বাজরা, চর্ম প্রভৃতি পণ্য এই পথে পরিবাহিত হয়। রায়চুর ব্যাঙ্গালোরের সহিত ও বেজওয়াড়া মাদ্রাজের সহিত শাখা-পথের দ্বারা সংযুক্ত। বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশের কার্পাস, সিমেণ্ট ও খনিজ শিল্পাঞ্চলের মধ্য দিয়া এই রেলপথ প্রসারিত।

(৮) **দক্ষিণ রেলপথ (Southern Railway)** (১০,১৫২·৫২ কি. মি.)—সদর কার্যালয় মাদ্রাজ। এই রেলপথের শাখাপ্রশাখাসমূহ দঃ মহারাষ্ট্রের কিয়দংশ, অন্ধ্রের বৃহত্তম অংশ, তামিলনাড়ু, মহীশূর ও কেরালার জনসমৃদ্ধ ও উর্বর ভূমিভাগের মধ্য দিয়া প্রসারিত। এই পথে খাদ্যশস্য, কার্পাস, তৈলবীজ, লবণ, চিনি, তামাক, কাষ্ঠ, ইক্ষু, চা, কফি, মশলা, বস্ত্র, লৌহ ও ইস্পাত মোটরগাড়ী, স্বর্ণ, অভ্র, ম্যাঙ্গানীজ, লৌহ ও চর্ম প্রচুর পরিমাণে পরিবাহিত হয়। এই রেলপথের শাখাসমূহ মাদ্রাজ, কোচিন, তুতিকোরিন, আলেপ্পি, কুইলন ও কালিকট বন্দরের সহিত সংযুক্ত। মাদ্রাজ, কোয়েম্বাটোর ও মাদুরার কার্পাস শিল্প কেন্দ্রসমূহ, ব্যাঙ্গালোরের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও বিমানপোত কেন্দ্র এবং ভদ্রাবতীর ইস্পাত কারখানা এই রেলপথেই পরস্পর সংযুক্ত।

(৯) **দক্ষিণ মধ্য রেলপথ (South Central Railway)**—সদর কার্যালয় সেকেন্দ্রাবাদ। মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, মহীশূর ও তামিলনাড়ুর অংশ বিশেষের মধ্য দিয়া এই রেলপথ প্রসারিত। এই পথে খাদ্যশস্য, কার্পাস, তৈলবীজ, খনি ও শিল্পজাত দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পরিবাহিত হয়।

প্রশ্নোত্তর

1. Examine the importance of transport system for the economic development of a country (দেশগত অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে পরিবহন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা কর।) (পৃঃ ১৯১-১৯২)

2. Describe the relative advantages and disadvantages of rail and motor transport system. (রেলপথ ও মোটরপথে পরিবহন ব্যবস্থার আপেক্ষিক সুবিধা ও অসুবিধা সম্পর্কে আলোচনা কর।) (পৃঃ ১৯৬)

3. What are trans-continental railways of the world ? (P. U. '64, '66 ; U. E. '64) (মহাদেশীয় রেলপথ কাহাকে বলে ? পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য মহাদেশীয় রেলপথসমূহের বর্ণনা কর।) (পৃঃ ১৯৭-২০৩)

4. Describe the railway zones of India. (ভারতীয় রেল অঞ্চলগুলির বর্ণনা কর।) (পৃঃ ২০৪-২০৭)

5. Describe and locate the various land frontier routes of India. (ভারতের সীমান্ত পথসমূহের বর্ণনা কর এবং মানচিত্রে অঙ্কন করিয়া ঐ পথগুলি দেখাও)। (পৃঃ ১৯৪-১৯৬)

দশম অধ্যায়

পরিবহন ব্যবস্থা—জলপথ

জলপথ বলিতে **আন্তর্দেশিক** (Inland) ও সামুদ্রিক (Oceanic) এই উভয়বিধ জলপথকেই বুঝাইয়া থাকে। আন্তর্দেশিক জলপথ বলিতে নাব্য নদনদী ও আভ্যন্তরীণ খালপথ এবং সামুদ্রিক জলপথ বলিতে প্রধান প্রধান সমুদ্রপথ ও সামুদ্রিক খালপথসমূহকেই বুঝায়। আন্তর্দেশিক জলপথসমূহের গুরুত্ব প্রধানতঃ আন্তর্বাণিজ্যে কিন্তু সামুদ্রিক জলপথের মৌলিক গুরুত্ব বহির্বাণিজ্যে।

আন্তদেশিক জলপথ বনাম **স্থলপথ** (Inland water transport system *versus* land transport system)—স্থলপথের তুলনায় আন্তর্দেশিক **জলপথের** প্রধান **অসুবিধা** এই যে—(১) জলপথে পণ্য-পরিবহন অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ। (২) স্থলপথের ন্যায় জলপথের পোতসমূহ যদৃচ্ছ চলাচল করিতে পারে না, কারণ, অনেক সময়ই নদীর গতি এবং পণ্য-পরিবহনের দিক এক নহে। অপর পক্ষে স্থলপথ অপেক্ষা আন্তর্দেশিক **জলপথের** প্রধান **সুবিধা** এই যে—(১) জলপথে পণ্য-পরিবহন-ব্যয় স্থলপথ অপেক্ষা অনেক কম, কারণ (ক) জলপথের নির্মাণ-ব্যয় নাই, (খ) জলপথে পোতচালনার জন্য অল্প ইন্ধনশক্তি ও শ্রমিকের প্রয়োজন, (গ) জলপথের পোতনির্মাণ-ব্যয় অপেক্ষাকৃত অল্প, এবং (ঘ) জলপথে বিপদাশঙ্কা অল্প হওয়ায় পণ্য-বীমার হারও সামান্য। (২) জলপথে দূর-দূরান্তরের সহিত সংযোগ স্থাপনে কোন বাধা নাই, কিন্তু স্থলপথে পণ্য-পরিবহন-ব্যবস্থা বহুবিধ বিধি-নিষেধ দ্বারা শৃঙ্খলিত। এই সমস্ত কারণে গুরুভার, বৃহদায়তন, অথচ দ্রুত পচনশীল নহে এইরূপ পণ্যই জলপথে পরিবাহিত হইয়া থাকে। আবার অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর দেশসমূহে আন্তর্দেশিক জলপথগুলিই পরিবহন ব্যবস্থার একমাত্র নির্ভরযোগ্য অবলম্বন। ব্রাজিলের আমাজন নদী ইহার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

নাব্য জলপথের গুণাগুণ—পণ্য পরিবহনে ব্যবহৃত আন্তর্দেশিক নদনদীসমূহ নিম্নরূপ হওয়া প্রয়োজন। (১) আন্তর্দেশিক নদনদীসমূহ **গভীর** ও **বিস্তৃত** হওয়া প্রয়োজন। কঙ্গো, আমাজন ও জাম্বেজী নদী স্থানে স্থানে অত্যন্ত সংকীর্ণ বলিয়া বাণিজ্যপোত চলাচলে বিঘ্ন উৎপাদন করে। (২) আন্তর্দেশিক নদনদী **অস্বাভাবিক স্রোত** ও **জলপ্রপাত মুক্ত** হওয়া প্রয়োজন। রুশিয়ার ভল্গা নদী সমভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত বলিয়া ইহা

সুনাব্য, কিন্তু ভারতের ব্রহ্মপুত্র, আফ্রিকার জাম্বেজী ও নীল নদের উচ্চ অংশ অত্যন্ত স্রোত ও জলপ্রপাতযুক্ত হওয়ায় বাণিজ্যপোত চলাচলে বিঘ্ন উৎপাদন করে। (৩) আন্তর্দেশিক নদনদীসমূহের **জলপ্রবাহ** সারা বৎসরই **সমান** থাকা প্রয়োজন। দক্ষিণ ভারতের নদীসমূহ গ্রীষ্মকালে প্রায় শুষ্ক হইয়া যায় বলিয়া এবং উত্তর সাইবেরিয়ার নদীসমূহ বৎসরে ছয়মাসকাল বরফাবৃত থাকায় এই নদীসমূহ সমস্ত বৎসর ধরিয়া পণ্য পরিবহনের অনুপযুক্ত থাকে। (৪) আন্তর্দেশিক নদনদীসমূহের নাব্য অংশ **দীর্ঘ** হওয়া প্রয়োজন। ইয়াংসী নদী মোহানা হইতে চীনের অভ্যন্তরে প্রায় ২,৫৬০ কি. মি. পযন্ত নাব্য বলিয়া পণ্য পরিবহনের বিশেষ উপযোগী, অন্যপক্ষে আফ্রিকার অরেঞ্জ নদীর নাব্য অংশ অতি সামান্য বলিয়া ইহা পণ্য পরিবহনের অনুপযুক্ত। (৫) আন্তর্দেশিক নদনদীসমূহের নাব্য অংশ **সরল** হইলে ইহা পণ্য পরিবহনে বিশেষ সহায়ক হয়। আমেরিকার হাডসন এবং সেণ্ট লরেন্স নদী এই কারণে পণ্য পরিবহনের বিশেষ উপযোগী। (৬) আন্তর্দেশিক নদনদীসমূহ জনবহুল ও সমৃদ্ধ দেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইলে ইহাদের উপযোগিতা বিশেষ বৃদ্ধি পায়। মধ্য ইউরোপের জনবহুল ও সমৃদ্ধ অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত বলিয়া রাইন ও দানিয়ুব নদীর গুরুত্ব অধিক। (৭) আন্তর্দেশিক নদনদীসমূহ **মুক্ত সমুদ্রে পতিত** এবং ঐ সমুদ্র বরফমুক্ত হইলে পণ্য পরিবহনে ইহাদের গুরুত্ব বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এ কারণে রাইনের গুরুত্ব সুদীর্ঘ দানিয়ুব বা ভল্‌গা হইতে অধিক। (৮) আন্তর্দেশিক নদনদীসমূহ **বাণিজ্য পথের অনুগামী** হওয়া প্রয়োজন। সাইবেরিয়ার ওব নদী বাণিজ্যপথের অনুগামী নহে বলিয়া ইহার গুরুত্ব হ্রাস পাইয়াছে।

পণ্য পরিবহনে ব্যবহৃত আন্তর্দেশিক **খালপথসমূহ** নিম্নরূপ হইলে উহাদের গুরুত্ব সমধিক বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।—(১) নাব্য খালপথ যে অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রসারিত হইবে তাহা বাণিজ্যিক পণ্যে সমৃদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। (২) নাব্য খালপথসমূহ সমতল ভূমিভাগের উপর দিয়া প্রসারিত হইলে উহাদের উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়। কারণ, বন্ধুর পার্বত্য ভূমিভাগের উপর দিয়া খালপথ প্রসারিত হইলে 'লকগেট' (lock gate) বা জলের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণকারী ফটকের সাহায্যে জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা করিতে হয়, ইহা ব্যয় ও সময় সাপেক্ষ হইয়া পড়ে। (৩) নাব্য খালপথসমূহ দুইটি নাব্য নদীপথের সহিত (যেরূপ রাইন-মার্স খালপথ) অথবা সাগরের সহিত (যেরূপ বাল্টিক-কৃষ্ণসাগর খালপথ) সংযোগ সাধন করিলে উহাদের গুরুত্ব সমধিক বৃদ্ধি পায়। (৪) উপকূলীয় সমুদ্র ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ হইলে দেশাভ্যন্তরে উপকূলের সমান্তরালে প্রসারিত নাব্য খালসমূহ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠে, যেরূপ চীনের গ্র্যাণ্ড ক্যানাল।

আন্তর্দেশিক জলপথসমূহ

উত্তর আমেরিকার নদীগুলির মধ্যে উপসাগর ও মহাসাগরে পতিত পূর্ব উপকূলের নদীসমূহই সুনাব্য ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উপযোগী। সুপিরিয়র, ইরি, অণ্টেরিও, হুরণ ও মিচিগান হ্রদসমূহও নাব্য। উঃ আমেরিকার আভ্যন্তরীণ জলভাগ পরিবহন, জলসেচ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হয়।

ক্যানাডার উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের নদীগুলির কোন কোনটি শীতকালে
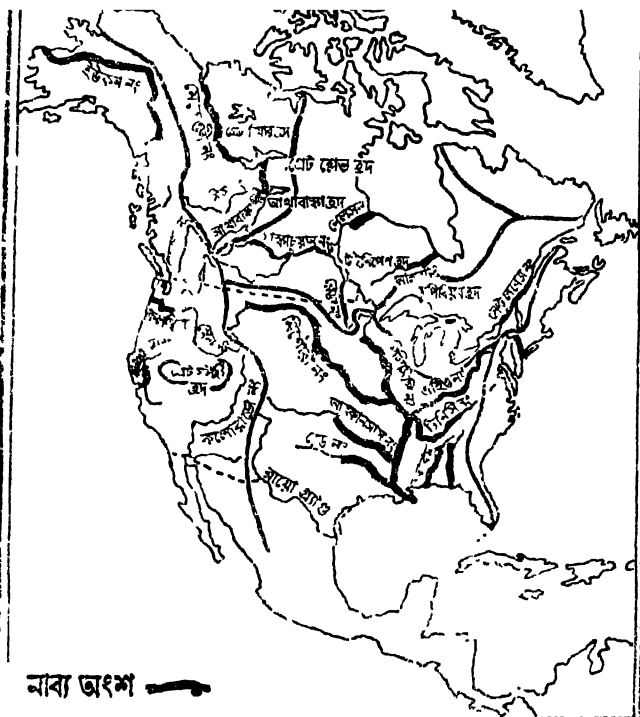
৪৬ নং চিত্র—উত্তর আমেরিকার নাব্য জলপথসমূহ

বরফাবৃত থাকায় এবং কোন কোনটি খরস্রোতা হওয়ায় সুনাব্য নহে। তবে সুপিরিয়র, মিচিগান, হুরন, অণ্টেরিও ও ইরি হ্রদ এবং সেণ্ট লরেন্স নদী সংযোগে গঠিত জলপথটি এই দেশের বাণিজ্য বিস্তারের বিশেষ সহায়ক। **যুক্তরাষ্ট্রের** আন্তর্দেশিক জলপথসমূহও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রধান নদী মিসিসিপি ও ইহার বিভিন্ন উপনদীসমূহ যেরূপ মিশৌরী, আরকানসাস, রেড, ওহিও প্রভৃতি

দেশাভ্যন্তরে সুবিস্তৃত নাব্য জলপথের সৃষ্টি করিয়াছে। রেলপথ স্থাপিত হইবার পূর্বে মিসিসিপি ও ইহার উপনদীসমূহই যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বাণিজ্যপথ ছিল। বর্তমানে ইহার গুরুত্ব হ্রাস পাইলেও কৃষি ও শিল্পাঞ্চলসমূহের পণ্য এবং পেনসিলভ্যানিয়ার কয়লা এই নদীপথেই চলাচল করে। ওহিও ও ইহার উপনদী মনঙ্গাহালা এবং আলবানিও সুনাব্য। যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব-উপকূলের হাডসন, ডেলাওয়ারা ও পটোম্যাক নদী নৌচালনার বিশেষ উপযোগী বলিয়া
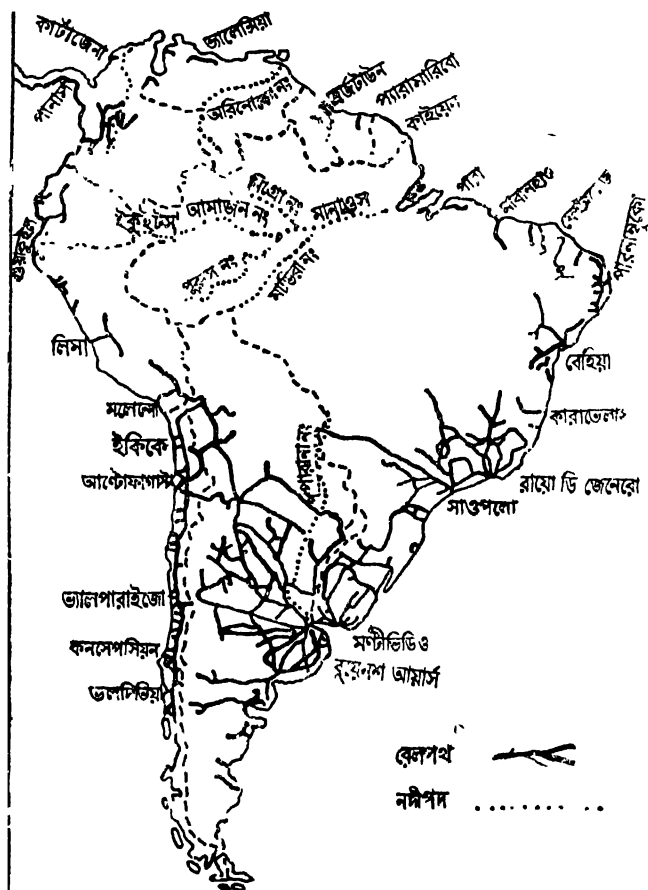
৪৭নং চিত্র—দক্ষিণ আমেরিকার নাব্য জলপথ ও রেলপথ সমূহ

ইহাদের মোহানায় পোতাশ্রয় এবং তীরে প্রয়োজনীয় বন্দর নির্মিত হইয়াছে। সেণ্ট লরেন্স নদী ও বৃহৎ হ্রদ পাঁচটির সমন্বয়ে গঠিত জলপথটিও এই দেশের বাণিজ্য বিস্তারের সহায়ক।

দক্ষিণ আমেরিকার নাব্য নদীগুলির মধ্যে আমাজন, প্লাটা ও অরিনোকো প্রধান। আমাজন সুনাব্য নদীপথ হইলেও ঘন বনাকীর্ণ, জনবিরল এবং অনুন্নত প্রদেশের উপর দিয়া প্রবাহিত হওয়ায় পরিবাহিত পণ্যের পরিমাণ সামান্য। পারানা, পারাগুয়ে; উরুগুয়ে ও প্লাটা নদীর মিলিত জলস্রোতটি কৃষিজ ও প্রাণিজ সম্পদে সমৃদ্ধ ও জনবহুল আর্জেন্টিনা, প্যারাগুয়ে, উরুগুয়ে ও দক্ষিণ ব্রাজিলের সর্বপ্রধান জলপথ। এই জলপথটি মোহানা হইতে প্রায় ১,৬০০ কি মি সুনাব্য। **অরিনোকো** নদীও মোহানা হইতে প্রায় ১,৬০০ কি.মি. সুনাব্য। এই মহাদেশের প্রধান প্রধান নাব্য নদীসমূহ পূর্ব-প্রবাহিণী। পশ্চিম-প্রবাহিণী নদীসমূহ নাব্য জলপথ হিসাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নহে।

অস্ট্রেলিয়ায় বৃহৎ নদনদীর সংখ্যা অতি সামান্য। অধিকাংশ নদী বর্ষাকালে পুষ্ট হয় এবং অন্য সময়ে শুষ্ক হইয়া যায়। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার **মারে-ডার্লিং** নদীই এই মহাদেশের একমাত্র নাব্য নদীপথ। এই নদীটি কখনও শুষ্ক হয় না। এই নদী হইতে খাল কাটিয়া ভূমিতে জলসেচন ব্যবস্থারও প্রবর্তন করা হইয়াছে।

আয়তনের তুলনায় **আফ্রিকায়** আভ্যন্তরীণ জলভাগের পরিমাণ অধিক নহে। দেশটির অধিকাংশই মালভূমি বলিয়া নদীসমূহ প্রাথমিক ও মধ্যগতিতে নাব্য, কিন্তু শেষগতিতে খরস্রোতা বলিয়া ইহারা নৌচালন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ উপযোগী নহে। নীল, কঙ্গো, নাইজার ও জাম্বেজী আফ্রিকার প্রধান প্রধান নাব্য জলপথ। টাঙ্গানিয়াকা ও নিয়াসা হ্রদসমূহও সুনাব্য।

সুনাব্য নদনদীর সংখ্যার দিক হইতে **ইউরোপ** মহাদেশ পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করে। নদীগুলি দীর্ঘ না হইলেও প্রায় সর্বত্রই নাব্য ও খালপথে পরস্পর সংযুক্ত। শিল্পসমৃদ্ধ ও ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হওয়ায় ইহারা বাণিজ্যের বিশেষ সহায়ক। সমুদ্র হইতে নদীপথে দেশের অভ্যন্তরে বহুদূর পর্যন্ত যাতায়াতের সুবিধা রহিয়াছে। পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান প্রধান বন্দর ইউরোপীয় নদীগুলির মোহানায় অবস্থিত।
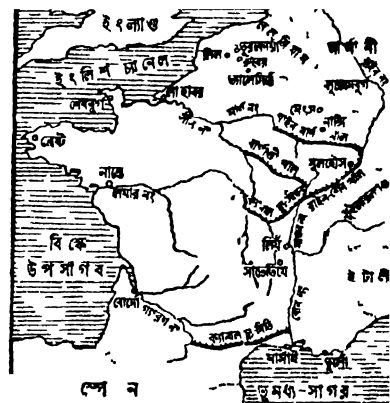
৪৮নং চিত্র—ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ জলপথ

ব্রিটেনে বহুসংখ্যক নদনদী এবং প্রায় ৩৮৪০ কি. মি. নাব্য খালপথ

রহিয়াছে। খালগুলির মধ্যে ইংল্যাণ্ডের ম্যাঞ্চেস্টার খাল এবং স্কটল্যাণ্ডের ক্যালিডোনিয়া খাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ফ্রান্সের জলপথসমূহ আন্তর্দেশীয় পণ্য পরিবহনের বিশেষ উপযোগী। রোন, সীন, লয়ার ও গ্যারন এই কয়টিই ফ্রান্সের প্রধান নদীপথ। এই সকল নদী ও ইহাদের বহুসংখ্যক উপনদী সুনাব্য খাল দ্বারা এরূপভাবে সংযুক্ত যে উত্তরে সীন নদীর মোহানায় হাব্‌র বন্দর ও উত্তর-পশ্চিমের ব্রেস্ত বন্দর হইতে অভ্যন্তর ভাগের প্রায় সমস্ত শিল্পবাণিজ্যপ্রধান অঞ্চলের মধ্য দিয়াই দক্ষিণে মার্শাই বন্দর পর্যন্ত জলপথে যাতায়াত করা চলে। আবার ফ্রান্সের জলপথসমূহ বেলজিয়াম ও জার্মানীর জলপথসমূহের সহিত সংযুক্ত থাকায় ইহাদের গুরুত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

জার্মানীর আন্তর্দেশিক জলপথসমূহ বিশেষ উন্নত ধরণের। দেশের মধ্য দিয়া যে সমস্ত নদী প্রবাহিত রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে রাইন, ওয়েজার, এলব, ওডার, ভিশ্চুলা ও দানিয়ুব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই নদীগুলির সমস্তই সুনাব্য। ইহাদের মধ্যে দানিয়ুব ব্যতীত অন্য সমস্ত নদীই দক্ষিণ-পূর্ব দিক হইতে উৎপত্তিলাভ করিয়া উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। কিন্তু জার্মানীর পণ্য চলাচলের দিক হইল প্রধানতঃ পূর্ব-পশ্চিমমুখী। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য নদীগুলিকে খালের সাহায্যে সংযুক্ত করিয়া পূর্ব-পশ্চিমমুখী জলপথসমূহের সৃষ্টি করা হইয়াছে।

রুশিয়ায় বর্তমানে ৩,৯৭,৪৪০ কি. মি. নাব্য **জলপথ** রহিয়াছে, তবে ইহার মাত্র $\frac{1}{8}$ অংশ পণ্য পরিবহনে ব্যবহৃত হইতেছে। **ইউরোপীয় রুশিয়ার** নাব্য নদীপথসমূহের মধ্যে ভল্গা, ডোনেৎস্, নীপার, নীস্টার, দানিয়ুব, ও ডুইনাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইউরোপীয় রুশিয়ার পূর্বভাগের আর্থিক উন্নতির মূলে রহিয়াছে এই অঞ্চলের নদীসমূহ। তবে নাব্য জলপথ হিসাবে রুশিয়ার নদীসমূহের কয়েকটি ত্রুটিও রহিয়াছে। যেরূপ—(১) শীতকালে নদীসমূহ বরফাবৃত থাকে এবং বরফ গলিলে নদীসমূহে প্লাবন হয়, আবার গ্রীষ্মকালে জলপ্রবাহ হ্রাস পায়। (২) নদীপথে বহু খরস্রোত ও বালিয়াড়ি রহিয়াছে। (৩) নদীসমূহের গতিপথ বহুক্ষেত্রেই সরল নহে। (৪) শ্রেষ্ঠ নদী ভল্গা কাস্পিয়ান সাগরে পতিত হওয়ায় ইহার উপযোগিতা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। (৫) উত্তরের নদীসমূহ বিরলবসতিপূর্ণ এবং অনুন্নত অংশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। এই সমস্ত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও রুশিয়ার জলপথসমূহ পণ্য পরিবহনে ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। সম্প্রতি এই নদীসমূহের মধ্যে পরস্পর-সংযোগকারী খাল কাটিয়া এবং নদীসমূহের গভীরতা সম্পাদন করিয়া ইহাদের উন্নতি বিধান করা হইয়াছে। উত্তরাঞ্চল হইতে কাষ্ঠ, দক্ষিণাঞ্চল হইতে খাদ্যশস্য, ডন অববাহিকা অঞ্চল হইতে কয়লা, ককেশাস অঞ্চল হইতে

কার্পাস ও তৈল, ইউরাল অঞ্চল হইতে খনিজ দ্রব্যসমূহ জলপথে মস্কো-লেনিনগ্রাদ শিল্পাঞ্চলে আনীত হয়। **এশীয় রুশিয়ার** নাব্য জলপথসমূহের মধ্যে ইরতিশ, ইনিসি, সেলেঙ্গা ও আঙ্গারা, লেনা ও আমুর বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। সাইবেরিয়ার নদীসমূহ (১) বিরলবসতিপূর্ণ এবং অনুন্নত অংশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত, (২) বৎসরের অধিকাংশ সময়েই বরফাবৃত এবং (৩) পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত না হওয়ায় পণ্য পরিবহনের বিশেষ উপযোগী নহে। মধ্য এশিয়ার তারিম, ইউরাল, সির ও আমু নদীই উল্লেখযোগ্য। তবে নদী-সমূহ স্বল্পজলবিশিষ্ট ও বালিয়াড়ি-সংকুল হওয়ায় সুনাব্য নহে কিন্তু সেচকার্যের সহায়ক। সির ও আমু কতকাংশে নাব্য। মধ্য এশিয়ার সমস্ত নদীই অন্তর্বাহিনী।

এশিয়া মহাদেশের নদীসমূহের মধ্যে আমুর, হোয়াংহো, ইয়াংসিকিয়াং, সিকিয়াং, মেকং, মেনাম, সালুয়েন, ইরাবতী, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সালুয়েন ব্যতীত অন্য সমস্ত নদীই সমভূমি অংশে নাব্য। পরিবহন কার্যে নদী ও খাল পথের ব্যবহার চীন ও ভারতেই অধিক। সেচ কার্য ও পণ্য পরিবহনে **চীনের নদী**সমূহ সর্বাধিক উল্লেখ-যোগ্য। হোয়াংহো, ইয়াংসিকিয়াং ও সিকিয়াং এই তিনটিই চীনের প্রধান নদী। **ইয়াংসি** (৫৭৬০ কি. মি.) নদী সমুদ্র হইতে প্রায় ২৫৬০ কি. মি. পর্যন্ত সুনাব্য। কৃষিজ ও বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ চীনের অভ্যন্তরভাগের ইহাই একমাত্র বাণিজ্য-পথ। **সিকিয়াং** নদী মোহানা হইতে প্রায় ১৬০০ কি. মি. নাব্য। **হোয়াংহো** বা **পীতনদী** (৪৩২০ কি. মি.) সুনাব্য নহে। ইহার নিম্ন অংশ উত্তর চীনের প্রধান নদীপথ। ইহার প্রবল বন্যায় দেশ প্লাবিত হওয়ায় এবং কয়েকবার ইহার গতিপথ পরিবর্তনের ফলে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন-নাশ ও আবাসস্থল ধ্বংস হইয়াছে বলিয়া ইহাকে "চীনের দুঃখ" বলা হয়। নদীসংযোগকারী **নাব্য খালের** সংখ্যার দিক হইতে চীনদেশ পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এই দেশে ৪০,০০০ কি. মি. নাব্য খাল রহিয়াছে। বাণিজ্য-পোত চলাচল, জলসেচ ও জলনিষ্কাশন প্রভৃতি কার্য এই খালগুলির সাহায্যে পরিচালিত হয়। ৭৫৬ কি. মি. দীর্ঘ 'গ্র্যাণ্ড খাল'ই চীনের দীর্ঘতম নাব্য খাল। ইহা ইয়াংসিকিয়াং ও হোয়াংহো-র বদ্বীপকে সংযুক্ত করিয়াছে।

ভারতের আন্তর্দেশিক জলপথসমূহ
(Inland Waterways of India)

ভারতে রেলপথের পরেই আন্তর্দেশিক জলপথের গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য। ভারতে ১২,৮৩০ কি. মি. সুনাব্য নদীপথ এবং ১৯,২০০ কি. মি. সুনাব্য খালপথ রহিয়াছে। নদীপথসমূহ উত্তর ভারতে এবং খালপথসমূহ পশ্চিমবঙ্গ

ও তামিলনাড়ুতেই প্রধানতঃ বিস্তৃত। তবে জলপথে পরিবাহিত পণ্যের পরিমাণ অতি সামান্য।

. পণ্য পরিবহন কার্যে আন্তর্দেশিক জলপথসমূহ ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে, বিশেষতঃ আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার রাজ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। দক্ষিণ ভারতের কেরালা রাজ্যেও আন্তর্দেশিক জলপথসমূহ পণ্য পরিবহন কার্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। উড়িষ্যার ব-দ্বীপাঞ্চলে আন্তর্দেশিক জলপথসমূহ পণ্য পরিবহনের একমাত্র উপায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এতদঞ্চলের কেন্দ্রপাড়া ও তালডাণ্ডা খাল ও উড়িষ্যার উপকূলাঞ্চলের খাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশের পণ্য পরিবহন কার্যেও আন্তর্দেশিক জলপথসমূহ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা **উত্তর ভারতের** প্রধান নাব্য **নদনদী**। উত্তর ভারতের নদীসমূহ সারাবৎসরই তুষার-গলা জল ও বৃষ্টির জলে পূর্ণ থাকে। ইহারা দীর্ঘ ও অল্প স্রোতযুক্ত হওয়ায় নৌ-চলাচলের বিশেষ উপযোগী। ইহাদের ঢালগুলি সুস্পষ্ট, তবে ইহারা মধ্যে মধ্যে গতিপথ পরিবর্তন করিয়া থাকে।

গঙ্গা (২৪০০ কি. মি.) নদী মোহানা হইতে বহুদূর পর্যন্ত নাব্য। ইহার উপনদীগুলির মধ্যে যমুনা ও ঘর্ঘরা বহুদূর পর্যন্ত এবং শোন, গোমতী ও গণ্ডক কিছুদূর পর্যন্ত নাব্য। নদীপথে পণ্য পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য ভাগীরথী, গণ্ডক, কুশী, শোন, ঘর্ঘরা ও যমুনা নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করা একান্ত কর্তব্য।

ব্রহ্মপুত্র (২৬০৮ কি. মি.) নদ মোহানা হইতে ডিব্রুগড় পর্যন্ত ১২৮০ কি. মি. সুনাব্য। ইহার উপনদীগুলির মধ্যে সুবর্ণশ্রী, মানস, তোর্সা, তিস্তা, করতোয়া, ডিবং, লোহিত, ডিহং ও ধনশ্রী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নূতন নূতন দ্বীপ ও বালিয়াড়ির সংগঠন এবং বর্ষাকালে প্রবল স্রোত ব্রহ্মপুত্র নদে নৌ-চলাচলে অসুবিধার সৃষ্টি করে।

দক্ষিণ ভারতের নদীসমূহের মধ্যে নর্মদা, তাপ্তী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী ও মহানদী প্রধান। দক্ষিণ-ভারতের নদীসমূহ বরফ-গলা জলে পুষ্ট নহে, সেইজন্য গ্রীষ্মকালে ইহারা প্রায়ই শীর্ণ বা শুষ্ক হইয়া যায়। আবার বর্ষাকালে ইহারা অত্যন্ত খরস্রোতা হয় বলিয়া নাব্য নহে। নদীগুলি দৈর্ঘ্যেও অপেক্ষাকৃত ছোট, ইহাদের গতিপথ নির্দিষ্ট কিন্তু ঢাল সুস্পষ্ট নহে। ইহারা জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

ভারতে নদীসংযোগকারী **খাল**সমূহও জলপথে পরিবহন-ব্যবস্থার বহু সুবিধা করিয়া দিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে ইস্টার্ণ ও সার্কুলার খাল (পূর্ববঙ্গেও বিস্তৃত), উত্তর প্রদেশে হরিদ্বার ও কানপুরের মধ্যে গঙ্গানদীর খাল, তামিলনাড়ুতে কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীর সংযোজক বাকিংহাম খাল, গোদাবরী,

কৃষ্ণা, কুর্ণুল-কুডাপ্পা খাল এবং উড়িষ্যার উপকূলবর্তী খাল এবিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উড়িষ্যা-উপকূলের এবং তামিলনাডু ও মহানদীর বদ্বীপাঞ্চলের খালসমূহের পরস্পর সংযোগ সাধনের দ্বারা কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ পর্যন্ত খাল-পথে নৌ-চলাচলের ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন।

ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত "সেণ্ট্রাল ইরিগেশন অ্যাণ্ড পাওয়ার কমিশন" নামক সংস্থাটি ভারতীয় নদীপথসমূহের সম্যক উন্নতি বিধান কল্পে নিযুক্ত রহিয়াছে।

আন্তর্দেশিক জলপথসমূহের নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কে "দি ইনল্যাণ্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট কমিটি" নামক একটি সমিতি ১৯৫৯ সালে একটি তথ্যপূর্ণ বিবরণী এবং আন্তর্দেশিক জলপথসমূহের সামগ্রিক উন্নতি কল্পে একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা পেশ করেন। এই সমিতি কর্তৃক নির্দিষ্ট সুপারিশগুলির পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় পরিকল্পনাকালীন কার্যসূচী গৃহীত হয়।

সমুদ্রপথ (Ocean Routes)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রধানতম অংশই সমুদ্রপথে পরিবাহিত হইয়া থাকে। সমুদ্রপথের কয়েকটি স্বাভাবিক সুবিধা রহিয়াছে : উপকূল সন্নিহিত সমুদ্রাঞ্চল ব্যতীত সমুদ্রপথে সকল জাতিরই সমান অধিকার আছে। আবার সমুদ্রপথের নির্মাণ ও সংরক্ষণ ব্যয় একেবারেই নাই বলিয়া সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহনের ব্যয় অতি সামান্য।

সমুদ্রপথে পরিবহন কার্যে ব্যবহৃত জাহাজগুলিকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। (১) 'ট্র্যাম্প' (Tramp) বা পণ্যবাহী জাহাজ—এইগুলি সুনির্দিষ্ট সময়-তালিকা বা পথ অনুসারে না চলিয়া যেখানে যে সময়ে প্রয়োজন পণ্য পরিবহন করে। (২) 'লাইনার' (Liner) বা যাত্রী ও পণ্যবাহী জাহাজ—এই জাহাজগুলি সুনির্দিষ্ট সময়-তালিকা ও পথ অনুসরণ করিয়া চলিয়া থাকে। সমুদ্রপথে পরিবাহিত যাত্রী ও পণ্যের ৮০%এরও অধিক বর্তমানে এই শ্রেণীর জাহাজের দ্বারাই পরিবাহিত হইয়া থাকে।

সমুদ্রপথ নির্বাচনে ভৌগোলিক প্রভাব (Geographical factors affecting the selection of ocean routes)—দুস্তর সমুদ্রের মধ্যে জাহাজ চলাচলের জন্য সুনির্দিষ্ট পথ আছে। সাধারণতঃ এক বন্দর হইতে অন্য বন্দরে যাইতে বাণিজ্যপোতসমূহ "বৃহৎ বৃত্তপথ" (great circle route) অনুসরণ করে ; কারণ পৃথিবী-পৃষ্ঠে যে-কোন দুইটি বিন্দুর বিভিন্ন সংযোগ-রেখার মধ্যে বৃহৎ বৃত্তাংশের দৈর্ঘ্যই সর্বাপেক্ষা অল্প। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই এই পথ অনুসরণের সুযোগ হয় না ; অল্প হইলেও এই পথে অবস্থিত অঞ্চল-সমূহে পণ্য ও কয়লা বা খনিজ তৈলের অভাব থাকিতে পারে ; কোথাও

কোথাও এরূপ পথ বৎসরের মধ্যে দীর্ঘকাল বরফে আচ্ছন্ন থাকে, স্থানে স্থানে আবার থাকে বাত্যা ও কুজ্ঝটিকার প্রাদুর্ভাব, প্রতিকূল সমুদ্রস্রোত এবং মরুভূমির অবস্থান। এই সমস্ত কারণে সামুদ্রিক বাণিজ্যপোতসমূহ বৃহৎ বৃত্তপথ হইতে বিচ্যুত হইয়া ঐ পথের নিকটবর্তী যে সমস্ত অঞ্চলে পণ্য ও কয়লার প্রাচুর্য রহিয়াছে এবং যে পথ বাত্যা, কুয়াশা, সমুদ্রস্রোত প্রভৃতি প্রতিকূল প্রাকৃতিক প্রভাব হইতে মুক্ত সেই পথেই পরিচালিত হয়।

পৃথিবীর প্রধান প্রধান সমুদ্রপথ (**Principal ocean routes**) ঃ পৃথিবীর প্রধান প্রধান সমুদ্রপথ হইল—

(ক) **উত্তর আটলান্টিক পথ** (**North Atlantic Route**)—পরিবাহিত পণ্য, যাত্রী ও ডাক চলাচলের পরিমাণ অনুযায়ী বিচার করিলে, এই পথটির গুরুত্ব হইয়া দাঁড়ায় সর্বাধিক। ইহা ইউরোপের পশ্চিম উপকূল এবং উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলের মধ্যে বিস্তৃত। এই পথে ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র হইতে বনজ ও প্রাণিজ দ্রব্য, গম, ভুট্টা, তামাক, খনিজতৈল, অ্যাস্‌বেস্টস্, লৌহ ও ইস্পাত, তাম্র, রৌপ্য, অ্যালুমিনিয়াম, কার্পাস, মৎস্য, ফল প্রভৃতি দ্রব্য ইউরোপ মহাদেশে **রপ্তানী** এবং ইউরোপ হইতে শিল্পজাত দ্রব্য আমেরিকায় **আমদানী** হয়। তবে সম্প্রতি ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমশিল্প প্রসার লাভ করায় ইউরোপ হইতে এদিকে শ্রমশিল্পজাত দ্রব্য বেশি চালান আসে না। এই পথে বাণিজ্যে নিযুক্ত **বন্দর**গুলির মধ্যে ইউরোপের গ্লাসগো, লিভারপুল, ম্যাঞ্চেস্টার, সাদাম্পটন, লণ্ডন, আমস্টারডাম, রটারডাম, হামবুর্গ, ব্রিমেন আন্টোয়ার্প, লা হেবর, শেরবুর্গ ও লিসবন, এবং উত্তর আমেরিকার কুইবেক, মণ্ট্রীল, হ্যালিফ্যাক্স, সেণ্ট জন বোস্টন, নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, বাল্টিমোর, চার্লস্টন গ্যালভেস্টন এবং নিউ অরলিয়ন্স বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উত্তর আটলান্টিক পথের দ্রুত **উন্নতির কারণ**—(১) এই পথের প্রায় সমস্ত বন্দরই একটি বৃহৎ বৃত্তাংশে অবস্থিত বলিয়া বাণিজ্যপোতগুলি হ্রস্বতম পথ অনুসরণ করিবার সুযোগ পায়। (২) আটলান্টিক সমুদ্রপথে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দ্বীপপুঞ্জ অথবা মগ্নভূমির সংখ্যা অল্প। (৩) এই পথের অন্তর্গত বন্দরসমূহ স্বাভাবিক ও উৎকৃষ্ট। (৪) এই পথের উভয় প্রান্তেই প্রচুর কয়লা পাইবার সুবিধা আছে। (৫) এই পথের উভয় প্রান্তে অবস্থিত দুইটি অংশেরই লোকবসতি ঘন, অধিবাসীদের জীবনমান উন্নত এবং বিনিময়যোগ্য পণ্যের পরিমাণও অধিক।

(খ) **ভূমধ্যসাগর-সুয়েজখাল-এশীয় (ভারত মহাসাগর) পথ**—(**Mediterranean-Suez-Asiatic Route**)—পরিবাহিত পণ্য ও যাত্রী চলাচলের পরিমাণ বিবেচনা করিলে এই পথটিকে উত্তর আটলান্টিক সমুদ্র

পথের পরেই স্থান দিতে হয়। এটি উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ ইউরোপ, উত্তর ও পূর্ব আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও সুদূর প্রাচ্যের দেশগুলি এবং অস্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ডের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিতেছে। পৃথিবীর অন্য কোন সমুদ্র-পথই এত অধিক সংখ্যক দেশের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে নাই।

এই পথে বাণিজ্যপোতগুলি লণ্ডন এবং অন্যান্য ইউরোপীয় বন্দর হইতে যাত্রা করিয়া জিব্রাল্টার, মাল্টা ও সৈয়দ বন্দরের মধ্য দিয়া সুয়েজখাল অতিক্রম করিয়া প্রথমে সুয়েজ বন্দরে এবং পরে লোহিত সাগর অতিক্রম করিয়া এডেন বন্দরে আসিয়া পৌঁছে। এডেন হইতে এই পথের প্রধান শাখা (কখন কখন বোম্বাই হইয়া) কলম্বো পর্যন্ত যায় এবং অপর শাখা আফ্রিকার পূর্ব উপকূল ধরিয়া মোম্বাসা, ডার-এস-সালাম ও মোজাম্বিক হইয়া ডারবান পর্যন্ত পৌঁছে। কলম্বো হইতে এই পথের এক শাখার গতি কলিকাতায়, আর এক শাখা ফ্রীম্যাণ্টল ও মেলবোর্ন হইয়া সিডনী এবং সেখান হইতে নিউজীল্যাণ্ডের ওয়েলিংটন বা অকল্যাণ্ড গিয়া পৌঁছিয়াছে; অপর একটি শাখা গিয়াছে সিঙ্গাপুর হইয়া হংকং ও সাংহাই এবং আরও একটি শাখা গিয়াছে রেঙ্গুন পর্যন্ত।

এই পথে আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড ও প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ হইতে চা, রেশম, পাট, তৈলবীজ, চর্ম, ধাতু আকরিক, দুগ্ধজাত দ্রব্য, পশম,
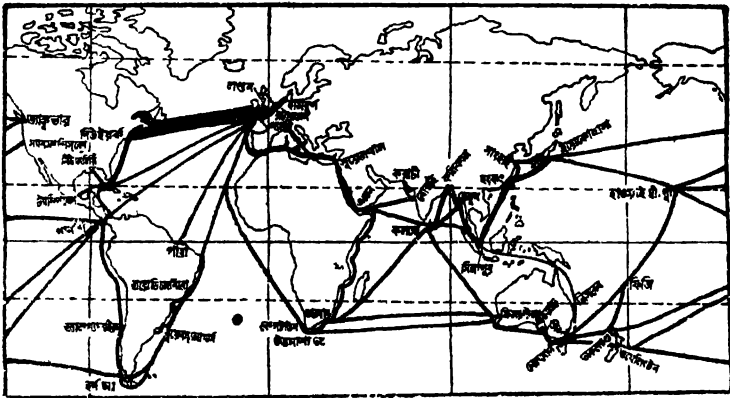
৪৯ নং চিত্র—পৃথিবীর প্রধান প্রধান সমুদ্রপথ

মাংস, গম, ময়দা, মদ, গঁদ, স্বর্ণ, তাম্র, শর্করা, তামাক, রবার, খেজুর, মুক্তা, খনিজ তৈল, কফি, সয়াবিন, রাং, লবঙ্গ, হস্তিদন্ত, চাউল, সেগুন কাষ্ঠ, নারিকেলের শাঁস, মশলা প্রভৃতি নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামাল ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হয় এবং ইউরোপ হইতে এই সমস্ত দেশে শিল্পজাত দ্রব্যাদি আমদানী হয়। কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্যসাগরের তীরস্থ বন্দরগুলিও এই

পথে আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্য চালাইয়া থাকে। এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত বিভিন্ন দেশগুলির বাণিজ্যিক পণ্যও এই পথেই পরিবাহিত হয়।

জিব্রাল্টার, সৈয়দ, এডেন, কলিকাতা, কলম্বো, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি বন্দর হইতে জাহাজে কয়লা বোঝাই করিবার সুবিধা থাকায় এই বাণিজ্যপথটির শ্রীবৃদ্ধি দ্রুত সাধিত হইয়াছে।

সুয়েজখাল-পথে জাহাজ চলাচলের জন্য উচ্চহারে শুল্ক দিতে হয় বলিয়া অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজীল্যাণ্ডগামী অল্পমূল্যের গুরুভার পণ্যসমূহ সাধারণতঃ উত্তমাশা অন্তরীপ-পথে পরিবাহিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে বহু যাত্রী যাতায়াতের ব্যয় লাঘবের জন্য অন্তরীপ-পথে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজীল্যাণ্ড গিয়া থাকে।

(গ) **আটলান্টিক-পানামা-প্রশান্তমহাসাগর পথ** (**Atlantic-Panama-Pacific Route**)—এই পথ প্রধানতঃ যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলের দেশগুলির সহিত পানামা খালের মারফৎ অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, জাপান, চীন এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের দেশগুলির সংযোগ সাধন করে। এই পথে পেরুর লিমা ও চিলির ভ্যালপ্যারাইসো বন্দরের সহিত ইউরোপের বন্দরগুলির বাণিজ্যও চলিয়া থাকে। এই পথে পরিবাহিত পণ্যের মধ্যে রেশম, চা, শর্করা, শণ, তৈলবীজ, কার্পাস, ধাতুদ্রব্য, যন্ত্রপাতি, কাষ্ঠ, কাষ্ঠমণ্ড, পশুলোম, গবাদি পশু, গম প্রভৃতিই প্রধান। নিউইয়র্ক, কোলন, সানডিয়াগো, ভ্যানকুভার, প্রিন্স রুপার্ট, ক্যালাও এবং অকল্যাণ্ড এই পথের অন্তর্গত উল্লেখযোগ্য বন্দর।

(ঘ) **উত্তমাশা অন্তরীপ পথ** (**Cape Route**)—এই পথ উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ, আফ্রিকার পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকূল, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজীল্যাণ্ডের মধ্যে বিস্তৃত। ম্যাডিরা অথবা ক্যানারী দ্বীপ হইতে এই পথের বাণিজ্য-পোতসমূহ কয়লা বোঝাই করে। এই পথে আফ্রিকা হইতে তালতৈল, রবার, গঁদ, হস্তিদন্ত, কাষ্ঠ, চর্ম, স্বর্ণ, হীরক, কোকো, তাম্র, উট-পাখীর পালক প্রভৃতি এবং অস্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ড হইতে গম, ভুট্টা, পশম, দুগ্ধজাত দ্রব্য, স্বর্ণ, ফল প্রভৃতি দ্রব্য ইউরোপে যায় এবং ইউরোপ হইতে বস্ত্র, লৌহ ও ইস্পাতজাত দ্রব্য, কয়লা এবং নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য এই সমস্ত দেশে আমদানী হয়। তবে পরিবাহিত পণ্যের পরিমাণ অতি সামান্য। এই পথে বাণিজ্যে নিযুক্ত বন্দরগুলির মধ্যে ইউরোপের লণ্ডন, লিভারপুল, কার্ডিফ, সাদাম্পটন, আন্টোয়ার্প, সোয়ানসী, লা হাভ্র, লিসবন, অ্যাসেন্সন, আফ্রিকার পোর্ট এলিজাবেথ, ইস্টলণ্ডন, কেপটাউন; এবং অস্ট্রেলিয়ার এ্যাডিলেড, মেলবোর্ন, সিড্‌নী ও ব্রিসবেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(ঙ) **দক্ষিণ আটলান্টিক পথ** (**South Atlantic Route**)—এই পথ উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের বন্দরসমূহকে প্রতীচ্য দ্বীপপুঞ্জ ও দক্ষিণ

আমেরিকার উত্তর ও পূর্ব উপকূলের হাভানা, ভেরাক্রুজ, পার্নাম্বুকো, বেহিয়া, ট্যাম্পিকো, রায়ো-ডি-জেনেরো, স্যান্টোমা, বুয়েনস আয়ার্স, মণ্টেভিডো এবং বোজারিও বন্দরসমূহের সহিত সংযুক্ত করিতেছে। এই পথে অধিকাংশ বাণিজ্যপোতই ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জ এবং ম্যাডিরাতে কয়লা বোঝাই করে। দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশ হইতে শর্করা, কলা, কফি, কোকো, রবার, গম, পশম, মাংস, চর্ম, তিসি, কাষ্ঠ, কার্পাস, তামাক, রৌপ্য, হীরক, গবাদি পশু প্রভৃতি এই পথে ইউরোপে যায় এবং ইউরোপ হইতে নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য দক্ষিণ আমেরিকা ও ইহার নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহে আমদানী হইয়া আসে। এই পথে অতি সামান্য পরিমাণ পণ্য চলাচল করে।

[দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের পূর্বদিকে আফ্রিকা ও পশ্চিমদিকে দক্ষিণ আমেরিকা অবস্থিত। এই উভয় মহাদেশই ব্যবসা-বাণিজ্যে অনুন্নত এবং উভয় দেশেরই উৎপন্ন দ্রব্যাদি প্রায় অনুরূপ। ইহার ফলে এই উভয় মহাদেশের মধ্যে বিনিময়যোগ্য পণ্যের একান্ত অভাব। এই কারণে দক্ষিণ আটলান্টিক জলপথ পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত না হইয়া উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত হইয়াছে।]

(চ) **প্রশান্ত মহাসাগরীয় পথ** (Pacific Route)—এই পথ পূর্ব-এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজীল্যাণ্ডের বন্দরগুলির সহিত আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলির সংযোগ স্থাপন করে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় পথ-গুলির মধ্যে বর্তমানে নিম্নলিখিত পথগুলিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য—(১) সিডনী অথবা অকল্যাণ্ড হইতে ফিজি, সামোয়া বা হনলুলু হইয়া স্যানফ্রান্সিস্‌কো বা ভ্যানকুভার। (২) ম্যানিলা, হংকং ও সাংহাই হইতে নাগাসাকি, কোবে এবং ইয়োকোহামা হইয়া ভ্যানকুভার ও সীট্‌ল। (৩) ম্যানিলা, হংকং ও সাংহাই হইতে হনলুলু হইয়া স্যানফ্রান্সিসকো, লস্ এঞ্জেলস্ এবং পানামা। (৪) মেলবোর্ন এবং সিডনী হইতে অকল্যাণ্ড বা ওয়েলিংটন হইয়া পানামা।

এই পথে সুদূর-প্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে রেশম ও তজ্জাত দ্রব্য, সয়াবিন, সয়াবিন তৈল, খেলনা, চা, চর্ম, পশুলোম, শণ, নারিকেলের শাঁস, শর্করা, রবার, ধান, রাং প্রভৃতি দ্রব্য আমেরিকায় আসে এবং আমেরিকা হইতে কার্পাস, কাষ্ঠ, মাংস, মৎস্য, গম, ময়দা, লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য, কার্পাস দ্রব্য, খনিজ তৈল প্রভৃতি সুদূর প্রাচ্যের দেশগুলিতে রপ্তানী হয়।

[প্রশান্ত মহাসাগরীয় পথসমূহ অন্যান্য সমুদ্রপথ অপেক্ষা **অনুন্নত। কারণ**—(১) এই পথে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম ভাগের সহিত পূর্ব এশিয়ার যোগ; অথচ এই দুইটি অংশই আধুনিক বৈষয়িক সভ্যতায় পশ্চাৎপদ। তাই এই পথে পরিবাহিত পণ্যের পরিমাণ কম। (২) প্রশান্ত মহাসাগরের তীরস্থ সমস্ত দেশই প্রায় একজাতীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন করে, কাজেই এই

সমস্ত দেশের মধ্যে বিনিময়যোগ্য পণ্যের অভাব। (৩) এই বিস্তীর্ণ জলভাগের মধ্যবর্তী অঞ্চলে উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয়, বন্দর এবং কয়লার অত্যন্ত অভাব।

এই জলপথের গুরুত্ব বর্তমানে অধিক না হইলেও ভবিষ্যতে প্রাচ্যদেশের বৈষয়িক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই পথে বাণিজ্যের প্রসার অবশ্যম্ভাবী। পানামা খাল কাটার পর হইতে এবং চীন ও জাপানের শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই বাণিজ্যের পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে।]

সামুদ্রিক খালপথ (Ship Canals)

আন্তর্জাতিক পণ্য পরিবহনে সমুদ্র-সংযোগকারী খালপথের গুরুত্বও কম নহে। এই সমস্ত খালপথে সমুদ্রগামী পোতসমূহ অনায়াসে চলাচল করিতে পারে। এই শ্রেণীর খালসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান।

সুয়েজ খাল (Suez Canal)—সুয়েজ খাল ভূমধ্য ও লোহিত সাগরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। ১৮৫৯ সালে ফরাসী পূর্তবিদ্ ফার্ডিন্যাণ্ড দ্য-লেসেপস্ মিশরের খেদিভের অনুমতি লইয়া এই খাল খনন আরম্ভ করেন এবং ১৮৬৯ সাল হইতে এই খাল দিয়া সমুদ্রগামী পোতসমূহ চলাচল সুরু করে। সুয়েজ খাল দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৬৫ কি.মি, তলদেশের সংকীর্ণতম প্রস্থ প্রায় ৩০·৫ মি. এবং সর্বাল্প গভীরতা প্রায় ১১ মি.। পূর্বে সুয়েজ খাল একটি সংঘের পরিচালনাধীন ছিল এবং এই

৫০ নং চিত্র—সুয়েজ খাল

সংঘের সর্বপ্রধান অংশীদার ছিল যুক্তরাজ্য। তবে দেশ হিসাবে ইহা মিশরের অন্তর্গত। ১৯৬৮ সালে পূর্বোক্ত সংঘের সহিত মিশরের চুক্তির মেয়াদ শেষ হইবার এবং সেই সময়ে এই খালটি মিশরের পূর্ণ আয়ত্তে আসিবার কথা ছিল, তবে ইহার পূর্বেই ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে সুয়েজ খালকে মিশরের জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়। এই খাল খননের পর হইতেই পশ্চিম ও দক্ষিণ ইউরোপের দেশগুলির সহিত এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার বাণিজ্য বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সুবিধা—(১) সুয়েজ পথে জাহাজসমূহ বহু সমৃদ্ধ ও জনবহুল দেশ স্পর্শ করিয়া যায় বলিয়া এই পথে পরিবহনযোগ্য বহু যাত্রী ও পণ্য পায়। (২)

সুয়েজ খালপথের উভয়প্রান্তে ও মধ্যবর্তী অঞ্চলসমূহে জাহাজ চলাচলের ইন্ধন ও পানীয় জলের সরবরাহ প্রচুর। পশ্চিমপ্রান্তে ইউরোপে কয়লা এবং পূর্বপ্রান্তে ব্রহ্মদেশ ও প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জে খনিজ তৈল রহিয়াছে। (৩) পূর্ব এশিয়ার বন্দরসমূহ সুয়েজপথে ইউরোপীয় বন্দরসমূহের নিকটতব। অন্তরীপ পথের তুলনায়, সুয়েজপথে ইউরোপের লিভারপুল হইতে বোম্বাই ৭২৬৬ কি.মি, বাটাভিয়া ৪৩০৩ কি.মি., হংকং ৫২৯৬ কি.মি. এবং সিডনী ৬২৬ কি.মি. নিকটতর। (৪) এই পথ পুরাতন পৃথিবীর অন্তর্গত প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দেশগুলির মধ্যে দ্রুত ও সুলভ সংযোগ স্থাপনের শ্রেষ্ঠ উপায়। (৫) এই পথে কমন্ওয়েলথ্-এর অন্তর্গত সিংহল, পাকিস্তান, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, এবং মালয়, হংকং প্রভৃতি ব্রিটিশ উপনিবেশ ও রক্ষণাবেক্ষণাধীন দেশসমূহের সংযোগ; তাই গ্রেট ব্রিটেনের পক্ষে এই পথেব গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক।

অসুবিধা—(১) এই খাল অত্যন্ত সংকীর্ণ বলিয়া বৃহদাকারের জাহাজ ইহার মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতে পাবে না। বর্তমানে এই অবস্থার একটু উন্নতি হইয়াছে, কারণ এখন ৪০,০০০ টনের অধিক জাহাজও এই খালপথে যাতায়াত করিতে পারে। (২) এই পথের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পযন্ত পেঁছিতে প্রায় ১২ ঘণ্টা সময় লাগে। (৩) এই পথে যাতায়াত কবিতে হইলে কর দিতে হয়। পূর্বে এই করের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক ছিল বলিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত ব্যাহত হইত, তবে বর্তমানে এই করেব পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় পূর্ব অবস্থার বহুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

পানামা খাল (Panama Canal)—পানামা খাল আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিতেছে। পূর্বে সমুদ্রপথে আমেরিকার পূর্বপ্রান্ত হইতে পশ্চিমপ্রান্তে যাতায়াতের একমাত্র উপায় ছিল হর্ণ অন্তরীপ পথ (হর্ণ অন্তরীপ দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ-প্রান্তে অবস্থিত)। পানামা খাল খননের পর হইতে হর্ণ অন্তরীপ পথের গুরুত্ব বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে।

৫১নং চিত্র—পানামা খাল

পানামা খাল প্রায় ৬৫ কি.মি দীর্ঘ এবং প্রশান্ত মহাসাগরের গভীর অঞ্চল হইতে আটলান্টিক মহাসাগরের গভীর অঞ্চল পর্যন্ত
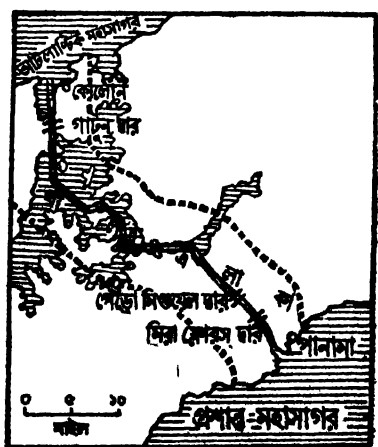
এই খালের দৈর্ঘ্য ৮১'১ কি.মি.। ইহা প্রস্থে ৯২ হইতে ৩০৫ মি. এবং ১২৫ মি. গভীর। গাটুন ও মিবাফ্লোরস্ হ্রদ দুইটি সংযুক্ত করিয়া খালটিকে আটলান্টিক হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত করা হইয়াছে। এই খালটি অতিক্রম করিতে প্রায় ৭।৮ ঘণ্টা সময় লাগে। দৈনিক এই খালপথে ৪৮টিজাহাজ যাতায়াত কবিতে পারে। ১৯১৪ সালেব ১১ই আগস্ট হইতে এই খালে জাহাজ চলাচল সুরু হয়। এই খাল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সবকাবেব অধীন।

সুবিধা ঃ—(১) এই পথ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলকে উত্তব আমেরিকাব পুব উপকূলেব এবং পশ্চিম ইউরোপেব বন্দবসমূহেব নিকটতব করিয়াছে। ইহার ফলে আমেবিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল-সমূহ দ্রুত উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। নিউইয়র্ক হইতে ভ্যালপ্যাবা-ইসো ম্যাজেলান প্রণালী পথে ১৩,৪৪০ কি.মি., কিন্তু পানামা পথে ৭৩৬০ কি. মি.। নিউইয়র্ক হইতে ম্যাজেলান প্রণালী পথে ওয়েলিংটন ১৮,০৮০ কি. মি. কিন্তু পানামা পথে ১৩,৬০০ কি. মি.। (২) পানামা খাল ইউরোপ হইতে অস্ট্রেলিয়া বা নিউজীল্যাণ্ড যাইবার পথে এক নূতন পথ উন্মুক্ত করিয়াছে এবং আমেবিকাব পূর্ব উপকূলকে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজীলাণ্ডের নিকটতর করিয়াছে। নিউইয়র্ক হইতে সিডনী সুয়েজ পথে ২১,৪৪০ কি. মি. কিন্তু পানামা পথে ১৫,৫২০ কি. মি.। লিভাবপুল হইতে পানামা পথে সিডনী ও ওয়েলিংটন যথাক্রমে ১৯,৮৪০ কি.মি. ও ১৭,৭৬০ কি.মি., কিন্তু সুয়েজ পথে এ দু'টির দূরত্ব যথাক্রমে ১৯,৫২০ কি.মি. এবং ২০,০০০ কি.মি.। (৩) প্রয়োজন হইলে পানামা খালপথে যুদ্ধজাহাজসমূহ আটলান্টিক মহাসাগর হইতে প্রশান্ত মহাসাগবে দ্রুত যাতায়াত করিতে পারে। (৪) এই পথের দ্রুত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেব অর্থনৈতিক উন্নতিও দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। (৫) আমেরিকার পুর্ব উপকূলের বন্দরসমূহ হইতে জাপানের দূরত্ব এই পথে বহুল পরিমাণে সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। নিউইয়র্ক হইতে ইয়োকো-হামা পানামা পথে ১৫,৫২০ কি.মি., কিন্তু সুয়েজ পথে ২০,৯৬০ কি.মি.। (৬) এই পথে জাহাজে ব্যবহৃত জ্বালানীর অপ্রতুলতা নাই।

অসুবিধা ঃ—(১) পানামা খাল পার্বত্য অঞ্চলের মধ্য দিয়া বিস্তৃত হওয়ায় জাহাজসমূহকে 'লকে'র সাহায্যে অসমতল সমুদ্রপৃষ্ঠ দিয়া যাতায়াত করিতে হয়। (২) পানামা খালের উভয় পার্শ্বে সুয়েজ খালের ন্যায় জনবহুল ও শিল্পবাণিজ্যে সমৃদ্ধ অঞ্চল নাই। (৩) পানামা খালের সাহায্যে কেবলমাত্র আমেরিকা মহাদেশেরই বিশেষ সুবিধা হইয়াছে, অন্য কোন দেশের বিশেষ সুবিধা হয় নাই। (৪) বিস্তৃত প্রশান্ত মহাসাগব বক্ষে বন্দর ও পোতাশ্রয়ের অভাব এই পথের প্রসারকে অত্যন্ত ব্যাহত করিয়াছে।

ভারতের সমুদ্রপথ (Ocean routes of India)

ভারত হইতে বিদেশাভিমুখে বিভিন্ন সমুদ্রপথসমূহ প্রধানতঃ কলিকাতা, বিশাখাপত্তনম্‌, মাদ্রাজ, কোচিন এবং বোম্বাই বন্দর হইতে প্রসারিত। ভারতীয় জাহাজগুলি বর্তমানে ভারত-যুক্তরাজ্য-ইউরোপ, ভারত-জাপান, ভারত-মালয়, ভারত-পূঃ আফ্রিকা, ভারত-পারস্য উপসাগর উপকূল, এবং ভারত-অস্ট্রেলিয়া এই ছয়টি পথে চলাচল করে। প্রথমোক্ত চারিটি পথে ভারতীয় জাহাজগুলি পণ্য ও শেষোক্ত দুইটি পথে পণ্য ও যাত্রী পরিবহন করিয়া থাকে।

১৯৬১ সালের ২রা অক্টোবর "ইস্টার্ণ সিপিং কর্পোরেশন" (১৯৫৬) ও "ওয়েস্টার্ণ সিপিং কর্পোরেশন" (১৯৫৬) এই দুইটি সংস্থাকে একত্রিত করিয়া "দি সিপিং কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড" নামক একটি সরকারী সংস্থায় পরিণত করা হইয়াছে। ১৯৬১ সালে এই সংস্থাটির অধিকারে ছিল ২৬টি মালবাহী জাহাজ, ২টি যাত্রী ও মালবাহী জাহাজ, এবং ৪টি ট্যাংকার নৌবহর। বর্তমানে ভারত-অস্ট্রেলিয়া, ভারত-সুদূর প্রাচ্য-জাপান, ভারত-কৃষ্ণসাগর, ভারতের পশ্চিম উপকূল-পশ্চিম পাকিস্তান-জাপান, ভারত-পাকিস্তান-যুক্তরাজ্য-ইউরোপ মহাদেশ, ভারত-পোল্যাণ্ড, ভারত-সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র এবং ভারত-যুক্তরাষ্ট্র জলপথে মালবাহী জাহাজগুলি এবং বোম্বাই-পূর্ব আফ্রিকা এবং মাদ্রাজ-সিঙ্গাপুর পথে যাত্রী ও মালবাহী জাহাজগুলি চলাচল করিতেছে। ট্যাংকার নৌবহরটি উপকূলাঞ্চল দিয়া পরিশোধিত তৈল পরিবহন কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। এই সংস্থাটি সম্প্রতি উপকূলীয় বাণিজ্যে কয়লা পরিবহনে এবং বহির্বাণিজ্যে তৈল পরিবহনে নিযুক্ত রহিয়াছে। "দি সিপিং কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া"-র একটি শাখা সংস্থা—"দি মোগল লাইন লিমিটেড" প্রধানতঃ হজ যাত্রীদের পরিবহন কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে।

ভারতে বর্তমানে ৩০-টিরও অধিক অন্যান্য জাহাজী প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে "দি সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশন কোং", "জয়ন্তী সিপিং কোং" "ইণ্ডিয়ান স্টীম সিপ কোং", "গ্রেট ইস্টার্ণ সিপিং কোং", "রত্নাকর সিপিং কোং", "ছোগুল স্টীম সিপ কোং",—এই ৬টি প্রতিষ্ঠান উপকূলীয় ও বহির্বাণিজ্যে পরিবহন কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে।

বর্তমানে উপকূলীয় বাণিজ্যের সমগ্র অংশ, নিকটবর্তী দেশসমূহের সহিত বাণিজ্যের ৪০% এবং দূরবর্তী দেশসমূহের সহিত বাণিজ্যের মাত্র ৫% ভারতীয় নৌবহর দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। অল্পব্যয়ে খাদ্য ও কাঁচামাল পরিবহনের জন্য উপকূলীয় সমুদ্রপথসমূহ বিশেষ প্রয়োজনীয়।

প্রশ্নোত্তর

1. State the relative advantages and disadvantages of inland water-transport system and land transport system. (আন্তর্দেশিক জলপথ ও স্থলপথসমূহের আপেক্ষিক সুবিধা-অসুবিধাগুলি নির্দেশ কর)। (পৃষ্ঠা ২০৯)

2. Mention the chief geographical factors which make a river a highway of commerce. Illustrate your answer by a few examples. (দৃষ্টান্ত উল্লেখপূর্বক নাব্য জলপথসমূহের গুণাগুণ নির্দেশ কর)। (পৃষ্ঠা ২০৯-২১০)

3. Discuss the geographical factors that affect the selection of ocean trade routes. (সমুদ্রপথ নির্বাচনে ভৌগোলিক প্রভাবসমূহের বর্ণনা কর ।) (পৃষ্ঠা ২১৭-২১৮)

4. Describe the North Atlantic (U. E. '63, '67, P U. '62,) and the Mediterranean-Suez-Asiatic routes. (P. U. '63, U. E. '63, '66, N. B.U. '63) (উত্তর আটলান্টিক ও ভূমধ্যসাগর-সুয়েজখাল-ভারতমহাসাগর সমুদ্রপথ দুইটি বর্ণনা কর ।) (পৃষ্ঠা ২১৮-২২০)

5. Describe the Suez and Panama canals indicating their respective merits and defects. (H. S. (C), '65) (আপেক্ষিক সুবিধা-অসুবিধা উল্লেখপূর্বক সুয়েজ ও পানামা খাল-পথ দুইটি বর্ণনা কর ।) (পৃষ্ঠা ২২২-২২৪)

6. Describe the trade route from Liverpool to Bombay *via* the Suez canal naming four important ports of call. State the principal advantages of this route over the route *via* the Cape of Good Hope. (H. S. '61, '65) (লিভারপুল হইতে সুয়েজ খাল হইয়া বোম্বাই পর্যন্ত প্রসারিত সমুদ্রপথটির বর্ণনা কর এবং এই পথের অন্তর্গত যে সমস্ত বন্দরে জাহাজ ধরে সেইরূপ চারিটি প্রধান প্রধান বন্দরের নাম লিখ। উত্তমাশা অন্তরীপ-পথ অপেক্ষা এই পথের প্রধান প্রধান সুবিধাগুলির উল্লেখ কর ।) (পৃষ্ঠা ২১৮-২২০, ২২২-২২৩)

একাদশ অধ্যায়

পরিবহন ব্যবস্থা—বিমানপথ

জল ও স্থলপথ বনাম বিমানপথ (**Surface transport *versus* Air transport**)—বিমান পথের প্রধান **সুবিধা** এই যে এই পথে সর্বাপেক্ষা অল্প সময়ে অতি দূর পথ অতিক্রম করা যায় এবং জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও শান্তি—শৃঙ্খলার দিক হইতে বিমানপথ বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহার প্রধান **অসুবিধা** এই যে স্থল বা জলপথের তুলনায় বিমান-পথ অধিক ব্যয়সাপেক্ষ। দ্বিতীয়তঃ, আকাশপথে বৃহদায়তন, গুরুভার দ্রব্যের পরিবহন বর্তমানে চলে না এবং অদূর ভবিষ্যতেও চলিবে কিনা বলা দুষ্কর। তবে যাত্রী, ডাক এবং মূল্যবান, অল্পায়তন ও লঘুভার পণ্য এবং দ্রুতপচনশীল দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত করিতে বিমানপথের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সমস্ত পণ্যসম্ভার পরিবহনে বিমানপথ জল ও স্থলপথের সহিত বর্তমানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে।

বিমানপথ নির্দেশক ভৌগোলিক অবস্থা (**Geographical factors affecting the selection of air routes**)—বিমানপথে পোত চালনার অবাধ স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও কতকগুলি নির্দিষ্ট পথেই বিমানপোত চলাচল করে। এই সকল পথ নিম্নলিখিত প্রাকৃতিক বা ভৌগোলিক অবস্থাগুলির দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। (১) যেখানে বৃষ্টিপাত ও তুষারপাত অত্যধিক কিংবা আবহাওয়া প্রায়ই কুয়াশাচ্ছন্ন থাকে, সেখানে বিমানপথ প্রসার লাভ করে না। বায়ুপ্রবাহের বেগ এবং গতিও বিমানপথ-নির্বাচন নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। মরুভূমি অঞ্চলে বিমানপথের প্রসার কম। (২) বিমানপোতের অবতরণের জন্য বহুদূর বিস্তৃত সমতলভূমির প্রয়োজন। তাই অত্যন্ত বন্ধুর অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য বিমানঘাঁটি দৃষ্ট হয় না এবং বিমানপথও প্রসার লাভ করিতে পারে না। (৩) বিস্তীর্ণ অরণ্যভূমি ও সমুদ্রাঞ্চলে বিমানপোতের অবতরণযোগ্য স্থানের অভাব থাকায় অরণ্য ও সমুদ্রের হ্রস্বতম অংশের উপর দিয়া বিমানপথ নির্ধারিত হয়। (৪) আন্তর্দেশিক বিমানপথের ক্ষেত্রে দেশের আয়তন বৃহৎ না হইলে বিমানপথে পরিবহন ব্যবস্থার সুবিধা অনুভব করা যায় না। এই কারণেই যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি বৃহদায়তন দেশসমূহে আন্তর্দেশিক বিমানপথে পরিবহন ব্যবস্থা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে লাভজনক হইয়া উঠিয়াছে। অপর

পক্ষে সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতির ন্যায় অল্প আয়তনযুক্ত দেশসমূহে আন্তর্দেশিক বিমানপথ তাদৃশ প্রসার লাভ করে নাই।

উপরোক্ত অনুকূল ভৌগোলিক অবস্থা ছাড়াও কোন অঞ্চলের জনসংখ্যাধিক্য, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং অন্যান্য পরিবহন ব্যবস্থার অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অবস্থা ঐ অঞ্চলে বিমানপথের ব্যাপক প্রসারে সহায়তা করে। অনুকূল ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাগুলি বিদ্যমান থাকায় পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপে রুশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রে বিমানপথ সর্বাধিক প্রসারলাভ করিয়াছে।

উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক বিমানপথ (Principal international air routes)—পৃথিবীর বিমানপথগুলিকে প্রধানতঃ আন্তর্জাতিক, মহাদেশীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয়—এই চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক বিমানপথগুলি প্রধানতঃ নিম্নলিখিত ছয়টি পথেই চলাচল করে।

(১) **ইউরোপ, এশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ার মধ্যবর্তী বিমানপথ**—এই পথে বিমানপোতগুলি লণ্ডন হইতে প্যারী, মার্শাই, এথেন্স, আলেকজান্দ্রিয়া, কায়রো, আম্মান, বাগদাদ, বসরা, বেহরিন, সারজাহ, করাচী, যোধপুর, দিল্লী, এলাহাবাদ, কালকাতা, রেঙ্গুন, ব্যাংকক, সিঙ্গাপুর ও বাটাভিয়া হইয়া উত্তর অস্ট্রেলিয়ার ডারউইনে পৌছায়। ডারউইন হইতে এই পথের এক শাখা অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্বদিকে ব্রিসবেন, সিডনী, মেলবোর্ন ও অ্যাডিলেড পর্যন্ত যায় এবং অপর শাখা অস্ট্রেলিয়ার উত্তর ও পশ্চিম উপকূল ধরিয়া পার্থ পর্যন্ত পৌছায়।

(২) **ইউরোপ এবং আফ্রিকার মধ্যবর্তী বিমানপথসমূহ**—এই পথে বিমানপোতগুলি ইংল্যাণ্ড (সাদাম্পটন) হইতে আলেকজান্দ্রিয়া ও খার্টুম হইয়া পশ্চিম আফ্রিকার লাগোস্ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন, আলেকজান্দ্রিয়া হইয়া বাথার্স্ট ও মাদাগাস্কার, এবং ত্রিপলি ও কায়রো হইয়া অ্যাবিসিনিয়ার আদ্দিস্-আবাবা পর্যন্ত বিস্তৃত।

(৩) **ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যবর্তী বিমানপথসমূহ**—এই পথগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত দুইটি পথই বিশেষ উল্লেখযোগ্য—(ক) **উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ ও বুয়েনশ-আয়ার্স বিমানপথ**—এই পথে বিমানপোতগুলি মার্শাই, জিব্রাল্টার, আফ্রিকার ডাকার বা ব্যাথার্স্ট হইয়া এবং তথা হইতে আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়া ব্রাজিলের নাটালে পৌছে। নাটাল বিমানপথে রায়ো-ডি-জেনিরো ও বুয়েনশ-আয়ার্সের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। নাটাল হইতে যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত বিমানপথসমূহ প্রসারিত রহিয়াছে। পশ্চিম ইউরোপ, ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনার মধ্যে বাণিজ্যসম্বন্ধ

বৃদ্ধি পাওয়ায় এই বিমানপথের গুরুত্ব দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। (খ) **উত্তর-আটলান্টিক বিমানপথ**—এই পথ ইউরোপ ও উঃ আমেরিকার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিতেছে। এই পথের প্রধান প্রধান শাখাগুলি লণ্ডন, শ্যানিন, ও গ্যাণ্ডার হইয়া অটাওয়া ও নিউইয়র্ক পর্যন্ত; প্যারী, লিস্‌বন, আজোর্স ও বারমুডা হইয়া নিউইয়র্ক পর্যন্ত; এবং স্টকহলম্, অসলো ও গ্যাণ্ডার হইয়া অটাওয়া ও নিউইয়র্ক পর্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে।

(৪) **আমেরিকা এবং এশিয়ার মধ্যবর্তী প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিমানপথ**—এই পথ স্যান্‌ফ্রান্সিস্‌কো, লস্ এঞ্জেল্‌স্ ও সীট্‌ল হইতে প্রসারিত হইয়াছে। স্যান্‌ফ্রান্সিস্‌কো ও লস্ এঞ্জেল্‌স্ হইতে প্রসারিত পথ দুইটি হনলুলু হইতে ম্যানিলা, সাংহাই, নিউজীল্যাণ্ড ও সিঙ্গাপুর পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। সীট্‌ল হইতে প্রসারিত পথটি ক্যানাডার পশ্চিম-উপকূলাঞ্চল ধরিয়া টোকিও ও সাংহাই পর্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে।

(৫) **উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যবর্তী বিমানপথ**—এই বিমানপথ বুয়েনশ-আয়ার্স হইতে নিউইয়র্ক পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পথের এক শাখা বুয়েনশ-আয়ার্স হইতে নাটাল, ত্রিনিদাদ, হাইতি, কিউবা এবং ফ্লোরিডা হইয়া নিউইয়র্ক পৌছে এবং অপর শাখা বুয়েনশ-আয়ার্স হইতে মেণ্ডোজা, ভ্যালপ্যারাইসো, কিউবা এবং মিয়ামি হইয়া নিউইয়র্ক পৌছে।

(৬) **পশ্চিম ইউরোপ ও পূর্ব এশিয়ার মধ্যবর্তী বিমানপথ**—এই পথ পঃ ইউরোপকে রুশিয়ার মধ্য দিয়া পূর্ব এশিয়ার সহিত সংযুক্ত করিতেছে। এই পথে বিমানপোতগুলি মস্কো হইতে কাজান, ওমস্ক, নোভোসাইবিরিস্ক, ইর্খুটস্ক, চিতা, স্থিয়েস্কো ও খার্বারোভস্ক হইয়া ভ্লাডিভস্টকে পৌছে।

বিমানপথে পণ্য-পরিবহন ও যাত্রীদের চলাচল সম্পর্কে পৃথিবীতে যুক্তরাষ্ট্রের স্থান প্রথম। যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ফ্রান্স, রুশিয়া, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশও এই বিষয়ে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে।

ভারতের বিমানপথ

ভারতের বিমানপথ (Air transport system of India)—বিমানপথের প্রসার ও বিমানপোতের চলাচলের দিক হইতে ভারত পৃথিবীতে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। ভারতের বোম্বাই (সান্তাক্রুজ), কলিকাতা (দমদম) এবং দিল্লীতে (পালাম) তিনটি সুবৃহৎ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর রহিয়াছে। ১৯৬০-৬১ সালে বেসামরিক বিমানবিভাগের আয়ত্তে ৮৫টি বিমানঘাঁটি ছিল। ভারতের সমস্ত বড় বড় শহরেই বিমানঘাঁটি রহিয়াছে।

বিমানপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের পরিমাণ নির্ভর করে দেশগত আর্থিক সঙ্গতির উপর। ভারতে বিমানপথ বিস্তারের ভৌগোলিক ও অন্যান্য সুবিধা যেরূপ রহিয়াছে তাহাতে আশা করা যায় যে ভবিষ্যতে ভারতের শিল্পসমূহ সম্যক প্রসার লাভ করিলে এবং খনিজ তৈলের মূল্য হ্রাস পাইলে বিমানপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। আবার আসাম, ত্রিপুরা, মনিপুর ও কাশ্মীর রাজ্যের পক্ষে বিমানপথে পরিবহন ব্যবস্থার প্রবর্তন ও প্রসারণ একান্ত প্রয়োজন। ১৯৫৩ সাল হইতেই ভারতে বিমানপথে চলাচল ব্যবস্থার **জাতীয়করণ** করা হয়। ঐসময় হইতে আভ্যন্তরীণ এবং নিকটবর্তী দেশসমূহের সহিত বিমানপথে চলাচল-ব্যবস্থা **ইণ্ডিয়ান এয়ার-লাইনস কর্পোরেশন** কর্তৃক এবং আন্তর্জাতিক চলাচল ব্যবস্থা **এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনাল** কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইতেছে।

ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস কর্পোরেশনটির বিমানপোতগুলি নিম্ন-লিখিত প্রধান প্রধান পথসমূহে চলাচল করে:—(১) বোম্বাই দিল্লী, (২) বোম্বাই আমেদাবাদ জয়পুর দিল্লী (৩) বোম্বাই-বরোদা আমেদাবাদ, (৪) বোম্বাই করাচী, (৫) বোম্বাই কলিকাতা, (৬) বোম্বাই নাগপুর কলিকাতা, (৭) বোম্বাই-মাদ্রাজ ব্যাঙ্গালোর, (৮) বোম্বাই হায়দরাবাদ-মাদ্রাজ কলম্বো, (৯) বোম্বাই-ইন্দোর-গোয়ালিয়র-দিল্লী, (১০) বোম্বাই পুণা ব্যাঙ্গালোর, (১১) বোম্বাই ভবনগর রাজকোট, (১২) বোম্বাই-হায়দরাবাদ, (১৩) বোম্বাই-জামনগর ভুজ-করাচী, (১৪) দিল্লী-অমৃতসর লাহোর কাবুল-কান্দাহার, (১৫) দিল্লী কলিকাতা, (১৬) দিল্লী লাহোর, (১৭) দিল্লী-যোধপুর-করাচী, (১৮) দিল্লী আগ্রা-পাটনা-বাগডোগরা-ডিব্রুগড, (১৯) দিল্লী-অমৃতসর জম্মু শ্রীনগর, (২০) কলিকাতা এলাহাবাদ-কানপুর দিল্লী, (২১) কলিকাতা পাটনা বেনারস-লক্ষ্ণৌ-দিল্লী, (২২) কলিকাতা চট্টগ্রাম, (২৩) কলিকাতা পাটনা মজঃফরপুর-কাটমাণ্ডু, (২৪) কলিকাতা ঢাকা, (২৫) কলিকাতা বাগডোগরা, (২৬) কলিকাতা গৌহাটি-মোহনবাড়ী (ডিব্রুগড), (২৭) কলিকাতা ভুবনেশ্বর-বিশাখাপত্তনম্-মাদ্রাজ-ব্যাঙ্গালোর, (২৮) কলিকাতা আগরতলা-শিলচর-ইম্ফল, (২৯) মাদ্রাজ-ব্যাঙ্গালোর-কোয়েম্বাটোর-কোচিন ত্রিবান্দ্রম, এবং (৩০) শ্রীনগর লেহ। ১৯৬৪-৬৫ সালে এই কর্পোরেশনটির অধীনে ৩৪টি ড্যাকোটা, ৩টি স্কাইমাস্টার, ৬টি ক্যারাভেল জেট, ১০টি ফোকার ফ্রেণ্ডসিপ ও ১২টি ভাইকাউণ্ট বিমানপোত নিযুক্ত ছিল। ঐ সালে এই কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত বিমান-পোতসমূহ ৩.৪ কোটি কি. মি. নিয়মিত পথে চলাচল করে এবং ১২.৪ লক্ষ যাত্রী পরিবহন করে। বর্তমানে নাগপুরের মাধ্যমে দিল্লী, বোম্বাই, কলিকাতা ও মাদ্রাজের মধ্যে রাত্রিকালে এই কর্পোরেশনের বিমানপোতসমূহে ডাক চলাচল করিতেছে।

এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনালের বিমানপোতসমূহ নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান পথসমূহে চলাচল করিতেছে :—(১) কলিকাতা-বোম্বাই-বসরা-কায়রো-জেনেভা-লণ্ডন, (২) কলিকাতা ব্যাংকক-সিঙ্গাপুর-জাকার্তা, (৩) কলিকাতা-ব্যাংকক-হংকং-টোকিও, (৪) বোম্বাই-এডেন-নাইরোবি। ১৯৬৪ ৬৫ সালে এই কর্পোরেশনটির অধীনে ৮টি বোইং জেট বিমানপোত নিযুক্ত ছিল। ১৯৬৪-৬৫ সালে এই বিমানপোতসমূহ ১৮ কোটি কি. মি. নিয়মিত পথে চলাচল করে ও ২১টি দেশের সহিত সংযোগ সাধন করে। ঐ সালে পরিবাহিত যাত্রীর পরিমাণ দাঁড়ায় ২ ৩৮ লক্ষ জন।
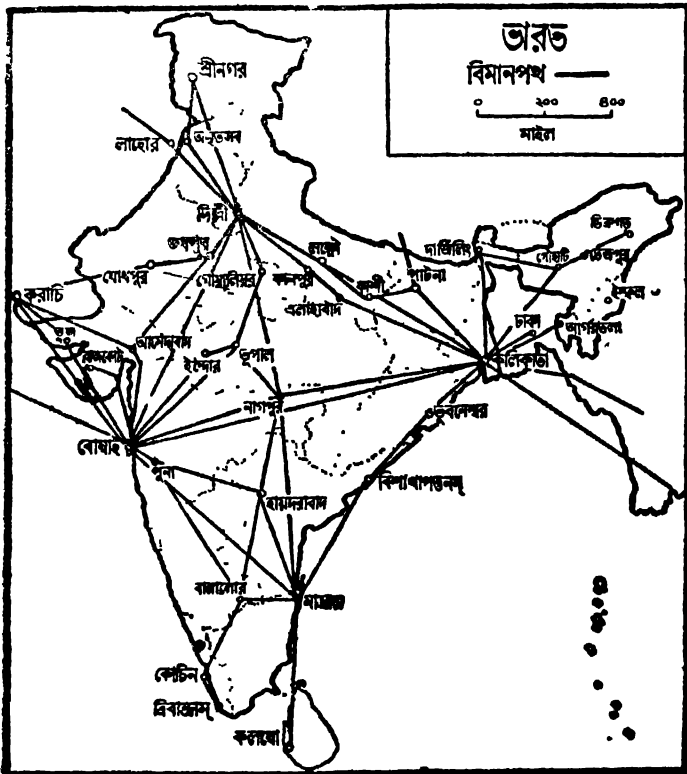
৫২নং চিত্র—ভারতের বিমানপথ

নিম্নলিখিত কয়েকটি বিমানপথে ভারতের মধ্য দিয়া বৈদেশিক বিমানপোতও চলাচল করে—(১) **ব্রিটিশ ওভারসীজ এয়ার কর্পোরেশন** (বি-ও-এ-সি) —(১) লণ্ডন-মাল্টা-কায়রো-বসরা-করাচী-দিল্লী-কলিকাতা-টোকিও-সিডনী,

(২) লণ্ডন-করাচী-বোম্বাই-কলম্বো। **(২) ট্রান্স-ওয়ার্লড্ এয়ারলাইন**—(টি-ডব্লিউ-এ)—ওয়াশিংটন-লণ্ডন-প্যারী-বোম্বাই। **(৩) এয়ার ফ্রান্স**—প্যারী-কায়রো-করাচী কলিকাতা-সাইগন। **(৪) ডাচ এয়ারলাইন** (কে-এল-এম)—আমাস্টার্ডম-করাচী-কলিকাতা-সিঙ্গাপুর-বাটাভিয়া। **(৫)—প্যান-আমেরিকান ওয়ার্লড এয়ারওয়েজ**—(১) কলিকাতা-দিল্লী-করাচী-লণ্ডন-গ্যাণ্ডার-নিউইয়র্ক, (২) কলিকাতা-ব্যাঙ্কক-ম্যানিলা-হনলুলু-স্যানফ্রান্সিস্কো। **(৬) স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান এয়ারওয়েজ**—অসলো-করাচী-কলিকাতা-ব্যাংকক। **(৭) এয়ার সিলোন**—কলম্বো-মাদ্রাজ-বোম্বাই-করাচী-লণ্ডন। **(৮) চায়না ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ কর্পোরেশন**—কলিকাতা-রেঙ্গুন-কুনমিং-হংকং। **(৯) ইরান এয়ারওয়েজ**—বোম্বাই-তেহরাণ। **(১০) ওরিয়েন্ট এয়ারওয়েজ**—(১) করাচী-দিল্লী, (২) করাচী-বোম্বাই, (৩) ঢাকা-দিল্লী, (৪) ঢাকা কলিকাতা এবং (৫) কলিকাতা-চট্টগ্রাম। **(১১) কোয়াণ্টাস এম্পায়ার এয়ারওয়েজ**—লণ্ডন-কলিকাতা-সিডনী। **(১২) বার্মা এয়ারওয়েজ**—রেঙ্গুন-আকিয়াব-কলিকাতা।

প্রশ্নোত্তর

1. Examine the relative merits and defects of surface transport and air transport system. (জল ও স্থলপথ এবং বিমানপথের আপেক্ষিক সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে আলোচনা কর)। (পৃঃ ২২৭)

2. Enumerate the geographical factors that influence the selection of the air routes of the world. Describe the principal international air routes of the world. (বিমানপথ নির্দেশক ভৌগোলিক অবস্থাসমূহের নির্দেশ কর। পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক বিমানপথসমূহের বর্ণনা কর।) (পৃঃ ২২৭-২২৯)

3. Describe the development of air transport system in India. (ভারতীয় বিমানপথের সম্প্রসারণ বর্ণনা কর।) (পৃঃ ২২৯-২৩২)

দ্বাদশ অধ্যায়

বন্দর ও নগরের উৎপত্তি ও উন্নতি
(Development of Ports and Trade centres)

বন্দর

বন্দর (Port)—অন্যত্র রপ্তানীর জন্য যেখানে পণ্যসম্ভার জাহাজে (অথবা বিমানপোতে) বোঝাই করা হয় এবং যেখানে আমদানীকৃত মাল জাহাজ (অথবা বিমানপোত) হইতে খালাস করিয়া জলপথে বা স্থলপথে অন্যত্র প্রেরণ করা হয় সেই স্থানকে বন্দর বলে। বন্দর নৌপথ ও স্থলপথের সংযোগ-স্থল।

অবস্থান অনুসারে বন্দরের শ্রেণীবিভাগ (Classification of ports according to location)—বন্দর প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর, সামুদ্রিক ও নদীপ্রান্তিক। (১) **সামুদ্রিক বন্দর** (Ocean ports)—সামুদ্রিক বন্দরকে দেশের বহির্বাণিজ্যের দ্বার-পথ বলা যাইতে পারে। অবস্থান অনুসারে সামুদ্রিক বন্দরগুলিকে প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। (ক) দেশাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট উপসাগরের উপর অবস্থিত **উপসাগরীয় বন্দর** (Bay ports), যথা—যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন, ভারতের সুরাট ও কাম্বে প্রভৃতি। উপসাগরীয় বন্দরগুলির পোতাশ্রয় স্বভাবতঃ প্রশস্ত, নিরাপদ ও গভীর হইয়া থাকে। (খ) নদী-মোহানায় অবস্থিত **মোহানা বন্দর** (Estuarine ports), যেরূপ—গঙ্গার মোহানায় কলিকাতা, কর্ণফুলীর মোহানায় চট্টগ্রাম প্রভৃতি। নদীবাহিত প্রচুর পঙ্ক ও আবর্জনা নদী-মোহানায় সঞ্চিত হয় বলিয়া মোহানা বন্দরের পোতাশ্রয় সাধারণতঃ অগভীর হইয়া থাকে। (গ) সমুদ্রগামী বাণিজ্যপোত চলাচলের উপযোগী খালের উপর অবস্থিত **খালবন্দর** (Canal ports), যথা—সুয়েজ খালের উভয়প্রান্তে অবস্থিত সুয়েজ ও সৈয়দ বন্দর। (ঘ) **সমুদ্র উপকূলের মুক্ত বন্দর** (Open roadsteads)—এইরূপ বন্দরগুলি সময়ে সময়ে ভীষণ ঝটিকা, উত্তাল তরঙ্গ ও উর্মি-তাড়িত বালুরাশির প্রভাবে বহু অসুবিধা ভোগ করে। বোম্বন এই শ্রেণীর বন্দর। উপসাগর ও নদী মোহানার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত বন্দরগুলিই সর্বোৎকৃষ্ট। কারণ এই সমস্ত বন্দরের পোতাশ্রয়গুলি সাধারণতঃ নিরাপদ, গভীর ও প্রশস্ত হয় এবং এই সমস্ত বন্দর নদীপথে পশ্চাদ্ভূমির সহিত সুগম যাতায়াত-ব্যবস্থা রক্ষা করিতে পারে।

(২) **নদীপ্রান্তিক বন্দর** (River ports)—নদীপথে ভ্রমণকারী বাণিজ্যিক পোতসমূহ দূরদেশ হইতে আমদানীকৃত পণ্যসম্ভার যে স্থানে

জাহাজ হইতে নামাইয়া দেয় এবং দূরদেশে রপ্তানীর জন্য পণ্যসম্ভার যে স্থানে জাহাজে বোঝাই করে সেই স্থানকে নদীপ্রান্তিক বন্দর বলে। গোয়ালন্দ পূর্ব পাকিস্তানের বিখ্যাত নদীপ্রান্তিক বন্দর। তবে নিম্নলিখিত সুযোগসুবিধাগুলি বর্তমান না থাকিলে নদীপ্রান্তিক বন্দর দ্রুত উন্নতি করিতে পারে না। যেরূপ (১) যে নদীর উপর বন্দর গড়িয়া উঠিবে উহা সারা বৎসরই সুনাব্য থাকা প্রয়োজন। (২) নদীপ্রান্তিক বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি বিস্তৃত, জনবহুল ও বাণিজ্যিক পণ্যে সমৃদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। (৩) নদীপ্রান্তিক বন্দরের সহিত জলপথে বা স্থলপথে পশ্চাদ্‌ভূমির সহজ যাতায়াত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। (৪) নদী-প্রান্তিক বন্দর নৌপথ ও স্থলপথ (যথা—খুলনা) অথবা দুইটি নৌপথের সংযোগস্থলে (যথা—পদ্মা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে গোয়ালন্দ) অবস্থিত হইলে দ্রুত উন্নতি লাভ করে। (৫) নদীপ্রান্তিক বন্দরের পোতাশ্রয় আদর্শ হওয়া প্রয়োজন।

বাণিজ্যের প্রকৃতি অনুসারে বন্দরের শ্রেণীবিভাগ (Classification of ports according to the nature of trade)—বাণিজ্যের প্রকৃতি অনুসারে আবার বন্দরগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যথা, (ক) **আমদানী-প্রধান বন্দর (Import ports)**—যেরূপ, রুশিয়ার আর্কেঞ্জেল ও যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন বন্দর, (খ) **রপ্তানি-প্রধান বন্দর (Export ports)**—যেরূপ, রুশিয়ার ওডেসা ও আরবের মোকা বন্দর; (গ) **আড়তদারী বন্দর (Entrepots)**—যে বন্দর হইতে আমদানীকৃত পণ্য সম্পূর্ণরূপে স্থানীয় প্রয়োজনে ব্যবহৃত না হইয়া অন্যান্য দেশে রপ্তানী হইয়া যায় সেই বন্দরকে আড়তদারী বন্দর বলে। ভারত হইতে চা সাধারণতঃ লণ্ডন বন্দরে প্রেরিত হয় এবং লণ্ডন হইতে ঐ চা ইউরোপের নানা দেশে প্রেরিত হয়। সুতরাং ভারতীয় চা-এর ক্ষেত্রে লণ্ডন আড়তদারী বন্দর। এইরূপ হামবুর্গ, কলম্বো, সিঙ্গাপুর, হংকং, সাংহাই, সৈয়দ বন্দর আড়তদারী বন্দরের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

নিম্নলিখিত সুযোগসুবিধাগুলি বর্তমান থাকিলে আড়তদারী বন্দর দ্রুত উন্নতি লাভ করিতে পারে—(১) যে সমস্ত পণ্য লইয়া আড়তদারী বন্দর গড়িয়া উঠিবে সে সমস্ত পণ্য দীর্ঘকালস্থায়ী, সহজে বহনযোগ্য, অথচ উচ্চ-মূল্যের হওয়া প্রয়োজন। মশলা, রেশম, চা প্রভৃতি এই শ্রেণীর পণ্য। (২) বাণিজ্যিক পণ্যের উৎপত্তিস্থল এবং আমদানীকারক বন্দরের মধ্যে দূরত্ব যত অধিক হইবে আড়তদারী বন্দরের গুরুত্বও তত বৃদ্ধি পাইবে। (৩) আড়তদারী বন্দর দেশের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হওয়া প্রয়োজন, কারণ অবস্থান এইরূপ হইলে পণ্য আমদানী-রপ্তানী করা সহজসাধ্য হয়। (৪) যে সমস্ত অঞ্চল হইতে পণ্য আমদানী বা যে সমস্ত অঞ্চলে পণ্য রপ্তানী করা

হইবে সে সমস্ত অঞ্চলের সহিত আড়তদারী বন্দরের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন। (৫) রপ্তানীকারক ও আমদানীকারক দেশের মধ্যে প্রত্যক্ষ ব্যবসায় বা মুদ্রা বিনিময়ের অসুবিধা থাকিলে আড়তদারী বাণিজ্য প্রসার লাভ করে।

পোতাশ্রয়ের প্রকৃতি অনুসারে বন্দরের শ্রেণীবিভাগ (Classification of ports according to the nature of harbour)—পোতাশ্রয়ের প্রকৃতি হিসাবে বন্দরগুলিকে আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। (ক) যে সমস্ত বন্দরের পোতাশ্রয় স্বাভাবিক, সেগুলিকে বলে **স্বাভাবিক বন্দর (Natural ports)**, যথা—বোম্বাই, লিভারপুল, সিড্‌নী, স্যানফ্রান্সিসকো প্রভৃতি। (খ) যে সমস্ত বন্দরের পোতাশ্রয় কৃত্রিম, সেগুলিকে বলে **কৃত্রিম বন্দর (Artificial ports)**। মাদ্রাজ একটি কৃত্রিম বন্দর।

সামুদ্রিক বন্দরের গঠন ও উন্নতি (Conditions for the development of good sea-ports)—নিম্নলিখিত সুযোগগুলি বর্তমান থাকিলে সামুদ্রিক বন্দর দ্রুত উন্নতি লাভ করিতে পারে।

(১) **আদর্শ পোতাশ্রয় (Ideal harbour)**—নিম্নলিখিত সুযোগ-সুবিধাগুলি বর্তমান থাকিলে পোতাশ্রয় আদর্শস্থানীয় হয়। (ক) পোতাশ্রয়ের অভ্যন্তরভাগ বাত্যা, সমুদ্রস্রোত, তরঙ্গবিক্ষেপ প্রভৃতির প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। (খ) পোতাশ্রয় এবং উপকূল সন্নিহিত অঞ্চলে সমুদ্রের যথোপযুক্ত গভীরতা থাকা আবশ্যক। সিড্‌নী, লণ্ডন, বোম্বাই, করাচী, স্যানফ্রান্সিস্‌কো প্রভৃতি বন্দরের পোতাশ্রয় উপযুক্ত পরিমাণে গভীর বলিয়া এই সমস্ত বন্দর দ্রুত উন্নতিলাভ করিয়াছে। (গ) পোতাশ্রয় এবং ইহার সন্নিহিত অঞ্চলসমূহ সারাবৎসরই বরফ ও কুয়াশা হইতে মুক্ত থাকা প্রয়োজন। উত্তর রুশিয়ার উপকূলাঞ্চল বৎসরের অধিকাংশ সময়ই বরফাবৃত থাকায় এই অঞ্চলে কোন উন্নতিশীল বন্দর গড়িয়া উঠে নাই। (ঘ) অধিকসংখ্যক বাণিজ্যপোত যাহাতে একত্রে পোতাশ্রয়ে থাকিতে পারে ও চলাচল করিতে পারে তজ্জন্য পোতাশ্রয়টি প্রশস্ত হওয়া প্রয়োজন। (ঙ) উন্মুক্ত সমুদ্র হইতে পোতাশ্রয়ের প্রবেশপথ বিঘ্নহীন ও সহজ হওয়া এবং উভয় অঞ্চলের সমুদ্রতল যথাসম্ভব সমান হওয়া প্রয়োজন। হংকং বন্দরে বাণিজ্যপোতগুলি অত্যন্ত সহজভাবে জেটি পর্যন্ত পৌছিতে পারে। অপরপক্ষে কলিকাতা, নিউ অরলিয়ঁ, গুয়াকুইল প্রভৃতি বন্দরের প্রবেশপথ এরূপ বক্র ও বিঘ্নসংকুল যে উন্মুক্ত সমুদ্র হইতে এই সমস্ত বন্দরের জেটি পর্যন্ত পৌছিতে প্রচুর সময় ও যথেষ্ট সাবধানতার প্রয়োজন হয়। (চ) পোতাশ্রয় সন্নিহিত অঞ্চলে বাণিজ্যপোত মেরামত ও জেটি নির্মাণের উপযোগী পর্যাপ্ত স্থান থাকা প্রয়োজন।

(২) **ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা** (Accommodation facilities)—বন্দরে বাণিজ্যপোতে ও বাণিজ্যপোত হইতে পণ্য বোঝাই ও খালাসের সুবিধা, যাত্রীদের আরোহণ ও অবরোহণের সুবিধা, পণ্য-উত্তোলক যন্ত্র, পণ্য মজুত রাখিবার ছাউনী, জেটি হইতে গুদামঘর পর্যন্ত পণ্যচলাচলের সুবিধার জন্য জলপথে ও স্থলপথে যাতায়াত ব্যবস্থা, পোতসমূহ মেরামতের জন্য সুযোগ্য স্থান, বন্দরের সন্নিকটে ইন্ধন দ্রব্য ও সুপেয় জল, স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া প্রভৃতি বর্তমান থাকা একান্ত প্রয়োজন। বন্দরের অবস্থান বিস্তৃত সমভূমি অঞ্চলে হইলে ব্যবসা-বাণিজ্যের এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

(৩) বিস্তৃত, জনবহুল, সমৃদ্ধ ও সহজ পরিবহনব্যবস্থাসম্পন্ন **পশ্চাদ্‌ভূমি** (Hinterland)—যে সকল অঞ্চলের রপ্তানীদ্রব্য কোন একটি বন্দরের মধ্য দিয়া বিদেশে প্রেরিত হয় এবং ঐ বন্দরের মধ্য দিয়া আনীত পণ্য যে সমস্ত অঞ্চলে বণ্টিত হয় সেই সমস্ত অঞ্চলকে ঐ বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি (Hinterland) বলে। যথা—পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম এবং উত্তরপ্রদেশের কিয়দংশ কলিকাতা বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমির অন্তর্গত, কারণ বঙ্গদেশের পাট, আসামের চা, উড়িষ্যা ও বিহারের লৌহ, লৌহ আকরিক ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ প্রভৃতি দ্রব্য কলিকাতা বন্দরের মধ্য দিয়া বিদেশে রপ্তানী হয়। আবার যন্ত্রপাতি, কার্পাসজাত দ্রব্য কলিকাতা বন্দর দিয়া এই সমস্ত অঞ্চলে বণ্টিত হয়। কোন কোন বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমির সুনির্দিষ্ট সীমারেখা নির্ণয় করা সম্ভব নহে, কারণ, অনেক সময় একই অঞ্চলের পণ্যদ্রব্য দুই বা ততোধিক বন্দর মারফৎ রপ্তানী হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে রাইন নদীর অববাহিকার পণ্য জার্মানীর ব্রিমেন, হল্যাণ্ডের রটারডাম এমন কি অনেক সময় বেলজিয়ামের আন্টোয়ার্প বন্দর মারফৎও রপ্তানী হইয়া থাকে। অনেক সময় আবার রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাদ্‌ভূমিরও পরিবর্তন সাধিত হয়। যেরূপ পূর্ববঙ্গ পূর্বে কলিকাতা বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমির অন্তর্ভুক্ত ছিল কিন্তু বর্তমানে উহা চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তবে বাণিজ্যের প্রকৃতি অনুসারে পশ্চাদ্‌ভূমি আমদানীপ্রধান (distributory) বা রপ্তানীপ্রধান (contributory) হইতে পারে।

বন্দরের উন্নতি বিশেষ করিয়া নির্ভর করে উহার পশ্চাদ্‌ভূমির বিস্তার ও সমৃদ্ধির উপর। পশ্চাদ্‌ভূমি, **প্রথমতঃ**, সমৃদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। কলিকাতা বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি উর্বর ও সমৃদ্ধ হওয়ায় এই বন্দরের রপ্তানী বাণিজ্য অত্যন্ত অধিক এবং এই বন্দর এত উন্নতিশীল। অপরপক্ষে সিন্ধুনদের মোহানায় অবস্থিত করাচী বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি অপেক্ষাকৃত অনুর্বর বলিয়া উহা বন্দর হিসাবে কলিকাতা অপেক্ষা নিকৃষ্ট। **দ্বিতীয়তঃ**, পশ্চাদ্‌ভূমি জনবহুল হওয়া

প্রয়োজন। জনবহুল পশ্চাদ্ভূমির চাহিদা মিটাইতে বহুল পরিমাণ পণ্যদ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। কলিকাতা, বোম্বাই, লণ্ডন, হামবুর্গ, নিউইয়র্ক, হংকং, সাংহাই প্রভৃতি পৃথিবীর সমস্ত প্রসিদ্ধ বন্দর বিস্তৃত, জনবহুল ও সমৃদ্ধ পশ্চাদ্ভূমির জন্যই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অপরপক্ষে আফ্রিকার নিরক্ষীয় অঞ্চলগুলিতে বাণিজ্যিক পণ্যের অপ্রতুলতা থাকায় এবং ঐ সমস্ত অঞ্চল জনবিরল হওয়ায় উল্লেখযোগ্য বন্দর বিশেষ ভাবে গড়িয়া উঠে নাই। **তৃতীয়তঃ**, বন্দরের সহিত পশ্চাদভূমির যোগাযোগ রক্ষার জন্য জলপথ বা স্থলপথে যাতায়াতের সহজ ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন। সহজ যাতায়াত ব্যবস্থার বিস্তারের উপর পশ্চাদ্ভূমির বিস্তৃতি বিশেষভাবে নির্ভর করে। **চতুর্থতঃ**, পশ্চাদ্ভূমির অধিবাসীদের বাণিজ্যে আসক্তি থাকা প্রয়োজন।

কখনও কখনও একই পশ্চাদ্ভূমিকে কেন্দ্র করিয়া একাধিক বন্দর গড়িয়া উঠে। ভারতের পশ্চিম উপকূলের অন্তর্গত ওখা পোরবন্দর, কাম্বে, ব্রোচ, সুরাট প্রভৃতি বন্দরগুলি প্রায় একই পশ্চাদভূমিকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে যে বন্দরে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ অধিক এবং আমদানী-রপ্তানীর ব্যয় অপেক্ষাকৃত অল্প সেই বন্দরের উন্নতি দ্রুত হয়।

নিউইয়র্ক পৃথিবীর একটি উন্নতিশীল বন্দর। ইহার পোতাশ্রয় আদর্শ-স্থানীয় এবং পশ্চাদ্ভূমিও বিশেষ সমৃদ্ধ ও জনবহুল। বন্দর হইতে রেলপথে বিভিন্ন অঞ্চলে যাওয়া যায়। এই সমস্ত কারণে এই বন্দর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। পক্ষান্তরে প্যারা একটি সামুদ্রিক বন্দর, কিন্তু ইহার পশ্চাদভূমি বিশেষ সমৃদ্ধ না হওয়ায় উহা বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই।

নগর ও বাণিজ্য কেন্দ্র

নগর ও বাণিজ্য কেন্দ্র সৃষ্টির কারণ (Factors responsible for the growth of towns and trade centres)—নগর ও বাণিজ্য কেন্দ্র সৃষ্টির প্রধান প্রধান কারণ আমরা নিম্নলিখিত ভাবে নিদেশ করিতে পারি :—

(১) **তীর্থস্থান** স্বভাবতঃই জনসমাগমের ফলে বাণিজ্যকেন্দ্র ও নগরে পরিণত হয়, যথা—মক্কা, কাশী, গয়া, লাসা প্রভৃতি। (২) **স্বাস্থ্যকর স্থান**ও জনসমাগমের ফলে নগরে পরিণত হয়, যথা—ওয়ালটেয়ার, চুনার, মধুপুর, দার্জিলিং, সারাটোগা, ভিসি, বাথ ইত্যাদি। (৩) **শিক্ষাকেন্দ্র** হিসাবেও পৃথিবীতে বহু নগরের সৃষ্টি হইয়াছে, যথা—শান্তিনিকেতন, আলিগড়, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ প্রভৃতি। (৪) **ঐতিহাসিক ও রাজ-নৈতিক ক্ষেত্র**ও শহরে পরিণত হয়, যথা—আগ্রা, মুর্শিদাবাদ, টোকিও,

ব্যাংকক, দিল্লী প্রভৃতি। (৫) সামরিক সঙ্কটক্ষেত্রের কেন্দ্ররূপে ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য **দুর্গাবাস**রূপে বহু নগরের সৃষ্টি হইয়াছে, যথা—কোয়েটা, পেশোয়ার, জিব্রাল্টার, ইস্তাম্বুল প্রভৃতি। (৬) **বৈষয়িক সম্পদের প্রাচুর্য** হেতু নারায়ণগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, আসানসোল, কোডারমা প্রভৃতি স্থান শহরে পরিণত হইয়াছে। (৭) **শক্তি সম্পদের** কেন্দ্রস্থলে বহু নগরের উৎপত্তি হয়। যথা—কয়লার প্রাচুর্যহেতু রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া, তৈলের প্রাচুর্যহেতু ডিগবয়, এবং জলশক্তির কেন্দ্র হিসাবে ভারতের শিবসমুদ্রম্ বিখ্যাত নগরে পরিণত হইয়াছে। (৮) **পর্বত ও সমভূমির সঙ্গমস্থলে** কালক্রমে নগরের উৎপত্তি হয়। যথা—ইতালীর মিলান, আসামের ইম্ফল প্রভৃতি (৯) **বাণিজ্যপথের সংযোগ-ক্ষেত্রে** শহর গড়িয়া উঠে, যথা—এলাহাবাদ, লীয়ঁ, মানাওস ইত্যাদি শহর নদনদীর সঙ্গমক্ষেত্রে অবস্থিত। উইনিপেগ, শিকাগো, টরন্টো প্রভৃতি বিমানপথের সংযোগক্ষেত্রের শহর এবং কায়রো, ভিয়েনা, দিল্লী প্রভৃতি নগর দুই বা ততোধিক স্থলপথের সংযোগক্ষেত্রে অবস্থিত। (১০) **শ্রমশিল্প-কেন্দ্র** শহরে পরিণত হয়, যথা—জামসেদপুর, ম্যাঞ্চেস্টার, পিটস্‌বার্গ প্রভৃতি। (১১) **বাণিজ্যকেন্দ্রে** নগরের উৎপত্তি হয়, যথা—মুলতান, শিকারপুর, শিকাগো ইত্যাদি। (১২) পণ্যবহনের পদ্ধতির পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বহু নগরের উদ্ভব ঘটিয়া থাকে। পৃথিবীর সামুদ্রিক বন্দরসমূহ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। পৃথিবীতে ১ লক্ষ অধিবাসী-সম্পন্ন ছয় শতেরও অধিক নগরী রহিয়াছে। ইহার প্রায় ৪০% ইউরোপ মহাদেশেই বিদ্যমান।

তবে এ প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, এভাবে খুঁটিয়া খুঁটিয়া কারণ নির্দেশ করার পদ্ধতি ব্যবপরনাই কৃত্রিম। কোনও শহরই সামান্য একটি কি দুইটি কারণে গড়িয়া উঠে না, প্রত্যেকটি শহরেরই উৎপত্তি ঘটে বহুবিধ জটিল কার্য-কারণ-পরম্পরার পারস্পরিক সম্বন্ধের ফলে। উত্তর প্রদেশের কাশী, তিব্বতের লাসা, আরবের মক্কা প্রভৃতি শুধু তীর্থস্থান বলিয়াই শহরে পরিণতি লাভ করে নাই, এগুলি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্র এবং বহু পথের স্বাভাবিক মিলনক্ষেত্রও বটে।

পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্রসমূহ
(Important Ports and Trade Centres of the World)

অস্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ড: সিড্‌নী (Sydney)—অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলে অবস্থিত নিউ সাউথ ওয়েলস্ রাজ্যের রাজধানী সিড্‌নী শহর অস্ট্রেলিয়ার শ্রেষ্ঠ বন্দর, উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয়, বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র এবং সামুদ্রিক বাণিজ্যপথের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি অতি সমৃদ্ধ এবং রেল-

পথ দ্বারা বন্দরটির সহিত সংযুক্ত। পশম, গম, মাখন ও অন্যান্য দুগ্ধজাত দ্রব্য, ফল প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য। ইহা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পশম-কেন্দ্র। **মেলবোর্ন** (Melbourne)—অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত ভিক্টোরিয়া রাজ্যের রাজধানী মেলবোর্ন অস্ট্রেলিয়ার শ্রেষ্ঠ বিমান বন্দর, দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর ও সামুদ্রিক বন্দর এবং উল্লেখযোগ্য শিল্প ও পশম কেন্দ্র। এই বন্দরের পোতাশ্রয় স্বাভাবিক। পশম, মাংস, গম, দুগ্ধজাত দ্রব্য, স্বর্ণ প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য। **ব্রিসবেন** (Brisbane)—ব্রিসবেন নদীমুখে অবস্থিত ব্রিসবেন, কুইন্সল্যাণ্ড রাজ্যের রাজধানী, শিল্প-কেন্দ্র ও প্রধান বন্দর। কুইন্সল্যাণ্ড রাজ্যের কৃষি ও শিল্পপ্রধান অঞ্চল এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি। পশম, হিমায়িত মাংস, পশুচর্ম, ফল, দুগ্ধজাত দ্রব্য, স্বর্ণ, তাম্র, শর্করা প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য। **অ্যাডিলেড** (Adelaide)—দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ও বন্দর, একটি উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয় এবং গম, ময়দা, খনিজদ্রব্য, পশুচর্ম, সংরক্ষিত মাংস, ফল, মদ্য, প্রভৃতির রপ্তানীকেন্দ্র। **ওয়েলিংটন** (Wellington)—কুক প্রণালীপথে অবস্থিত ওয়েলিংটন নিউজীল্যাণ্ডের রাজধানী ও সামুদ্রিক বাণিজ্য পথের কেন্দ্রস্থল। ইহা দেশটির একটি উল্লেখযোগ্য ক্রয়বিক্রয় কেন্দ্রও বটে।

দক্ষিণ আমেরিকা: বুয়েনস আয়ার্স (Buenos Aires)—প্লাতা নদীর মোহানার সমভূমির উপর অবস্থিত বুয়েনস আয়ার্স আর্জেন্টিনার রাজধানী, রেলকেন্দ্র ও তৎস্থানের তথা সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম শহর, পোতাশ্রয় ও বন্দর। আর্জেন্টিনার সমগ্র কৃষিপ্রধান অঞ্চল লইয়া গঠিত ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি বিভিন্ন দিকে বিস্তৃত রেলপথ দ্বারা এই বন্দরের সহিত সংযুক্ত। গম, যব, ভুট্টা, তিসি, হিমায়িত মাংস, মাংসনির্যাস, চর্ম, পশম, দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য এবং কয়লা, কার্পাস-বস্ত্র, যন্ত্রপাতি, নানাপ্রকার তৈল প্রভৃতি প্রধান আমদানী দ্রব্য। **রায়ো-ডি-জেনেরো** (Rio-de-Janeiro)—আটলান্টিক মহাসাগর তীরে অবস্থিত রায়ো-ডি-জেনেরো দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত ব্রাজিলের রাজধানী ও উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয়যুক্ত প্রধান সামুদ্রিক বন্দর। সাওপোলো, মিনেস্ গেরায়েস্, পানামা এবং ট্রাভেসিয়া লইয়া গঠিত ইহার সমৃদ্ধ পশ্চাদ্‌ভূমি বন্দরের সহিত রেলপথে সংযুক্ত। কফি, কোকো, রবার, তামাক, চর্ম, ম্যাঙ্গানীজ, লৌহ আকরিক প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান রপ্তানী এবং কয়লা, কার্পাসবস্ত্র, খাদ্য-দ্রব্য, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি প্রধান আমদানী দ্রব্য। **ভ্যালপ্যারাইজো** (Valparaiso)—প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে অবস্থিত দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত চিলির প্রধান বন্দর ও উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয়। চিলির খনি অঞ্চলগুলি এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমির অন্তর্গত। তাম্র, রৌপ্য, সোরা, পশম, গম এবং

চিলির ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে উৎপন্ন নানাবিধ ফল এই বন্দরের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য। আমদানী দ্রব্যের মধ্যে শিল্পজাত সামগ্রীই প্রধান। রেলপথে এই বন্দর বুয়েনশ আয়ার্সের সহিত সংযুক্ত। **মন্টিভিডিও (Montevideo)**—উরুগুয়ের রাজধানী ও প্রশস্ত পোতাশ্রয়যুক্ত প্রধান বন্দর। তবে সমুদ্রতল অগভীর বলিয়া সমুদ্রগামী বাণিজ্যপোতসমূহ জেটি হইতে ২.৩ মাইল দূরে নোঙর করে। পশম, মাংস, দুগ্ধজাত দ্রব্য, চর্ম, গম প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য এবং কয়লা, খনিজ তৈল, লৌহ ও ইস্পাত, যন্ত্রপাতি, কলকব্জা প্রভৃতি প্রধান আমদানী দ্রব্য।

আফ্রিকা: আলেকজান্দ্রিয়া (Alexandria)—ভূমধ্যসাগর-তীরে সুয়েজ খালের পথে নীল নদের ব-দ্বীপের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত আলেকজান্দ্রিয়া মিশরের সর্বপ্রধান বন্দর এবং উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর। নীল নদের সমগ্র উপত্যকা অঞ্চল এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি। কার্পাস, কার্পাসবীজ, চিনি, ভুট্টা, চাউল ও নানাবিধ ফল এই বন্দরের প্রধান রপ্তানী এবং কয়লা, ময়দা, তামাক, কাষ্ঠ ও ধাতুদ্রব্য প্রধান আমদানী দ্রব্য। **কায়রো** (Cairo)—নীলনদের পূর্বতীরে বদ্বীপের প্রান্তদেশে অবস্থিত কায়রো মিশরের রাজধানী, উন্নত শহর ও বিমান বন্দর। **সৈয়দ বন্দর** (Port Said)—সুয়েজ খালের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত সৈয়দ মিশরের উল্লেখযোগ্য বন্দর এবং মধ্য প্রাচ্যের বিখ্যাত আড়তদারী কেন্দ্র। এখান হইতে জলপথে পৃথিবীর সমস্ত উল্লেখযোগ্য বন্দরের সহিত মিশরের যোগাযোগ রহিয়াছে। এখানে জাহাজে কয়লা সরবরাহের ব্যবস্থা রহিয়াছে। আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় এই বন্দরের গুরুত্ব অত্যধিক। **ডারবান** (Durban)—দক্ষিণ আফ্রিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত নাটাল প্রদেশের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত ডারবান নাটালের প্রধান বন্দর ও উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয় এবং সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দর। কৃষিজ ও খনিজ দ্রব্যে সমৃদ্ধ ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি বন্দরটির সহিত রেলপথে সংযুক্ত। কয়লা, স্বর্ণ, তাম্র, চর্ম, গম, ভুট্টা, ইক্ষু, চাউল প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য। **কেপ টাউন** (Cape Town)—দক্ষিণ আফ্রিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদেশের রাজধানী, শ্রেষ্ঠ বন্দর ও পোতাশ্রয়। **জোহানেসবার্গ** (Johannesburg)—দক্ষিণ আফ্রিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত জোহানেসবার্গ ট্রান্সভাল রাজ্যের তথা সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকার বৃহত্তম নগর এবং বিখ্যাত স্বর্ণখনি অঞ্চল। **মোম্বাসা** (Mombasa)—ব্রিটিশ পূর্ব আফ্রিকার অন্তর্গত মোম্বাসা কেনিয়া রাজ্যের বিখ্যাত বন্দর।

উত্তর আমেরিকা: মন্ট্রিল (Montreal)—আটলান্টিক মহাসাগরের তীর হইতে দেশের ১৬০০ কি. মি. অভ্যন্তরে সেন্ট লরেন্স নদীর একটি

দ্বীপের উপর অবস্থিত মন্ট্রিল ক্যানাডার সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর, উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয় ও শিল্পকেন্দ্র। বন্দরটি জলপথে ও স্থলপথে নিউ ইয়র্কের সহিত সংযুক্ত। ক্যানাডার পূর্বাঞ্চলের কৃষি ও খনি অঞ্চলগুলি এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি। এই বন্দর শীতকালে বরফাচ্ছন্ন থাকে। গম, ভুট্টা, নিকেল, রৌপ্য, তাম্র, কাষ্ঠ, কাষ্ঠমণ্ড, দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য। আমদানী দ্রব্যের মধ্যে যন্ত্রপাতি, কার্পাসবস্ত্র ও পশমবস্ত্রই প্রধান। মন্ট্রিল পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ গম ও ময়দা রপ্তানীর বন্দর। **ভ্যানকুভার** (Vancouver)—প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে ভ্যান্‌কুভার দ্বীপের পশ্চাদ্‌ভাগে ফ্রেজার নদীর তীরে অবস্থিত ভ্যান্‌কুভার ক্যানাডার পশ্চিম উপকূলের প্রধান বন্দর, উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয় ও রেলকেন্দ্র। ক্যানাডার পশ্চিম-প্রেয়রী অঞ্চল এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি। মৎস্য, তাম্র, রৌপ্য, কাগজ, গম, কাষ্ঠ প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য এবং লৌহ ও ইস্পাতের যন্ত্রপাতি ও শর্করা প্রধান আমদানী দ্রব্য।

নিউ ইয়র্ক (New York)—পূর্ব উপকূলে হাড্‌সন নদীমুখে মানহাট্টান দ্বীপের উপর অবস্থিত নিউইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান শিল্প-বাণিজ্যকেন্দ্র, সর্ব প্রধান নগর, উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয় ও শ্রেষ্ঠ বন্দর এবং পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর। পেন্‌সিলভ্যানিয়া ও নিউ ইংল্যাণ্ডের শিল্পাঞ্চল এবং হ্রদ অঞ্চল এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি। এই বন্দর দিয়া কার্পাস, গম, ময়দা, ভুট্টা, মাংস, দুগ্ধজাত দ্রব্য, তাম্র, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি রপ্তানী হয় এবং রবার, কফি, চর্ম, শর্করা, রাং প্রভৃতি আমদানী হয়। **বোস্টন** (Boston)—যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত বোস্টন নিউ ইংল্যাণ্ড রাজ্যের প্রধান উপসাগরীয় বন্দর, উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয় এবং উল্লেখযোগ্য পশম-বাণিজ্যের কেন্দ্র। ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি নিউ ইংল্যাণ্ডের শিল্পপ্রধান অঞ্চলসমূহের সহিত ইহা রেলপথে সংযুক্ত। কার্পাস, পশম, চর্ম প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান আমদানী দ্রব্য এবং মেষ-মাংস, দুগ্ধজাত দ্রব্য, কার্পাস বস্ত্র প্রভৃতি প্রধান রপ্তানী দ্রব্য। যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য বন্দর অপেক্ষা বোস্টন ইউরোপীয় বন্দরসমূহের নিকটতম। **বাল্‌টিমোর** (Baltimore)—চিজাপীক উপসাগরের উপর অবস্থিত বাল্‌টিমোর দঃ পূঃ যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রধান নগর, একটি উল্লেখযোগ্য বন্দর ও শিল্পবাণিজ্য-কেন্দ্র। ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি মধ্য আপালাচিয়ানের শিল্প ও খনি অঞ্চলের সহিত জলপথে এই বন্দর সংযুক্ত। তাম্র, ভুট্টা, গম, ময়দা ও তামাক এই বন্দরের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য। আমদানী দ্রব্যের মধ্যে লৌহ আকরিক, নানাপ্রকার সার ও ফলই প্রধান। **পিটস্‌বার্গ** (Pittsburg)—যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভ্যানিয়া খনি অঞ্চলের মধ্যগত পিটস্‌বার্গ যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র। ইহা কাঁচ শিল্পের অন্যতম কেন্দ্রও বটে। **নিউ অরলিন্স** (New Orleans)—

মিসিসিপি নদীর মোহানায় অবস্থিত নিউ অরলিয়ঁ মেক্সিকো উপসাগর অঞ্চলের প্রধান বন্দর, যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় প্রধান বন্দর এবং কার্পাস ব্যবসায়ের সর্বপ্রধান কেন্দ্র। সমুদ্রগামী বাণিজ্য-পোতসমূহের জেটি পর্যন্ত যাতায়াতের সুবিধার জন্য সর্বদা নদীগর্ভের মৃত্তিকা খনন করিয়া নদীর গভীরতা বৃদ্ধি করাইতে হয়। কৃষিজ সম্পদে সমৃদ্ধ মিসিসিপি অববাহিকার অতি বিস্তৃত ভূখণ্ড এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি। কার্পাস, তৈল, কাষ্ঠ, গম, মাংস, মাংসজাত দ্রব্য প্রভৃতি এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমির প্রধান প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। কফি, শর্করা, ফল, সিসল শণ, চট প্রভৃতি এই বন্দরেব প্রধান আমদানী দ্রব্য। **গ্যালভেস্টন** (Galveston)—যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে গ্যালভেস্টন উপসাগর মুখে অবস্থিত গ্যালভেস্টন বন্দর দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানতম বন্দব। কার্পাস রপ্তানীর ক্ষেত্রে এই বন্দর পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। **লস্ এঞ্জেলস্** (Los Angeles)—যুক্তরাষ্ট্রেব পশ্চিম উপকূলে সমুদ্র হইতে দেশের ৩২ কি. মি. অভ্যন্তরে অবস্থিত লস্ এঞ্জেলস্ একটি উল্লেখযোগ্য কৃত্রিম বন্দর এবং চলচ্চিত্র শিল্পের প্রধান কেন্দ্রস্থল (হলিউড)। সমগ্র ক্যালিফোর্নিয়া এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি। ফল এই বন্দরেব প্রধান রপ্তানী দ্রব্য। **সীটল** (Seattle)—যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলে পাগেটসাউণ্ডের উপর অবস্থিত সীটল একটি উল্লেখযোগ্য বন্দর এবং উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয়। ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি অধিক বিস্তৃত নহে। কাষ্ঠ, গম, মৎস্য, ফল প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য। **স্যান ফ্রান্সিস্‌কো** (San Francisco)—যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলে স্যান্ ফ্রান্সিস্‌কো উপসাগরের মোহানায় অবস্থিত স্যান্ ফ্রান্সিস্‌কো ক্যালিফোর্নিয়ার রাজধানী, রেলকেন্দ্র, উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয় ও প্রধান বন্দর। সমগ্র ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যই এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি। গম, যব, ফল, খনিজ তৈল, স্বর্ণ প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য। চা, রেশম, চিনি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদিই এই বন্দরের প্রধান আমদানী। পানামা খাল কাটার পর হইতে এই বন্দরের গুরুত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। **শিকাগো** (Chicago)—মিচিগান হ্রদের দক্ষিণে অবস্থিত শিকাগো যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত শিল্প, বাণিজ্য ও রেলকেন্দ্র এবং রেলপথে মিসিসিপি নদীর উপত্যকা অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত। ইহা মাংস ও গম রপ্তানীর প্রধান কেন্দ্র এবং ইস্পাত শিল্পের কেন্দ্র হিসাবে বিখ্যাত।

ইউরোপ : লণ্ডন (London)—টেমস নদীর উভয় তীরে সমুদ্র হইতে ৮৮ কি. মি. অভ্যন্তরে অবস্থিত লণ্ডন নগরী যুক্তরাজ্যের রাজধানী, পৃথিবীর বৃহত্তম নগর, শ্রেষ্ঠ সামুদ্রিক ও আড়তদারী বন্দর, বিখ্যাত রেল ও শিল্পকেন্দ্র। পৃথিবীর প্রধান বাণিজ্যপথগুলির সহিত লণ্ডনের যোগাযোগ রহিয়াছে। চা, কফি, রবার, তামাক এবং অন্যান্য ক্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল, পশম, দুগ্ধজাত দ্রব্য,

চর্ম, গম, ভুট্টা, কার্পাস প্রভৃতি দ্রব্য এই বন্দরে আমদানী হয়। **লিভারপুল** (Liverpool)—ইংল্যাণ্ডের পশ্চিম উপকূলে মার্স নদীর মোহানায় অবস্থিত লিভারপুল ইংল্যাণ্ডের একটি উল্লেখযোগ্য বন্দর, রাসায়নিক ও কার্পাস শিল্পকেন্দ্র এবং বিমান-বন্দর। দক্ষিণ ল্যাঙ্কাশায়ার, ইয়র্কশায়ার, স্ট্যাফর্ডশায়ার এবং চেশায়ার অঞ্চল এই বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি। ম্যাঞ্চেস্টারের কার্পাস দ্রব্য এবং অন্যান্য শিল্পাঞ্চলের দ্রব্যাদি এই বন্দরের রপ্তানী দ্রব্য এবং কার্পাস, গম ও নানাবিধ জান্তব পদার্থ ইহার আমদানী দ্রব্য। এই বন্দর দিয়া প্রধানতঃ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ব্যবসাবাণিজ্য পরিচালিত হয়। লিভারপুল ও ম্যাঞ্চেস্টারের মধ্যে "ম্যাঞ্চেস্টার খাল" দ্বারা এই বন্দরকে জলপথে শিল্পাঞ্চলগুলির সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে। **ম্যাঞ্চেস্টার** (Manchester) —ইংল্যাণ্ডের অন্তর্গত পিনাইন পর্বতমালার পশ্চিমে মার্সের উপনদী ইরওয়েল-এর তীরে অবস্থিত ম্যাঞ্চেস্টার গ্রেট ব্রিটেনের একটি উল্লেখযোগ্য অন্তর্দেশীয় বন্দর, শ্রেষ্ঠ কার্পাস শিল্পাঞ্চল, এবং আমদানীকৃত কার্পাসের বিতরণ-কেন্দ্র। সমুদ্রগামী বাণিজ্য-পোতসমূহ ম্যাঞ্চেস্টার খালপথে লিভারপুল হইতে ম্যাঞ্চেস্টার পযন্ত চলাচল করে। **বার্মিংহাম** (Birmingham)—ইংল্যাণ্ডের মধ্যভাগের ঈষৎ আন্দোলিত সমভূমির অন্তর্গত বার্মিংহাম একটি উল্লেখযোগ্য শিল্পবাণিজ্যকেন্দ্র। এতদঞ্চলের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বার্মিংহাম নল, পিন, ছিপ এবং মোটরগাড়ী নির্মাণে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করিয়াছে। এই বন্দরের উপকূলীয় বাণিজ্যের পরিমাণও অধিক। **সাদাম্পটন** (Southampton)—ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত একটি বিখ্যাত যাত্রী-বন্দর, উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয় এবং আমেরিকা হইতে আগত জাহাজ সমূহের সর্বপ্রথম ও প্রধান ঘাঁটি। বন্দরটি রেল, স্থল ও জলপথে ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন অংশের সহিত সংযুক্ত। গম, মাংস প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য এবং নানাবিধ কাঁচা-মাল এই বন্দরের আমদানী দ্রব্য এবং রাসায়নিক দ্রব্য, লৌহ ও ইস্পাত প্রভৃতি রপ্তানী দ্রব্য। **হাল** (Hull)—ইহা ইংল্যাণ্ডের পূর্ব উপকূলে হাম্বার নদীমুখে অবস্থিত একটি উল্লেখযোগ্য বন্দর এবং উত্তর সাগরের মৎস্য আহরণ ও মৎস্য ব্যবসায়ের একটি বিখ্যাত কেন্দ্র। গম, মাংস, পশম, মাখন, তৈল ও তৈলবীজ, লৌহ আকর প্রভৃতি এই বন্দরের আমদানী দ্রব্য এবং মৎস্য ও তৎসংক্রান্ত দ্রব্যাদি, কার্পাস ও পশম বস্ত্র, কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য প্রভৃতি প্রধান রপ্তানী দ্রব্য। **কার্ডিফ** (Cardiff)—দঃ ওয়েল্সের দঃ পুঃ প্রান্তে টাফ নদীর মোহানার নিকট অবস্থিত কার্ডিফ গ্রেট ব্রিটেনের তথা সমগ্র পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য কয়লা রপ্তানীর বন্দর। বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে কয়লার চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় এই বন্দরের উন্নতি ব্যাহত হইয়াছে। কাষ্ঠ, খাদ্যশস্য ও লৌহ আকরিক এই বন্দরের বাণিজ্যিক পণ্য। ইহা একটি লৌহ

ও ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র। **গ্লাসগো** (Glasgow)—ক্লাইড নদীর মোহানায় অবস্থিত গ্লাসগো স্কটল্যাণ্ডের বিখ্যাত বন্দর ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাহাজ নির্মাণ-কেন্দ্র। স্কটল্যাণ্ডের ঘন বসতিপূর্ণ শিল্প ও খনি অঞ্চলসমূহ এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি। এই স্থানের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, পশম ও কার্পাস শিল্প, শর্করা ও নানাবিধ রাসায়নিক শিল্প উল্লেখযোগ্য। **এ্যাবারডিন** (Aberdeen)—স্কটল্যাণ্ডের একটি উন্নতিশীল শিল্পনগরী ও বিখ্যাত বন্দর। পশমজাত দ্রব্য, গালিচা, লিনেন, রাসায়নিক দ্রব্য, ক্যাম্বিস প্রভৃতি এতদঞ্চলের প্রধান প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এস্থানে একটি অতি বৃহৎ চিরুনীর কারখানা রহিয়াছে।

ডানজিগ (Danzig)—ভিশ্চুলা নদীর মোহানায় অবস্থিত ডানজিগ পোল্যাণ্ডের বাল্টিক-তীরস্থ বিখ্যাত বন্দর, শিল্প ও জাহাজনির্মাণ কেন্দ্র। শীতকালে এই বন্দর বরফাবৃত থাকে বলিয়া সেই সময়ে এই বন্দরের বাণিজ্য সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়। **হামবুর্গ** (Hamburg)—এল্‌ব নদীতীরে অবস্থিত হামবুর্গ জার্মানীর সর্বপ্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ও নদীবন্দর এবং উঃ পঃ ইউরোপের বিখ্যাত আড়তদারী কেন্দ্র। ইহা নদী-মোহানা হইতে প্রায় ৭০ মাইল অভ্যন্তরে অবস্থিত হওয়ায় মোহানার নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে পঙ্কোদ্ধার করিয়া এই বন্দরের উন্নতি সাধন করা হইয়াছে। জলপথে ও স্থলপথে জার্মানীর সমভূমি অঞ্চলের সহিত হামবুর্গ সংযুক্ত। কফি, কোকো, শর্করা, কয়লা, কার্পাস, পশম ও শিল্পজাত দ্রব্য ইহার প্রধান আমদানী। শিল্পজাত দ্রব্য, লবণ, শর্করা ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদিই এই বন্দরের প্রধান রপ্তানী। **রটারডাম** (Rotterdam)—রাইন ও মার্স (মিউজ) নদীর সম্মিলিত মোহানার নিকট অবস্থিত রটারডাম হল্যাণ্ডের একটি বিখ্যাত বন্দর ও জাহাজ-নির্মাণ-কেন্দ্র। 'নিউ ওয়াটারওয়ে' খালপথে সমুদ্রগামী বাণিজ্যপোত-সমূহ উত্তর সাগর হইতে নিরাপদে বন্দরে পৌছিতে পারে। সমগ্র রাইন অববাহিকা এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি। দুগ্ধজাত দ্রব্য, গবাদি পশু প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান রপ্তানী এবং তামাক, রবার, চা, কার্পাস, চাউল, শর্করা, কয়লা, খনিজতৈল প্রভৃতি আমদানী দ্রব্য। **আন্টোয়ার্প** (Antwerp)—সেল্ড নদীর মোহানায় অবস্থিত আন্টোয়ার্প বেলজিয়ামের একটি উল্লেখযোগ্য বন্দর, আড়তদারী শিল্প কেন্দ্র এবং উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয়। বেলজিয়াম, পূর্ব ফ্রান্স, রাইন উপত্যকা ও রূঢ় প্রদেশের খনি অঞ্চলসমূহ এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি। ইহা হীরক কাটিবার ও পালিশ করিবার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। খাদ্যশস্য, শর্করা, কফি, কার্পাস, পশম, চর্ম, লৌহ-আকরিক, কয়লা, খনিজতৈল প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান আমদানী এবং যন্ত্রপাতি, লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য, কার্পাস দ্রব্য, কাচ, তিসি ও দুগ্ধজাত দ্রব্যই প্রধান রপ্তানী। **লিসবন** (Lisbon)—টেগাস নদীর মোহানার নিকট অবস্থিত লিসবন পর্তুগালের রাজধানী,

উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয়, শিল্পকেন্দ্র এবং প্রধান বন্দর। এই বন্দর দিয়া কৃষিজ দ্রব্য রপ্তানী ও শিল্পজাত দ্রব্য আমদানী হয়। **জিব্রাল্টার** (Gibraltar)—আটলান্টিক মহাসাগর হইতে ভূমধ্যসাগরের প্রবেশপথে সংকীর্ণ জিব্রাল্টার প্রণালী অবস্থিত। ইহারই সন্নিকটে স্পেনের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত জিব্রাল্টার একটি রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ এবং উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয়যুক্ত সামুদ্রিক বন্দর। ইহা একটি সুরক্ষিত দুর্গ এবং বৃটিশের একটি প্রধান ঘাঁটি। এই স্থান হইতে জাহাজে কয়লা বোঝাই করা হয়। **মার্শাই** (Marseilles)—রোন নদীর ব-দ্বীপের পুর্বপ্রান্তে ভূমধ্যসাগর তীরে অবস্থিত মার্শাই ফ্রান্সের প্রধান বন্দর। রোন নদীর মোহানা হইতে এই বন্দর প্রায় ৪৮ কি. মি. দূরে অবস্থিত। রোন নদীর সমৃদ্ধ অববাহিকা এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি। রেশম, রেশমজাত দ্রব্যাদি, সাবান, গন্ধদ্রব্য, বিলাসদ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য, মোটর গাড়ী, মদ্য, তৈল প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য এবং তৈলবীজ, গম, পশম, রেশম, কার্পাস, রবার, কয়লা, শর্করা, কফি, তালতৈল প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান আমদানী দ্রব্য। সুয়েজ খাল কাটার পর হইতে এই বন্দরের গুরুত্ব বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পুর্বে ইহা ডাক জাহাজের একটি প্রধান বন্দর ছিল। **ত্রিয়েস্তি** (Trieste)—ইতালীর উত্তরাঞ্চলে লম্বার্ডি সমভূমির পূর্বপ্রান্তে আড্রিয়াতিক সাগরের উপকূলে অবস্থিত ত্রিয়েস্তি একটি বিখ্যাত আড়তদারী বন্দর। মধ্য ইউরোপের দানিয়ুব অববাহিকা অঞ্চলের বহুবিধ পণ্য এই বন্দরের মধ্য দিয়া বিদেশে রপ্তানী হয়। **মস্কো** (Moscow)—মোস্কাভা নদীর তীরে অবস্থিত মস্কো রুশিয়ার রাজধানী, শিল্প ও বাণিজ্য পথের কেন্দ্র, ও "পঞ্চ সমুদ্রের বন্দর" (খাল ও নদীপথে মস্কো বাল্টিক, শ্বেত, কাস্পিয়ান, আজভ ও কৃষ্ণ সাগরের সহিত সংযুক্ত থাকায় মস্কোকে "পঞ্চ সমুদ্রের বন্দর" বা (Port of the five seas বলা হয়)। বস্ত্র, চর্মদ্রব্য, যন্ত্রপাতি, কাগজ প্রভৃতির কারখানা এতদঞ্চলে রহিয়াছে। **লেনিনগ্রাদ** (Leningrad)—নিভা নদীর তীরে অবস্থিত লেনিনগ্রাদ বিখ্যাত বাল্টিক সাগরস্থ বন্দর ও শিল্পাঞ্চল। এই বন্দর বৎসরে প্রায় ৫ মাস কাল বরফাবৃত থাকে। জাহাজ-নির্মাণ, কাগজ ও অ্যালুমিনিয়াম শিল্পের জন্য ইহা বিখ্যাত। **ওডেসা** (Odessa)—কৃষ্ণসাগরের উত্তরতীরে অবস্থিত ওডেসা দক্ষিণ রুশিয়ার শ্রেষ্ঠ গম রপ্তানীর বন্দর।

এশিয়া : রেঙ্গুন (Rangoon)—ইরাবতী নদীর ব-দ্বীপের উপর অবস্থিত রেঙ্গুন শহর ব্রহ্মদেশের রাজধানী, প্রধান বন্দর ও বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র। ইরাবতীর উর্বর উপত্যকা লইয়া গঠিত ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি স্থলপথে ও জলপথে এই বন্দরের সহিত সংযুক্ত। চাউল, খনিজ তৈল ও সেগুন কাষ্ঠ এই বন্দরের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য এবং শিল্পজাত দ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য ও বিলাস দ্রব্য এই

বন্দরের প্রধান আমদানী। **সিঙ্গাপুর** (Singapore)—মালয় উপদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত ঐ রাজ্যের রাজধানী সিঙ্গাপুর পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর এবং উৎকৃষ্ট স্বাভাবিক পোতাশ্রয়। ইহা উপদ্বীপের সহিত রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত। ইহা সমগ্র দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়ার শ্রেষ্ঠ আড়তদারী বন্দর এবং আন্তর্জাতিক বিমানপথের ও ব্রিটিশ রণতরীর একটি উল্লেখযোগ্য ঘাঁটি। পুর্ব পশ্চিম গোলার্ধগামী প্রায় সমুদয় বাণিজ্যপোতই এখানে কয়লা বোঝাই করে। রবার, বাং, নারিকেলের শাঁস, আনারস, মশলা, দারুচিনি প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান রপ্তানী এবং লৌহ ও ইস্পাত, বস্ত্র, খনিজ তৈল, কলকব্জা, তামাক, শর্করা প্রভৃতি প্রধান আমদানী দ্রব্য। **হংকং** (Hongkong)—চীনের দক্ষিণ পুর্ব অংশে সিকিয়াং নদীর মোহানায় অবস্থিত হংকং দ্বীপ পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ বন্দর, উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয়, আড়তদারী ও জাহাজনির্মাণ-কেন্দ্র। সমগ্র দক্ষিণ চীন এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি। চা, শর্করা, ধান, কার্পাস, চাউল, তামাক, ধাতু পদার্থ, কয়লা, ময়দা, খনিজ তৈল, আফিং প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান রপ্তানী এবং বস্ত্র, লৌহ ও ইস্পাত, তৈল ও চর্বি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রভৃতি প্রধান আমদানী দ্রব্য। **সাংহাই** (Shanghai)—চীনের পুর্ব উপকূলের মধ্যাঞ্চলে ইয়াংসি নদীর মোহানার নিকট অবস্থিত সাংহাই চীনের সর্বপ্রধান নগর, আড়তদারী কেন্দ্র এবং সমগ্র এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। এই বন্দরের পোতাশ্রয় অগভীর। ইয়াংসি নদীর উর্বর ও জনবহুল অববাহিকা এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি। কার্পাস ও কার্পাস-জাত দ্রব্য, চা, তামাক, রেশম, আফিং, সয়াবিন প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য। এই বন্দর রেশম, পশম ও কার্পাস বস্ত্রবয়নশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। **ইয়োকোহামা** (Yokohama)—টোকিওর দক্ষিণে টোকিও উপসাগরের অন্তর্গত হনসু দ্বীপের উপর অবস্থিত ইয়োকোহামা জাপানের একটি উল্লেখযোগ্য বন্দর ও উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয়। রেশম, কৃত্রিম রেশম, পশম ও পশমজাত দ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য, কাচ, চীনামাটির দ্রব্য, চা, চাউল, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য। আমদানী দ্রব্যের মধ্যে খাদ্যশস্য, কার্পাস, ময়দা, শর্করা প্রভৃতিই প্রধান। **কোবে** (Kobe)—ওসাকা হইতে ৩২ কি. মি. পশ্চিমে অবস্থিত কোবে জাপানের দ্বিতীয় বন্দর, উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয় এবং জাহাজ, রবার, দিয়াশলাই ও রেশম শিল্পের কেন্দ্র। **টোকিও** (Tokyo)—হনসু দ্বীপের পুর্ব উপকূলে অবস্থিত টোকিও জাপানের রাজধানী, শিল্পবাণিজ্যের কেন্দ্র ও পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম নগর। **কলম্বো** (Colombo)—সিংহল দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত কলম্বো ঐ দ্বীপের রাজধানী, বন্দর, এবং বিখ্যাত আড়তদারী কেন্দ্র। এই বন্দরের পোতাশ্রয় কৃত্রিম। সমগ্র সিংহল দ্বীপ এই বন্দরের

পশ্চাদ্‌ভূমি। সুয়েজ খালপথে অস্ট্রেলিয়া ও পূর্ব এশিয়াগামী প্রায় সমুদয় বাণিজ্যপোতই এই বন্দরে কয়লা লয়। নারিকেল, নারিকেল তৈল, দারুচিনি, রবার প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান রপ্তানী এবং কয়লা, খনিজতৈল, চিনি, চাউল, যন্ত্রপাতি, বস্ত্র, রাসায়নিক দ্রব্য, কাগজ, কাচ প্রভৃতি প্রধান আমদানী দ্রব্য। **এডেন** (Aden)—আরবের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে এডেন একটি রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ স্বাভাবিক বন্দর ও আড়তদারী কেন্দ্র। সুয়েজ খালপথে যাতায়াতকারী বাণিজ্যপোতসমূহ এই বন্দরে কয়লা বোঝাই করে। ইয়েমেন ও আবিসিনিয়ার পর্বতাঞ্চলে উৎপন্ন কফি এই বন্দর দিয়া বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হয়।

ভারতের বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্রসমূহ

ভারতের বন্দরসমূহ

ভারতের সুদীর্ঘ উপকূলভাগ প্রায় অভগ্ন। **পশ্চিম উপকূলের** নিকট দিয়া পশ্চিমঘাট পর্বতমালা বিস্তৃত, উপকূলভাগ সংকীর্ণ, উপকূলসংলগ্ন সমুদ্র সাধারণতঃ অগভীর এবং ইহার অনেকাংশ বালুকাময়। সেইজন্য এ অঞ্চলে পোতাশ্রয় ও বন্দর নির্মাণ কষ্টকর। তবে এই উপকূলে কাণ্ডলা, বোম্বাই, গোয়া ও কোচিন এই চারিটি স্বাভাবিক বন্দর রহিয়াছে। আবার কাণ্ডলা, বোম্বাই ও গোয়া ব্যতীত এই উপকূলাঞ্চলের অন্যান্য বন্দর মে হইতে আগস্ট মাস পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু-প্রবাহের সময় বন্ধ থাকে। **পূর্ব উপকূল** সংলগ্ন সমুদ্র অত্যন্ত অগভীর ও তরঙ্গসঙ্কুল হওয়ায় পূর্ব উপকূলে স্বাভাবিক বন্দর ও পোতাশ্রয়ের সংখ্যা অতি সামান্য। পূর্ব উপকূলের মাদ্রাজ বন্দরের পোতাশ্রয় কৃত্রিম এবং কলকাতা বন্দরের পোতাশ্রয় অত্যন্ত অগভীর।

এই সমস্ত প্রতিকূল পরিবেশের জন্য ভারতে প্রধান প্রধান* (Major ports) বন্দর ও পোতাশ্রয়ের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। পশ্চিম উপকূলের কাণ্ডলা, বোম্বাই, মার্মাগাও ও কোচিন এবং পূর্ব উপকূলের মাদ্রাজ, বিশাখাপত্তনম ও কলিকাতা ভারতের প্রধান প্রধান বন্দর। ভারতের ন্যায় বিশাল দেশের পক্ষে এই সাতটি বন্দর অতি সামান্য। ইহাদের মাধ্যমে মাত্র ৪·৮ (১৯৬৪-৬৫) কোটি টন পণ্য চলাচল করে।

ভারতে প্রায় ২২৫টি অপ্রধান বন্দর (Minor ports) রহিয়াছে, তবে উহাদের মধ্যে প্রায় ১৫০টি বন্দর মারফৎ প্রায় ১৯ লক্ষ টন পণ্য চলাচল করে।

* পোতাশ্রয়ের প্রকৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা, পশ্চাদ্‌ভূমির প্রসার ও সমৃদ্ধি, বাণিজ্যের পরিমাণ প্রভৃতির তারতম্য হিসাবে ভারতের বন্দরসমূহ প্রধান ও অপ্রধান এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যে সকল বন্দরের মারফৎ বার্ষিক পাঁচ লক্ষাধিক টনের পণ্য চলাচল করে সেগুলিকে প্রধান বন্দর বলা হয়। অপরগুলি অপ্রধান বন্দর।

ইহাদের মধ্যে ১৮টিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যেরূপ—ওখা, পোরবন্দর, ক্যালিকট, তুতিকোরিন, ম্যাঙ্গালোর, কাকিনাড়া, মশুলিপত্তনম্, কুড্ডালোর, আলেপ্পি, ভবনগর, বেদী, নবলক্ষী, কুইলন, সুরাট প্রভৃতি। প্রধান বন্দরগুলি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এবং অপ্রধান বন্দরসমূহ রাজ্য সরকার কর্তৃক শাসিত হয়।

কাঠিয়াবাড় ও কচ্ছের বন্দর (Ports of Kathiawar and Cutch) : **কাণ্ডলা** (Kandla)—কচ্ছের রাজধানী ভূজ হইতে ৪৮ কি. মি. দক্ষিণ-পূর্বে কচ্ছ উপসাগরের পূর্বপ্রান্তে নবনির্মিত কাণ্ডলা বন্দর অবস্থিত। ইহার পোতাশ্রয় স্বাভাবিক, গভীর ও সুরক্ষিত। গুজরাট রাজ্য, মহারাষ্ট্রের উত্তরাংশ, রাজস্থান, পাঞ্জাব, কাশ্মীর এবং মধ্য ও উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশ এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি। এই বহুবিস্তৃত পশ্চাদ্‌ভূমি লবণ, সিমেণ্ট, কাচ, মৎস্য প্রভৃতি শিল্প সংগঠনের সম্ভাবনায় পূর্ণ এবং সাজিমাটি, কয়লা, অ্যালুমিনিয়ম প্রভৃতি খনিজ দ্রব্যে সমৃদ্ধ। এই অঞ্চলে লোকবসতি বিরল হওয়ায় এস্থানে বন্দর গঠনের ও সম্প্রসারণের উপযুক্ত বিস্তৃত ভূভাগ রহিয়াছে। ২৮৩ কি. মি. দীর্ঘ দিশা-গান্ধীধাম রেলপথ ও ১০ কি. মি. দীর্ঘ গান্ধীধাম-কাণ্ডলা রেলপথ নির্মাণের ফলে ইহা পশ্চিম রেলপথের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ২১৯ কি. মি. দীর্ঘ ঝাণ্ড্-কাণ্ডলা রেলপথ নির্মাণেরও একটি পরিকল্পনা রহিয়াছে। কাণ্ডলা বন্দরের কয়েকটি অসুবিধাও রহিয়াছে। সমুদ্র হইতে এই বন্দরের পোতাশ্রয়ে প্রবেশপথ অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং এই অঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের অত্যন্ত অভাব রহিয়াছে। তবে এই সমস্ত অসুবিধা দূর করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হইবে বলিয়া মনে হয় না। **বেদী** (Bedi)—কচ্ছ উপসাগরের তীরে অবস্থিত বেদী কাঠিয়াবাড়ের অন্যতম বন্দর ও অগভীর পোতাশ্রয়। এই বন্দরের উপকূল-বাণিজ্যের পরিমাণ অধিক। **ওখা** (Okha)—কাঠিয়াবাড়ের পশ্চিম প্রান্তের বন্দর ওখা একটি উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয় কিন্তু পোতাশ্রয়ে প্রবেশপথ বিঘ্নসঙ্কুল। পশ্চাদ্‌ভূমি জনবিরল ও অসমৃদ্ধ হওয়ায় এবং বন্দরের সহিত পশ্চাদ্‌ভূমির উপযুক্ত যোগাযোগ-ব্যবস্থা না থাকায় ইহার উন্নতি ব্যাহত হইয়াছে। একটি রেলপথের দ্বারা ইহা আমেদাবাদের সহিত সংযুক্ত। তৈলবীজ ও কার্পাস এই বন্দরের রপ্তানী এবং বয়ন যন্ত্রপাতি, মোটর গাড়ী, লৌহজাত দ্রব্য, শর্করা, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি প্রধান আমদানী পণ্য। **পোরবন্দর** (Porbandar)—কাঠিয়াবাড়ের পশ্চিমে অবস্থিত এই বন্দর উপকূলীয় বাণিজ্যে ব্যবহৃত হয়। সমুদ্রগামী জাহাজ এখানে আসিতে পারে না। সিমেণ্ট ও গৃহাদি নির্মাণের প্রস্তর এই বন্দরের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য।

কঙ্কণ উপকূলের বন্দর (Ports of the Konkon coast) : **বোম্বাই** (Bombay)—ইহা ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর ও প্রধানতম

বন্দর। এই বন্দর একটি দ্বীপের উপর অবস্থিত এবং ইহার পোতাশ্রয় সুরক্ষিত, স্বাভাবিক, ২৩ কি. মি. দীর্ঘ, ৮ কি. মি. প্রশস্ত ও ৬·৭—১১·২ মি. গভীর। এই বন্দর দিয়া সারা বৎসরই পণ্য চলাচল করে। সমগ্র মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র, রাজস্থানের পূর্বাঞ্চল, মহীশূরের উত্তরাংশ ও উত্তর-প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল ইহার পশ্চাদ্ভূমি। এই পশ্চাদ্ভূমিতে প্রচুর কার্পাস, তৈলবীজ, ম্যাঙ্গানীজ, চর্ম ও বয়নশিল্পজাত দ্রব্যাদি উৎপাদিত হয়। বোম্বাই বন্দর পশ্চিম ও মধ্য রেলপথের দ্বারা ইহার পশ্চাদ্ভূমির বিভিন্ন অংশের সহিত সংযুক্ত। কার্পাস, তৈলবীজ, পশম ও পশমজাত দ্রব্য, চর্ম, ম্যাঙ্গানীজ, খাদ্যশস্য ও বয়নজাত দ্রব্যাদি এই বন্দর দিয়া রপ্তানী হয় এবং রেলের ইঞ্জিন, যন্ত্রপাতি, কার্পাসজাত দ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য, মোটরগাড়ী, লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য, কয়লা, খনিজ তৈল প্রভৃতি নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য আমদানী হয়। করাচী বন্দর পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বোম্বাই বন্দরের বাণিজ্যের পরিমাণ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বোম্বাই একটি শিল্পপ্রধান অঞ্চল। কার্পাস-বস্ত্রবয়ন এস্থানের প্রধান শিল্প। **মালপে** (Malpe)—পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত ও মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত মালপে একটি সুরক্ষিত স্বাভাবিক পোতাশ্রয় ও বিখ্যাত মৎস্য আহরণ কেন্দ্র। তৃতীয় পরিকল্পনার কাযকালে এই বন্দরটির উন্নয়নমূলক নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। **মার্মাগাও** (**Marmugao**)—ইহা গোয়ার বন্দর। অন্ধ্র, মহীশূর ও মহারাষ্ট্রের দক্ষিণাংশ এই বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি। বাদাম, কার্পাস, নারিকেল ও ম্যাঙ্গানীজ এই বন্দরের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য। **ম্যাঙ্গালোর** (Mangalore)—বোম্বাই ও কোচিন বন্দরের মধ্যস্থলে অবস্থিত ম্যাঙ্গালোর মহীশূর রাজ্যের পশ্চিম উপকূলের একটি অপ্রধান বন্দর। ইহা দক্ষিণ রেলপথের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের শেষ স্টেশন এবং রাস্তার সাহায্যে হাসানের সহিত সংযুক্ত। গোলমরিচ, চা, কাজু বাদাম, কফি, চন্দন-কাষ্ঠ, রবার, সার প্রভৃতি এই বন্দরের উল্লেখযোগ্য রপ্তানী দ্রব্য। সম্প্রতি এই বন্দরটির উন্নতি বিধানের চেষ্টা করা হইতেছে।

মালাবার উপকূলের বন্দর (**Ports of the Malabar coast**): **কালিকট** (**Calicut**) (কোঝিকোড়)—কোচিন হইতে ১৪৪ কি. মি. উত্তরে দক্ষিণ রেলপথের অন্তর্বর্তী কালিকট কেরালা রাজ্যের পশ্চিম উপকূলের বন্দর, অগভীর পোতাশ্রয় ও বস্ত্রশিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। নারিকেলের শাঁস, কফি, চা, লঙ্কা, আদা, রবার, বাদাম, প্রভৃতি এই বন্দরের রপ্তানী দ্রব্য। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমীবায়ু-প্রবাহের সময় এই বন্দর দিয়া বাণিজ্য চলাচল বন্ধ থাকে। **কোচিন** (**Cochin**)—কেরালা রাজ্যের অন্তর্গত কোচিন একটি উন্নতিশীল বন্দর, নবনির্মিত পোতাশ্রয় ও অন্যতম নৌ-ঘাঁটি। রেলপথে ইহা মাদ্রাজের সহিত সংযুক্ত। নারিকেল, নারিকেলের ছোব্ড়া ও দড়ি, চা,

কফি, লঙ্কা, রবার, এলাচ প্রভৃতি এই বন্দরের রপ্তানী দ্রব্য। কোচিন নারিকেল তৈলের জন্য বিখ্যাত।

করোমণ্ডল উপকূলের বন্দর (Ports of the Coromondal coast): **তুতিকোরিন** (Tuticorin)—তামিলনাড়ুর অন্তর্গত তুতিকোরিন দক্ষিণ ভারতের তৃতীয় বন্দর, অগভীর পোতাশ্রয় ও বাণিজ্য-কেন্দ্র। দক্ষিণ রেলপথের দ্বারা ইহা মাদুরার সহিত সংযুক্ত। সিংহলের সহিত এই বন্দরের বাণিজ্যসম্পর্ক ব্যাপক। চাউল, ডাল, পেঁয়াজ, লঙ্কা, গবাদি পশু, এলাচ প্রভৃতি এই বন্দরের বাণিজ্যিক পণ্য। উপকূলাঞ্চল হইতে মুক্তা সংগৃহীত হয়। **মাদ্রাজ** (Madras)—ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম নগর ও বন্দর। মাদ্রাজ বন্দরের পোতাশ্রয় কৃত্রিম। দাক্ষিণাত্যের মালভূমির দক্ষিণ-পূর্বার্ধের প্রায় সমগ্র অংশই এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি। দক্ষিণ রেলপথের দ্বারা এই বন্দরটি পশ্চাদ্‌ভূমির সহিত সংযুক্ত। এই বন্দর দিয়া ধান, খাদ্যশস্য, কয়লা, তৈল, সার, কাগজ, কাষ্ঠ, মোটর গাড়ী, সাইকেল, স্থাপত্য শিল্পের প্রস্তর প্রভৃতি দ্রব্য আমদানী হয় এবং বাদাম, চর্ম, তামাক, ধাতু আকরিক, কার্পাস দ্রব্য, সার, কফি প্রভৃতি দ্রব্য রপ্তানী হয়। সংকীর্ণ ও অসমৃদ্ধ পশ্চাদ্‌ভূমি এবং কয়লার অত্যন্ত অভাব হেতু মাদ্রাজ বন্দর বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই।

উড়িষ্যা উপকূলের বন্দর (Ports of the Orissa coast): **বিশাখাপত্তনম্‌** (Vishakhapattanam)—কলিকাতা হইতে ৮০০ কি. মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে ও মাদ্রাজ হইতে ৫২০ কি. মি. উত্তর-পূর্বে অবস্থিত বিশাখাপত্তনম্‌ অন্ধ্ররাজ্যের একটি উন্নতিশীল বন্দর। এই বন্দরের পোতাশ্রয় স্বাভাবিক, গভীর ও নিরাপদ। অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশের পূর্বাঞ্চল, ও উড়িষ্যা লইয়া গঠিত এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি লৌহ আকরিক, ম্যাঙ্গানীজ ও অন্যান্য খনিজ ও বনজ দ্রব্যে সমৃদ্ধ। বন্দরটি দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ রেলপথের দ্বারা পশ্চাদ্‌ভূমির সহিত সংযুক্ত। রায়পুর হইতে বিশাখাপত্তনম্‌ পর্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত থাকায় মধ্যপ্রদেশের খনিজ, বনজ ও কৃষিজ দ্রব্য এই বন্দর দিয়াই রপ্তানী হয়। ইহা ভারতের শ্রেষ্ঠ জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র। এই বন্দর দিয়া ম্যাঙ্গানীজ, তৈলবীজ, খইল, হরীতকী ও বনজ দ্রব্য রপ্তানী হয় এবং লৌহজাত দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, খাদ্য-শস্য, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি আমদানী হয়। কটকের ৮৮ কি. মি. পূর্বে পূর্ব উপকূলে অবস্থিত **পরাদিপ** (Paradip) বন্দরটির উন্নয়নমূলক কার্যসূচী দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে গৃহীত হয়। **কলিকাতা** (Calcutta)—ভারতের বৃহত্তম নগর ও বন্দর। কলিকাতা সমুদ্র হইতে ১২৮ কি. মি. দূরে হুগলী নদীর বাম তীরে অবস্থিত। এই বন্দরের পোতাশ্রয় কৃত্রিম। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা এবং উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশের কিয়দংশ এই বন্দরের

পশ্চাদ্‌ভূমি। এই পশ্চাদ্‌ভূমি জনবহুল, শিল্প ও কৃষিজ দ্রব্যে সমৃদ্ধ এবং উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থাযুক্ত। উঃ পূর্ব, ও দঃ পূঃ রেলপথের দ্বারা এবং স্থল ও জলপথে কলিকাতা বন্দরের পণ্য উহার পশ্চাদ্‌ভূমির সহিত আদানপ্রদান করা হয়। হুগলী নদী ক্রমশঃ অগভীর হইয়া উঠায় জাহাজ চলাচলের জন্য সর্বদাই মাটি কাটিয়া নদীগর্ভ গভীর রাখিতে হয়। ফলে এই বন্দরের সংরক্ষণ ব্যয় অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়ে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে গঙ্গাবাঁধ পরিকল্পনাটি গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে কলিকাতা বন্দরের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। পাট ও পাটজাত দ্রব্য, চা, ম্যাঙ্গানীজ, কয়লা, অবিশুদ্ধ লৌহ প্রভৃতি এই বন্দরের রপ্তানী এবং শিল্প ও রাসায়নিক দ্রব্য, কাগজ, মদ্য, লবণ, মোটরগাড়ী, খাদ্যশস্য প্রভৃতি আমদানী দ্রব্য। ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের প্রায় অর্ধেকই কলিকাতা বন্দর দিয়া যায়। বয়ন শিল্প, কাগজ শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, অ্যালুমিনিয়াম শিল্প, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, দিয়াশলাই শিল্প প্রভৃতি নানাবিধ শিল্প কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠে ব্যাপক-ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। কলিকাতা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাট-শিল্পকেন্দ্র। কলিকাতার উপকণ্ঠে খিদিরপুরে কলিকাতা বন্দরের সুবৃহৎ পোতাশ্রয় কিং জর্জ ডক অবস্থিত। **হলদিয়া** (Haldia)—কলিকাতা হইতে ১০৪ কি. মি দক্ষিণে হুগলী ও হলদী নদীর সঙ্গমস্থলে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় এই বন্দরটি নির্মিত হইতেছে। ইহা কলিকাতা বন্দরের পরিপুরক হিসাবে কাজ করিবে। এখানে একটি সারের কারখানা ও তৈলশোধনাগার স্থাপনের পরিকল্পনা রহিয়াছে। বন্দরটি রেলপথে কোলাঘাটের সহিত সংযুক্ত।

ভারতের উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যকেন্দ্রসমূহ

অমৃতসর (Amritsar)—পাঞ্জাবের অন্তর্গত অমৃতসর উত্তর রেলপথের শেষ শ্রেষ্ঠ রেলকেন্দ্র ও শিখদের প্রধান তীর্থস্থান। এ স্থানের স্বর্ণমন্দির বিখ্যাত। ইহা কৃষিজ দ্রব্য, কার্পাস ও পশম বস্ত্রের বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র। অমৃতসরের গালিচা, পশমী শাল এবং নক্সাদার কাষ্ঠদ্রব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাশ্মীরের সহিত ভারতের সমগ্র বাণিজ্যই অমৃতসরের ভিতর দিয়া চলাচল করে। কার্পাসবয়ন শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, গেঞ্জি, মোজা এবং চর্ম শিল্প এ স্থানের অন্যান্য শিল্প। **জলন্ধর** (Jullandhar)—পাঞ্জাবের একটি বিখ্যাত সেনানিবাস ও কৃষিজ দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়কেন্দ্র। **চণ্ডীগড়** (Chandigarh)—পাঞ্জাবের রাজধানী। **লুধিয়ানা** (Ludhiana)—জলন্ধর হইতে ৩৯ কি. মি. দক্ষিণে উত্তর রেলপথের উপর অবস্থিত লুধিয়ানা পাঞ্জাবের অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্র। এস্থানের রেশম, কার্পাস ও পশমবয়ন শিল্প এবং গেঞ্জি ও

মোজা প্রস্তুত শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লুধিয়ানাতে সৈন্যদের জন্য পাগড়ী প্রস্তুত হয়। **সিমলা** (Simla)—সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২·১ কি. মি. উচ্চে হিমালয় পর্বতগাত্রে অবস্থিত সিমলা হিমাচল প্রদেশের রাজধানী ও মনোরম শৈলাবাস। মার্চ হইতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত এই স্থান হইতে তিব্বত ও চীনের আড়তদারী বাণিজ্য চলাচল করে। **পাঠানকোট** (Pathankote) —পাঞ্জাবের উত্তরাংশে অবস্থিত পাঠানকোট উত্তর রেলপথের শেষ রেল স্টেশন। এস্থান হইতে মোটর ও আকাশপথে কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর সংযুক্ত।

দিল্লী (Delhi)—উত্তরে হিমালয় পর্বত, দক্ষিণে আরাবল্লী পর্বত ও থর মরুভূমির মধ্যবর্তী স্থানে এবং পূবে গঙ্গার ও পশ্চিমে সিন্ধু অববাহিকার মধ্যবর্তী শৈলশিরার প্রান্তে যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত দিল্লী ভারতের রাজধানী। এই নগর উত্তর ভারতের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। পশ্চিম হইতে গঙ্গার অববাহিকার মধ্যে ইহাই প্রবেশদ্বার। ইহা রেলপথের একটি বিখ্যাত সঙ্গমস্থল। কার্পাস, শর্করা ও ময়দা শিল্পের বহু প্রতিষ্ঠান দিল্লীতে রহিয়াছে। দিল্লীর নক্সাদার স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্রব্য, রেশম, কার্পাস ও পশম দ্রব্য, মস্‌লিন, গজদন্ত, জরীর কায প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মোরাদাবাদ (Moradabad)—দিল্লী হইতে ১৬০ কি. মি. পূর্বে উত্তর রেলপথের উপর অবস্থিত মোরাদাবাদ উত্তর প্রদেশের একটি উল্লেখযোগ্য রেল জংসন ও শিল্পকেন্দ্র। এস্থানের নক্সাদার পিতল ও কাঁসার দ্রব্য, এনামেল শিল্প এবং ছুরি ও কাঁচি বিখ্যাত। এস্থান হইতে প্রচুর আম রপ্তানী হয়। **আলিগড়** (Aligarh)—উত্তর প্রদেশের অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্র। এ স্থানের তালা, ছুরি-কাঁচি, পিতল-কাঁসার দ্রব্য, কাঁচের চুড়ি ও অন্যান্য দ্রব্য এবং দুগ্ধশিল্প বিশেষ প্রসিদ্ধ। এস্থান হইতে প্রচুর মাখন ও ঘি ভারতের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী হয়। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। **আগ্রা** (Agra)—যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত আগ্রা উত্তর প্রদেশের অন্যতম বাণিজ্য-কেন্দ্র ও ঐতিহাসিক নগর। উচ্চশ্রেণীর কারুশিল্প ও নক্সাদার মর্মর দ্রব্যের জন্য এস্থান প্রসিদ্ধ। আগ্রার নিকটেই দয়ালবাগে জুতা, গালিচা এবং পিতলের তৈজসপত্র প্রস্তুত হয়। এস্থানের তাজমহল পৃথিবীবিখ্যাত। **ফিরোজাবাদ** (Firozabad)—আগ্রার কিছু পূর্বে অবস্থিত ফিরোজাবাদ কাঁচ শিল্পের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। **কানপুর** (Kanpur)—গঙ্গাতীরে পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব রেলপথের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত কানপুর উত্তর প্রদেশের বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নগর। এস্থান কার্পাস ও পশম বয়নশিল্প, শর্করা শিল্প, চর্ম শিল্প ও তৈল নিষ্কাশন শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। কানপুরে প্রচুর তাঁবু প্রস্তুত হয়। ইহা একটি প্রসিদ্ধ বিমান বন্দর। **লক্ষ্ণৌ**

(Lucknow)—গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত লক্ষ্ণৌ উত্তর প্রদেশের বৃহত্তম নগর ও রাজধানী। এস্থানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং একটি বিখ্যাত সঙ্গীত বিদ্যালয় আছে। এস্থানের রৌপ্য ও স্বর্ণদ্রব্য, হস্তিদন্ত ও কাষ্ঠের কারুশিল্প, মৃৎপাত্র এবং গন্ধদ্রব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অযোধ্যার কৃষিজাত দ্রব্য এস্থান হইতে নানাদিকে রপ্তানী হয়। লক্ষ্ণৌ অনেকগুলি রেলপথের কেন্দ্র। **এলাহাবাদ** (Allahabad)—গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এলাহাবাদ উত্তর প্রদেশের পুরাতন রাজধানী ও হিন্দুদের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এস্থানে সরিষার তৈল, শর্করা, কাঁচ ও ময়দার বহু কারখানা রহিয়াছে। ইহা উত্তর প্রদেশের বিখ্যাত রেলওয়ে জংসন ও বিমানঘাঁটি। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে জোয়ার, বাজরা, তিসি, তামাক, আম, পেয়ারা প্রভৃতি এস্থানে সংগৃহীত হয়, এবং পরে এস্থান হইতে ঐ সমস্ত দ্রব্য নদীপথে ও রেলপথে বিভিন্ন দিকে রপ্তানী হয়। **মির্জাপুর** (Mirzapur)—এলাহাবাদের ৭২ কি. মি. পূর্বে গঙ্গাতীরে অবস্থিত মির্জাপুর উত্তর প্রদেশের একটি বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র। এস্থানের গালিচা, ছুরি-কাঁচি, মৃতপাত্র, পিত্তল শিল্প এবং প্রস্তর দ্রব্য বিখ্যাত। **বারাণসী** (Varanashi)—গঙ্গাতীরে অবস্থিত বারাণসী হিন্দুদের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান এবং ভারতের অন্যতম প্রধান নগর। ইহা খাদ্যশস্য ও তৈলবীজের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। এস্থানে তৈল, শর্করা ও ময়দার বহু কারখানা রহিয়াছে। বারাণসী রেশমশিল্প ও জরীর কাজের জন্য বিখ্যাত। কাঠের পুতুল, জর্দা, গালার চুড়ি, হস্তিদন্তের দ্রব্যাদি, কম্বল, রেশম দ্রব্য, তিসি, সরিষা, শর্করা, ছোলা, আম, পেয়ারা, কাঁচ ও ধাতুদ্রব্য এস্থান হইতে রপ্তানী হয়। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। বারাণসীর অনতিদূরে সারনাথ অবস্থিত। **গোরক্ষপুর** (Gorakhpur)—রাপ্তী নদীর বামতীরে অবস্থিত গোরক্ষপুর উত্তর প্রদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিখ্যাত কৃষি ও শিল্পকেন্দ্র। ইহা ময়দা, কাষ্ঠ ও শর্করা শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ।

পাটনা (Patna)—গঙ্গা নদীর তীরে পূর্ব রেলপথের উপর অবস্থিত পাটনা বিহারের রাজধানী ও বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র। এস্থানে চিনি ও বিজলী বাতি প্রস্তুত হয়। এইস্থান হইতে প্রচুর লঙ্কা রপ্তানী হয়। এস্থানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় রহিয়াছে। পাটনার নিকট প্রাচীন মগধ রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্র অবস্থিত। **রাঁচি** (Ranchi)—বিহারের অন্তর্গত রাঁচি একটি মনোরম শৈলাবাস ও স্বাস্থ্যনিবাস। এখানে রেশম ও লাক্ষা সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার রহিয়াছে। ইহার কিছু দূরেই বিখ্যাত হুড্রু জলপ্রপাত রহিয়াছে। **কোডারমা** (Kodarma)—বনাঞ্চলের নিকট অবস্থিত কোডারমা বিহারের অতি প্রসিদ্ধ অভ্র উত্তোলন কেন্দ্র।

ডালমিয়ানগর (Dalmianagar)—শোন নদের তীরে পূর্ব রেলপথের উপর অবস্থিত ডালমিয়ানগর বিহারের অন্যতম উন্নতিশীল শিল্পকেন্দ্র। এস্থানের শর্করা ও সিমেন্ট শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিকটবর্তী স্থানে প্রচুর চুনাপাথর পাওয়া যায়। **ঝরিয়া** (Jharia), **বোকারো** (Bokaro), **ধানবাদ** (Dhanbad), **গোমো** (Gomoh) ও **বার্মো** (Bermo)—বিহারের উল্লেখযোগ্য কয়লাখনি অঞ্চল। বোকারোতে সম্প্রতি একটি তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র (১'৫ লক্ষ কিঃ ওঃ) স্থাপিত হইয়াছে। **গিরিডি** (Giridih)—বিহারেব অন্তর্গত গিবিডি অভ্র ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ। **সিন্ধ্রি** (Sindhri)—বিহারেব অন্তর্গত ও ধানবাদেব ২৪ কি. মি. দক্ষিণ-পুর্বে অবস্থিত সিন্ধ্রিতে এশিয়াব বৃহত্তম সাব তৈয়ারীর কারখানা অবস্থিত। এখানে একটি সিমেণ্টেব কারখানাও আছে। নিকটেই কয়লাব খনি ও দামোদব অববাহিকার বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রগুলি থাকায় শহবটির ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা প্রচুব। **বারাউনি** (Barauni)—বিহারেব অন্তর্গত বারাউনিতে সরকারী মালিকানায় একটি তৈল শোধনাগার স্থাপিত হইয়াছে। আসামেব নাহারকাটিয়া-মোরানেব তৈলখনি হইতে অপবিসুত তৈল নলপথে এস্থানে আনীত হয়।

কালিম্পঙ (Kalimpong)—দার্জিলিং জেলাব অন্তর্গত কালিম্পঙ পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম শৈলাবাস। তিব্বতের সহিত স্থলপথের বাণিজ্য এই স্থান দিয়া চলাচল করে। কালিম্পঙ পশম বাণিজ্যেব একটি প্রধান কেন্দ্র। গালিচা, শাল ও নানাবিধ পশমজাত দ্রব্য এস্থানে পাওয়া যায়। **শিলিগুড়ি** (Siliguri)—উত্তবের পার্বত্য অঞ্চলের পাদদেশে অবস্থিত পঃ বঙ্গের শিলিগুড়ি কাষ্ঠ, চা, কমলা, আনারস প্রভৃতির একটি উল্লেখযোগ্য ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্র। ইহা একটি গুরুত্বপুর্ণ বেলকেন্দ্রও বটে। **মুর্শিদাবাদ** (Murshidabad)—পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত মুর্শিদাবাদ অতি প্রাচীন শহর, বাংলার মুসলমান নবাবদের শেষ রাজধানী। এস্থানের রেশম ও কার্পাস বয়নশিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এস্থান হইতে প্রচুর আম রপ্তানী হয়। **শ্রীরামপুর** (Serampur)—হুগলী নদীর তীরে কলিকাতার ১৯ কি. মি. উত্তরে অবস্থিত শ্রীরামপুর পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত পাট ও কাগজ শিল্পের কেন্দ্র। এখানে কয়েকটি কার্পাস শিল্পাগারও রহিয়াছে। **রাণীগঞ্জ** (Ranigunj)—পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম কয়লাখনি অঞ্চল। এস্থানে কাগজের কল ও মৃৎ শিল্পের প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। **আসানসোল** (Asansol)—পশ্চিমবঙ্গের একটি উল্লেখযোগ্য কয়লাখনি ও উন্নতিশীল শিল্পাঞ্চল। এস্থানের নিকটে কুলটি ও বার্নপুরে লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা, অম্বুপনগরে অ্যালুমিনিয়ামের কারখানা, মৃৎশিল্পের কারখানা ও কাপড়ের কল রহিয়াছে।

বাটানগর (Batanagar)—কলিকাতার উপকণ্ঠে হুগলী নদীর তীরে বাটানগর পশ্চিম বঙ্গের একটি উন্নতিশীল শিল্পকেন্দ্র। এই স্থানে বাটা কোম্পানীর জুতা নির্মাণের একটি বৃহৎ কারখানা রহিয়াছে। **বহরমপুর** (Berhampur)—পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত রেশম শিল্পের কেন্দ্র। **চিত্তরঞ্জন** (Chittaranjan)—পঃ বঙ্গ ও বিহারের সীমান্তে অবস্থিত পঃ বঙ্গের অন্তর্গত চিত্তরঞ্জনে রেলইঞ্জিন নির্মাণের কারখানা রহিয়াছে। নিকটেই **রূপনারায়ণপুরে** (Rupnarayanpur) টেলিফোনের তার নির্মাণের একটি বৃহৎ সরকারী কারখানা রহিয়াছে।

শিলং (Shillong)—খাসিয়া পর্বতের ক্রোড়ে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১·০৫ কি. মি. উচ্চে অবস্থিত এবং গৌহাটির সহিত মোটরপথে সংযুক্ত শিলং আসামের রাজধানী ও বিখ্যাত শৈলাবাস। নানাবিধ ফল, কাষ্ঠ, চা, প্রভৃতি পর্বতাঞ্চলের পণ্য এই স্থান হইতে রপ্তানী হয়। **গৌহাটি** (Gauhati)—ব্রহ্মপুত্র তীরে অবস্থিত গৌহাটি আসামের বৃহত্তম নগর, বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। চা, এণ্ডি বস্ত্র এবং কাষ্ঠ এইস্থানের রপ্তানী দ্রব্য। এস্থানের কামাখ্যা দেবীর মন্দির হিন্দুদের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। সমগ্র ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা অঞ্চলে জলপথে স্টীমার চলাচলের ব্যবস্থা রহিয়াছে। **ডিব্রুগড়** (Dibrugarh)—ব্রহ্মপুত্র তীরে অবস্থিত ডিব্রুগড় আসামের বিখ্যাত নদীবন্দর। এই স্থান হইতে চা, কাষ্ঠ ও ডিগবয় অঞ্চলের খনিজ তৈল রপ্তানী হয়। **ডিগবয়** (Digboi) —আসামের অন্তর্গত লখিমপুর জেলার ডিগবয় তৈলখনির জন্য প্রসিদ্ধ।

কটক (Cuttack)—কলিকাতা হইতে ৪০৫ কি. মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে মহানদী ও তাহার এক শাখা কাঠজুড়ি নদীর সঙ্গমস্থলে দঃ-পূঃ রেলপথের উপর অবস্থিত কটক উড়িষ্যার পুরাতন রাজধানী, বিখ্যাত রেলকেন্দ্র, প্রধান শহর ও বন্দর এবং কাষ্ঠ রপ্তানীর অন্যতম কেন্দ্রস্থল। লাক্ষার পুতুল ও বালা, জুতা, খেল্‌না, চিরুণী এবং কাষ্ঠের দ্রব্য এস্থানে প্রস্তুত হয়। **ভুবনেশ্বর** (Bhubaneswar)—ইহা উড়িষ্যার নূতন রাজধানী, একটি তীর্থস্থান ও বিমানঘাটি। **পুরী** (Puri)—উড়িষ্যার সমুদ্রোপকূলবর্তী বিখ্যাত তীর্থস্থান, স্বাস্থ্যাবাস ও বন্দর। পিতল ও কাঁসার দ্রব্য, রৌপ্য ও স্বর্ণের অলঙ্কার এখানে প্রস্তুত হয়। এইস্থানের সমুদ্র অগভীর বলিয়া উপকূলাঞ্চল হইতে প্রায় ১১ কি. মি. দূরে গভীর সমুদ্রে জাহাজসমূহ নোঙ্গর করে। **সম্বলপুর** (Sambalpur)—মহানদীর তীরে অবস্থিত সম্বলপুর উড়িষ্যার একটি উল্লেখযোগ্য কার্পাস ও রেশমবয়ন-কেন্দ্র। এই স্থান পূর্ব রেলপথের একটি শাখাপথের দ্বারা নাগপুর ও কলিকাতার সহিত সংযুক্ত। ইহার অনতিদূরে হীরাকুদে জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। চতুর্থ

পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইলে সম্বলপুর শিল্পে বিশেষ উন্নতিলাভ করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

জব্বলপুর (Jabalpur)—নর্মদার উপত্যকার মুখে অবস্থিত জব্বলপুর মধ্যপ্রদেশের একটি বৃহৎ রেলওয়ে জংশন ও শিল্প-নগর। এইস্থানের সিমেণ্ট, কাঁচ, চুন, পিতল ও কাঁসার দ্রব্য, বয়নশিল্প, রেলকারখানা ও গোলাবারুদের কারখানা প্রসিদ্ধ। এই স্থানে প্রচুর মর্মরপ্রস্তর পাওয়া যায়। ইহার অনতিদূরেই নর্মদার বিখ্যাত জলপ্রপাত দেখিতে পাওয়া যায়। **ভূপাল** (Bhopal)—মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ও একটি শিল্প-বাণিজ্য-কেন্দ্র। **কাট্নী** (Katni)—মধ্যপ্রদেশের অন্যতম উন্নতিশীল শিল্পপ্রধান নগরী। এস্থানে সিমেণ্ট ও অ্যালুমিনিয়ামের বৃহৎ কারখানা রহিয়াছে। মধ্য-রেলপথ দ্বারা কাট্নী জব্বলপুরের সহিত সংযুক্ত। এস্থানের তৈজসপত্র, প্রস্তরদ্রব্য ও কৃষিজ দ্রব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **ইন্দোর** (Indore)—মধ্যপ্রদেশের প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র। এস্থানে বহু কাপড়ের কল, ময়দার কল, পিতল, কাঁসা ও ধাতু-দ্রব্যের কারখানা রহিয়াছে। **গোয়ালিয়র** (Gwalior)—মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত গোয়ালিয়র একটি বিখ্যাত রেলকেন্দ্র। এখানে একটি সিগারেটের কারখানা রহিয়াছে। এস্থানের প্রস্তর শিল্প বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

অমরাবতী (Amraoti), **আকোলা** (Akola), **ইয়োটমল** (Yeotmal) ও **ওয়ার্ধা** (Wardha)—মহারাষ্ট্রের কার্পাস শিল্প ও কার্পাস বাণিজ্যের কেন্দ্রসমূহ। **আমেদাবাদ** (Ahmedabad)—কাম্বে উপসাগর হইতে ৮০ কি. মি. অভ্যন্তরে সবরমতী নদীর বাম তীরে পশ্চিম রেলপথের উপর অবস্থিত আমেদাবাদ ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম কার্পাস শিল্পাঞ্চল ও নবগঠিত গুজরাট রাজ্যের রাজধানী। **নাসিক** (Nasik)—পশ্চিমঘাট পর্বতের সানুদেশে গোদাবরী নদীর উৎসমুখে অবস্থিত নাসিক একটি স্বাস্থ্যকর স্থান ও তীর্থক্ষেত্র। তামা, পিতল ও কাঁসার দ্রব্যাদি এস্থানে প্রস্তুত হয়। **পুণা** (Poona)—পশ্চিমঘাট পর্বতক্রোড়ে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫৬৭ মিঃ উচ্চে অবস্থিত পুণা মারাঠা সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল। ইহা বস্ত্র ও অন্যান্য নানাবিধ শিল্পের বাণিজ্যকেন্দ্র। **বেলগাঁও** (Belgaon)—মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত বেলগাঁও কার্পাস ব্যবসায় এবং বস্ত্রশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। **সুরাট** (Surat)—তাপ্তী নদীর তীরে অবস্থিত সুরাট গুজরাটের অন্যতম প্রাচীন বন্দর এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যসূত্র নির্মাণের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। এখানে কয়েকটি কার্পাস শিল্পাগারও রহিয়াছে। বর্তমানে এই বন্দরের গুরুত্ব বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। **ব্রোচ** (Broach)—পশ্চিম ভারতের অন্যতম প্রাচীন বন্দর ব্রোচ গুজরাটের অন্তর্গত। এই বন্দরের উপকূল-বাণিজ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **বরোদা** (Baroda)—গুজরাটের অন্তর্গত এবং কাম্বে উপসাগরের পূর্বদিকে

অবস্থিত বরোদা কার্পাস শিল্পের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। **নাগপুর** (Nagpur)—কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের মধ্যপথে মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত নাগপুর প্রাক্তন মধ্যপ্রদেশের রাজধানী এবং বর্তমানে নবগঠিত মহারাষ্ট্রের একটি আঞ্চলিক শাসনকেন্দ্র ও বিখ্যাত শিল্প-বাণিজ্যকেন্দ্র। এই স্থান কার্পাস, কাঁচ ও মৃৎশিল্পে বিশেষ উন্নত। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় রহিয়াছে। কমলালেবু ও ম্যাঙ্গানিজ এই স্থানের প্রধান রপ্তানীদ্রব্য। ইহা একটি বিখ্যাত রেলকেন্দ্র ও বিমানবন্দরও বটে।

ত্রিচিনপল্লী (Trichinopalli **বা** Tiruchirapalli **বা** Tiruchi) —দক্ষিণ রেলপথের উপর অবস্থিত ত্রিচিনপল্লী বা তিরুচিরাপল্লী তামিলনাড়ু রাজ্যের একটি বিখ্যাত রেলওয়ে জংশন ও তীর্থস্থান। এ স্থানে কার্পাস শিল্প, চুরুটের কারখানা ও চাউলের ব্যবসায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **মাদুরা** (Madura)—তামিলনাড়ু রাজ্যের অন্তর্গত মাদুরা দক্ষিণ ভারতের একটি বিখ্যাত তীর্থস্থান। এ স্থানের কার্পাস ও রেশম দ্রব্য, তামা, কাঁসা ও পিতলের দ্রব্য বিখ্যাত। মাদুরার মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরের কারুকার্য ও সৌন্দর্য বিখ্যাত। **কোয়েম্বাটোর** (Coimbatore)—তামিলনাড়ুর উন্নতিশীল শিল্পকেন্দ্র ও সমগ্র দক্ষিণ ভারতের সর্ববৃহৎ কার্পাস শিল্পাঞ্চল। এ স্থানে শর্করা শিল্পের বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার রহিয়াছে। এই স্থান কার্পাস ও বাদামের একটি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যকেন্দ্র। পাইকারা জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন-কারখানা হইতে প্রচুর জলবিদ্যুৎ এই স্থানের শিল্পাগারসমূহে ব্যবহৃত হয়।

বেজওয়াড়া (Bezwada) —কৃষ্ণা নদীর তীরে অবস্থিত বেজওয়াডা অন্ধ্ররাজ্যের একটি বৃহৎ রেল জংশন ও শিল্পকেন্দ্র। **হায়দরাবাদ** (Hyderabad)—কৃষ্ণার উপনদী মুছির তীরে অবস্থিত হায়দরাবাদ অন্ধ্র রাজ্যের রাজধানী ও অন্যতম শিল্প-বাণিজ্যকেন্দ্র। ইহা স্থল, জল ও বিমান পথের কেন্দ্রস্থলও বটে।

শ্রীনগর (Srinagar)—ঝিলম্ নদীর তীরে উলার হ্রদের নিকট একটি মনোরম উপত্যকায় অবস্থিত শ্রীনগর কাশ্মীরের রাজধানী। এস্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী অতি মনোরম। এই স্থান শাল, কম্বল, টুইড, রেশম, নক্সাদার কাষ্ঠ দ্রব্য এবং নানাবিধ ফলের বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র।

যোধপুর (Jodhpur)—রাজস্থানের অন্তর্গত যোধপুর মরুঅঞ্চলের দুর্গনগরী ও বিমান বন্দর। এই স্থানের প্রস্তর, লবণ, পশম ও কার্পাস শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **জয়পুর** (Jaipur)—রাজস্থানের রাজধানী জয়পুর ঐ রাজ্যের বৃহত্তম নগর ও শিল্প-বাণিজ্যকেন্দ্র। এই স্থানের মৃৎশিল্প, কারুশিল্প এবং নক্সাদার প্রস্তর ও পিতলের দ্রব্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জয়পুরের অনতিদূরে অভ্রের খনি রহিয়াছে।

ব্যাঙ্গালোর (Bangalore)—মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত ও দঃ রেলপথের উপর অবস্থিত ব্যাঙ্গালোর ঐ রাজ্যের রাজধানী ও সর্বপ্রধান শিল্পকেন্দ্র। এস্থানে বহু কার্পাস, রেশম ও চর্মের কারখানা, তৈলের কল, রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠান, সাবানের কারখানা, মৃৎশিল্প প্রতিষ্ঠান ও বৈদ্যুতিক বাতি প্রস্তুতের কারখানা রহিয়াছে। এই স্থানে বিমানপোত নির্মাণ শিল্প দ্রুত প্রসারলাভ করিতেছে। এস্থানের কৃষি ও দুগ্ধ সরবরাহের গবেষণাগার ও বিজ্ঞানপরিষদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই অঞ্চলে শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহে জলবিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহৃত হয়। **মহীশূর** (Mysore)—মহীশূর রাজ্যের দক্ষিণে অবস্থিত মহীশূর ঐ রাজ্যের একটি বিখ্যাত শিল্প-বাণিজ্যকেন্দ্র।

ত্রিবান্দ্রাম (Trivandrum)—কেরালা রাজ্যের রাজধানী ত্রিবান্দ্রাম ঐ রাজ্যের একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প-বাণিজ্যকেন্দ্র। এস্থানে নারিকেলের দড়ি, পেন্সিল, হাতীর দাঁতের কাজ, সিমেণ্ট প্রভৃতি সংক্রান্ত নানাবিধ শিল্প-প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে।

প্রশ্নোত্তর

1. Define a port. Explain the different classes of ports with conspicuous examples. (বন্দর কাহাকে বলে? দৃষ্টান্ত উল্লেখ পূর্বক বন্দরের শ্রেণীবিভাগ সাধন কর।) (পৃঃ ২৩৩-২৩৫)

2. State the necessary conditions for the development of good sea ports. Illustrate your answer with suitable examples. (P. U. '62, '65; U. E. '63, '65; H. S. '63) (সামুদ্রিক বন্দরের গঠন ও উন্নতির অনুকূল অবস্থাগুলি দৃষ্টান্ত উল্লেখ পূর্বক নির্দেশ কর।) (পৃঃ ২৩৫-২৩৭)

3. Explain and illustrate the factors responsible for the growth and development of towns and commercial centres of the world. (P. U. '67) (নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র সৃষ্টির কারণসমূহ দৃষ্টান্ত উল্লেখ পূর্বক নির্দেশ কর।) (পৃঃ ২৩৭-২৩৮)

4. Account for the commercial importance of the following :—Sydney, Brisbane, Durban, Port Said, Buenos Aires, Montreal, Vancouver, New York, Boston, New Orleans, Los Angeles, Seattle, San Francisco, Liverpool, Glasgow, Cardiff, Hamburg, Rotterdam, Antwerp, Gibraltar, Marseilles, Trieste, Singapore, Hongkong, Shanghai, Yokohama, Colombo, Aden, Chieago, Alexandria, Leningrad, Rio-de-Janeiro, Johannesburg, Melbourne, Southampton, Aberdeen, Mombasa, Odessa, Tokyo. (নিম্নলিখিত স্থানসমূহ কি, কোথায় এবং কি জন্য বিখ্যাত?—সিডনী, ব্রিসবেন, ডারবান, পোর্ট সৈয়দ, বুয়েনশ আয়ার্স, মণ্ট্রিল, ভ্যানকুভার, নিউইয়র্ক, বোষ্টন, নিউ অরলিন্স, লস এঞ্জেলস, সীটল, স্যান ফ্রান্সিসকো, লিভারপুল, গ্লাসগো, কার্ডিফ, হামবুর্গ, রটারডাম, আন্তোয়ার্প, জিব্রাল্টার, মার্সাই, ট্রিয়েষ্টি, সিঙ্গাপুর, হংকং, সাংহাই, ইয়োকোহামা, কলম্বো, এডেন, শিকাগো, আলেকজান্দ্রিয়া, লেনিনগ্রাদ, রায়োডিজেনেরো, জোহানেসবার্গ, মেলবোর্ন, সাদাম্পটন, অ্যাবারডিন, মোম্বাসা, ওডেসা, টোকিও।) (H.S. '54, '56, '61, '63, '65) (পৃঃ ২৩৮-২৪৭)

5. Compare and contrast the east coast of India with the west coast in respect of: (a) Suitability for locating ports and harbours and (b) Economic activities in the coastal plains. [(ক) বন্দর ও পোতাশ্রয় নির্মাণ এবং (খ) অর্থনৈতিক সঙ্গতির দিক দিয়া ভারতের পূর্ব উপকূলের সহিত পশ্চিম উপকূলের তুলনামূলক আলোচনা কর।] (পৃ: ২৪৭-২৪৮,৬০-৬২)

6. Discribe the hinterland and the nature of trade of the following ports: Kandla, Bombay, Cochin, Madras, Vishakhapattanam, Calcutta. (P. U. '61, '63, '64, '66; U. E. '61, '64, '65, '66) (নিম্নলিখিত বন্দরসমূহের পশ্চাৎভূমি ও বাণিজ্যের প্রকৃতি বর্ণনা কর:—কাণ্ডলা, বোম্বাই, কোচিন, মাদ্রাজ, বিশাখাপত্তনম্‌, ও কলিকাতা)। (পৃ: ২৪৮-২৫১)

7. Account for the commercial importance of the following:

Amritsar, Jullandhar, Chandigarh, Simla, Delhi, Aligarh, Agra, Firozabad, Kanpur, Lucknow, Allahabad, Gorakhpur, Dalmianagar, Bokaro, Sindhri, Kalimpong, Serampur, Asansol, Chittaranjan, Gauhati, Dibrugarh, Digboi, Bhubaneswar, Bhopal, Indore, Ahmedabad, Nagpur, Tiruchi, Coimbatore, Hyderabad, Srinagar, Bangalore, Trivandrum, Ludhiana, Ranchi, Kharagpur, Barauni. (নিম্নলিখিত স্থানসমূহ কি, কোথায় এবং কি জন্য বিখ্যাত?—অমৃতসর, জলন্ধর, চণ্ডীগড়, সিমলা, দিল্লী, আলীগড়, আগ্রা, ফিরোজাবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, গোরক্ষপুর, ডালমিয়ানগর, বোকারো, সিন্ধ্রী, কালিম্পঙ, শ্রীরামপুর, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, গৌহাটী, ডিব্রুগড়, ডিগবয়, ভুবেনশ্বর, ভুপাল, ইন্দোর, আমেদাবাদ, নাগপুর, তিরুচি, কোয়েম্বাটোর, হায়দরাবাদ, শ্রীনগর, ব্যাঙ্গালোর, ত্রিবান্দ্রম, লুধিয়ানা, রাঁচী, খড়্গপুর, বারাউনি।) (P. U. '62, '63, '65, '66, '67; U. E. '61, '63, '65, '66; H. S. '65.) (পৃ: ২৫১-২৫৮)

8. Account for the importance of the following: Nunmati, Bhilai, Trombay, Paradip, Jamhsedpur, Durgapur, Ankleswar, Hirakud, Nepanagar (নিম্নলিখিত স্থানসমূহের গুরুত্ব লিখ: নুনমাটি, ভিলাই, ট্রম্বে, পরাদীপ, জামসেদপুর, দুর্গাপুর, অ্যাংক্লেশ্বর, হিরাকুদ, নেপানগর) (U. E. '61, '65)

(পৃ: ১৭৭,২৭২,১৭৭,২৫০,২৭০,২৭২,১৭৬,১৮৪)

চতুর্থ খণ্ড

গৌণ উৎপাদন

ত্রয়োদশ অধ্যায়

যন্ত্র শিল্প

(Manufacturing Industries)

অর্থনৈতিক ভূগোল অনুশীলনের চারিটি ক্ষেত্রের মধ্যে প্রাথমিক উৎপাদন ও পরিবহন ব্যবস্থার পরেই গৌণ-উৎপাদন বা শ্রমশিল্পের স্থান। কারণ প্রাথমিক উৎপাদন দ্বারা আহৃত দ্রব্যসামগ্রী ভোগকেন্দ্রে পরিবাহিত হইবার পরও বহুক্ষেত্রে রূপান্তরিত না হইলে ভোগ করা সম্ভব হইয়া উঠে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে প্রাথমিক ভাবে উৎপাদিত ধান চাউলে, কার্পাস বস্ত্রে, লৌহ আকরিক ইস্পাতে রূপান্তরিত না হইলে উহা মানুষের ব্যবহারোপযোগী হয় না। প্রাথমিক উৎপাদন দ্বারা আহৃত দ্রব্যাদির এই রূপান্তরীকরণকে গৌণ উৎপাদন (secondary production) বা শ্রমশিল্প বলা হয়। অর্থনীতির ভাষায় গৌণ উৎপাদনের দ্বারা প্রাথমিকভাবে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর আকারগত উপযোগের (form utility) সৃষ্টি করা হয়।

শ্রমশিল্পের একদেশীভবন (Localisation of industries)—সাধারণতঃ এক-এক প্রকারের শ্রমশিল্প এক-এক প্রকার অনুকূল অবস্থার সমাবেশে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গড়িয়া উঠে। ইহাকেই বলে শ্রমশিল্পের 'একদেশীভবন'। কলিকাতার আশেপাশে ভাগীরথীতীরের পাট-কলগুলি এই ব্যাপারের একটি চমৎকার নিদর্শন। বোম্বাই-এর কার্পাস বয়ন, উঃ প্রদেশের শর্করা শিল্প, কলিকাতার কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলে পুস্তক-ব্যবসায়ের কেন্দ্রীভবনও ইহার বিভিন্ন নিদর্শন।

একদেশীভবনের কারণ (Causes of localisation)—(ক) **ভৌগোলিক কারণ** : (১) **জলবায়ু**—শিল্পের একদেশতা নির্ণয়ে ইহার প্রভাব অসামান্য। ভিন্ন ভিন্ন শিল্প গঠনে বিভিন্ন প্রকারের জলবায়ুর প্রয়োজন। সেই কারণে আর্দ্র জলবায়ুযুক্ত ল্যাঙ্কাশায়ারে কার্পাসশিল্প ; শুষ্ক জলবায়ুযুক্ত ইয়র্কশায়ারে পশমশিল্প, বুদাপেস্ট এবং করাচীতে ময়দাশিল্প এবং

ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুযুক্ত লস্ এঞ্জেলস্-এর হলিউডে চলচ্চিত্রশিল্প একদেশীভূত হইয়াছে। জলবায়ু আবার শিল্পদ্রব্যের চাহিদা, কাঁচামালের উৎপাদন, শ্রমিকের সরবরাহ ও তাহাদের কর্মনৈপুণ্য, পরিবহন ব্যবস্থা, শিল্পাগারের আয়তন প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করিয়া পরোক্ষভাবেও শিল্পসংগঠনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে।

(২) **কাঁচামালের নিকটবর্তিতা**—কাঁচামালকে রূপান্তরিত করাই হইল শ্রমশিল্পের প্রধান কার্য। কাজেই যে সমস্ত অঞ্চলে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল অপর্যাপ্ত সেই সমস্ত অঞ্চলে ঐ সমস্ত কাঁচামালকে ভিত্তি করিয়া নানাবিধ শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠাই স্বাভাবিক। তবে শিল্পজাত দ্রব্যে পরিবর্তিত হইলে যে সমস্ত কাঁচামাল হীনভার (weight-losing raw materials) হইয়া পড়ে (যেমন ধাতুদ্রব্য, ইক্ষু ইত্যাদি) সেইরূপ কাঁচামাল-সংক্রান্ত শিল্পসমূহ কাঁচামালের উৎপাদন-কেন্দ্র হইতে অধিক দূরে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না (যেরূপ টাটানগরের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, উঃ প্রদেশের শর্করা শিল্প প্রভৃতি), কারণ সে সব স্থলে কাঁচামালের পরিবহন ব্যয় অত্যধিক হইয়া পড়ে। অপর পক্ষে শিল্পজাত দ্রব্যে পরিবর্তিত হইলে যে সমস্ত কাঁচামাল হীনভার হয় না (pure raw materials) সেই সমস্ত কাঁচামাল-সংক্রান্ত শিল্প (যেরূপ বয়নশিল্পে ব্যবহৃত কার্পাস, রেশম, পাট প্রভৃতি) কাঁচামালের উৎপাদনকেন্দ্র হইতে বহু দূরেও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে (যেরূপ গ্রেট ব্রিটেন ও জাপানের বয়ন শিল্প)। আবার শিল্পকার্যে ব্যবহৃত কাঁচামাল-সমূহ গুরুভার ও স্বল্পমূল্যবিশিষ্ট (যেরূপ কাষ্ঠ) অথবা দ্রুত পচনশীল (যেরূপ দুগ্ধ) হইলে ঐ সমস্ত কাঁচামাল-সংক্রান্ত শিল্প (যেরূপ কাষ্ঠমণ্ড, মাখন, পনীর প্রভৃতি) কাঁচামালের উৎপাদন ক্ষেত্র হইতে বহু দূরে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। (৩) **শক্তি সম্পদের নিকটবর্তিতা**—শিল্প যেখানে ইন্ধনশক্তি হিসাবে কয়লার উপর নির্ভরশীল সেখানে কয়লাক্ষেত্রের নিকটেই শিল্পের একদেশতা ঘটিবার সম্ভাবনা অধিক। কোন কোন শিল্পে নিযুক্ত দুই চারিটি কাঁচামাল ব্যতীত অধিকাংশ কাঁচামালই কয়লা অপেক্ষা লঘুভার। এজন্য কাঁচামালের উৎপাদন কেন্দ্রে কয়লা পরিবহনের ব্যয় অপেক্ষা কয়লা খনি অঞ্চলে কাঁচামাল পরিবহনের ব্যয় অল্প। এই কারণে পৃথিবীর, বিশেষতঃ ইউরোপের, অধিকাংশ কয়লাখনি অঞ্চলেই শিল্প একদেশতা লাভ করিয়াছে। আবার কয়েকটি শিল্পে (যেরূপ লৌহ ও ইস্পাত, কাঁচশিল্প, মৃৎশিল্প, বয়নশিল্প, আলকাতরাজাত রাসায়নিক শিল্প প্রভৃতি) কয়লার ব্যবহার অপরিহার্য। সেজন্য যেসব অঞ্চলে কয়লার খনি আছে পৃথিবীর সব দেশেই সেই সমস্ত অঞ্চলেই এই সমস্ত শিল্পের পত্তন হইয়াছে। তবে বর্তমানকালে শিল্পসংগঠনে খনিজ তৈল ও জলবিদ্যুৎ শক্তির ব্যাপক ব্যবহারের ফলে শিল্পসমূহের বিকেন্দ্রী-

ভবনের সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে এবং শিল্পকেন্দ্রের অবস্থান নিয়ন্ত্রণে শক্তি সম্পদের অবস্থানেব প্রভাব ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে।

(খ) **অর্থনৈতিক কারণ :** (১) **বিক্রয়কেন্দ্রের নিকটবর্তিতা**—উৎপন্ন দ্রব্যেব উপযুক্ত বাজাব বা চাহিদা পাওয়া যায় বলিয়া বৃহৎ শহবের নিকটবর্তী অঞ্চলেই সাধারণতঃ শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ একদেশীভূত হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কলিকাতাব পাটশিল্প ও বোম্বাই-এব কার্পাসশিল্পেব উল্লেখ কবা যাইতে পারে। তবে পৃথিবীব পবিবহন ব্যবস্থার উন্নতিব ফলে বর্তমানে শিল্পজাত দ্রব্যেব বাজাব বলিতে কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ বাজারকেই বুঝায় না, দেশ-দেশান্তরেব বাজাবকেও বুঝাইয়া থাকে। (২) **শ্রমিক সরবরাহের নিকটবর্তিতা**—ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে শ্রমিকের অভাব হয় না বলিয়া শিল্পসমূহ প্রসাব লাভ কবিতে পারে। আবাব শ্রমিকের নিপুণতাব জন্যও বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ শিল্প গডিয়া উঠে, যেরূপ, জার্মানীর রাসায়নিক শিল্প। (৩) **মূলধনের প্রাচুর্য**—আধুনিক শিল্পগঠনে মূলধনেব প্রভাব অসামান্য। তবে কাঁচামাল, শক্তিসম্পদ, শ্রমিক সববরাহ প্রভৃতিব তুলনায় মূলধনেব গতিশীলতা অধিক বলিয়া শিল্পকেন্দ্রের অবস্থান নির্ণয়ে মূলধনেব বিশেষ কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব নাই। তবে সাধারণতঃ শহবগুলিতে মূলধন-সববরাহকাবী ব্যাংক, ইনসিওরেন্স কোম্পানী বা ধনী লোকেব প্রাচুয থাকায় এই সমস্ত স্থানেই বৃহৎ বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ একদেশীভূত হয়। (৪) **পরিবহনের সুব্যবস্থা**—কাঁচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্য আমদানী-রপ্তানীব সুবিধাব জন্য উপযুক্ত যানবাহন-ব্যবস্থাযুক্ত অঞ্চলসমূহেই সাধাবণতঃ শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ একদেশীভূত হইয়া থাকে।

(গ) **ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক কারণ : সরকারের সহায়তা**—দেশীয় সরকারেব সাহায্য ও উৎসাহের ফলেও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকাব শিল্পপ্রতিষ্ঠান একদেশীভূত হইয়া থাকে। কাশ্মীবের শালবয়ন শিল্প ও ঢাকার মস্‌লিন শিল্প এইরূপ একদেশীভবনের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

(ঘ) **শিল্পের একদেশতা**—শিল্পের একদেশতাই পরবর্তী কালে আরও অধিক একদেশতার কাবণ হইয়া থাকে। উদাহবণ স্বরূপ বলা যাইতে পাবে যে কলিকাতায় নূতন পুস্তকের দোকান স্থাপন করিতে হইলে পুস্তকব্যবসায়ী কলেজ স্কোয়াবের সন্নিকটেই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের চেষ্টা করে।

উপরোক্ত অনুকূল অবস্থাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক অবস্থার সমন্বয়েব ফলে সর্বাপেক্ষা অধিক সুবিধা যে স্থানে পাওয়া যায় সেই স্থানেই সাধারণতঃ শিল্পের একদেশীভবন হইয়া থাকে। পশ্চিম বঙ্গের পাটশিল্পের জন্য শ্রমিক বিহার ও উড়িষ্যা হইতে আনীত হয় সত্য, কিন্তু কাঁচামাল, যানবাহন,

মূলধন প্রভৃতি বিষয়ে অনেক সুবিধা থাকায় এই শিল্প কলিকাতার উপকণ্ঠেই গড়িয়া উঠিয়াছে।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শিল্প
(Some Important Industries)

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প (Iron and Steel Industry)

পৃথিবীর বিভিন্ন শ্রমশিল্পের মধ্যে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পই সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে ব্যবহৃত অধিকাংশ কাঁচামালই শিল্পদ্রব্যে পরিণত হইলে হীনভার হইয়া পড়ে বলিয়া কাঁচামালের (কয়লা ও কোক, লৌহ আকরিক, চুনাপাথর ও ডলোমাইট, ম্যাঙ্গানীজ ও অন্যান্য লৌহ সংকর ধাতব খনিজ) নিকটেই এই শিল্প গড়িয়া উঠে।

লৌহ আকরিক হইতে ইস্পাত উৎপাদন (Production of steel from iron ore)—প্রথমে আকরিক লৌহ, কোক কয়লা ও চুনাপাথর একত্রে বাতচুল্লীতে (blast furnace) ঢালিয়া দিয়া গালান হয়, এবং গলিত লৌহকে ছাঁচে ঢালিয়া লৌহ পিণ্ড (pig iron) প্রস্তুত করা হয়। এই লৌহ পিণ্ডকে পুনরায় গালাইয়া অঙ্গার প্রভৃতি খাদের পরিমাণ হ্রাস করাইলে নমনীয় পিষ্ট লৌহ (wrought iron) পাওয়া যায়। পিষ্ট লৌহের সহিত সামান্য অঙ্গারচূর্ণ ও ম্যাঙ্গানীজ মিশ্রিত করিয়া অথবা সরাসরি লৌহ পিণ্ডের সহিত ম্যাঙ্গানীজ মিশ্রিত করিয়া ইস্পাত (steel) প্রস্তুত করা হয়। সম্প্রতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বৈদ্যুতিক চুল্লীতে (electric furnace) ইস্পাত উৎপাদিত হইতেছে। বৈদ্যুতিক চুল্লীতে উৎপাদিত ইস্পাত অতিশয় সুলভ হইয়া থাকে।

আঞ্চলিক বণ্টন (Regional distribution)—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করে। যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশেও এই শিল্পের প্রসার ব্যাপক।

(ক) **যুক্তরাষ্ট্র**—বিগত অর্ধশতাব্দী যাবৎ যুক্তরাষ্ট্র লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। যুক্তরাষ্ট্রের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের এতাদৃশ উন্নতির কারণ হইল উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা ও লৌহ আকরিকের প্রাচুর্য ও উহাদের পাশাপাশি অবস্থান, দক্ষ শ্রমিকের প্রাচুর্য, লৌহজাত দ্রব্যের প্রচুর স্থানীয় চাহিদা, জলবিদ্যুৎশক্তির প্রাচুর্য, পর্যাপ্ত মূলধনের সরবরাহ, পরিবহনের সুযোগ সুবিধা, দৈহিক শ্রমের অনুকূল জলবায়ু ও স্থিতিশীল শাসনযন্ত্র।

যুক্তরাষ্ট্রের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প মূলতঃ উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে একদেশীভূত

হইয়াছে। তবে ঐ অঞ্চল ব্যতীতও দক্ষিণ আপালাচিয়ান এবং পশ্চিমাঞ্চলেও এই শিল্পের সামান্য প্রসার পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। **উত্তর-পূর্বাঞ্চল** বলিতে উত্তরে মেইন এবং মেরীল্যাণ্ড প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমে মিসিসিপি নদী এবং দক্ষিণে ওহিও ও পটোম্যাক নদীর উত্তরাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলটিকেই বুঝাইয়া থাকে। এই বিস্তৃত অঞ্চলের তিনটি স্থানে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের প্রসার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (১) **হ্রদ অঞ্চল**—সুপিরিয়র হ্রদ সন্নিহিত ডুলুথ, মিচিগান হ্রদ সন্নিহিত ক্যালুমেট, ইরি হ্রদ সন্নিহিত ডেট্রয়েট, ক্লীভল্যাণ্ড ও বাফেলো প্রভৃতি বিখ্যাত লৌহ ও ইস্পাত কেন্দ্রসমূহ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এই অঞ্চলের লৌহ ও ইস্পাত কেন্দ্রগুলি আপালাচিয়ান কয়লাখনি অঞ্চল হইতে কয়লা ও মেসাবী, ভারমিলিয়ন, গোগেবিক, কুইনা এবং মার্কেট লৌহখনি অঞ্চল হইতে লৌহ আকরিক ব্যবহার করে। এই অতি বিস্তৃত হ্রদ অঞ্চলটির মধ্যে **শিকাগো, ইণ্ডিয়ানা পোতাশ্রয়, গ্যারী ও জোলিয়েট** লইয়া গঠিত অঞ্চলটিতেই সমগ্র হ্রদ অঞ্চলে উৎপাদিত লৌহ ও ইস্পাতের ৫০% এবং যুক্তরাষ্ট্রের মোট উৎপাদনের ১৬% উৎপাদিত হইয়া থাকে। (২) **উত্তর আপালাচিয়ান অঞ্চল**—পশ্চিম পেনসিলভ্যানিয়া হইতে পূর্ব ওহিও পর্যন্ত বিস্তৃত এই অঞ্চল লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। **পিটস্‌বার্গ** এই অঞ্চলের মধ্যমণি। এ স্থানের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের কেন্দ্রগুলি উত্তর আপালাচিয়ান কয়লাখনিসমূহ হইতে পর্যাপ্ত কোক কয়লার এবং সুপিরিয়র হ্রদ অঞ্চল হইতে হ্রদ ও রেলপথে অল্প-ব্যয়ে লৌহ আকরিকের সরবরাহ পায়। ইয়ংস্টাউনেও প্রচুর লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদিত হয়। (৩) **মধ্য আটলান্টিক অঞ্চল**—যুক্তরাষ্ট্রের আটলাণ্টিক উপকূল সন্নিহিত মধ্যবর্তী রাষ্ট্রসমূহ লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। তবে **পূর্ব পেনসিলভ্যানিয়া ও মেরীল্যাণ্ড** সন্নিহিত স্থানসমূহই এই সমগ্র অঞ্চলটির মধ্যমণি। চিলি, কিউবা প্রভৃতি দেশ হইতে আকরিক লৌহ আমদানীর সুবিধা, উপকূলাঞ্চলে অবস্থানহেতু উৎপন্ন-দ্রব্যাদি বিদেশে রপ্তানীর সুবিধা, সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্রের নিকটবর্তিতা, পর্যাপ্ত জল ও শ্রমিকের সরবরাহ প্রভৃতি কারণে মধ্যে আটলাণ্টিক অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প একদেশীভূত হইয়াছে। এই অঞ্চল হইতে প্রচুর লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী হইয়া যায়।

দক্ষিণ আপালাচিয়ান অঞ্চলের অন্তর্গত আলাবামা রাজ্যের **বার্মিংহাম** বিখ্যাত লৌহ ও ইস্পাত কেন্দ্র। কয়লা, লৌহ আকরিক, এবং চুনাপাথর ও ডোলোমাইট-এর পাশাপাশি অবস্থান, যানবাহনের সুব্যবস্থা, সুলভ শ্রমিকের সরবরাহ প্রভৃতি কারণে এই অঞ্চলে লৌহ ও

ইস্পাত শিল্প একদেশীভূত হইয়াছে। এই অঞ্চলে উৎপাদিত ঢালাই লৌহ উত্তরাঞ্চলের শিল্পসমূহে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হইয়া যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের **পশ্চিমাঞ্চলের** অন্তর্গত ডেনভার, পুয়েব্লো, স্যানফ্রান্সিসকো, লস্ এঞ্জেল্স্ এবং পাগেট্ সাউণ্ডে সম্প্রতি লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এতদঞ্চলের শিল্পকেন্দ্রসমূহ স্থানীয় আকরিক ও কয়লার সাহায্যেই উৎপাদন কার্য চালাইয়া থাকে এবং কেবলমাত্র স্থানীয় চাহিদা মিটাইবার প্রয়াস পায়। আকরিক, মূলধন ও শ্রমিকের স্বল্পতাই এতদঞ্চলে এই শিল্পটির প্রসারের অন্তরায় স্বরূপ।

উৎপাদনবৈশিষ্ট্য যুক্তরাষ্ট্রের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। ওয়ারসেস্টার, ফিলাডেলফিয়া প্রভৃতি বয়নকেন্দ্রসমূহে বয়ন যন্ত্রপাতি; নিউইয়র্ক, পিট্সবার্গ এবং হার্টফোর্ডে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি; শিকাগো ও মিলওয়াকীতে কৃষি-যন্ত্রপাতি; ফিলাডেলফিয়া, শিকাগো, পিট্স্বার্গ ও সেণ্ট লুই অঞ্চলে রেলগাড়ী; মিচিগান (ডেট্রয়েট), ওহিও, ইণ্ডিয়ানা, উইস্কনসিন এবং ইলিনয় অঞ্চলে মোটর গাড়ী এবং বাল্টিমোর, ওহিও, পেনসিল্ভ্যানিয়া, নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সি, ভার্জিনিয়া, ওকল্যাণ্ড, সীট্ল প্রভৃতি অঞ্চলে জাহাজ প্রস্তুত হয়। বর্তমানে লৌহজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও সরবরাহে যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করে।

(খ) **ইউরোপ**—ইউরোপ মহাদেশের অন্তর্গত বহু দেশেই লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য উৎপাদিত হইলেও কেবলমাত্র দুইটি অঞ্চলেই ইহার উৎপাদন সমধিক উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে একটি হইল গ্রেট ব্রিটেন এবং অপরটি হইল ফ্রান্সের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া বেলজিয়াম ও লুক্সেমবুর্গের মধ্য দিয়া পশ্চিম জার্মানীর রূঢ় অববাহিকা পর্যন্ত প্রসারিত ত্রিভুজাকৃতি শিল্পবলয়টি।

গ্রেট ব্রিটেন লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে পৃথিবীতে বর্তমানে পঞ্চম স্থান অধিকার করে। গ্রেট ব্রিটেনের অনেক কয়লাখনি অঞ্চলের নিকটেই লৌহ আকরিক থাকাতে ঐ সমস্ত অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প দ্রুত প্রসার লাভ করিয়াছে। প্রধানতঃ নিম্নলিখিত অঞ্চলসমূহে এই শিল্পের প্রসার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (১) **স্কটল্যাণ্ড অঞ্চল**—সমুদ্রসান্নিধ্য এবং লৌহ আকরিক ও কয়লার পাশাপাশি অবস্থানহেতু এই অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প একদেশীভূত হইয়াছে। গ্লাসগো ও কোটব্রীজ অঞ্চলে ঢালাই লৌহ এবং মাদারওয়েল, উইসেণ্ড, গ্লাসগো ও কোটব্রীজ অঞ্চলে ইস্পাত প্রস্তুত হইতেছে। (২) **টীনদীর মোহানা অঞ্চল**—ক্লীভল্যাণ্ড পর্বতাঞ্চলে লৌহ আকরিকের উৎপাদন, দক্ষিণ-পশ্চিম ডারহাম অঞ্চল হইতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রচুর কয়লা ও উইয়ারডেল অঞ্চল হইতে চুনাপাথরের সরবরাহ, সমুদ্রসান্নিধ্যে অবস্থানহেতু আমদানী-

রপ্তানীর সুবিধা প্রভৃতি নানা কারণে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এই অঞ্চলে একদেশীভূত হইয়াছে। গ্রেট ব্রিটেনের সমগ্র লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ লৌহ ও ইস্পাত এই অঞ্চলেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। কনসেট ও পশ্চিম হার্টলপুল এই অঞ্চলের প্রধান লৌহ ও ইস্পাত কেন্দ্র। (৩) **পশ্চিম উপকূলাঞ্চল**—প্রচুর হেমাটাইট লৌহ আকরিক ও পর্যাপ্ত চুনাপাথরের সরবরাহ, ডারহাম কয়লাখনি অঞ্চলের নিকটবর্তিতা, সমুদ্র-সান্নিধ্যহেতু আমদানী ও রপ্তানীর সুবিধা প্রভৃতি অবস্থা এই অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের একাদেশীভবনের সহায়তা করে। এই অঞ্চলে উৎপাদিত অধিকাংশ ঢালাই লৌহ শেফিল্ড, বেলফাস্ট, দক্ষিণ ওয়েল্স, স্কটল্যাণ্ড এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও রপ্তানী হইয়া যায়। (৪) **দক্ষিণ ওয়েল্স্ অঞ্চল**—লান্‌লে, সোয়ানসী, ব্রিটনফেরী, পোর্ট ট্যালবট, কার্ডিফ প্রভৃতি দক্ষিণ ওয়েলস্ এর প্রধান প্রধান লৌহ ও ইস্পাত কেন্দ্র। যানবাহনের অধিকতর সুযোগ ও বাং ঢালাই শিল্পের সুবিধার জন্য দক্ষিণ ওয়েল্স-এর লৌহ ও ইস্পাত শিল্প পূর্ব উপকূল অপেক্ষা পশ্চিম উপকূলেই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। (৫) **লিনকন্‌শায়ার অঞ্চল**—ফ্রডিংহাম এবং স্কানথোপ অঞ্চলে লৌহ আকরিকের উৎপাদন, ইয়র্কশায়ার কয়লা খনি অঞ্চলের নৈকট্য, আমদানী-রপ্তানীর সুবিধা প্রভৃতি কারণে এই অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প একদেশীভূত হইয়াছে। (৬) **অন্যান্য অঞ্চল**—গ্রেট ব্রিটেনের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অন্যান্য বহু স্থানেও লৌহ ও ইস্পাত উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে দক্ষিণ ও পশ্চিম ইয়র্কশায়ার এবং ডার্বিশায়ার অঞ্চলে কাঁচা লোহা, দক্ষিণ ল্যাঙ্কাশায়ার এবং উত্তর ওয়েল্স্ অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত, নর্দাম্পটনশায়ার ও লিস্টারশায়ার অঞ্চলে কাঁচা লোহা এবং শেফিল্ড অঞ্চলে অতি উচ্চশ্রেণীর ইস্পাত দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

গ্রেট ব্রিটেনের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে যে পরিমাণ লৌহ আকরিক ব্যবহৃত হয় তাহার প্রায় ·৫ ভাগই বর্তমানে গ্রেট ব্রিটেনে উৎপাদিত হইয়া থাকে। গ্রেট ব্রিটেন সাধারণতঃ উচ্চ শ্রেণীর লৌহ আকরিক স্পেন, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি অঞ্চল হইতে আমদানী করিয়া থাকে। মধ্যাঞ্চলের লৌহ ও ইস্পাতের কারখানাসমূহ বর্তমানে ইস্পাত দ্রব্যের উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিবার চেষ্টা করিতেছে। বার্মিংহাম—নল, পিন, ছিপ এবং মোটর গাড়ী নির্মাণে, শেফিল্ড—ছুরি, কাঁচি ও অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণে, বোল্টন, ওল্ডহাম এবং কেইলি—মাকু এবং বয়নযন্ত্র নির্মাণে, ইস্ট্‌লে, ডনকাস্টার, ডার্বি, অসওয়েস্ট্রি এবং গ্লাসগো—রেলগাড়ী নির্মাণ ও মেরামতি কার্যে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করিয়াছে।

(গ) মহাদেশীয় ইউরোপের (Continental Europe) অন্তর্গত

উত্তর ফ্রান্স, বেলজিয়াম, লুক্সেমবুর্গ ও জার্মানীর রূঢ় অববাহিকা লইয়া গঠিত ত্রিভুজাকৃতি শিল্পবলয়টি গত অর্ধ শতাব্দী যাবৎ লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সংগঠনে এই অঞ্চলটির কয়েকটি স্বাভাবিক সুবিধা রহিয়াছে। **প্রথমতঃ,** লোরেনের সমৃদ্ধ লৌহক্ষেত্রটি এই শিল্পবলয়টির মধ্যভাগে অবস্থিত। **দ্বিতীয়তঃ,** এই শিল্পবলয়টির অন্তর্গত প্রতিটি ইস্পাত কেন্দ্র এক বা একাধিক কয়লাক্ষেত্রকে ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। আবার বিদেশ হইতে কয়লা ও কোক আমদানীর সুবিধাও রহিয়াছে প্রচুর। **তৃতীয়তঃ,** এতদঞ্চলের ইস্পাত-কেন্দ্রসমূহ অন্তর্দেশীয় জলপথ ও রেলপথে একদিকে কয়লা ও লৌহ ক্ষেত্র-সমূহের সহিত এবং অন্য দিকে সামুদ্রিক বন্দরসমূহের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। **চতুর্থতঃ,** এই ত্রিভুজাকৃতি শিল্পাঞ্চলটি ইউরোপীয় প্রধান শিল্প-বলয়টির কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হওয়ায় এতদঞ্চলে উৎপাদিত ইস্পাত দ্রব্যের চাহিদাও ব্যাপক।

জার্মানীর লৌহ ও ইস্পাত শিল্প প্রধানতঃ রূঢ় অববাহিকা অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। এসেন হইল এই অঞ্চলের মধ্যমণি। **ফ্রান্সের** অধিকাংশ লৌহ ও ইস্পাত কেন্দ্রসমূহ কয়লা ও আকরিক ক্ষেত্রের নিকটেই অবস্থিত। লোরেনের নান্সি, নর্মাণ্ডির কায়েন, মধ্যবর্তী অধিত্যকার স্যাঁতেতিএঁ এবং উত্তর-পূর্বের কয়লাখনি সন্নিহিত ভ্যালেসিএঁ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ক্লারমফেরাঁ ও প্যারী অঞ্চলে গাড়ী নির্মাণ শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **বেলজিয়ামের** লৌহ আকরিক ও কয়লার সংস্থান অতি সামান্য। লীজ এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ ইস্পাত কেন্দ্র। কয়লা ও লৌহ আকরিকের সান্নিধ্যহেতু **লুকসেমবুর্গে** ইস্পাত শিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে। পর্যাপ্ত কয়লা সম্পদের অবস্থিতি ও পরিবহন ব্যবস্থার সুবিধার জন্য **সাইলেশিয়ায়** লৌহ ও ইস্পাত শিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে।
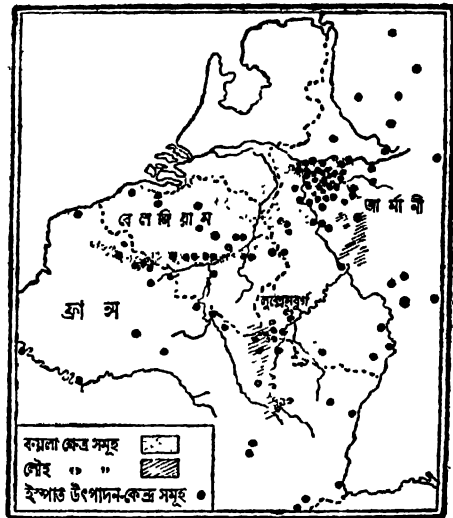
৫৪ নং চিত্র—মহাদেশীয় ইউরোপের ইস্পাত উৎপাদন-কেন্দ্রসমূহ

বর্তমানে এই অঞ্চলটির অধিকাংশই পোল্যাণ্ডের এবং সামান্য অংশ চেকোশ্লোভাকিয়ার অন্তর্গত। যুক্তরাজ্য ও জার্মানী হইতে আমদানীকৃত কয়লা ও কোকের সাহায্যে স্থানীয় (এলবা দ্বীপ) লৌহ আকরিককে কাজে লাগাইবার জন্য সম্প্রতি **ইতালিতে** কয়েকটি ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর আকরিক, কাঠকয়লা ও জলবিদ্যুৎ শক্তির প্রাচুর্য, যুক্তরাজ্য হইতে কয়লা আমদানীর সুবিধা, রেল ও জলপথে সুলভ পরিবহন ব্যবস্থা এবং আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োগহেতু অধুনা **সুইডেন** লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে উন্নতি লাভ করিয়াছে। সুইডেনের অধিকাংশ ইস্পাত-শিল্পকেন্দ্র মধ্যভাগের হ্রদসন্নিহিত অঞ্চলসমূহেই সীমাবদ্ধ। দেশাভ্যন্তরে উৎপাদিত ইস্পাতের পরিমাণ সামান্য হইলেও উৎপাদিত ইস্পাত অতি উচ্চ শ্রেণীর।

(ঘ) **রুশিয়া** বর্তমানে লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। রুশিয়ার ইস্পাত শিল্পকেন্দ্রসমূহ বিভিন্ন কয়লাক্ষেত্রকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। দেশাভ্যন্তরে বহুস্থানে ইস্পাত উৎপাদিত হইলেও দক্ষিণ ইউক্রেন, দক্ষিণ ইউরাল, মস্কো-টুলা এবং পশ্চিম সাইবেরিয়ার কুজনেৎস্ক অঞ্চলেই ইস্পাতের উৎপাদন অধিক। দক্ষিণ ইউক্রেনের অন্তর্গত ক্রিভয়রগ, জেরঝিন্স্ক (Dzerzhinsk), নিপ্রোপেট্রোভস্ক, গরলোভকা, ঝানভ (Zhdanov) বা ম্যারিউপোল, স্টালিনো, মাকিয়েভকা, ইয়েনাকিয়েভো, ভরোশিলোভস্ক ও ভরোশিলোভগ্রাদ; মস্কো-টুলা অঞ্চলের অন্তর্গত টুলা, লিপেৎস্ক, ভরোনেঝ ও গর্কি; ইউরাল অঞ্চলের অন্তর্গত নোভোসাইবিবিস্ক, ম্যাগনিটোগর্স্ক, চেলিযাবিনস্ক ও স্বার্দলোভস্ক এবং কুজনেস্ক অঞ্চলের অন্তর্গত বার্নাউল, স্ট্যালিনিস্ক, প্রোপোপভেস্ক, কেমেরোভো ও টোমস্ক উল্লেখযোগ্য ইস্পাত শিল্পকেন্দ্রসমূহ। লেনিনগ্রাদ, টাসখেণ্ট ও কমসোমলস্ক অঞ্চলেও ইস্পাত শিল্পকেন্দ্রসমূহ রহিয়াছে।

(ঙ) **এশিয়া**—লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সংগঠনে এশিয়ার অন্তর্গত জাপান, মাঞ্চুরিয়া, চীন এবং ভারতই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উচ্চশ্রেণীর লৌহ আকরিক ও কয়লার অভাব সত্ত্বেও ফিলিপিন, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, চীন, মালয়, ভারত, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানীকৃত লৌহ আকরিক, লৌহ পিণ্ড ও কোক এবং দেশাভ্যন্তরে উৎপাদিত জলবিদ্যুতের সাহায্যে উত্তর কিউসিউ, টোকিও-ইয়োকোহামা এবং কোবে-ওসাকা শিল্পাঞ্চলেই **জাপানের** লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এদেশের ইস্পাত শিল্পকেন্দ্রসমূহ আমদানীকৃত কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল বলিয়া উপকূলাঞ্চলেই একদেশীভূত হইয়াছে। কিউসিউ দ্বীপের অন্তর্গত ইয়া-ওয়াটার বিশাল ইস্পাত কারখানা এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম।

চীনের লৌহ ও ইস্পাত কেন্দ্রসমূহ ইয়াংসী নদীর নিম্নপর্যংকে এবং সাংটাং উপদ্বীপাঞ্চলেই গড়িয়া উঠিয়াছে। **ভারতের** ইস্পাত কারখানা-সমূহ জামসেদপুর, আসানসোল, ভদ্রাবতী, ভিলাই, রাউরকেলা ও দুর্গাপুর অঞ্চলে প্রসার লাভ করিয়াছে। **কোরিয়া** (হেইজো) এবং **মাঞ্চুরিয়া** (আনসান) অঞ্চলেও ইস্পাত উৎপাদিত হয়।

(চ) **দক্ষিণ গোলার্ধ—অস্ট্রেলিয়া** দক্ষিণ গোলার্ধের শ্রেষ্ঠ ইস্পাত উৎপাদক দেশ। এই দেশের দক্ষিণ-পুর্ব উপকূলাঞ্চল ব্যাপিয়া উচ্চশ্রেণীর কয়লা রহিয়াছে কিন্তু দেশটি লৌহ আকরিক সম্পদে নিতান্তই দরিদ্র। অস্ট্রেলিয়ার আয়রন-নব (Iron-knob) এবং কুলান দ্বীপের ইয়াম্পী অঞ্চল হইতে আনীত আকরিক লৌহের সাহায্যে পূর্ব উপকূলের নিউক্যাসল, কেম্বলা ও লিথগো অঞ্চলেই এই শিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে। সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশের একমাত্র আধুনিক ইস্পাত উৎপাদক প্রতিষ্ঠানটি **দক্ষিণ আফ্রিকায়** অবস্থিত। কয়লা, আকরিক লৌহ ও চুনাপাথরের সান্নিধ্যহেতু প্রিটোরিয়া ও নিউক্যাসল অঞ্চলেই ইস্পাত শিল্পকেন্দ্রসমূহ গড়িয়া উঠিয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনে **ব্রাজিল** শীর্ষস্থান অধিকার করে। রায়ো-ডু-জেনিরোর উত্তর দিকে অবস্থিত ভোল্টা রেডোণ্ডা (Volta Redonda) অঞ্চলে একটি আধুনিক ইস্পাত কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। মিনাস গেরায়েস (Minas Geraes), সাওপাউলো এবং করাম্বা অঞ্চলেও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহ ও ইস্পাত কেন্দ্র রহিয়াছে। ভোল্টা রেডোণ্ডা অঞ্চলের খনিটি মিনাস গেরায়েস অঞ্চলের লৌহ আকরিক, চুনাপাথর ও লৌহ সংকর ধাতব খনিজ এবং ৫০০ মাইল দূরবর্তী সান্টা ক্যাথারিনার পুর্বাংশের কয়লা ব্যবহার করিয়া থাকে। **মধ্য চিলির** দক্ষিণাংশে, উপকূল সন্নিহিত হুয়াচিপাটো (Huachipato) অঞ্চলে একটি আধুনিক ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র রহিয়াছে। উত্তর চিলির লৌহ আকরিক ও ম্যাঙ্গানীজ, মধ্য চিলির কয়লা, এবং দক্ষিণাঞ্চলের একটি দ্বীপ হইতে আনীত চুনাপাথর এই শিল্পকেন্দ্রে ব্যবহৃত হয়। উৎপাদিত ইস্পাত স্থানীয় চাহিদা মিটাইতেই ব্যয়িত হইয়া যায়। দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য দেশেও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র রহিয়াছে।

ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। আকরিক লৌহের প্রাচুর্য এবং কয়লা, ম্যাঙ্গানীজ, চুনাপাথর, ডলোমাইট প্রভৃতি দ্রব্যের লৌহক্ষেত্রের পাশাপাশি অবস্থান ভারতীয় লৌহ শিল্পের উন্নতির সহায়ক।

উৎপাদক অঞ্চল ও একদেশীভবন—১৮৭৫ সালে আসানসোলের নিকটবর্তী কুলটি অঞ্চলে ভারতে সর্বপ্রথম ঢালাই লোহার উৎপাদন আরম্ভ হয়। বর্তমানে নিম্নলিখিত অঞ্চলসমূহে লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদিত হইতেছে।

(১) **জামসেদপুর অঞ্চল**—এই অঞ্চলে ভারতের শ্রেষ্ঠ এবং এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম লৌহ ও ইস্পাত শিল্পাগার "টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোং লিঃ"-এর কারখানা অবস্থিত। এই কারখানা ১৯০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯১১ সাল হইতে লৌহ উৎপাদন আরম্ভ করে। নিম্নলিখিত অনুকূল কারণে জামসেদপুর অঞ্চলে এই শিল্প একত্র সমাবিষ্ট হইয়াছে—(ক) জামসেদপুর হইতে মাত্র ৭২ কি. মি. দক্ষিণে ময়ূরভঞ্জের গুরুমহিষানী অঞ্চল হইতে লৌহ আকরিকের প্রচুর সরবরাহ; (খ) ঝরিয়ার কয়লাক্ষেত্র জামসেদপুর হইতে মাত্র ১৮৪ কি. মি. উত্তরে অবস্থিত; (গ) জামসেদপুর হইতে মাত্র ১৭৬ কি. মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে গাঙ্গপুর হইতে ম্যাঙ্গানীজ, চুনাপাথর ও ডলোমাইট-এর পর্যাপ্ত সরবরাহ; (ঘ) কলিকাতা বন্দর জামসেদপুর হইতে মাত্র ২৪৬ কি. মি. পূর্বে অবস্থিত; (ঙ) এই সমুদয় অঞ্চলই দঃ-পূব রেলপথ এবং উহার শাখাপথের দ্বারা জামসেদপুব ও ভারতেব অন্যান্য অঞ্চলেব সহিত সংযুক্ত; (চ) রেল কোম্পানীও অপেক্ষাকৃত সুলভ ভাড়ায় টাটা কোম্পানীর মাল আমদানী-রপ্তানী করে; (ছ) জামসেদপুরের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পাগারসমূহে মধ্যপ্রদেশ ও ছোটনাগপুব অঞ্চল হইতে পর্যাপ্ত সুলভ ও দক্ষ শ্রমিকের সরবরাহ হয়; (জ) সুবর্ণরেখা নদী এই শিল্পাগারসমূহে প্রচুর জল সরবরাহ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতেই টাটা কোম্পানী সাধারণের ব্যবহার্য ও যুদ্ধোপকরণ তৈয়ারীর জন্য প্রয়োজনীয় নানাপ্রকার ইস্পাত অতি দক্ষতার সহিত উৎপাদন করিতে থাকে। বর্তমানে এই কারখানাটির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ২০ লক্ষ টন।

(২) **বার্নপুর অঞ্চল**—বার্নপুরের অন্তর্গত কুলটি ও হিরাপুরের কারখানা-গুলিতে ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোং-র মালিকানায় লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদিত হইতেছে। উড়িষ্যার খানসমূহ হইতে লৌহ আকর; রাণীগঞ্জের কয়লা; মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার চুনাপাথর ও ম্যাঙ্গানীজ; পর্যাপ্ত জল, প্রয়োজনীয় শ্রমিক ও মূলধনের প্রচুর সরবরাহ এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সহিত রেলপথে এই কারখানাটির যোগাযোগ হেতু এই অঞ্চলে ইস্পাত শিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে। বর্তমানে এই কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক ১২ লক্ষ টন।

(৩) **মহীশূর অঞ্চল**—এই অঞ্চলে ভদ্রাবতীতে 'মাইশোর আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল লিঃ' নামক ইস্পাত কারখানাটি অবস্থিত। ৪৫ কি. মি. দক্ষিণে বাবাবুদান পর্বতাঞ্চলের কেমাঙ্গুণ্ডি খনি হইতে লৌহ আকরিক, অভ্র ও

মধ্যপ্রদেশ হইতে ম্যাঙ্গানীজ এবং ২৪ কি. মি. পূর্বে ভাণ্ডিগুড্ডা হইতে চুনাপাথর ভদ্রাবতীর শিল্পাগারে নীত হয়। ঐ অঞ্চলে প্রচুর শ্রমিক ও মূলধনের সরবরাহ রহিয়াছে। তবে এই অঞ্চলে কয়লার অভাবহেতু সিমোগা ও কাডুব বনাঞ্চলের কাষ্ঠই পূর্বে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হইত। বর্তমানে যোগ জলপ্রপাত হইতে উৎপাদিত জলবিদ্যুতের দ্বারা এই কারখানার কার্য

৫৫নং চিত্র—ভারতের উত্তর-পূর্ব শিল্পাঞ্চল

পরিচালিত হইতেছে। সম্প্রতি মহীশূরের কারখানায় দুইটি নূতন বৈদ্যুতিক চুল্লী স্থাপিত হইয়াছে। ১৯২৩ সাল হইতে এই প্রতিষ্ঠান লৌহ উৎপাদন আরম্ভ করে। এই কারখানার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১ লক্ষ টন।

দেশাভ্যন্তরে ইস্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ভারত সরকার সম্প্রতি উড়িষ্যার রাউরকেলা, মধ্যপ্রদেশের ভিলাই এবং পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর অঞ্চলের প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া মোট তিনটি কারখানা স্থাপন করিয়াছেন।

রাউরকেলা—উড়িষ্যার সুন্দরগড় জেলায় ব্রাহ্মণী নদীর বামতীরে কলিকাতা হইতে ৪১১ কি. মি. পশ্চিমে দঃ পূঃ রেলপথের কলিকাতা-নাগপুর শাখাপথের উপর অবস্থিত রাউরকেলার ইস্পাতের কারখানাটি ভারত সরকার পশ্চিম জার্মানীর ক্রুপ-ডেমাগ নামক একটি ইস্পাত উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের যান্ত্রিক ও আর্থিক সহযোগিতায় নির্মাণ করিয়াছেন। এস্থানে ইস্পাত কারখানা স্থাপনের কয়েকটি সুবিধা রহিয়াছে। যেরূপ—(১) উড়িষ্যার বোনাই, কেওনঝড়, নোয়ামুণ্ডি, গুয়া প্রভৃতি লৌহখনিসমূহ ইহার অতি নিকটেই অবস্থিত ; (২) উড়িষ্যার ইব, রামপুর, হিমগির, তালচের প্রভৃতি খনি হইতে প্রচুর স্টীম কয়লা পাওয়া যাইবে। কোক কয়লা আসিবে এখান

হইতে ২৮০ কি. মি. দূরে অবস্থিত ঝরিয়ার খনি হইতে ; (৩) এস্থান হইতে মাত্র ২৪ কি. মি. দূরে অবস্থিত গাঙ্গপুরের বীরমিত্রপুর হইতে প্রচুর চুনাপাথর পাওয়া যাইবে ; (৪) ডলোমাইট পাওয়া যাইবে রাউরকেলার অতি নিকটেই অবস্থিত গাঙ্গপুর রাজ্যের পানপোষ ও আমঘাট এবং সম্বলপুর রাজ্যের স্থলাই অঞ্চল হইতে , (৫) এ স্থানের অতি নিকটেই অবস্থিত গাঙ্গপুর, কেওন্ঝড়, বোনাই, পাটনা ও কালাহাণ্ডির খনিসমূহ হইতে আসিবে ম্যাঙ্গানীজ. (৬) ফায়ার ক্লে পাওয়া যাইবে রামপুরের কয়লার খনি ও গাঙ্গপুর হইতে , (৭) উচ্চশ্রেণীর ইস্পাত উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত কোয়ার্টজ, ক্রোমিয়াম, ভ্যানেডিয়াম, গ্র্যাফাইট প্রভৃতির এ অঞ্চলে অসদ্ভাব নাই ; (৮) কাঁচামাল-সমূহের নিকটবর্তী অবস্থানহেতু ইহাদের সংযোজন ব্যয়ও হইবে অল্প , (৯) ব্রাহ্মণী নদী হইতে প্রচুর জল ও হীরাকুদ হইতে বিদ্যুতের সরবরাহ আসিবে , (১০) এস্থান রেলপথে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে এবং (১১) পর্যাপ্ত সমতলভূমি, প্রচুর শ্রমিক ও গৃহ নির্মাণ দ্রব্যাদির সরবরাহও এখানে রহিয়াছে। ১৯৬৫ সালে এই কারখানায় ১০'৭ লক্ষ টন লৌহ এবং ১০ ৮ লক্ষ টন ইস্পাত পিণ্ড উৎপাদিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা ১৮ লক্ষ টন।

ভিলাই—মধ্যপ্রদেশের দ্রুগ জেলার অন্তর্গত ভিলাই কলিকাতা হইতে ৮৪৮ কি. মি. দঃ পশ্চিমে দঃ পূঃ রেলপথের কলিকাতা-নাগপুর শাখাপথের উপর অবস্থিত। ভারত সরকার কর্তৃক রুশ সরকারের যান্ত্রিক ও আর্থিক সহযোগিতায় এ স্থানে একটি ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এ অঞ্চলে ইস্পাত কারখানা স্থাপনের নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রহিয়াছে—(১) ভিলাইয়ের দক্ষিণে ৮০ কি. মি.-এর মধ্যে (৩২ কি. মি. দক্ষিণে ঢালি-রাজহারা লৌহ খনি অঞ্চল) প্রচুর লৌহ আকর রহিয়াছে ; (২) ভিলাইয়ের উত্তরে অবস্থিত বিলাসপুরের করবাতে প্রচুর কয়লা রহিয়াছে ; (৩) ছত্রিশগড় এলাকায় প্রয়োজনীয় চুনাপাথর এবং বিলাসপুরে প্রচুর ডলোমাইট পাওয়া যাইবে ; (৪) ম্যাঙ্গানীজ সম্পদে মধ্যপ্রদেশ ভারতে শীর্ষস্থানীয় ; (৫) বর্তমানে ভিলাই হইতে ৩২-৪০ কি. মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত টুণ্ডলা জলাধার হইতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে ; (৬) এস্থানের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর ; (৭) এ অঞ্চলে কর্মঠ শ্রমিকের প্রাচুর্যও রহিয়াছে। ১৯৬৫ সালে ইহা ১২'৭ লক্ষ টন ইস্পাত পিণ্ড এবং ১৪'৯ লক্ষ টন লৌহ পিণ্ড উৎপাদন করে। বর্তমানে এই কারখানাটির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ২৫ লক্ষ টন।

দুর্গাপুর—পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত দুর্গাপুর কলিকাতা হইতে প্রায় ১৬০ কি. মি. পশ্চিমে পূর্ব-রেলপথের উপর অবস্থিত। এই অঞ্চলে কয়েকটি ব্রিটিশ ইস্পাত উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ও যান্ত্রিক সহযোগিতায় ভারত সরকার

একটি বিরাট ইস্পাত কারখানা নির্মাণ করাইয়াছেন। ইস্পাত কারখানা স্থাপনের পক্ষে দুর্গাপুরের সুবিধা হইল :—(১) রাণীগঞ্জ কয়লা খনি হইতে পর্যাপ্ত কয়লা এবং দুর্গাপুরের "কোক ওভেন" কারখানা হইতে প্রচুর কোকের সরবরাহ ; (২) সিংভূমের বিভিন্ন খনি অঞ্চল হইতে পর্যাপ্ত লৌহ আকরের সরবরাহ, (৩) উড়িষ্যার গাঙ্গপুর রাজ্য ও মধ্যপ্রদেশ হইতে চুনাপাথর, ম্যাঙ্গানীজ ও ডালামাইটের পর্যাপ্ত সরবরাহ ; (৪) দুর্গাপুর জলাধার ও ডি. ভি. সি. হইতে প্রচুর জল ও বিদ্যুতের সরবরাহ এবং (৫) রেল ও খালপথে কলিকাতার সহিত এবং রেলপথে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সহিত দুর্গাপুরের যোগাযোগ। ১৯৬৫ সালে ইহা ১২.৬৭ লক্ষ টন লৌহ পিণ্ড ও ১০.৭ লক্ষ টন ইস্পাত পিণ্ড উৎপাদন করে। বর্তমানে এই কারখানাটির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৬ লক্ষ টন।

বর্তমান অবস্থা—তামিলনাডু অঞ্চলেও লৌহ ও ইস্পাত শিল্পাগার স্থাপনের বহু সুবিধা রহিয়াছে। **তামিলনাডুর** সালেম ও ত্রিচিনপল্লী অঞ্চলে প্রচুর লৌহ আকরিক, চুনাপাথর ও ডলোমাইট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল পাওয়া যায়। তবে কয়লার যে অভাব রহিয়াছে তাহা কাঠ কয়লার সাহায্যে বা জলবিদ্যুতের দ্বারা বহুলাংশে মিটান যাইতে পারে। সম্প্রতি বিহার রাজ্যের **বোকারোতে** সরকারী মালিকানায় ও রুশ সরকারের আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় প্রথমপর্যায়ে ১৭ লক্ষ টন ইস্পাত পিণ্ড উৎপাদনের ক্ষমতাযুক্ত আর একটি নূতন কারখানা স্থাপনের কাজ সুরু হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় কয়লা, সিংভূমের লৌহ আকর, ম্যাঙ্গানীজ ও ডলোমাইট ; দামোদর অঞ্চলের জল ও জলবিদ্যুৎ এই কারখানায় ব্যবহৃত হইবে। এই স্থানটি ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সহিত রেলপথে সংযুক্ত। এস্থানে সুলভ শ্রমিকেরও প্রাচুর্য রহিয়াছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতেই ভারতে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের ব্যাপক উন্নতি দেখা দিয়াছে। এই সময় হইতেই লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্যের উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং নানাপ্রকার লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্যের উৎপাদনেও ভারত অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। এখানকার ইস্পাত অন্যান্য দেশের তুলনায় সুলভ। তবে ভারতকে এখনও প্রয়োজনীয় লৌহ ও ইস্পাতের একটি বিশিষ্ট অংশ বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। এই শিল্পের **বর্তমান সমস্যাগুলি** হইল—(১) মূলধনের অপ্রাচুর্য ; (২) শ্রমিক সংখ্যায় আধিক্য হেতু উৎপাদন ব্যয়ের আধিক্য ; (৩) ধাতব শিল্পে ব্যবহৃত কয়লার অপ্রাচুর্য ; এবং (৪) নিম্ন শ্রেণীর লৌহ ও কোক কয়লা সরবরাহের অপ্রাচুর্য ও অনিশ্চয়তা এবং অতিরিক্ত উৎপাদন হেতু নিকৃষ্ট শ্রেণীর ঢালাই লৌহের উৎপাদন।

ভারতে লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদন, ১৯৫৫-১৯৬৫

('০০০ টন)

	১৯৫৫	১৯৫৬	১৯৬১	১৯৬৩°	১৯৬৩	১৯৬৪	১৯৬৫ (অনুমিত)
লৌহ পিণ্ড	১৭,৫৭	১৮,০৭	৪৯,৮০	৫৭ ৯৬	৬৬,০৩	৬৫,৯৩	৬৯,৫৬
ইস্পাত	১২,৬০	১৩,৩৮	২৮,১০	৩৭,০৮	৪২,৫৭	৪৩,৪৩	৪৫,৩২

পাট শিল্প (Jute industry)

ভারত হইতে আমদানীকৃত পাটের সাহায্যে স্কটল্যাণ্ডের ডাণ্ডি (Dundee) অঞ্চলেই পৃথিবীর পাটশিল্প ১৮৩৫ সালে সর্বপ্রথম গড়িয়া উঠে। পরবর্তীকালে অবশ্য পাটশিল্প **ভারতের** একচেটিয়া শিল্প হিসাবে পরিগণিত হয়।

পূর্ব পাকিস্তানে অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাট উৎপাদিত হয়। বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের খুলনা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও গোবাসালে ১৪টি আধুনিক ধরণের পাটের কল আছে। পাকিস্তানের কলগুলি আমদানীকৃত কয়লার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল।

গ্রেট ব্রিটেনের ডাণ্ডি ও বার্নশ্লে শহরে উন্নত ধরনের পাটের কল রহিয়াছে। এই কলগুলিতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাটজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভারত ও পাকিস্তান হইতে আমদনীকৃত পাটের সাহায্যেই এই কলগুলি পরিচালিত হয়।

পঃ জার্মানী, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, তুরস্ক, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল, প্রভৃতি অঞ্চলেও পাট শিল্প দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে।

ভারতের পাট শিল্প

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত শ্রীরামপুরের সন্নিকটে রিষড়া নামক স্থানে ভারতের প্রথম চটকল স্থাপিত হয়। তবে প্রকৃত পক্ষে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হইতেই বঙ্গদেশ পাট শিল্পে সমৃদ্ধিলাভ করিতে থাকে। বর্তমানে ভারতে ১১৩টি পাটের কল আছে। তন্মধ্যে পশ্চিম বঙ্গে ১০১টি, বিহারে ৩টি, উত্তরপ্রদেশে ৩টি, মধ্যপ্রদেশে ১টি, অন্ধ্রে ৪টি এবং আসামে ১টি কল অবস্থিত। বর্তমানে এই শিল্পে ৩ লক্ষেরও অধিক শ্রমিক এবং প্রায় ১৯ কোটি টাকা পরিমিত স্থিরীকৃত মূলধন নিযুক্ত রহিয়াছে। এই কলগুলির প্রকৃত উৎপাদন ১৪ লক্ষ টন (১৯৬৫-৬৬)। এই কলগুলিতে মোট পাটের দরকার প্রায় ৭০ লক্ষ গাঁইট ; কিন্তু আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের পরিমাণ ৬০ লক্ষ গাঁইট।

উৎপাদক অঞ্চল ও একদেশীভবন—পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্গত কলিকাতার উপকণ্ঠে হুগলী নদীর তীরে ভারতের পাট শিল্প প্রায় সম্পূর্ণরূপে একত্র সমাবিষ্ট হইয়াছে ; কারণ—(১) কলিকাতা বন্দর ভিন্ন অন্য কোন বন্দর দিয়া পাট রপ্তানী হয় না। (২) ২১০ কি. মি. দূরে অবস্থিত রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়ার কয়লার খনিসমূহ হইতে কলিকাতার পাটকলসমূহে স্বল্পব্যয়ে কয়লা আমদানী করা সহজ। (৩) এই অঞ্চলে মূলধনের সরবরাহ প্রচুর। (৪) এই অঞ্চলে শ্রমিকের প্রাচুর্য রহিয়াছে। বিহার ও উড়িষ্যা হইতে সহজে শ্রমিক সংগ্রহ করা যায়। (৫) এই অঞ্চলে নদীপথে যানবাহন ব্যবস্থা অতি উন্নত। (৬) এই অঞ্চলের আর্দ্র জলবায়ু পাট শিল্প প্রসারের অনুকূল। (৭) পাট উৎপাদক অঞ্চলসমূহ এ অঞ্চলের নিকটবর্তী এবং উত্তম পরিবহন ব্যবস্থার দ্বারা সংযুক্ত। (৮) ১৮৫৫ সালে শ্রীরামপুরের নিকটবর্তী রিষড়াতে ভারতের সর্বপ্রথম পাটকল স্থাপিত হয়। পরবর্তী কালেও এই অঞ্চলের চতুর্দিকে বহু পাট-শিল্পাগার গড়িয়া উঠিতে থাকে। (৯) কলিকাতা বন্দরের নৈকট্য হেতু বিদেশ হইতে পাট-বয়ন সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি আমদানী করার এবং পাটজাত দ্রব্যাদি বিদেশে রপ্তানী করার প্রচুর সুবিধা রহিয়াছে। বালী, আগরপাড়া, রিষড়া, শ্রীরামপুর, শ্যামনগর, কাঁকিনাড়া, হুগলী, বাঁশবেড়িয়া ও বজবজ পশ্চিম বঙ্গের বিখ্যাত পাটশিল্পকেন্দ্র। **অন্ধ্রের ৪টি কলের মধ্যে দুইটিই বৃহদায়তন।** ইহাদের একটি বিশাখাপত্তনম জেলার বিমলিপট্টম তালুকের অন্তর্গত চিতাভালসা এবং অপরটি ঐ জেলার নেলিমারলা অঞ্চলে অবস্থিত। **উত্তরপ্রদেশের** তিনটি কল কানপুর ও সাজানওয়া অঞ্চলে অবস্থিত।
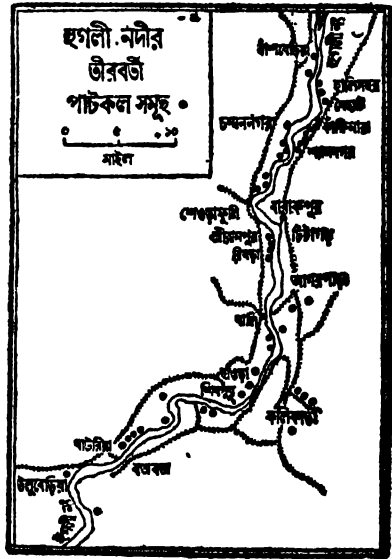
৫৬নং চিত্র—হুগলী নদীর তীরবর্তী পাটকলসমূহ

পাটজাত দ্রব্যাদি চারি শ্রেণীর—থলে, চট, গালিচা এবং দড়ি। যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালী, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, যবদ্বীপ, জাপান, আর্জেন্টিনা, ক্যানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, কিউবা এবং নেদারল্যাণ্ড প্রচুর পরিমাণে ভারতীয় পাটজাত দ্রব্যাদি আমদানী করিয়া থাকে। বর্তমানে

মোট রপ্তানীর প্রায় অর্ধেকই যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করে এবং ইহার পরই যুক্তরাজ্য ও আর্জেন্টিনার স্থান। কলিকাতা বন্দরের মোট রপ্তানীর প্রায় ৫০% এবং সমগ্র ভারতের মোট রপ্তানীর ২০%-২৫%-ই পাট ও পাটজাত দ্রব্য।

বর্তমান অবস্থা—১৯৪৭ সালে বঙ্গ বিভাগের পর হইতেই পশ্চিমবঙ্গের পাটশিল্পে নানাবিধ সমস্যা দেখা দিয়াছে। তবে **বর্তমান সমস্যা**গুলির মধ্যে দেশাভ্যন্তরে পাট উৎপাদনের স্বল্পতা এবং যন্ত্রপাতির ও কলকারখানার সংস্কার সাধনই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (১) বঙ্গ বিভাগের পর হইতেই ভারত পাটের জন্য পাকিস্তানের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। তবে পরবর্তীকালে ভারত সরকারের চেষ্টায় দেশাভ্যন্তরের পাটের উৎপাদন ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। (২) আবার পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল, ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ, জাপান প্রভৃতি দেশে আধুনিক ধরণের পাটের কল গড়িয়া উঠিতেছে। এমতাবস্থায় বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে হইলে ভারতীয় কলগুলির যন্ত্রপাতির সংস্কার সাধন করা আশু কর্তব্য।

পাটশিল্পের উন্নতি বিধানের জন্য "দি ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল জুট এনকোয়ারী কমিটি" বস্তা ও চট ব্যতীত অন্যান্য কি কি কাযে পাট ব্যবহার করা যাইতে পারে সেই সম্বন্ধে গবেষণা কার্য চালাইতেছে। এই সমিতির উদ্যোগে ও গবেষণার ফলে পাটজাত দ্রব্যাদি গৃহনির্মাণ, যানবাহন ও বয়নশিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। ১৯৪৮ সালে স্থাপিত "দি ইনষ্টিট্যুট অব জুট টেকনোলজি"-ও পাটের নানাবিধ ব্যবহার উদ্ভাবন কল্পে নিযুক্ত রহিয়াছে। এই শিল্পের অধিকতর প্রসার কল্পে নিম্নলিখিত কার্যসূচী নির্দিষ্ট হইয়াছে:—
(১) পাটকলসমূহের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে; (২) স্বল্পমেয়াদী কার্যধারা হিসাবে পাকিস্তান হইতে বাণিজ্যিক চুক্তির মাধ্যমে পাটের আমদানী করিতে হইবে, (৩) পাটশিল্পে ব্যবহৃত নানাবিধ কলকব্জা ও যন্ত্রপাতির উৎপাদনের ব্যবস্থা দেশাভ্যন্তরেই করিতে হইবে, (৪) প্রচারকার্যের দ্বারা বিদেশে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি করিতে হইবে, এবং (৫) আভ্যন্তরীণ মূল্য-স্তর ও বৈদেশিক চাহিদার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া মধ্যে মধ্যে রপ্তানী শুল্কের পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে।

ভারতের শর্করা শিল্প

অতি পুরাকাল হইতেই ভারতে দেশী প্রথায় চিনি প্রস্তুত হইতেছে। তবে যান্ত্রিক শিল্প হিসাবে ১৯৩২ সালে সরকারী সংরক্ষণ পাইবার পর হইতেই ভারতীয় শর্করা শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করিতে থাকে। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে আধুনিক ধরণের চিনি কলের সংখ্যা ছিল ১৫৬টি। ১৯৬৫-৬৬ সালে

এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮৫টি। এই কলগুলির মোট উৎপাদন ৩৫ লক্ষ টন। এই শিল্পে ৬০ কোটি টাকার মূলধন ও ১৩৫,০০০ শ্রমিক নিযুক্ত রহিয়াছে।

উৎপাদক অঞ্চল—ভারতের শর্করা শিল্প **উত্তরপ্রদেশ** এবং **বিহারেই** সর্বাপেক্ষা অধিক প্রসার লাভ করিয়াছে। উত্তরপ্রদেশের কানপুর, গোরক্ষপুর, লক্ষ্ণৌ ও এলাহাবাদ; বিহারের চম্পারণ, শরণ, মজঃফরপুর এবং ভাগলপুরে শর্করা শিল্পের প্রসার অধিক। তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটোর, মহারাষ্ট্রের বেলাপুর এবং পাঞ্জাবের অমৃতসরের শর্করা শিল্পও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতের মধ্যে **পাঞ্জাবেই** সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে শর্করা ব্যবহৃত হয়। ইক্ষু উৎপাদনেও এই প্রদেশের স্থান উত্তরপ্রদেশের পরেই। পাঞ্জাবের ইক্ষুতে শর্করার পরিমাণ অল্প থাকায় এই স্থানে শর্করা শিল্প বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। শর্করা ব্যবহারে **মহারাষ্ট্র** ভারতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। মহারাষ্ট্রে একর প্রতি ইক্ষুর উৎপাদনও বিহার বা উত্তরপ্রদেশ অপেক্ষা অধিক। এই অঞ্চলের ইক্ষুও উচ্চশ্রেণীর। মহারাষ্ট্রে শর্করা প্রস্তুত করার পক্ষে অনুকূল সময়ও বিহার বা উত্তরপ্রদেশ অপেক্ষা দীর্ঘতর। কিন্তু কেবলমাত্র ইক্ষু চাষের জন্য বিস্তৃত জমির অভাব ও জলসেচের এবং কৃত্রিম সারের ব্যবহার হেতু ইক্ষু উৎপাদনের ব্যয় অধিক হওয়ায় মহারাষ্ট্রের শর্করা শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। মহারাষ্ট্রের ন্যায় **তামিলনাড়ু** রাজ্যেও চিনির কল স্থাপনের সুবিধা রহিয়াছে, কিন্তু ইক্ষুর চাষের জন্য বহুদূরবিস্তৃত জমির অভাব থাকায় তামিলনাড়ুর শর্করা শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। এখানেও উৎপাদনের হার বিহার ও উত্তরপ্রদেশ অপেক্ষা অধিক। **পশ্চিমবঙ্গে** শর্করাশিল্প প্রসারের বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে। মহীশূর ও হায়দরাবাদ রাজ্যদ্বয়ও শর্করা শিল্পে উন্নত।

বর্তমান অবস্থা—ভারতে বর্তমানে তিন প্রকারের শর্করা উৎপাদিত হয় (ক) আধুনিক কলসমূহে ইক্ষু হইতে, (খ) পরিস্রাবণ প্রথায় গুড় হইতে, এবং (গ) দেশীয় খান্দেশ্বরী প্রথায়। (খ) ও (গ) প্রথায় শর্করা উৎপাদনের পরিমাণ অতি সামান্য। ভারত বর্তমানে পৃথিবীর প্রধান চিনি উৎপাদক দেশ। এই দেশ এক্ষণে চিনির ব্যাপারে একপ্রকার আত্মনির্ভরশীল। গুণাগুণের দিক হইতে বিচার করিলেও দেখা যায় যে ভারতীয় চিনি প্রায় যবদ্বীপের চিনির সমকক্ষ, কিন্তু একর-প্রতি উৎপাদন হিসাবে ভারত যবদ্বীপের $\frac{1}{4}$ অংশ উৎপাদন করে। ভারতীয় শর্করা শিল্পের এতাদৃশ উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতীয় চিনির মূল্য অধিক। এই কারণে অধিকাংশ ভারতবাসীর পক্ষেই ইহা ক্রয় করা সাধ্যাতীত। শুধু আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেই নহে, আন্তর্জাতিক বাজারেও অধিক মূল্য হেতু ভারতীয় চিনি অন্যান্য দেশের চিনির সহিত প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারে না। ভারতীয় চিনির মূল্য অধিক

হওয়ার কারণ—(ক) ভারতের ইক্ষুক্ষেত্রসমূহ চিনির কল হইতে বহুদূরে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিত এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের ইক্ষুও বিভিন্ন প্রকারের, (খ) দূরবর্তী ইক্ষুক্ষেত্র হইতে গরুর গাড়ীতে বা রেলগাড়ীতে শিল্পাগারসমূহে ইক্ষু আনয়ন করিতে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হয় এবং ইক্ষুর রসও অনেক শুকাইয়া যায়, (গ) ভারতীয় চিনির কলসমূহ সারা বৎসরে প্রায় তিনমাসকাল চালু থাকে, অবশিষ্ট নয়মাস কালই এই কলগুলিকে বন্ধ রাখিতে হয় বলিয়া ভারতীয় চিনির উৎপাদনব্যয়ও অধিক হইয়া পড়ে, (ঘ) ভারতে ইক্ষু হইতে রস নিষ্কাশন-পদ্ধতি অত্যন্ত ত্রুটি-বহুল হওয়ায় ইক্ষুপ্রতি নিষ্কাশিত রসের পরিমাণ অল্প, আবার পরিস্রাবণের সময় বহু রসও অনর্থক নষ্ট হইয়া যায়। এই সমস্ত কারণে ভারতীয় চিনির উৎপাদন ব্যয় অধিক হইয়া পড়ে। যবদ্বীপের চিনির কলসমূহে শর্করা শিল্পের উপজাত দ্রব্য হিসাবে মদ ('রাম'), মেথিলেটেড স্পিরিট, কাগজ ও পেস্ট বোর্ড প্রস্তুত হয়, কিন্তু এদেশের কারখানাসমূহে সেরূপ কোন উপজাতদ্রব্য প্রস্তুত হয় না। সুতরাং ইহাতেও এদেশের চিনির উৎপাদন ব্যয় যবদ্বীপের তুলনায় অধিক হইয়া পড়ে। উপরোক্ত ত্রুটিসমূহ দূরীভূত না হইলে ভারতে চিনির মূল্য হ্রাস করা ও চিনির অভাব দূর করা সহজসাধ্য হইবে বলিয়া মনে হয় না। ভারতবাসী মাথাপ্রতি যে পরিমাণ চিনি ব্যবহার করে তাহা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই সামান্য। ভারতবাসীর জীবনধারণের মান উন্নত হইবার সঙ্গে সঙ্গে চিনির চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। তবে চিনির মূল্য হ্রাস না পাইলে চিনির ব্যবহার আশানুরূপ বৃদ্ধি পাইবে না।

ভারতীয় শর্করা শিল্পের ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল। চিনির মূল্য হ্রাস পাইলে শুধু যে আভ্যন্তরীণ চাহিদাই বৃদ্ধি পাইবে তাহাই নহে, পরন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলিতেও ভারতীয় চিনির রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইবে এবং দেশের উৎপাদনও বহুলাংশে বাড়িয়া যাইবে।

বয়ন শিল্প
(Textile Industries)

বয়ন শিল্পের অন্তর্গত প্রধান প্রধান শিল্পসমূহ হইল (১) কার্পাস বয়ন, (২) পশম বয়ন, (৩) রেশম বয়ন, এবং (৪) কৃত্রিম রেশম বয়ন শিল্প।

(১) কার্পাস বয়নশিল্প (Cotton Textile Industry)

বয়ন শিল্প সমূহের মধ্যে কার্পাস বয়ন শিল্পই সমধিক প্রসিদ্ধ। যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সর্বপ্রধান কার্পাস বয়ন কেন্দ্র। যুক্তরাজ্য, রুশিয়া, জাপান, ফ্রান্স, ভারত প্রভৃতি দেশও কার্পাস বয়ন শিল্পে বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে।

(ক) **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র** কার্পাস দ্রব্য উৎপাদনে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। আপালাচিয়ান পর্বতমালার পূর্বাঞ্চলে উত্তরে মেইন হইতে আলাবামা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে যুক্তরাষ্ট্রের কার্পাস শিল্পের প্রসার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সমগ্র অঞ্চলটির মধ্যে তিনটি স্থানেই এই শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে। (১) **নিউইংল্যাণ্ড অঞ্চল**—আর্দ্র জলবায়ু, দক্ষিণাঞ্চল হইতে কার্পাস আনয়নের সুবিধা, জলবিদ্যুতের
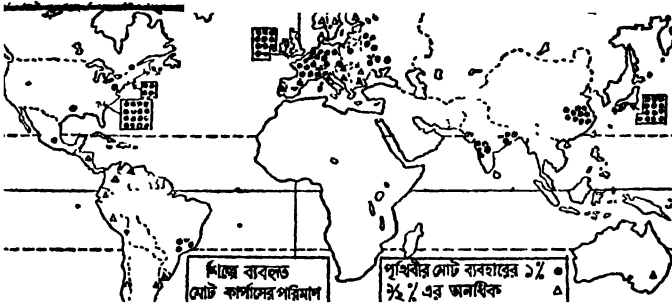
৫৭ নং চিত্র—পৃথিবীর প্রধান প্রধান কার্পাস-বয়ন-কেন্দ্রসমূহ

প্রাচুর্য, বন্দর ও পোতাশ্রয়ের নৈকট্য, জল ও স্থলপথে উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থা, দক্ষ ও সুলভ শ্রমিক এবং মূলধনের প্রাচুর্য প্রভৃতি কারণে নিউইংল্যাণ্ড অঞ্চলে কার্পাস শিল্প একদেশীভূত হইয়াছে। ফল্‌রিভার, উত্তর অ্যাডামস্‌, হালিওক্‌স, টটন, লোয়েল, লরেন্স, ম্যাঞ্চেস্টার, ফিচবার্গ, পটুকেট, ওয়ারউইক, উইনস্‌গেট এবং নিউস্‌টন্‌ এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য কার্পাস-শিল্প কেন্দ্র। নিউইংল্যাণ্ড অঞ্চল অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে। এই অঞ্চলের বস্ত্র ধোলাই এবং রং ও ছাপার কার্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (২) **দক্ষিণাঞ্চল**—পিয়েডমণ্ট বলয়ের অন্তর্গত উত্তর ও দক্ষিণ ক্যারোলিনা, জর্জিয়া ও আলাবামাতে কার্পাস শিল্প ব্যাপকভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। কার্পাস উৎপাদক অঞ্চলসমূহের নৈকট্য, মধ্য ও দক্ষিণ আপালাচিয়ান অঞ্চল হইতে কয়লা ও জলবিদ্যুতের সরবরাহ, মূলধন এবং সুলভ ও নিপুণ শ্রমিকের প্রাচুর্য, কার্পাস দ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা, কার্পাস উৎপাদক অঞ্চল ও ভোগকেন্দ্রের সহিত শিল্পাগার সমূহের উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থা এই শিল্পের প্রসারের সহায়ক। এই অঞ্চলে চুনবর্জিত নরম জলের পর্যাপ্ত সরবরাহ না থাকায় বস্ত্র ধোলাই, রং ও ছাপার কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় না। গ্রীনভীল, স্পার্টানবার্গ, গ্যাস্টোমা, চার্লোটে, কংকর্ড, কলাম্বাস, মেকন, অগাস্টা ও

কলম্বিয়া অঞ্চলে বহু কার্পাস শিল্পাগার রহিয়াছে। এই অঞ্চলে উৎপন্ন কার্পাস দ্রব্যাদি ঈষৎ মোটা। ইহা বিদেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হয়। (৩) **মধ্য আটলান্টিক অঞ্চল**—পেনসিলভ্যানিয়া, নিউইয়র্ক এবং মেরীল্যাণ্ড অঞ্চলে কার্পাস শিল্প ব্যাপকভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। কার্পাস উৎপাদক অঞ্চলসমূহের নৈকট্য, সুলভ ও দক্ষ শ্রমিক এবং জলবিদ্যুতের পর্যাপ্ত সরবরাহ এই অঞ্চলে কার্পাস শিল্পের প্রসারে সহায়তা করে। এই অঞ্চলে সাধারণতঃ গেঞ্জি ও মোজার উৎপাদন সর্বাপেক্ষা অধিক। ফিলাডেলফিয়া গেঞ্জি, মোজা ও লেস উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে।

(খ) গ্রেট ব্রিটেন—কার্পাস শিল্প সংগঠনে গ্রেট ব্রিটেন পৃথিবীতে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। গ্রেট ব্রিটেনের কার্পাসশিল্প প্রধানতঃ ল্যাঙ্কাশায়ারের **ম্যাঞ্চেস্টার** অঞ্চলে বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে। এই একদেশীভবনের কারণ—(ক) এই অঞ্চলের জলবায়ু সারা বৎসরই আর্দ্র থাকায় কার্পাস বয়ন শিল্পের সহায়ক, (খ) এই অঞ্চলে চুনবর্জিত বিশুদ্ধ ও নরম জলের পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকায় বস্ত্র ধোলাই, রং, ছাপা প্রভৃতি কার্যের বিশেষ সুবিধা হয়; (গ) নিকটবর্তী ল্যাঙ্কাশায়ারের কয়লা খনি হইতে পর্যাপ্ত কয়লার সরবরাহ পাওয়া যায়; (ঘ) ল্যাঙ্কাশায়ারের ভূমিভাগ কৃষিকার্যের অনুপযোগী হওয়ায় এই অঞ্চলের প্রায় সমস্ত শ্রমিক এই শিল্পে মনোনিবেশ করিয়াছে, (ঙ) লিভারপুল বন্দরের সান্নিধ্য যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশ হইতে কার্পাস আমদানী ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বস্ত্র রপ্তানীর সুবিধা দান করে; (চ) চেশায়ার অঞ্চলের রাসায়নিক শিল্প এই অঞ্চলের নিকটবর্তী হওয়ায় বস্ত্র ধোলাই, রং এবং ছাপা প্রভৃতি কার্যের উপযোগী রাসায়নিক দ্রব্যাদির সরবরাহ এই অঞ্চলে প্রচুর, (ছ) এই অঞ্চলে যানবাহনের প্রচুর সুবিধা রহিয়াছে।

ল্যাঙ্কাশায়ারের কার্পাস শিল্পে **উৎপাদনবৈশিষ্ট্য** বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। ওল্ডহ্যাম, বোল্টন, ম্যাঞ্চেস্টার, প্রভৃতি দক্ষিণাঞ্চলের কেন্দ্রসমূহে সূতাকাটা অত্যন্ত ব্যাপক। বার্নলে, ব্ল্যাকবার্ন, প্রেস্টন, প্রভৃতি উত্তরাঞ্চলের কেন্দ্রসমূহে বস্ত্রবয়ন অত্যন্ত ব্যাপক। ম্যাঞ্চেস্টার, স্তালফোর্ড, স্টকপোর্ট, বিউরী, বোল্টন, রকডেল, র‍্যাডক্লীফ, হোয়াইটফীল্ড এবং মিড্‌লটন অঞ্চলের বস্ত্র ধোলাই, রং ও ছাপার কার্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গ্রেট ব্রিটেনের কার্পাস শিল্প বিদেশ হইতে আমদানীকৃত কার্পাসের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া থাকে। বর্তমানে অধিকাংশ কার্পাসই যুক্তরাষ্ট্র, মিশর, ব্রাজিল, পেরু, সুদান প্রভৃতি স্থান হইতে আমদানী হয়। গ্রেট ব্রিটেন হইতে উচ্চশ্রেণীর কার্পাস দ্রব্য যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহে রপ্তানী হয় এবং নিম্নশ্রেণীর কার্পাস দ্রব্য ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহ,

আফ্রিকা, পশ্চিম ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হয়।

উপরোক্ত অঞ্চল ব্যতীতও (১) ডাবিশায়ার ও ইয়র্কশায়ারের প্রান্তভাগে বস্ত্র ধোলাই, রং, ছাপা প্রভৃতির কায, (২) গ্লাসগো অঞ্চলে উচ্চশ্রেণীর পপলিন, মসলিন ও জামার কাপড; পেস্‌লী অঞ্চলে সেলাইয়ের সূতা এবং (৩) আয়ারল্যাণ্ডের বেলফাস্ট অঞ্চলেও কার্পাস শিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে।

(গ) মহাদেশীয় ইউরোপ—ইউরোপ মহাদেশের প্রধান ভূমিভাগের পশ্চিমে ইংলিশ চ্যানেল হইতে পূর্বে রুশিয়া এবং দক্ষিণে ইতালী ও স্পেন হইতে উত্তরে সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে কার্পাস-বয়নশিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে। এই বিস্তৃত অঞ্চলের মধ্যে উত্তর-পূর্ব ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, জার্মানী, পোল্যাণ্ড, ইতালী, বেলজিয়াম এবং সুইজারল্যাণ্ডে উচ্চশ্রেণীর কার্পাস দ্রব্য, লেস, গেঞ্জি, মোজা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হইয়া থাকে। সমুদ্রসান্নিধ্য, নিবিড় লোকবসতি, ব্যাপক চাহিদা, সুলভ ও দক্ষ শ্রমিক এবং জলবিদ্যুৎ ও কয়লার প্রাচুর্য, চুনবর্জিত জলের পর্যাপ্ত সরবরাহ এবং উন্নত ধরণের পরিবহন ব্যবস্থা প্রভৃতি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কার্পাস শিল্পের উন্নতি ও প্রসারের কারণ। এতদঞ্চলে প্রধানতঃ আমদানীকৃত কার্পাসের সাহায্যেই বয়নশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। অতি উচ্চশ্রেণীর ও উন্নতধরণের কার্পাস দ্রব্য উৎপাদনে ফ্রান্স (লীল, রুয়েন, মূলহাউস্) পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করে।

(ঘ) রুশিয়া—দক্ষিণ রুশিয়া ও সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে পর্যাপ্ত কার্পাসের সরবরাহ এবং সুলভ শ্রমিক ও বিদ্যুৎশক্তির প্রাচুর্য হেতু রুশিয়া কার্পাস বয়ন শিল্প সংগঠনে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। প্রধানতঃ আঞ্চলিক চাহিদা মিটাইবার জন্য রুশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে কার্পাস বয়ন শিল্প প্রসার লাভ করিলেও লেনিনগ্রাদ, আইভানোভা, ক্যালিনিন ও মস্কো অঞ্চলেই ইহার প্রসার সমধিক উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি ককেসাস, ক্রিমিয়া, উজবেকিস্তান এবং পশ্চিম ও মধ্য সাইবেরিয়ার বিভিন্ন স্থানেও বৃহদায়তন কার্পাস বয়নকেন্দ্রসমূহ প্রসার লাভ করিতেছে।

(ঙ) জাপান—কার্পাস শিল্প সংগঠনে জাপান একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। কার্পাস শিল্পের প্রসারের পক্ষে জাপানের কয়েকটি সুবিধা রহিয়াছে। (১) সমগ্র জাপানের, বিশেষতঃ ইহার দক্ষিণ অংশের আর্দ্র জলবায়ু, (২) সুলভ জলবিদ্যুৎ সরবরাহের প্রাচুর্য, (৩) উন্নত যানবাহন ব্যবস্থা, (৪) সুলভ ও দক্ষ শ্রমিকের প্রাচুর্য, (৫) চীন, ভারত এবং ইন্দোনেশিয়ায় জাপানী দ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা, (৬) উন্নত ধরণের শিল্প সংগঠন এবং মধ্যস্থতার অপসারণ, (৭) জাপানে স্বয়ংক্রিয় বয়নযন্ত্র ব্যবহারের ফলে সুতার

অপচয় হ্রাস, এবং (৮) আধুনিক ও উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে উৎপাদন ব্যয়ের স্বল্পতা।

জাপানের কার্পাস বয়নশিল্প সম্পূর্ণরূপে বৈদেশিক কার্পাস আমদানীর উপর (মুখ্যতঃ যুক্তরাষ্ট্র ও গৌণতঃ মিশর ও চীন হইতে) নির্ভরশীল। ওসাকা, টোকিও, নাগোয়া এবং কোবে অঞ্চলে জাপানের কার্পাস শিল্প সমধিক প্রসার লাভ করিয়াছে। ওসাকাতে কার্পাস বয়নশিল্প এত অধিক প্রসার লাভ করিয়াছে যে ইহাকে প্রাচ্যের ম্যাঞ্চেস্টার বলা হয়। জাপানে সাধারণতঃ মোটা কার্পাস দ্রব্য উৎপাদিত হয়। বর্তমানে দীর্ঘ আঁশযুক্ত উচ্চশ্রেণীর মার্কিন কার্পাস হইতে সূক্ষ্ম বস্ত্রাদির উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইতেছে। জাপানের কার্পাস দ্রব্য ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং প্রাচ্যের অন্যান্য দেশসমূহে রপ্তানী হইয়া যায়। বর্তমানে জাপান বস্ত্র রপ্তানীর ক্ষেত্রে পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করে।

(চ) **চীন** দেশের সাংহাই অঞ্চলেই কার্পাস বয়নশিল্পের প্রসার অধিক। **পাকিস্তানের** বিভিন্ন অঞ্চলেও কার্পাস বয়নশিল্প দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। কার্পাস বয়ন **ভারতের** একটি উল্লেখযোগ্য এবং অতি প্রাচীন শিল্প। **মেক্সিকো** দেশের ওরিজাবা ও মেক্সিকো সিটি অঞ্চলে কার্পাস বয়ন প্রসার লাভ করিয়াছে। সরকারী তত্ত্বাবধানে **ব্রাজিলের** রেসিফ (Recife) হইতে সাওপাওলো অঞ্চল ব্যাপিয়া কার্পাস বয়ন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। কার্পাস বয়ন বর্তমানে ব্রাজিলের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্প। এতদঞ্চল হইতে কার্পাস বস্ত্র দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অন্যান্য নিকটবর্তী অঞ্চল সমূহে রপ্তানী হইয়া যায়। **অস্ট্রেলিয়া** ও **দক্ষিণ আফ্রিকা**তে কার্পাস বয়নের আধুনিক প্রতিষ্ঠান সমূহ গড়িয়া উঠিয়াছে।

ভারতের কার্পাস বয়নশিল্প

কার্পাস বস্ত্র বয়ন ভারতের প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম শিল্প। পশ্চিম বঙ্গের হুগলী জেলার অন্তর্গত ঘুষুড়ী অঞ্চলে ১৮১৮ সালে ভারতের প্রথম কার্পাস শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইলেও ১৮৫১ সালে বোম্বাই প্রদেশে কার্পাস শিল্পাগার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই ভারতীয় কার্পাস শিল্প দ্রুত প্রসার লাভ করিতে আরম্ভ করে।

উৎপাদক অঞ্চল ও শিল্পের একত্র সমাবেশ—বর্তমানে নিম্নলিখিত চারিটি অঞ্চলেই এই শিল্পের প্রসার ব্যাপক—(১) **মহারাষ্ট্র ও গুজরাট** কার্পাস জাত দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ ও কলের সংখ্যার দিক হইতে ভারতে

শীর্ষস্থান অধিকার করে। এই অঞ্চলের অন্তর্গত বোম্বাই, আমেদাবাদ, সোলাপুর, বেলগাঁও এবং সুরাটে বহু কার্পাস শিল্পাগার রহিয়াছে। এতদঞ্চলে কার্পাস শিল্পের একত্র সমাবেশ ও দ্রুত প্রসারের কারণ—(ক) খান্দেশ, বেরার, ওয়ার্ধা প্রভৃতি কার্পাস উৎপাদক অঞ্চলসমূহের নিকটবর্তিতা; (খ) মূলধনের প্রাচুর্য, (গ) উচ্চশ্রেণীর কার্পাস তন্তু উৎপাদনের উপযোগী আর্দ্র জলবায়ুর বিদ্যমানতা; (ঘ) বোম্বাই বন্দরের মাধ্যমে আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশসমূহ হইতে বয়নযন্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানীর সুবিধা; (ঙ) কার্পাস শিল্পকেন্দ্রসমূহে পর্যাপ্ত জলবিদ্যুৎ শক্তির সরবরাহ; (চ) ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সহিত উপযুক্ত পরিবহন ব্যবস্থা দ্বারা এই অঞ্চলের সংযোগ সাধন এবং (ছ) মধ্যপ্রদেশ ও ছোটনাগপুর অঞ্চল হইতে প্রচুর শ্রমিকের সরবরাহ। প্রধানতঃ মধ্যম শ্রেণীর হাল্কা বস্ত্রই এতদঞ্চলের শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহে উৎপাদিত হয়। তবে বর্তমানে উচ্চশ্রেণীর সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র উৎপাদনেও এই অঞ্চল বৈশিষ্ট্য অর্জন করিবার প্রয়াস পাইতেছে। বোম্বাইতে 'ইণ্ডিয়ান সেন্ট্রাল কটন কমিটি'র গবেষণাগার অবস্থিত।

(২) **তামিলনাড়ু অঞ্চল**—কার্পাস শিল্প সংগঠনে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের পরেই তামিলনাড়ুর স্থান। আর্দ্র জলবায়ু, দীর্ঘ আঁশযুক্ত কার্পাসের পর্যাপ্ত স্থানীয় সরবরাহ, শিল্পকেন্দ্রসমূহে জলবিদ্যুতের ব্যবহার, সুলভ ও দক্ষ শ্রমিক এবং মূলধনের প্রাচুর্য, যানবাহনের সুবিধা এবং সর্বোপরি কার্পাস বস্ত্রের ব্যাপক স্থানীয় চাহিদা হেতু এই অঞ্চলে কার্পাস শিল্প দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। রুমাল, কোট ও জামার কাপড়, ড্রিল, খাকী প্রভৃতি বস্ত্র এই অঞ্চলে উৎপাদিত হয়। এই অঞ্চলের কলসমূহ তাঁত শিল্পকে প্রচুর সুতা যোগান দেয়। তামিলনাড়ুর তাঁতের কাপড় বিখ্যাত।

(৩) **উত্তর প্রদেশ অঞ্চল**—কার্পাস শিল্প সংগঠনে এই অঞ্চল ভারতের মধ্যে তৃতীয় স্থানীয়। কানপুর এই অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ কার্পাসশিল্প কেন্দ্র। আগ্রা, আলিগড়, বেরেলী, মোরাদাবাদ প্রভৃতি স্থানেও বহু কার্পাস শিল্প প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। কার্পাসজাত দ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা, সুলভ ও দক্ষ শ্রমিকের প্রাচুর্য ও উন্নত ধরণের যানবাহনের ব্যবস্থা এই অঞ্চলের কার্পাস শিল্পের উন্নতির সহায়ক। তবে এই অঞ্চল হইতে কয়লার খনি ও কার্পাস উৎপাদক স্থানসমূহ বহুদূরে অবস্থিত হওয়ায় কার্পাস শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদৃশ প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। সুতা, বস্ত্র, গেঞ্জী, মোজা, গালিচা প্রভৃতি এই অঞ্চলের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। কানপুরের তাঁবুর কাপড় বিখ্যাত।

(৪) **পশ্চিম বঙ্গ অঞ্চল**—পশ্চিম বঙ্গের কার্পাস শিল্প হুগলী অববাহিকার অন্তর্গত কলিকাতার উপকণ্ঠেই একত্র সমাবিষ্ট হইয়াছে। ইহার কারণ—

(ক) রেল ও জলপথে ভারতের প্রসিদ্ধ ক্রয়বিক্রয় কেন্দ্রসমূহের সহিত কলিকাতা বন্দরের সংযোগ, (খ) কলিকাতা বন্দরের নৈকট্য, (গ) ঝরিয়া ও রাণীগঞ্জের কয়লাখনিসমূহের নিকটবর্তী অবস্থান হেতু প্রচুর শক্তিসম্পদের সুলভ সরবরাহ, (ঘ) পঃ বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা হইতে প্রচুর সুলভ শ্রমিকের সরবরাহ, (ঙ) কলিকাতার ব্যাঙ্ক-সমূহ ও ধনী সম্প্রদায় হইতে মূলধনের সরবরাহ, (চ) পশ্চিম বঙ্গের আর্দ্র জলবায়ু, এবং (ছ) কার্পাসজাত দ্রব্যের ব্যাপক স্থানীয় চাহিদা। পশ্চিমবঙ্গে কার্পাস শিল্পের অধিকতর প্রসারের প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের কলসমূহে যে পরিমাণ কার্পাসজাত দ্রব্য উৎপাদিত হয় তাহা দ্বারা স্থানীয় চাহিদাও মিটান যায় না। অথচ কেবল মাত্র আভ্যন্তরীণ চাহিদাই যে ব্যাপক তাহা নহে, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যাতেও পশ্চিম বঙ্গের কার্পাসজাত দ্রব্যের প্রচুর চাহিদা রহিয়াছে। তবে কার্পাস উৎপাদক অঞ্চলসমূহ শিল্পকেন্দ্রসমূহ হইতে বহুদূরে অবস্থিত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গকে যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। বর্তমানে এখানকার কার্পাস শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহে আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইবার জন্যই অধিক পরিমাণে ধুতি ও শাড়ী উৎপাদিত হইতেছে।
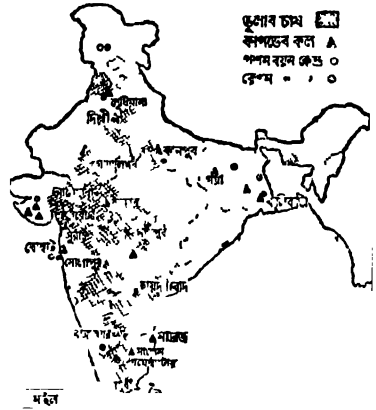
৫৮ নং চিত্র—উল্লেখযোগ্য বয়ন-কেন্দ্রসমূহ

উপরোক্ত চারিটি অঞ্চল ব্যতীতও পাঞ্জাব, দিল্লী, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র, রাজস্থান, মধ্যভারত, সৌরাষ্ট্র, উড়িষ্যা, বিহার, মহীশূর এবং কেরালায় কার্পাস শিল্প প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। দিল্লীর ধুতি, তাঁবু, চাদর প্রভৃতি দ্রব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা—বর্তমানে ভারতে পৃথিবীর সমগ্র উৎপাদনের ১৫% বস্ত্র এবং ১৩% সুতা উৎপাদিত হইতেছে। ভারতীয় কার্পাস শিল্পের **বর্তমান সমস্যা**গুলির মধ্যে (১) দেশাভ্যন্তরে কার্পাস উৎপাদনের স্বল্পতা, (২) শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদন-ক্ষমতার স্বল্পতা, (৩) যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত উৎপাদনজনিত বয়নযন্ত্রসমূহের অস্বাভাবিক ক্ষয় এবং (৪) কলের সুতা উৎপাদন ও তাঁত শিল্পের সহিত সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের অভাবই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতের কার্পাস শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ভারতে উৎপাদিত ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত কার্পাস ব্যতীতও পূর্ব আফ্রিকা, মিশর, সুদান, যুক্তরাষ্ট্র,

পাকিস্তান প্রভৃতি অঞ্চল হইতে আমদানীকৃত উচ্চশ্রেণীর কার্পাস ব্যবহার করিয়া থাকে। তবে বর্তমানে ভারতের বহুস্থানে দীর্ঘ আঁশযুক্ত কার্পাস উৎপাদনের এবং সকল প্রকার কার্পাসের অধিকতর উৎপাদনের চেষ্টা চলিতেছে এবং এই চেষ্টা ফলবতী হইতেও আরম্ভ করিয়াছে।

ভারতীয় কার্পাস শিল্পের প্রতিষ্ঠানসমূহের বোম্বাই অঞ্চল হইতে **বিকেন্দ্রীভবন** বর্তমান কালের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বোম্বাই অঞ্চলে যে সমস্ত প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা রহিয়াছে দেশাভ্যন্তরে অবস্থিত অন্যান্য কার্পাস শিল্পকেন্দ্রসমূহে উহা অপেক্ষাও অধিকতর সুযোগসুবিধা রহিয়াছে। এই সমস্ত কারণে কার্পাস শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি বোম্বাই অঞ্চল হইতে বিকেন্দ্রীভূত হইয়া উপরোক্ত অঞ্চলসমূহে গড়িয়া উঠিতেছে।

ভারতীয় কার্পাস শিল্পের অধিকতর প্রসারের বিপুল **সম্ভাবনা** রহিয়াছে। কারণ আভ্যন্তরীণ চাহিদা ছাড়াও বিদেশে ভারতীয় কার্পাসজাত দ্রব্যের চাহিদা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। এমতাবস্থায় ভারতে উন্নতধরণের উৎপাদনপদ্ধতি প্রবর্তিত হইলে, উৎপাদিত দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাস পাইলে, ভারত কার্পাস উৎপাদনে স্বাবলম্বী হইতে পারিলে এবং বহুমুখী পরিকল্পনার সহায়তায় জলবিদ্যুতের উৎপাদন সুলভ হইলে, ভারত ভবিষ্যতে কাপড়ের কল ও তাঁত শিল্পের সাহায্যে দেশের চাহিদা মিটাইয়াও পৃথিবীর বাজারে, বিশেষতঃ চীন, মধ্যপ্রাচ্য, ব্রহ্মদেশ, পূর্ব আফ্রিকা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর বস্ত্র রপ্তানী করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ১৯৬০-৬১ সালে ভারতে বস্ত্র ও সূতা উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬৭৩·৮ কোটি মি. বস্ত্র ও ৮০·১ কোটি কি. গ্রা. সূতা। ১৯৬৫ সালে ভারতীয় কলগুলির বস্ত্র ও সূতা উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪৬০·৬ কোটি মি. বস্ত্র ও ৯৪ কি. গ্রা. সূতা। বর্তমানে ভারতের ৫৬২টি কাপড়ের কলে ১২২ কোটি টাকার মূলধন ও ১০ লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত রহিয়াছে।

(২) পশমবয়ন শিল্প (Woollen Textile Industry)

কুটিরশিল্প হিসাবে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত পশম উৎপাদক অঞ্চলেই এই শিল্পের প্রসার পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু যান্ত্রিক উৎপাদনের দিক হইতে গ্রেট ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং জার্মানীর পশমশিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর সমগ্র পশমশিল্পে যে পরিমাণ পশম ব্যবহৃত হয় তাহার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ইউরোপীয় পশমশিল্পকেন্দ্রসমূহেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইউরোপীয় পশমশিল্প গ্রেট ব্রিটেন হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম রুশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে সর্বাধিক প্রসার লাভ করিয়াছে। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া, জাপান,

ক্যানাডা, ইতালী, বেলজিয়াম প্রভৃতি অঞ্চলেও পশম শিল্পের প্রসার দেখা যাইতেছে।
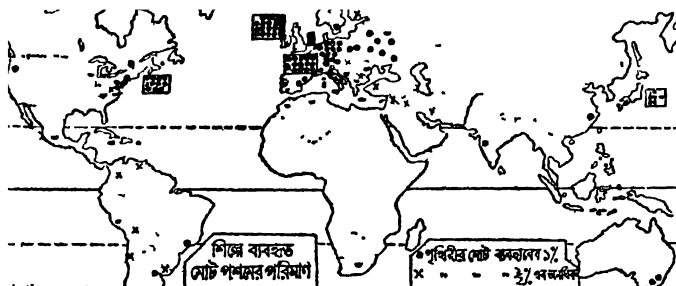
৫৯ নং চিত্র—পৃথিবীর প্রধান প্রধান পশম-বয়নকেন্দ্রসমূহ

পশম-উৎপাদক অঞ্চলসমূহে পশম শিল্পের অনুন্নত অবস্থা—যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চল, আন্দিজ পর্বতাঞ্চল, দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চল, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজীল্যাণ্ড সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পশম উৎপাদন করিয়া থাকে। কিন্তু এই সমস্ত অঞ্চলে পশম শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই, **কারণ**—(১) এই সমস্ত অঞ্চলে লোকবসতি বিরল হওয়ায় শ্রমিক সরবরাহ অপ্রচুর, (২) এই সমস্ত অঞ্চল বয়নযন্ত্র-উৎপাদক অঞ্চলসমূহ হইতে বহুদূরে অবস্থিত, (৩) এই সমস্ত অঞ্চলে মৃদু ও স্বল্পকালস্থায়ী শীতকাল এবং বিরল লোকবসতির দরুণ পশম বস্ত্রের চাহিদা অতি অল্প, (৪) পরিষ্কৃত ও ধৌত পশম মূল্যবান এবং স্থায়ী বলিয়া এই সমস্ত পশম বহু দূর দেশে রপ্তানী হইয়া থাকে।

(ক) **গ্রেট ব্রিটেন** পশম-বয়নশিল্পের সংগঠনে পৃথিবীতে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। গ্রেট ব্রিটেনের **ইয়র্কশায়ার** অঞ্চলে এই শিল্প একদেশীভূত হইয়াছে, কারণ—(১) ইয়র্কশায়ারের নিকটবর্তী পিনাইন পর্বতমালার গাত্র বহিয়া যে সমস্ত জলধারা পতিত হয় তাহাদের জল চুনবর্জিত ও নরম। তৈলাক্ত পশম পরিষ্কৃত করিবার পক্ষে এই শ্রেণীর জল একান্ত প্রয়োজনীয়। (২) ইয়র্ক-ডার্বি-নটিংহামশায়ার কয়লাখনির অঞ্চলসমূহ ইহার নিকটেই অবস্থিত। (৩) এই অঞ্চলে সুলভ শিল্পশ্রমিকের পর্যাপ্ত সরবরাহ রহিয়াছে। (৪) পিনাইন পর্বতাঞ্চল হইতে প্রচুর পশমের সরবরাহ হয়। (৫) পশমজাত দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ চাহিদা অত্যধিক। (৬) এই অঞ্চল সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত হওয়ায় যানবাহন ও আমদানী-রপ্তানীর প্রচুর সুবিধা

রহিয়াছে। (৭) এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক আবহাওয়া পশমশিল্পের অনুকূল।

লীড্‌স, ব্র্যাডফোর্ড, হাডার্সফিল্ড, হ্যালিফ্যাক্স, ওয়েকফিল্ড, ডিউসবেরী এবং ব্যাটলী ইয়র্কশায়ার অঞ্চলের বিখ্যাত পশমশিল্পকেন্দ্র। এই নাতিবিস্তৃত অঞ্চলটির মধ্যে আবার **উৎপাদনবৈশিষ্ট্য** পরিলক্ষিত হয়। ইয়র্কশায়ারের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত ব্র্যাডফোর্ড, হ্যালিফ্যাক্স, কেইলী প্রভৃতি পশমশিল্প-কেন্দ্রসমূহ অতি উচ্চ শ্রেণীর পশমজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন করে এবং হাডার্স-ফিল্ড, ডিউসবেরী, ব্র্যাডফোর্ড, লীডস্ প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পশম-কেন্দ্র-সমূহ অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর পশমজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন করিয়া থাকে।

ইয়র্কশায়ার ব্যতীতও (১) পূর্ব ল্যাঙ্কাশায়ার, উত্তর ম্যাঞ্চেস্টার (রক্‌ডেল এবং বিউরি), পূর্ব ম্যাঞ্চেস্টার (মস্‌লে এবং স্ট্যালীব্রীজ), (২) পশ্চিম ইংল্যাণ্ড (স্ট্রাউড, ডাবস্‌লে, উইট্‌নে, ট্রব্রিজ, কিডারমিনিস্টার), (৩) ওয়েলস (ক্যামার্থেনশায়ার), (৪) লীস্টারশায়ার (লীস্টার, মত্রে, উইগস্টন, লাফার-বরো), (৫) স্কটল্যাণ্ড (হুডউইক) এবং (৬) আয়র্ল্যাণ্ড (বলিমেলা, বেলফাস্ট এবং কর্ক) অঞ্চলেও পশম শিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে।

গ্রেট ব্রিটেনের পশম শিল্পে নিযুক্ত সমগ্র পশমের মাত্র ১৫ ভাগ গ্রেট ব্রিটেনে উৎপন্ন হয়। অবশিষ্টাংশ অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, দক্ষিণ-আফ্রিকা, উরুগুয়ে এবং আর্জেন্টিনা হইতে আমদানী হইয়া আসে। গ্রেট ব্রিটেন অতি উচ্চ শ্রেণীর পশমজাত দ্রব্য উৎপাদন ও রপ্তানী করে। ভারত, জাপান, সুইডেন, নরওয়ে, রুশিয়া, ডেনমার্ক, ইতালী, স্পেন, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ ব্রিটেনের পশমজাত দ্রব্যের প্রধান গ্রাহক।

(খ) **মহাদেশীয় ইউরোপ**—উচ্চশ্রেণীর পশমজাত দ্রব্যাদির উৎপাদনে **ফ্রান্স** পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করে। ফ্রান্সের পশম শিল্প প্রধানতঃ উত্তরাঞ্চলেই সমধিক প্রসার লাভ করিয়াছে। ফ্রান্সে উৎপন্ন পশমের পরিমাণ ঐ দেশের পশম শিল্পের চাহিদা অপেক্ষা অল্প হওয়ায় প্রচুর পরিমাণে পশম আর্জেন্টিনা এবং অস্ট্রেলিয়া হইতে ফ্রান্সে আমদানী হইয়া আসে। রুয়েঁ, রুবে, লীল, টুরকোয়াঁ ও রেইম ফ্রান্সের উল্লেখযোগ্য পশমশিল্পকেন্দ্র। **বেলজিয়ামের** ব্রুসেলস্, **পশ্চিম জার্মানীর** রূঢ় অববাহিকা, **পূর্ব-জার্মানীর** স্যাক্সনী অঞ্চল এবং **পোল্যাণ্ডের** সাইলেশিয়া ইউরোপীয় পশম বয়ন শিল্পের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রসমূহ।

(গ) **রুশিয়ার পশম বয়ন** কেন্দ্রসমূহ ঐ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রসার লাভ করিলেও মস্কো, লেনিনগ্রাদ, ক্রিয়ানোভো, ক্লিন্‌ৎসি, পাভলোভস্কি প্রভৃতি স্থানে এবং ইউরোপীয় রুশিয়ার মধ্যভাগেই সমধিক প্রসারলাভ করিয়াছে। সম্প্রতি ইউক্রেন, ককেসাস, কাজাকস্তান প্রভৃতি অঞ্চলেও নূতন নূতন পশম বয়ন কেন্দ্রসমূহ গড়িয়া উঠিতেছে।

(ঘ) **যুক্তরাষ্ট্রে** পশম-শিল্পের প্রসার প্রায় সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। তবে মেরীল্যাণ্ড হইতে ওহিও, পেনসিলভ্যানিয়া, নিউজার্সি, নিউইয়র্ক এবং দক্ষিণ নিউ ইংল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া মেইন পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে এই শিল্পের প্রসার অত্যন্ত ব্যাপক। এই বহুবিস্তৃত অঞ্চলটির মধ্যে আবার ফিলাডেলফিয়া, প্রভিডেন্স, লোয়েল এবং অরসেস্টার অঞ্চলে বয়ন যন্ত্রপাতির নৈকট্য, অনুকূল জলবায়ু, কয়লা ও জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের নিকটবর্তিতা, পশম বস্ত্রের ব্যাপক চাহিদা এবং পর্যাপ্ত নিপুণ শ্রমিকের সরবরাহ হেতু পশম বয়নশিল্প সমধিক প্রসারলাভ করিয়াছে। এতদঞ্চলের ফিলাডেলফিয়া গালিচা তৈয়ারীর শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। দেশীয় শিল্পের চাহিদা মিটাইবার জন্য যুক্তরাষ্ট্র বহুল পরিমাণে পশম অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা ও এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আমদানী করিয়া থাকে। উৎপাদিত পশমবস্ত্রের অধিকাংশই দেশাভ্যন্তরে ব্যবহৃত হয়, অতি সামান্য অংশই বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়।

(ঙ) **জাপানের** পশম শিল্প অন্যান্য শিল্পের ন্যায় তাদৃশ উন্নত নহে। অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে আমদানীকৃত পশমের সাহায্যে ওসাকা ও আচি অঞ্চলে এই শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। **চীন** (সাংহাই), **অস্ট্রেলিয়া** (সিড্নী ও মেলবোর্ন), **ভারত** (পাঞ্জাব ও উঃ প্রদেশ), **ব্রাজিল** (রায়ো-ডি-জেনেরো), **আর্জেন্টিনা** (বুয়েনস আয়ার্স) প্রভৃতি অন্যান্য উৎপাদক অঞ্চলসমূহ।

(৩) রেশম বয়ন-শিল্প* (Silk Industry)

(ক) **যুক্তরাষ্ট্রের রেশম বয়ন-শিল্প**—রেশম-শিল্প সংগঠনে যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। পূঃ পেন্সিল্ভ্যানিয়া, দঃ নিউইংল্যাণ্ড, উঃ নিউজার্সি এবং দঃ নিউইয়র্ক অঞ্চলে এই শিল্পের প্রসার সমধিক। এই অঞ্চলে পৃথিবীর মোট রেশম দ্রব্য উৎপাদনের ৪০% এবং যুক্তরাষ্ট্রের মোট রেশম-দ্রব্য উৎপাদনের ৮০% উৎপাদিত হয়। নিপুণ শ্রমিক ও শক্তি সম্পদের প্রাচুর্য, স্থানীয় চাহিদার ব্যাপকতা, ক্রয়বিক্রয় কেন্দ্রের নৈকট্য, এবং পরিবহন ব্যবস্থার সুবিধা হেতু এই সমগ্র অঞ্চলটিতে রেশম বয়নশিল্প একদেশীভূত হইয়াছে। শিল্পে ব্যবহৃত সমগ্র রেশমই জাপান, চীন প্রভৃতি দেশ হইতে যুক্তরাষ্ট্রে আমদানী হইয়া আসে। রেশম দ্রব্যের ব্যবহারে যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে।

(খ) **ইউরোপের রেশম বয়ন-শিল্প**—পৃথিবীর মোট রেশম বস্ত্রের প্রায় ⅓ অংশই ইউরোপ মহাদেশে উৎপাদিত হয়। দক্ষিণ ইউরোপের ফ্রান্স

* গুটি (cocoon) হইতে রেশম সুতার উৎপাদন—৯২ পৃঃ দেখ।

ও ইতালীতেই এই শিল্পের প্রসার সমধিক। সুইজারল্যাণ্ড, জার্মানী, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি অঞ্চলেও এই শিল্পের প্রসার পরিলক্ষিত হয়। কয়লা ও জলবিদ্যুৎ শক্তির প্রাচুর্য, সুলভ ও নিপুণ শ্রমিকের পর্যাপ্ত সরবরাহ, রেশমবস্ত্রের ব্যাপক স্থানীয় চাহিদা, দক্ষিণ ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে রেশম সরবরাহ, এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকার কর্তৃক স্থানীয় রেশমবয়নশিল্পসমূহকে শুল্কের সাহায্যে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে সংরক্ষণ প্রভৃতিই হইল ইউরোপীয় রেশম বয়ন শিল্পের উন্নতির মূল কারণ। লিয়ঁ **ফ্রান্সের** সর্বপ্রধান রেশমশিল্পকেন্দ্র। এই অঞ্চলে দক্ষ ও সুলভ শ্রমিকের সরবরাহ এবং রোন অববাহিকার কয়লা ও রেশমের প্রাচুর্য এই শিল্পের উন্নতির সহায়ক। শিল্পাগারসমূহে ব্যবহৃত রেশমের পরিমাণ দেশাভ্যন্তরে উৎপাদিত রেশমের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হওয়ায় ইতালী, জাপান ও চীন হইতেও ফ্রান্সে রেশম আমদানী করা হয়। স্যাঁতেতিয়েঁ, অ্যাভিগ্‌নঁ এবং নিমে অঞ্চলেও রেশম দ্রব্য উৎপাদিত হয়। উত্তরে পো অববাহিকা অঞ্চলে **ইতালীর** রেশম শিল্প সংগঠিত হইয়াছে। এই অঞ্চলে রেশম, জলবিদ্যুৎ এবং সুলভ ও দক্ষ শ্রমিকের প্রাচুর্য রেশম-শিল্পের উন্নতি ও প্রসারের সহায়তা করে। কমো, মিলান ও বার্গমোতে রেশম সূত্র প্রস্তুত হয় এবং মিলানে রেশম বয়ন হইয়া থাকে। ইহা ইউরোপের শ্রেষ্ঠ রেশমবয়ন-কেন্দ্র। **জার্মানীর** স্যাক্সনী ও রাইন পর্যংকে বহু রেশম বয়ন প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। ক্রেফেল্ড জার্মানীর বিখ্যাত রেশম বয়ন কেন্দ্র। **সুইজারল্যাণ্ডের** বিভিন্ন অঞ্চলে রেশম বয়ন-শিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে। **যুক্তরাজ্যে** রেশম শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই। দক্ষিণ-পূর্ব চেশায়ার, উত্তর-পশ্চিম স্ট্যাফর্ডশায়ার, ম্যাকল্‌স্‌ফিল্ড, লীক এবং লংটন অঞ্চলেই এই শিল্পের প্রসার ব্যাপক।

(গ) **জাপানের রেশম বয়ন-শিল্প**—জাপানে রেশমকীট পালন (sericulture) এবং গুটি হইতে রেশম সূত্রের উৎপাদন একটি ব্যাপক শিল্প হইলেও রেশম বয়নশিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই। জাপানের জলবায়ু রেশমকীট পালনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। জাপানের অন্তর্গত হনসু দ্বীপের অনুর্বর ভূমিভাগে প্রচুর তুঁত গাছ জন্মিয়া থাকে। এই গাছের পাতা খাইয়াই গুটিপোকা বাঁচিয়া থাকে। জাপানে বৎসরে দুইবার (বসন্ত ও শরৎকালে) রেশমগুটির উৎপাদন করা হয়। গুটি হইতে সূতা উৎপাদন প্রধানতঃ কুটির শিল্প হিসাবে পরিচালিত হইয়া থাকে। মধ্য হনসু (ফোলা ম্যাগনা, কোয়াণ্টো সমভূমি ও নাগোইয়া অঞ্চল) ও কিউসিউ দ্বীপেই অধিক পরিমাণে রেশম সূতা উৎপাদিত হয়।

রেশম বয়নশিল্পের প্রতিষ্ঠানসমূহ ইসিকাওয়া, কিয়োটো, কোয়াণ্টো, টোচিগি, ইমানসী প্রভৃতি অঞ্চলেই সমধিক প্রসার লাভ করিয়াছে।

এতদঞ্চলের রেশমশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের অধিকাংশই ক্ষুদ্রায়তন। তবে হনসু দ্বীপের পশ্চিমতটে অবস্থিত ফুকুই ও কানাজাওয়াতে রেশম শিল্পের বৃহদায়তন কারখানাও রহিয়াছে।

জাপানের রেশম বস্ত্রের প্রধান প্রধান ক্রেতা হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, ফিলিপিন, ইন্দোনেশিয়া, সিংহল, ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ।

(ঘ) **চীনের রেশম বয়ন শিল্প**—চীনদেশে হস্তচালিত তাঁতের সাহায্যে প্রচুর রেশম দ্রব্য উৎপন্ন হয়। বর্তমানে ক্যান্টন, সাংহাই এবং অন্যান্য শহরে বয়নের কারখানা সমূহ স্থাপিত হইয়াছে। চীনের রেশমদ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হয়।

(ঙ) **ভারতের রেশম বয়ন শিল্প**—বর্তমানে ভারতে গরদ, তসর, এণ্ডি, মুগা, প্রভৃতি নানা শ্রেণীর রেশম বস্ত্র বহু পরিমাণে উৎপাদিত হইতেছে। ভারতের প্রধানতঃ তিনটি অঞ্চলেই রেশম বস্ত্র উৎপাদিত হয় :—(ক) দক্ষিণ মহীশূর ও তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটোর জেলা; (খ) পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলা, এবং (গ) কাশ্মীর, জম্মু ও পাঞ্জাবের সন্নিহিত অঞ্চলসমূহ। ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশের কিয়দংশে তসর; আসামে এণ্ডি ও মুগা, নীলগিরি অঞ্চলে মুগা এবং উত্তর বিহার অঞ্চলেও বর্তমানে রেশমের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে।

(৪) কৃত্রিম রেশম বয়ন বা রেয়ঁ শিল্প (Artificial Silk বা Rayon Industry)

বর্তমানে কীটজ রেশম অপেক্ষা কৃত্রিম রেশম অনেক অধিক পরিমাণে উৎপাদিত হইতেছে। প্রথমতঃ, করাতের গুঁড়া, নরম কাষ্ঠ (প্রধানতঃ স্প্রুস ও পাইন) বা পরিত্যক্ত কার্পাস রাসায়নিক দ্রব্যের সহিত (প্রধানতঃ কার্বন বাইসালফাইড, অ্যাসেটিক অ্যাসিড ও ইথার) মিশ্রিত করিয়া মণ্ডে পরিণত করা হয়। পরে ঐ মণ্ড অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট নলের মধ্য দিয়া প্রবল বেগে চালিত করিলে উহা সূক্ষ্ম সূত্রাকারে পরিণত হয়। পরে এইরূপ কয়েকটি সূক্ষ্ম সূত্র পাকাইয়া উহাদ্বারা বস্ত্র বয়নের উপযোগী সূত্র প্রস্তুত করা হয়। পর্যাপ্ত কাঁচামাল, নরম জল, সুলভ ও দক্ষ শ্রমিকের সরবরাহ ও বিক্রয়কেন্দ্রের নৈকট্য এই শিল্পের গঠন ও একদেশীভবনের সহায়তা করে। রেয়ঁ সাধারণতঃ গেঞ্জি, মোজা প্রভৃতি প্রস্তুতিতে; কার্পাস ও কীটজ রেশমের সহিত মিশ্রিত করিতে এবং প্যারাসুট সিল্ক প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হইতেছে এবং এই সমস্ত কার্যে রেয়ঁ-র ব্যবহার দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। যদিও কৃত্রিম রেশম কীটজ রেশমের ন্যায় কোমল, মসৃণ, সূক্ষ্ম ও চিক্কণ নহে তবুও সুলভতার জন্য কৃত্রিম রেশমের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। এই দিক হইতে বিচার করিলে ইহা নিঃসন্দেহে

বলা যায় যে কৃত্রিম রেশম কীটজ রেশমের সহিত প্রতিযোগিতায় নামিয়াছে। জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, ইতালী, জার্মানী, যুক্তরাজ্য, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ড প্রধান প্রধান কৃত্রিম রেশম **উৎপাদক দেশ**। ক্যানাডা, বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশেও কৃত্রিম রেশম উৎপন্ন হইতেছে। **ভারতের** কৃত্রিম রেশম শিল্প কেরালা, বোম্বাই ও অন্ধ্র অঞ্চলে একদেশীভূত হইয়াছে। ভারতের এই শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়াই মনে হয়। রেয়ঁ বস্ত্রের **রপ্তানীকারক** হিসাবে জাপান প্রধান। অন্যান্য রপ্তানীকারক দেশগুলির মধ্যে পশ্চিম জার্মানী, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ড উল্লেখযোগ্য।

কাগজ শিল্প (Paper Industry)

যে কোন প্রকার তন্তুময় উদ্ভিজ্জ পদার্থকে মণ্ডে পরিণত করিয়া তাহার দ্বারা কাগজ প্রস্তুত করা যায়। তবে ঐ মণ্ডের সহিত বিবিধ রাসায়নিক দ্রব্য, যথা—চায়না ক্লে, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, ফটকিরি ও ট্যাল্‌ক মিশ্রিত করা হয়। কাগজের মণ্ড প্রস্তুত করিতে প্রধানতঃ এস্‌পার্টো ও সাবাই ঘাস, খড়, বাঁশ, তুঁতগাছ, বাওবাব, পরিত্যক্ত পাট, ছিন্ন বস্ত্র, নরম কাষ্ঠ প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে পৃথিবীতে যত কাগজ তৈয়ারী হয় তাহার ৯০%-এরই মূল উপকরণ কাষ্ঠমণ্ড। কাষ্ঠমণ্ড তৈয়ারীর জন্য কেবল মাত্র কোমল কাষ্ঠই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে স্প্রুস, ফার ও পাইন—এই তিন প্রকারের কাষ্ঠের ব্যবহারই অধিক। কঠিন কাষ্ঠ হইতেও কাগজের উপযোগী মণ্ড প্রস্তুত হয় তবে উহাতে সময়, পরিশ্রম ও ব্যয় অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়ে। কাগজ শিল্পের একদেশীভবনের পক্ষে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভৌগোলিক অবস্থার একত্র সমাবেশ সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় :—(১) প্রচুর কোমল কাষ্ঠ সমৃদ্ধ বনভূমির নিকটবর্তিতা। (২) পরিষ্কার ও নরম জলের পর্যাপ্ত সরবরাহ। (৩) কল-কারখানা চালাইবার জন্য প্রচুর যান্ত্রিক বা বৈদ্যুতিক শক্তির সরবরাহ ; কারণ দৈনিক ১ টন কাষ্ঠমণ্ড তৈয়ারীর জন্য গড়ে প্রায় ১০০ অশ্বশক্তি পরিমিত যান্ত্রিক বা বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে। (৪) কাগজশিল্পে ব্যবহৃত নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ। (৫) শিল্পকেন্দ্রে কাষ্ঠ ও বিবিধ রাসায়নিক পদার্থের সরবরাহ এবং শিল্পকেন্দ্র হইতে কাষ্ঠমণ্ড বা কাগজ বিভিন্ন ভোগকেন্দ্রে প্রেরণ করিবার জন্য সুনিয়ন্ত্রিত ও সুলভ পরিবহন ব্যবস্থার প্রয়োজন। বনাঞ্চল হইতে কাষ্ঠ ছেদন, কারখানায় কাষ্ঠ প্রেরণ প্রভৃতি কার্যের জন্য সুদক্ষ শ্রমিকের পর্যাপ্ত সরবরাহ।

বৃহৎ আকারে এই সমস্ত ব্যাপারের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া কাগজ উৎপাদনে পৃথিবীর দুইটি অঞ্চল সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে —(১) উত্তর আমেরিকার সেন্ট-লরেন্স নদীর অববাহিকার অন্তর্গত যুক্তরাষ্ট্র ও

ক্যানাডার পূর্বাঞ্চল এবং (২) উঃ পঃ ইউরোপের অন্তর্গত নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড, পঃ জার্মানী, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য। ইহা ব্যতীত জাপান এবং রুশিয়াও কাগজ উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। ভারতেও কাগজ প্রস্তুত হয় তবে ভারতের কাগজশিল্প বিশেষ উন্নত নহে। পৃথিবীর মোট উৎপাদিত কাগজের প্রায় ১/৩ অংশ যুক্তরাষ্ট্রে, ১/৫ অংশ ক্যানাডায় এবং প্রায় ১/৩ অংশ উঃ পঃ ইউরোপের দেশসমূহে উৎপাদিত হয়।

ভারতের কাগজ

ভারতে কলে প্রস্তুত কাগজের উৎপাদন আরম্ভ হয় ১৮৭০ সালে, হুগলী নদীর তীরে বালির "রয়্যাল পেপার মিলে"। বর্তমানে ভারতে মোট ১৯টি কাগজের কল আছে। ইহাদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ৪টি, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে ৪টি, উত্তরপ্রদেশে ২টি, অন্ধ্রে ৩টি, মহীশূরে ২টি, এবং বিহার, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, ও কেরালার প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া কল আছে। পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতাই ভারতীয় কাগজ-শিল্পের প্রধান কেন্দ্রস্থল। এই ১৯টি কলের মোট বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ২·১ লক্ষ টন এবং প্রকৃত উৎপাদন ২ লক্ষ টন। উহা ব্যতীতও ভারতে ১৮টি বোর্ড তৈয়ারীর কল আছে।

ভারতীয় কাগজের কলসমূহে সাবাই ঘাস ও বাঁশ প্রধান **কাঁচামাল** রূপে ব্যবহৃত হয়। নিকৃষ্ট শ্রেণীর কাগজ তৈয়ারীর জন্য ছিন্নবস্ত্র, পাট, শণ এবং পুরাতন কাগজও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাবাই ঘাস উত্তরপ্রদেশ ও নেপালে প্রচুর জন্মে। আসামের কাছাড়, উড়িষ্যার সম্বলপুর, আঙ্গুল, পুরী, গঞ্জাম প্রভৃতি জেলায় এবং গুজরাট রাজ্যের সুরাট ও মহারাষ্ট্রের কানাড়া জেলায় প্রচুর বাঁশ পাওয়া যায়। বাঁশের মণ্ডে প্রস্তুত কাগজ সাবাই ঘাসের কাগজ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। কিন্তু বাঁশের মণ্ডে কাগজের পরিমাণ অধিক হয় এবং উৎপাদিত কাগজের মূল্যও সুলভ হয়। ভারতে বাঁশের সরবরাহ অপর্যাপ্ত হওয়ায় এবং ভারতে উচ্চশ্রেণীর কাগজের চাহিদা অল্প হওয়ায় মনে হয় এদেশে বাঁশ হইতে কাগজ উৎপাদনের বিরাট সম্ভাবনা আছে। উচ্চশ্রেণীর সংবাদপত্রের কাগজ তৈয়ারী করিতে কাষ্ঠমণ্ড
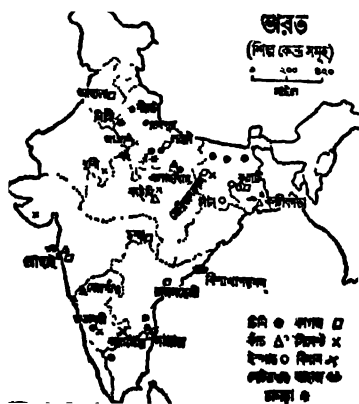
৬০নং চিত্র—ভারতের শিল্পকেন্দ্রসমূহ

ব্যবহৃত হয়। হিমালয়ের পাদদেশে পাইন, ফার, বার্চ প্রভৃতি সরলবর্গীয় বৃক্ষ যদিও প্রচুর জন্মে, কিন্তু যানবাহনের অসুবিধা হেতু উহাদিগকে উপযুক্তভাবে কার্যে ব্যবহার করা যাইতেছে না। কাশ্মীর রাজ্যের পাইন বৃক্ষ হইতে কাষ্ঠমণ্ড এবং উচ্চশ্রেণীর কাগজ প্রস্তুতির বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে। সম্প্রতি দেরাদুনের বন-বিজ্ঞান গবেষণাগার বাগাসের সাহায্যে কাগজ উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছে। কাগজ প্রস্তুত করিতে ব্লিচিং পাউডার, কস্টিক সোডা, সোডা অ্যাশ, ক্লোরিন, গন্ধক, সোডিয়াম সাল্‌ফেট, অ্যালুমিনিয়াম সালফেট প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। ১ টন কাগজ প্রস্তুত করিতে প্রায় ৩½ টন কয়লা জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তবে যে সমস্ত অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত ও ব্যবহৃত হইতেছে সে সমস্ত স্থানে কয়লার ব্যবহার অল্প।

উৎপাদক অঞ্চল—পশ্চিমবঙ্গের কাঁকিনাড়া, টিটাগড, রাণীগঞ্জ এবং নৈহাটিতে কাগজের কল রহিয়াছে। পূর্বে এই সমস্ত কলে ১৬০০ কি. মি. দূর হইতে আনীত সাবাই ঘাস কাঁচামালরূপে ব্যবহৃত হইত। বর্তমানে এই কলসমূহে বাঁশের মণ্ডও ব্যবহৃত হইতেছে। পঃ বঙ্গ ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল-সমূহ হইতে ছেঁড়া কাপড, কাগজ, ঘাস ও বাঁশের ; রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া, বোকারো প্রভৃতি খনি হইতে পর্যাপ্ত কয়লার, স্থানীয় শিল্পাগারসমূহ হইতে এবং কলিকাতা বন্দরের মাধ্যমে আমদানীকৃত রাসায়নিক দ্রব্যের, জল, মূলধন ও শ্রমিকের স্থানীয় সরবরাহের প্রাচুয এবং সর্বোপরি শিক্ষার ব্যাপক প্রসার হেতু ভারতের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কাগজ প্রস্তুত হয়। কলিকাতা কাগজের একটি শ্রেষ্ঠ বাজার। **উত্তরপ্রদেশ** কাগজ উৎপাদনে ভারতের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এই প্রদেশের কাগজের কল তুইটির একটি লক্ষ্ণৌ এবং অপরটি সাহারানপুরে অবস্থিত। লক্ষ্ণৌ-এর কলটি বর্তমানে উত্তরপ্রদেশেব পূর্বাঞ্চল হইতে সংগৃহীত ঘাসের দ্বারা এবং সাহারান-পুরের কলটি উত্তবপ্রদেশের পশ্চিম অঞ্চলের ঘাসের সাহায্যে কাগজ উৎপাদন করিতেছে। **বিহারের** কাগজের কল ডালমিয়ানগরে অবস্থিত। এই কলে সাবাই ঘাস ব্যবহৃত হয়। **উড়িষ্যার** সম্বলপুর জেলার অন্তর্গত ব্রজরাজনগরের কাগজের কলে বাঁশ ব্যবহৃত হয়। **পাঞ্জাবের** কাগজের কল জগদ্ধ্রীতে অবস্থিত। ৮০০ কি. মি. দূরবর্তী নেপাল হইতে ঘাস সংগ্রহ করিয়া এই কল চালানো হয়। জগদ্ধ্রীর কলটিতে সুলভ জলবিদ্যুৎ সরবরাহের সুযোগ রহিয়াছে। **মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের** কাগজের কলসমূহ বোম্বাই, পুণা এবং আমেদাবাদে অবস্থিত। এই কলগুলির নিকট কাঁচামাল না থাকায় কাষ্ঠমণ্ড (আমদানীকৃত), ছিন্নবস্ত্র এবং কাগজ এই অঞ্চলের কারখানাসমূহে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। **মহীশূর** (ভদ্রাবতী) এবং **কেরালার** (পুণালুর) কলসমূহে বাঁশ এবং জলবিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। **অন্ধ্রের** কলগুলি রাজমহেন্দ্রী

ও সিরপুরে অবস্থিত। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের **নেপানগরে** সংবাদপত্রের কাগজ উৎপাদনের জন্য একটি কারখানা মধ্যপ্রদেশ সরকারের আর্থিক সাহায্যে গঠিত হইয়াছে। স্থানীয় কাষ্ঠ হইতে কলে ব্যবহারের উপযোগী কাষ্ঠমণ্ড প্রস্তুত হয়। কাশ্মীর এবং গাড়োয়াল রাজ্যেও কাগজ শিল্প সংগঠনের বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে। *টিস্যু* কাগজ তৈয়ারীর জন্য পঃ বঙ্গের হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণীতে একটি কারখানা খোলা হইয়াছে।

বর্তমান অবস্থা—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে ভারতীয় কাগজ-শিল্পের বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছে। যুদ্ধের পর হইতেই কাগজের উৎপাদন ও চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। তবে, বর্তমানে ভারতীয় কাগজ-শিল্প কতকগুলি **অসুবিধার** মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে। (১) কষ্টিক সোডা, ব্লিচিং পাউডার, সল্ট-কেক্ প্রভৃতি অত্যাবশ্যক রাসায়নিক দ্রব্যসমূহ অতি উচ্চমূল্যে বিদেশ হইতে আমদানী করা হইতেছে ; (২) বন্দর-অঞ্চল হইতে এই সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্য কাগজ-শিল্পাগারসমূহে প্রেরণের খরচও অত্যধিক ; (৩) শিল্পশক্তির অভাবও কাগজ-শিল্পাগারসমূহে বিশেষরূপে অনুভূত হইতেছে; (৪) বিদেশী কাগজের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভারতীয় শিল্পের উন্নতির পথে অন্তরায় স্বরূপ হইয়া উঠিতেছে ; এবং (৫) দেশ বিভক্ত হওয়ায় বাঁশের অপ্রাচুর্য দেখা গিয়াছে।

ভারত সাধারণতঃ যুক্তরাজ্য, নরওয়ে, সুইডেন, জার্মানী, জাপান এবং নেদারল্যাণ্ড হইতে কাগজ আমদানী করে। ভারতে যদিও উচ্চশ্রেণীর কাগজ বিশেষ প্রস্তুত হয় না তথাপি দেশের প্রয়োজনীয় নিকৃষ্ট শ্রেণীর কাগজও ভারতীয় কলগুলি সম্পূর্ণরূপে সরবরাহ করিতে পারে না। ভারতীয় কাগজ শিল্পের অধিকতর সম্প্রসারণ করা আশু কর্তব্য।

রাসায়নিক শিল্প (Chemical Industries)

বর্তমানকালে রাসায়নিক দ্রব্যাদি পৃথিবীর প্রায় সমস্ত শিল্পকার্যেই ব্যবহৃত হয় বলিয়া পৃথিবীর অধিকাংশ শিল্পাঞ্চলেই রাসায়নিক শিল্পের সংগঠন অল্প-বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। তবে জার্মানী, ব্রিটেন, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, রুশিয়া, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, সুইজারল্যাণ্ড ও জাপানেই এই শিল্পের প্রসার সমধিক।

রাসায়নিক শিল্পের বৈশিষ্ট্য—অন্যান্য শ্রমশিল্পের তুলনায় রাসায়নিক শিল্পের কয়েকটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

(১) অন্যান্য যে কোন শিল্প অপেক্ষা এই শিল্পে গবেষণা কার্যে নিযুক্ত মূলধনের পরিমাণ বহুগুণে অধিক ; (২) রাসায়নিক শিল্পে ক্রমাগত গবেষণার ফলে উৎপাদিত দ্রব্যাদির এবং উৎপাদন পদ্ধতির দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয় ;

(৩) রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রথমতঃ গবেষণাগারে পরীক্ষামূলক ভাবে প্রস্তুত করিয়া পরে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বৃহদায়তন শিল্পাগারসমূহে উহাদের উৎপাদন করা হইয়া থাকে। এইরূপভাবে অন্য কোন শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন করা হয় না; (৪) রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন পদ্ধতি দ্রুত পরিবর্তিত হয় বলিয়া এই শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিরও দ্রুত পরিবর্তন আবশ্যক। ফলে উৎপাদন ব্যয়ও অধিক হইয়া পড়ে; (৫) একই রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠানে সাধারণতঃ বহুপ্রকারের দ্রব্যাদি উৎপাদিত হইয়া থাকে; (৬) অন্যান্য যে-কোন শিল্প অপেক্ষা এই শিল্পে রসায়ন বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ বহু শ্রমিকের প্রয়োজন হইয়া থাকে, এবং (৭) এই শিল্পে ব্যবহৃত বহু কাঁচামাল, যেরূপ, বাতাস, জল, লবণ, কাষ্ঠ, কয়লা, প্রভৃতির সরবরাহ প্রচুর ও সুলভ।

বিভিন্ন শ্রেণীর রাসায়নিক দ্রব্যাদি

গুরু রাসায়নিক দ্রব্যাদি (Heavy chemicals)—সালফিউরিক অ্যাসিড, সোডাঅ্যাস, ক্লোরিন, কষ্টিক সোডা, কৃত্রিম সার প্রভৃতিই ইহার অন্তর্গত।

সালফিউরিক অ্যাসিড (Sulphuric Acid)—নানাবিধ শিল্পকার্যে ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহার উৎপাদন ও ব্যবহার দেশগত উন্নতি বা অবনতির সূচক বলিয়া গণ্য করা হয়। পৃথিবীতে উৎপাদিত মোট সালফিউরিক অ্যাসিডের ৪৭.৫% আমেরিকা (যুক্তরাষ্ট্র ৪৫%, ক্যানাডা ৩০% এবং অন্যান্য ২৫%), ৩৬% ইউরোপ (যুক্তরাজ্য ৮%, জার্মানী ৬০%, ফ্রান্স ৫%, ইতালী ৫%, বেলজিয়াম ৪%, স্পেন ২%, নেদারল্যাণ্ড ২%, এবং অন্যান্য ১৪%), ৯% রুশিয়া, ৩ % অস্ট্রেলিয়া এবং ৪.৫% অন্যান্য দেশগুলি উৎপাদন করিয়া থাকে। গন্ধক ও পাইরাইট (pyrite) হইল ইহার উৎপাদনের প্রধান প্রধান কাঁচামাল।

সোডাঅ্যাস, ক্লোরিন এবং কষ্টিক সোডা পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য ক্ষার রসায়ন। বহুবিধ রাসায়নিক দ্রব্য, কাগজ, কাঁচ, সাবান প্রভৃতি প্রস্তুতিতে প্রচুর পরিমাণে **সোডা অ্যাস** (Soda Ash) ব্যবহৃত হয়। চুনাপাথর, লবণ ও কোক কয়লা ইহার প্রধান প্রধান কাঁচামাল। রুশিয়া, ব্রিটেন ও জার্মানী একযোগে যে পরিমাণ সোডাঅ্যাস উৎপাদন করে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রেই সেই পরিমাণ সোডাঅ্যাস উৎপাদিত হইয়া থাকে। আফ্রিকার কেনিয়া অঞ্চলেও বর্তমানে ইহা উৎপাদিত হইতেছে।

বীজাণুনাশক ও জল পরিশোধক হিসাবে এবং রঞ্জক ও বিস্ফোরক দ্রব্যাদি উৎপাদনে প্রচুর **ক্লোরিন** (Chlorin) এবং সাবান, রাসায়নিক দ্রব্য ও কৃত্রিম রেশম উৎপাদনে প্রচুর **কস্টিক সোডা** (Caustic Soda) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই উভয়বিধ রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি

সাধারণতঃ জলপথে উত্তম পরিবহন ব্যবস্থাযুক্ত লবণক্ষেত্র সমূহের সান্নিধ্যেই গড়িয়া উঠে।

রাসায়নিক সার (Chemical Fertilisers)—গুরু রাসায়নিক শিল্পের মধ্যে রাসায়নিক সার প্রস্তুত শিল্প অন্যতম। নাইট্রোজেন ও ইহার বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ, ফসফরাস্ ও পটাস এই শিল্পের প্রধান প্রধান উপাদান।

নাইট্রোজেনের বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ হইতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর রাসায়নিক সার প্রস্তুত হইয়া থাকে। তবে, সোডিয়াম নাইট্রেট বা সোরা হইতে আহৃত খনিজ নাইট্রোজেনের সাহায্যে প্রস্তুত রাসায়নিক সারই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ আমেরিকার **চিলি** সোরার একচেটিয়া কারবারী। বহুক্ষেত্রে অ্যামোনিয়াম সালফেটকে সোরার পরিবর্ত সামগ্রী হিসাবে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। অ্যামোনিয়াম সালফেট কয়লার উপজাত সামগ্রী হিসাবে পাওয়া যায় বলিয়া যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জার্মানী, জাপান, কোরিয়া, ফ্রান্স এবং রুশিয়ায় ইহার উৎপাদন অধিক। পৃথিবীতে উৎপাদিত নাইট্রোজেন ঘটিত সারের প্রায় ৫০% ইউরোপ মহাদেশের অন্তর্গত বিভিন্ন দেশে উৎপাদিত হয়। এই শ্রেণীর সার উৎপাদনে জার্মানী পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করে।

উদ্ভিদ্ খাদ্য ফসফরাস সরবরাহকারী **ফসফেট** সাধারণতঃ মৃত প্রাণীর হাড় হইতে পাওয়া গেলেও খনিজ ফসফেট হইতেই ইহার সরবরাহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই জাতীয় খনিজ ফসফেট-এর উৎপাদন যুক্তরাষ্ট্রেই (রকি পর্বতাঞ্চল, ফ্লোরিডা ও আপালাচিয়ান অঞ্চল) সর্বাধিক। রুশিয়া (কোলা, মস্কো ও কাজাকস্তান), উত্তর আফ্রিকা এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপসমূহেও ইহার সরবরাহ প্রচুর। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের গাদ (slag) হইতেও ফসফেট পাওয়া যায়। জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও লুক্সেমবুর্গ এইরূপ গাদ হইতেই ফসফেট-ঘটিত সার প্রস্তুত করিয়া থাকে। যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ফ্রান্স, ইতালী, অস্ট্রেলিয়া, স্পেন, জার্মানী এবং নেদারল্যাণ্ড প্রচুর ফসফেট-ঘটিত সার প্রস্তুত করে। স্বাভাবিক অবস্থায় ইউরোপীয় দেশগুলিতে এই সারের উৎপাদন উত্তর আমেরিকার উৎপাদনের দ্বিগুণেরও অধিক।

পটাস প্রধানতঃ জার্মানী (স্টাসফার্ট), ফ্রান্স (আলসাস), স্পেন (করডোবা), যুক্তরাষ্ট্র (কার্লসবাড, নিউইয়র্ক ও টেক্সাস), রুশিয়া (ইউরাল) এবং পোল্যাণ্ড (গ্যালিসিয়া) হইতে পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত অঞ্চলেই পটাস-ঘটিত সার প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বিস্ফোরক দ্রব্য (Explosives)—পটাসিয়াম নাইট্রেট, কাঠকয়লা, গন্ধক, নাইট্রোসেলুলোজ, অ্যাসিটোন প্রভৃতি হইল বিস্ফোরক দ্রব্যাদি প্রস্তুতির প্রধান প্রধান কাঁচামাল। তবে ইহাদের মধ্যে নাইট্রোজেনের বিভিন্ন যৌগিক পদার্থই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই নাইট্রোজেন প্রধানতঃ

চিলির সোডিয়াম নাইট্রেট হইতে, কোকচুল্লীর উপজাত দ্রব্যাদি হইতে অথবা বাতাস হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। বিস্ফোরক দ্রব্যাদির সামরিক গুরুত্ব হেতু বর্তমানে পৃথিবীর প্রত্যেক শিল্পপ্রধান দেশেই ইহা উৎপাদিত হইতেছে।

বিশ্লেষিত রঞ্জক দ্রব্য (Synthetic dyes)—আলকাতরা হইতে উৎপাদিত বেনজলের সহিত সালফিউরিক অ্যাসিড মিশাইয়া রঞ্জক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা হয়। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ইতালী, সুইজারল্যাণ্ড, জার্মানী, যুক্তরাষ্ট্র, রুশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে ইহার উৎপাদন প্রচুর। যুক্তরাষ্ট্র ও সুইজারল্যাণ্ড হইতে প্রচুর রঞ্জক দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়।

ঔষধপত্র (Drugs and Medicines)—আর্সেনিক ও উহার নানাবিধ যৌগিক পদার্থ, অ্যাস্পিরিন, ফেনল, বার্বিটল, সালফানিলামাইড, অ্যাটিব্রিন, প্যালুড্রিন, অরিয়ো-মাইসিন প্রভৃতি নানাবিধ বিশ্লেষিত ঔষধপত্র ইহার অন্তর্গত। জার্মানী, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রেই ইহাদের উৎপাদন সমধিক।

প্লাস্টিক্স্ (Plastics)—কাষ্ঠ বা কার্পাস মণ্ডের সহিত নাইট্রিক অ্যাসিড মিশ্রিত করিয়া "নাইট্রোসেলুলোজ" বা "পাইরোক্সাইলিন" প্রস্তুত করা হয়। ইহাই প্লাস্টিক শিল্পের প্রধান কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাষ্ঠমণ্ড বা করাতের গুঁড়া হইতে যে "লিগনিন" পাওয়া যায় তাহার দ্বারাও প্লাস্টিক প্রস্তুত হয়। নানাবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে বহুবিধ গুণসম্পন্ন—যেরূপ ইস্পাত অপেক্ষাও কঠিন, অ্যালুমিনিয়াম অপেক্ষাও হাল্কা, অগ্নি ও অম্লরোধক, বহুবিধ বর্ণ ও স্বচ্ছতা বিশিষ্ট প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর প্লাস্টিক প্রস্তুত হইতেছে। প্লাস্টিক বর্তমানে গৃহাদি নির্মাণ কার্যে, বৈদ্যুতিক শিল্পে, জলরোধক বস্ত্র, গাণিতিক যন্ত্রপাতি, থলি, বোতাম, কোমরবন্ধ, জুতা, কৃত্রিম দাঁত, চিরুণী প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হইতেছে। ভারতেও বর্তমানে এই শিল্পের প্রসার লক্ষ্য করা যাইতেছে।

সাবান ও তৎসংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি—সাবান, স্যাম্পু, ক্ষৌরকর্মে ব্যবহৃত ক্রীম, বহুবিধ প্রসাধন দ্রব্য প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত। সাবান প্রস্তুতিতে চর্বি ও উদ্ভিজ্জ তৈল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর বহু দেশেই এই সমস্ত শিল্পের প্রসার পরিলক্ষিত হয়। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সাবান প্রস্তুতিতে ফ্রান্স উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে।

সিমেণ্ট (Cement)—রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত হয় বলিয়া ইহাকেও রাসায়নিক শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলা যাইতে পারে। গৃহাদি নির্মাণে ইহার ব্যবহার সমধিক। চুনাপাথর, কাদা, জিপসাম, বাতচুল্লীর গাদ, বেলেপাথর, কয়লা প্রভৃতিই হইল এই শিল্পের প্রধান প্রধান কাঁচামাল। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত উন্নতিশীল দেশেই সিমেণ্ট প্রস্তুত হইয়া থাকে। তবে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলি (জার্মানী, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালী, রুশিয়া

প্রভৃতি) একযোগে পৃথিবীর প্রায় ৭৫% সিমেণ্ট উৎপাদন করিয়া থাকে। সিমেণ্ট শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল সমূহ গুরুভার বলিয়া এই শিল্প সাধারণতঃ কাঁচামালের সান্নিধ্যেই গড়িয়া উঠে।

ভারতের রাসায়নিক ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রধান প্রধান শিল্প সমূহ

ভারতের রাসায়নিক শিল্প—দেশরক্ষার্থ যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত করিতে, স্বাস্থ্যরক্ষার্থ নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুত করিতে, কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য সার প্রস্তুত করিতে ও নানাবিধ শিল্পে ব্যবহার্য বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন করিতে দেশাভ্যন্তরে রাসায়নিক শিল্পের উৎকর্ষ সাধন করা যে কোন রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতেই এদেশে রাসায়নিক শিল্প প্রসার লাভ করিতে আরম্ভ করে। বর্তমানে ভারতের ২৫০টিরও অধিক ক্ষুদ্রায়তন রাসায়নিক শিল্পাগারে প্রায় ৩৫ হাজার শ্রমিক নিযুক্ত রহিয়াছে।

শিল্পাঞ্চল—ভারতীয় রাসায়নিক দ্রব্যগুলিকে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা চলে।

(ক) **গুরু রাসায়নিক দ্রব্য**—গন্ধক ও তজ্জাত দ্রব্য, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড, সোডাঅ্যাস, কষ্টিক সোডা, এবং রাসায়নিক সার এই শ্রেণীর অন্তর্গত। নানাবিধ শিল্পে এই শ্রেণীর রাসায়নিক দ্রব্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে ভারতে শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন আশাতীত রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বর্তমানে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী, কানপুর, অমৃতসর, মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর প্রভৃতি অঞ্চলে বিভিন্ন শ্রেণীর গুরু রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদিত হইতেছে। এই শ্রেণীর রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনের উপযোগী কাঁচামাল, যেরূপ লবণ, চুনাপাথর, জিপসাম, বক্সাইট, জিরকন, ইলমেনাইট, বেরিলিয়াম, মোনাজাইট, কেওলিন প্রভৃতি দ্রব্য, ভারতে প্রচুর পাওয়া যায়। তবে পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীত অন্য সমস্ত অঞ্চলে (দিল্লী, মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং ব্যাঙ্গালোর) জ্বালানীর অত্যন্ত অসুবিধা থাকায় ঐ সমস্ত স্থানে এই শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। দক্ষিণ ভারতে জলবিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় ঐ সমস্ত অঞ্চলে গুরু রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে।

নিম্নের পরিসংখ্যান হইতে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রাসায়নিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার ফলাফল এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় নির্ধারিত ভাগ বুঝা যাইবে।

ভারতে গুরু রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন, ১৯৫০-৫১—১৯৬৪-৬৫

(একক : হাজার টন)

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১		১৯৬৫-৬৬	
	উৎপাদন	উৎপাদন	অনুমিত উৎপাদন ক্ষমতা	উৎপাদন	উৎপাদন ক্ষমতা	উৎপাদন (১৯৬৪-৬৫)
সালফিউরিক অ্যাসিড	১,০১	১৬৭	৪৭৬	৩৬৮	১৭৫০	৬৯৫
সোডা অ্যাস	৪৫	৮২	২৬৮	১৫২	৫৩০	২৮৬
কষ্টিক সোডা	১২	৩৬	১২৪	১০১	৪০০	১৯২

(ক) **আলকাতরা-জাত রাসায়নিক দ্রব্য**—আলকাতরা হইতে বেনজল, অ্যানথ্রাসিন, অ্যানথ্রাসিন তৈল প্রভৃতি পাওয়া যায়। এই সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্য রঞ্জক, বিস্ফোরক, গন্ধ দ্রব্য, প্লাস্টিক প্রভৃতি বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। কলিকাতা, কুলটি, জামসেদপুর, বোম্বাই, ঝরিয়া এবং হীরাপুর অঞ্চলে এই সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। (গ) **বিদ্যুৎজাত রাসায়নিক দ্রব্য**--ক্যালসিয়াম কারবাইড, অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, এবং ফেরোম্যাঙ্গানীজ এই শ্রেণীর দ্রব্য। এই সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনে প্রচুর বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহৃত হয় বলিয়া, বিদ্যুৎশক্তির সরবরাহের উপর এই শ্রেণীর রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন নির্ভর করে। এই শ্রেণীর রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন ভারতে অধিক প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। ভারতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে পশ্চিম বঙ্গ, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, মহীশূর এবং উত্তর প্রদেশে এই শ্রেণীর দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বর্তমান অবস্থা—ভারতের বৃহদায়তন রাসায়নিক শিল্পাগারসমূহ প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং মহীশূর রাজ্যেই অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা ভারতীয় রাসায়নিক শিল্পের কেন্দ্রস্থল। সমগ্র ভারতে যত রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদিত হয় তাহার প্রায় ৪৮ ভাগই কলিকাতায় প্রস্তুত হইয়া থাকে। দেশের চাহিদার অনুপাতে নিত্যব্যবহার্য রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন এদেশে এখনও অতি অল্প! তবে ভারত সরকার পুণাতে "ন্যাশনাল কেমিক্যাল লেবোরেটরিজ" নামে যে বৃহৎ রাসায়নিক শিল্প গবেষণাগার স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে ভারতের রাসায়নিক দ্রব্যের অভাব বহুলাংশে দূরীভূত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ভারতের রাসায়নিক শিল্পের প্রধান ত্রুটি হইল এই যে ইহা কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় মধ্যবর্তী সামগ্রীর ক্ষেত্রে বিদেশের

উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। তবে আশা করা যায় যে 'ইণ্ডিয়ান ড্রাগস এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিঃ' ও 'হিন্দুস্থান অর্গানিক কেমিক্যালস্ লিঃ' এই প্রতিষ্ঠান দুইটি সম্পূর্ণ হইলে এই ত্রুটি বহুল পরিমাণে দূরীভূত হইবে। ভারত সরকার সম্প্রতি দিল্লীতে একটি DDT তৈয়ারীর কারখানা এবং পুণার পিম্প্রিতে পেনিসিলিন, স্ট্রেপটোমাইসিন, টেট্রাসাইক্লিন ও ভিটামিন 'সি' তৈয়ারীর কারখানা স্থাপন করিয়াছেন।

ভারতের সার প্রস্তুত শিল্প

ভারতে যে সার উৎপাদিত হয় তাহাদিগকে নিম্নলিখিত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়:—

(১) **নাইট্রোজেন-ঘটিত সার**—এযাবৎকাল পর্যন্ত এই শ্রেণীর সারের মধ্যে অ্যামোনিয়াম সালফেট-ই সর্বাধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। বিহার ও পঃ বঙ্গের কয়লার খনি অঞ্চলে কয়লা হইতে কোক তৈয়ারীর ৪টি কারখানায় উপজাত দ্রব্য হিসাবে ইহা এতদিন পর্যন্ত প্রস্তুত হইতেছিল, তবে ১৯৩৯ সালে মহীশূরের বেলাগুলায় সর্বপ্রথম বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে ইহার উৎপাদন কার্য সুরু হয়। কেরালার আলওয়াএ এবং বিহারের সিন্ত্রীতেও সম্প্রতি ইহার কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। সালফিউরিক অ্যাসিড ও জিপসাম এই শিল্পের প্রধান **কাঁচামাল**। ভারত সরকার কর্তৃক পরিচালিত এশিয়ার বৃহত্তম সার উৎপাদন কারখানা "**সিন্ত্রী** ফার্টিলাইজার অ্যাণ্ড কেমিক্যাল্স্" বিহারে ধানবাদ হইতে ১৭ মাইল দঃ পূর্বে অবস্থিত। এই কারখানা ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাস হইতে উৎপাদন কার্য আরম্ভ করে। ইহার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৩.৫ লক্ষ টন অ্যামোনিয়াম সালফেট। এই কারখানায় প্রতিদিন ৫০০-৬০০ টন কোক কয়লার প্রয়োজন হয়, তাহা আসে সিন্ত্রীর নিজস্ব কোক কয়লা প্রস্তুতির চুল্লী হইতে। এই সার উৎপাদন কার্যে পর্যাপ্ত জলের প্রয়োজন হয় বলিয়া গোয়াই নদীতে বাঁধ দিয়া জলসংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ধানবাদের কয়লাখনির নিকটেই অবস্থিত হওয়ায় এ স্থানে কয়লারও প্রাচুর্য রহিয়াছে। সিন্ত্রী উপযুক্ত পরিবহন ব্যবস্থা দ্বারা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত। সিন্ত্রীর কারখানা হইতে উপজাত দ্রব্য হিসাবে প্রতিদিন যে ১০০০ টন ক্যালসিয়াম কার্বনেট পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা একটি সিমেন্টের কারখানাও চালান যাইবে।

১৯৫০-৫১ সালে ভারতে ৩.৭ লক্ষ টন অ্যামোনিয়াম সালফেট আমদানী হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালে ইহার চাহিদা দাঁড়ায় ৬.১ লক্ষ টন। এই শিল্পের **বর্তমান সমস্যা**গুলির মধ্যে গন্ধক সরবরাহের অপ্রতুলতা এবং সিন্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য কারখানাগুলির উৎপাদন ব্যয়ের আধিক্যই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সরকারী সার উৎপাদন কারখানাগুলি ১৯৬১ সালে স্থাপিত 'ফার্টিলাইজার

কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ' নামক এক প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইতেছে।

(২) **ফসফেট-ঘটিত সার**ঃ—১৯৫১ সালে ভারতের ১৪টি কারখানায় (বোম্বাইয়ে ৭টি, মহীশূরে ২টি, এবং পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, মাদ্রাজ, প্রাক্তন হায়দরাবাদ এবং দিল্লীর প্রত্যেকটিতে ১টি করিয়া) ৬১,০১৮ টন সুপার-ফসফেট উৎপাদিত হয় (মোট উৎপাদনের ক্ষমতা ১'২৩৫ লক্ষ টন)। রক ফসফেট ও সালফিউরিক অ্যাসিড এই শিল্পের প্রধান **কাঁচামাল**। রক ফসফেট বিদেশ হইতে আমদানী হয় এবং সালফিউরিক অ্যাসিড আমদানীকৃত গন্ধকের সাহায্যে এ দেশেই কেহ কেহ তৈয়ারী করিয়া লয়। দেশাভ্যন্তরে এই সারের চাহিদা বার্ষিক প্রায় ১'২ লক্ষ টন। উৎপাদন ব্যয়ের আধিক্য এবং গন্ধকের অপ্রাচুর্যই এই শিল্পের **বর্তমান সমস্যা**।

(৩) **পটাস-ঘটিত সার**—ভারতে এই শ্রেণীর সার (১) বিহার, উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাব রাজ্যের পটাসিয়াম নাইট্রেট হইতে, (২) লবণ উৎপাদনের উপজাত দ্রব্য হিসাবে এবং (৩) গুড় হইতে প্রস্তুত হইতেছে। আমাদের দেশে ইহার প্রয়োজন বর্তমানে প্রায় ৩৭,৫০০ টনের। আশা করা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে দেশে ইহার ব্যবহার বৃদ্ধি পাইবে।

ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষির উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে তাহাতে ভারতীয় সার প্রস্তুত শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়াই মনে হয়।

ভারতে সারের উৎপাদন, ১৯৫০-৫১—১৯৬৫-৬৬

(একক : হাজার টন)

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১		১৯৬৫-৬৬	১৯৬৪-৬৫
	উৎপাদন	উৎপাদন	অনুমিত উৎপাদন ক্ষমতা	উৎপাদন	উৎপাদন ক্ষমতা	উৎপাদন
নাইট্রোজেন-ঘটিত সার (নাইট্রোজেন ভিত্তিতে)	৯	৮০	২৪৮	৯৯	১০০০	২৩৩
ফসফেট-ঘটিত সার (P_2O_5 ভিত্তিতে)	৯	১২	৬০	৫৪	৫০০	১৩১

ভারতের সিমেণ্ট শিল্প

গৃহাদি নির্মাণে সিমেণ্ট একটি অপরিহার্য উপকরণ। ১ টন সিমেণ্ট তৈয়ারী করিতে ১'৬ টন চুনাপাথর ও এঁটেল মাটি, ০'২ টন হইতে ০'৫ টন

কয়লা এবং ০'০৩৫ টন জিপসাম **কাঁচামাল** রূপে ব্যবহৃত হয়। উৎকৃষ্ট চুনাপাথর ভারতের অনেক স্থানে রেলপথের নিকটেই পাওয়া যায়। এঁটেল মাটিও সর্বত্র পাওয়া যায়। ভারতে জিপসাম ও কয়লার উৎপাদনও প্রচুর।

শিল্পাঞ্চল—১৯০৪ সালে মাদ্রাজে ভারতের প্রথম সিমেণ্ট তৈয়ারীর কারখানা স্থাপিত হয়। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতের ২১টি সিমেণ্টের কারখানার মধ্যে বিহারে ৫টি, মধ্যপ্রদেশে ১টি, মাদ্রাজ-অন্ধ্রে ৫টি, সৌরাষ্ট্রে [illegible], পেপসুতে ২টি এবং মহীশূর, হায়দরাবাদ, রাজস্থান, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন ও মধ্যভারতের প্রত্যেকটিতে ১টি করিয়া কারখানা ছিল। এই কারখানাগুলির মোট উৎপাদনক্ষমতা ও প্রকৃত উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ৩২'৮ লক্ষ টন ও ২৬'৯২ লক্ষ টন। ঐ সালে এই প্রতিষ্ঠানসমূহে ২৭ কোটি টাকা পরিমিত মূলধন ও ৩৩০০০ শ্রমিক নিযুক্ত ছিল। ভারতের মধ্যে **বিহার** সিমেণ্ট উৎপাদনে প্রধান স্থান অধিকার করে। বিহারের ডালমিয়ানগর, জাপলা, চাঁইবাসা ও খেলারী সিমেণ্ট উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। ডালমিয়ানগরের সিমেণ্টের কারখানা ভারতের মধ্যে বৃহত্তম। মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর ও গোয়ালিয়র; গুজরাটের পোরবন্দর, মহীশূরের ব্যাঙ্গালোর; তামিলনাড়ু-অন্ধ্রের মধুকরাই, বেজওয়াদা, ডালমিয়াপুরম ও মঙ্গলগিরি, পাঞ্জাবের অমৃতসর, ও প্রাক্তন হায়দরাবাদ সিমেণ্ট উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। ১৯৫২ সালে "অ্যাসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কোং অব ইণ্ডিয়া" নামক একটি সংঘের কর্তৃত্বাধীনে ১২টি (মোট উৎপাদনক্ষমতা ২৩ লক্ষ টন), ডালমিয়ার তত্ত্বাবধানে ৪টি (মোট উৎপাদন-ক্ষমতা ৮'৩ লক্ষ টন), মহীশূর সরকারের তত্ত্বাবধানে ১টি (মোট উৎপাদন-ক্ষমতা ০'৮৬ লক্ষ টন) এবং ৬টি স্বতন্ত্র (মোট উৎপাদনক্ষমতা ৬'৭ লক্ষ টন) প্রতিষ্ঠান ছিল। সিমেণ্টের উৎপাদন এবং মূল্য "এ. সি. সি. আই" সংঘ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়।

বর্তমানে ভারতে যে পরিমাণ সিমেণ্ট উৎপাদিত হইতেছে তাহার দ্বারা দেশের চাহিদা মিটাইয়া বিদেশে রপ্তানী করার মত উদ্বৃত্ত থাকে না। পূর্বে ইরাক, সিংহল ও ইন্দোনেশিয়াতে ভারতীয় সিমেণ্ট রপ্তানী হইত। ভারত বিদেশ হইতে সামান্য পরিমাণে উচ্চ শ্রেণীর সিমেণ্ট আমদানী করে।

ভারতীয় সিমেণ্ট শিল্পের **বর্তমান সমস্যা**গুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান:—(১) বর্তমানে সিমেণ্টের কলগুলির মধ্যে ৮টিরই উৎপাদনক্ষমতা ১ লক্ষ টনেরও অল্প, এই কারণে ইহাদের উৎপাদন-ব্যয় অধিক হইয়া পড়ে; (২) প্যাকিং, দূরবর্তী স্থান হইতে চুনাপাথর আনিবার ব্যয়, বিদেশ হইতে বর্তমানে বর্ধিত মূল্যে যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং দূরবর্তী স্থান হইতে বহু ব্যয়ে কয়লা আনাইতে হয় বলিয়া ভারতে সিমেণ্টের উৎপাদন-ব্যয় অধিক হইয়া পড়ে। ১৯৫৫-৫৬ সাল নাগাদ ভারতের ২৭টি সিমেণ্টের কলের (বোম্বাইতে ২টি

এবং বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানের প্রত্যেকটিতে ১টি করিয়া নূতন কল) মোট উৎপাদন দাঁড়ায় ৪৭ লক্ষ টন। ১৯৬০-৬১ সালে ভারতের সিমেন্টের কারখানাগুলির মোট উৎপাদন ক্ষমতা ও প্রকৃত উৎপাদন দাঁড়ায় যথাক্রমে ৯০ লক্ষ ও ৭৯ লক্ষ টন। ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১·৩ কোটি ও ১·১ কোটি টন।

ভারতের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প

(ক) ভারতের জাহাজ নির্মাণ শিল্প

(Shipbuilding industry of India)

ভারতীয় জাহাজ নির্মাণ শিল্পের ব্যাপক প্রসার অত্যন্ত **প্রয়োজনীয়**, কারণ (১) ভারতের বহির্বাণিজ্য প্রধানতঃ জলপথের উপরই নির্ভরশীল। (২) বর্তমানে সমুদ্রপথে নিকটবর্তী দেশসমূহের সহিত বাণিজ্যের মাত্র ৪০% ও দূরবর্তী দেশসমূহের সহিত বাণিজ্যের মাত্র ৫% ভারতীয় নৌবহর দ্বারা পরিবাহিত হয়। (৩) রাষ্ট্রিক নিরাপত্তার দিক হইতেও উন্নততর ও শক্তিশালী নৌবহর অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। (৪) ভারতে জাহাজ নির্মাণের উপযোগী কাঁচামাল—যথা, লৌহ, কয়লা, জলবিদ্যুৎ ও কাষ্ঠ এবং কারখানার কার্য করিবার নিমিত্ত সুলভ শ্রমিকের প্রাচুর্য রহিয়াছে।

কোন অঞ্চলে জাহাজ নির্মাণ শিল্প গড়িয়া তুলিতে হইলে সেই অঞ্চলে নিম্নলিখিত সুযোগ-সুবিধাগুলি থাকা প্রয়োজন—(১) গভীর জলযুক্ত স্বাভাবিক পোতাশ্রয়, (২) জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতের জন্য প্রশস্ত প্রাঙ্গণ; (৩) লৌহ ও ইস্পাত, কাষ্ঠ, কয়লা, প্রভৃতি কাঁচা মালের সান্নিধ্য ও সহজলভ্যতা; এবং (৪) সুলভ শ্রমশক্তির প্রাচুর্য।

শিল্পাঞ্চল—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে "সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী" **বিশাখাপত্তনমে** ১০,[illegible]০ টন পরিমিত পণ্যবাহী জাহাজ নির্মাণের প্রাঙ্গণ প্রস্তুত করেন। বিশাখাপত্তনমে জাহাজ নির্মাণ প্রাঙ্গণ স্থাপনের উপযোগী কয়েকটি সুবিধা রহিয়াছে—(১) বিশাখাপত্তনম বন্দরের পোতাশ্রয়টি স্বাভাবিক ও গভীর। (২) এই অঞ্চল জনবহুল না হওয়ায় জাহাজ নির্মাণের উপযুক্ত প্রশস্ত প্রাঙ্গণ সস্তায় পাওয়া যায়। (৩) রাউরকেলা, জামসেদপুর ও বরাকরের লৌহ কারখানা হইতে প্রয়োজনীয় লৌহ ও ইস্পাত দঃ-পূর্ব রেলপথে অল্প ব্যয়ে এই অঞ্চলে আনয়ন করার সুবিধা রহিয়াছে। (৪) জাহাজের ডেক, কেবিন প্রভৃতি নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় কাষ্ঠ বিহার ও উড়িষ্যার অরণ্যাঞ্চল হইতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। (৫) বিহার ও উড়িষ্যার গণ্ডোয়ানা কয়লা-বলয়

হইতে উপযুক্ত পরিমাণে কয়লা সংগ্রহের সুযোগও এ অঞ্চলে রহিয়াছে। (৬) ভারতের প্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধ শিল্পকেন্দ্রসমূহের সহিত বিশাখাপত্তনম রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত। (৭) মাদ্রাজ ও কলিকাতার শিল্প ও বাণিজ্যিক পণ্যে সমৃদ্ধ অঞ্চলসমূহ বিশাখাপত্তনম হইতে দূরে নহে। (৮) নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহ হইতে প্রচুর সুলভ শ্রমিক পাওয়া যায়। (৯) বিশাখাপত্তনম রায়পুর রেলপথে মধ্য প্রদেশ হইতে শ্রমিক ও কাষ্ঠ সহজে আনয়ন করা যায়। এই সমস্ত কারণে বিশাখাপত্তনম অঞ্চলে জাহাজ নির্মাণ শিল্প অবস্থিতি লাভ করিয়াছে। ১৯৫২ সালের ১লা মার্চ হইতে "সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোং" ভারত সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত "হিন্দুস্থান শিপাইয়ার্ড লিঃ" নামক একটি নূতন প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়।

কলিকাতা বন্দর অঞ্চলেও জাহাজ নির্মাণ শিল্প গঠনের বহু সুযোগ-সুবিধা আছে। কারণ এই অঞ্চল লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা, শ্রমিক ও বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চলসমূহের অতি নিকটেই অবস্থিত। কিন্তু জাহাজ নির্মাণ শিল্প সংগঠনের পক্ষে কলিকাতার প্রধান অসুবিধা এই যে—(১) হুগলী নদীতে পলল সঞ্চয়ের ফলে এই নদী ক্রমশঃই অগভীর হইয়া পড়িতেছে। এই কারণে, এই নদীপথে ১০.০০০ টন অপেক্ষা অধিকতর মালবাহী জাহাজ যাতায়াত করিতে পারে না। (২) হুগলী নদীর অববাহিকা অঞ্চল জনবহুল হওয়ায় জাহাজ নির্মাণের উপযোগী বিস্তৃত প্রাঙ্গণ এস্থানে পাওয়া কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষ। এই সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও কলিকাতা জাহাজ-নির্মাণ-শিল্প সম্প্রসারণের উপযুক্ত স্থানরূপে নির্বাচিত হওয়া উচিত। কলিকাতা বন্দরের খিদিরপুর জাহাজ মেরামতের কেন্দ্র হিসাবে খুব বিখ্যাত। বন্দর হিসাবে কলিকাতার গুরুত্ব, জাহাজ নির্মাণের অতি প্রয়োজনীয় উপকরণাদির প্রাচুর্য, দক্ষ কারিগর ও বাংলায় জাহাজী নাবিকের সংখ্যাধিক্য এবং রাষ্ট্রিক নিরাপত্তার দিক হইতে শক্তিশালী নৌবহরের বিপুল প্রয়োজনীয়তা ভবিষ্যতে কলিকাতা অঞ্চলে জাহাজ নির্মাণ শিল্প সম্প্রসারণের বিশেষ অনুপ্রেরণা দিবে বলিয়া আশা করা যায়। **মাদ্রাজের** পোতাশ্রয় অগভীর ও কৃত্রিম হওয়ায় জাহাজ নির্মাণ শিল্প সংগঠনের উপযোগী নহে। পশ্চিম উপকূলে মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত **ভাতকাল** বন্দরে একটি জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। ভদ্রাবতীর লৌহাগার হইতে ইস্পাত এবং মহীশূরের যোগপ্রপাত হইতে উৎপাদিত জলবিদ্যুত এইঅঞ্চলের জাহাজ নির্মাণ শিল্পে ব্যবহৃত হইতেছে। লৌহ ও ইস্পাত এবং কয়লা উৎপাদক অঞ্চলসমূহ হইতে বহুদূরে অবস্থিত থাকায় এবং পোতাশ্রয় জনবহুল হওয়ায় **বোম্বাই** অঞ্চলে এই শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। বর্তমানে বোম্বাইতে একটি জাহাজ মেরামতের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

(খ) ভারতের মোটর গাড়ী নির্মাণ শিল্প
(Automobile Industry of India)

ভারতে বর্তমানে (১৯৬৬) অনুমান ৯·৬ লক্ষ কি. মি. রাস্তা রহিয়াছে এবং ইহার মধ্যে ২·৮৪ লক্ষ কি. মি. রাস্তা পাকা। ভারতে রেলপথ পর্যাপ্ত নয়, আবার বহুস্থান রেলপথ দ্বারা সংযুক্তও নহে। সুতরাং এই বহুদূরবিস্তৃত দেশে মোটরযানের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক। লোকসংখ্যা অনুপাতে এই দেশে মোটর গাড়ীর সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। ভারতীয় জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মোটর গাড়ীর চাহিদা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে—বর্তমানে বেসামরিক চাহিদার পরিমাণ বৎসরে ২৫,০০০ মোটর গাড়ীর। ইহা ব্যতীত মোটর গাড়ী প্রস্তুতের উপযোগী লৌহ, ইস্পাত, অলৌহবর্গীয় ধাতু-দ্রব্য, লৌহসংকর ধাতু, রবার এবং অন্যান্য কাঁচা মালও ভারতে প্রচুর রহিয়াছে। এই সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিলে মনে হয় ভারতে মোটর গাড়ী নির্মাণ শিল্পের বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে। ভারতে বর্তমানে ১২টি প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে ; তবে ইহারা উৎপাদন অপেক্ষা সংযোজন কার্যই অধিক করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে মাত্র দুইটি (হিন্দুস্থান মোটর্স লিঃ [কলিকাতা] ও প্রিমিয়ার অটোমোবাইল্‌স্ লিঃ [বোম্বাই] প্রতিষ্ঠানই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শিল্পাঞ্চল—১৯৪১ সালে **বোম্বাই**-এর উপকণ্ঠে মাতুঙ্গায় ভারতের প্রথম মোটর গাড়ী নির্মাণের প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এই শিল্পপ্রতিষ্ঠানটি আমেরিকার ক্রাইস্‌লার কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইতেছে। পর্যাপ্ত জল ও জলবিদ্যুতের সরবরাহ, সমভাবাপন্ন জলবায়ু, বোম্বাই শহরের ন্যায় সমৃদ্ধ ক্রয়বিক্রয় কেন্দ্রের নৈকট্য, সুলভ ও প্রচুর শ্রমিকের সরবরাহ এবং বোম্বাই বন্দরের নৈকট্য এই অঞ্চলের মোটরগাড়ী নির্মাণ শিল্পের সহায়তা করে। বোম্বাই অঞ্চলে মোট ৬টি মোটরগাড়ী নির্মাণের কেন্দ্র রহিয়াছে। ১৯৪৪ সালে **কলিকাতার** উপকণ্ঠে কোন্নগরে বিড়লা ব্রাদার্স প্রতিষ্ঠিত হিন্দুস্থান মোটর কোম্পানী নামে একটি মোটর শিল্পাগার স্থাপিত হইয়াছে। কয়লা ও লৌহ-ক্ষেত্রের নিকটে অবস্থিতি, কলিকাতা বন্দর মারফৎ বিদেশ হইতে প্রাথমিক যন্ত্রপাতি আমদানীর সুবিধা, সুলভ শ্রমিকের প্রাচুর্য, উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য কলিকাতার ন্যায় সমৃদ্ধ বিক্রয়কেন্দ্রের নৈকট্য প্রভৃতি সুবিধা থাকায় এই কারখানা কোন্নগরে স্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতা অঞ্চলে মোট ৩টি মোটর-গাড়ী নির্মাণ কেন্দ্র রহিয়াছে। **জামসেদপুর** এবং **ব্যাঙ্গালোরেও** এইরূপ কারখানা স্থাপনের বহুবিধ সুযোগসুবিধা রহিয়াছে। তামিলনাড়ুর **কোয়েম্বাটোরে** ৩টি মোটর শিল্প কারখানায় পত্তন হইয়াছে।

এই শিল্পের **বর্তমান সমস্যাগুলির** মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান—(১)

জীবনযাত্রার মান নিম্ন হওয়ায় দেশাভ্যন্তরে মোটর গাড়ীর চাহিদার স্বল্পতা; (২) এই শিল্পে ব্যবহৃত কয়েকটি বিশিষ্ট শ্রেণীর ইস্পাত দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ সরবরাহের ও বৈদেশিক আমদানীর স্বল্পতা; (৩) মোটর গাড়ীর বিভিন্ন অংশ নির্মাণের উপযোগী শিল্পের অভাব; এবং (৪) সংযোজক ও উৎপাদকের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা। এই শিল্পের ভবিষ্যৎ প্রসারকল্পে নিম্নলিখিত কাযধারা নির্দিষ্ট হইয়াছে:— (১) বর্তমান প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক উৎপাদনের সম্প্রসারণ এবং অল্পমূল্যে উৎপাদন ব্যবস্থার অবলম্বন; (২) নূতন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান গঠন করা অপেক্ষা বর্তমান উৎপাদক প্রতিষ্ঠান দুইটিকে অধিকতর উৎপাদন কার্যে উৎসাহিত করা; (৩) সংযোজক প্রতিষ্ঠানসমূহকে মোটর গাড়ীর বিভিন্ন অংশ উৎপাদনে উৎসাহিত করা; (৪) উৎপাদক প্রতিষ্ঠানসমূহকে আমদানীর সুবিধা দান এবং সংযোজক প্রতিষ্ঠানগুলির আমদানী হ্রাস করা; (৫) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের দ্বারা প্রকৃত উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং (৬) মোটরে ব্যবহৃত বিভিন্ন অংশসমূহের মান নির্ধারণ করা। নিম্নের পরিসংখ্যান হইতে ভারতে মোটর গাড়ীর উৎপাদনের পরিমাণ বুঝা যাইবে।

ভারতে মোটর গাড়ীর উৎপাদন, ১৯৫০-৫১—১৯৬৪-৬৫

(একক : হাজার)

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১	১৯৬৪-৬৫
নানাবিধ ব্যবসায়ে ব্যবহৃত গাড়ী	৮·৬	৯·৯	২৮·৪	৩৬·৮
যাত্রীবাহী গাড়ী ইত্যাদি	৭·৯	১৫·৪	২৬ ৬	৩৪·০
মোট	১৬·৫	২৫·৩	৫৫·০	৭০ ৮

(গ) ভারতের বিমানপোত নির্মাণ শিল্প

(Aircraft industry of India)

ভারতের বিমানপোত নির্মাণ শিল্পের বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই দেশের বহুদূরবিস্তৃত আয়তন এবং এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তের অত্যধিক দূরত্ব; অন্যান্য পরিবহন ব্যবস্থার অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অবস্থা; পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধের মধ্যপথে অবস্থান হেতু ইউরোপ ও এশিয়া সংযোগকারী অধিকাংশ বিমানপথেরই ভারতের মধ্য দিয়া প্রসারণ; ভারতে বিমানপোত চালনার অনুকূল জলবায়ু ও আবহাওয়া; প্রচুর বক্সাইট, জলবিদ্যুৎ এবং বিমানপোত নির্মাণের উপযোগী কাঠের সরবরাহ এবং সর্বোপরি ভারতের নবলব্ধ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত সামরিক ও অসামরিক বিমানপোতের চাহিদা ভারতে এই শিল্পের গঠন ও প্রসারণের বিশেষ সহায়ক।

শিল্পাঞ্চল—যুদ্ধের তাগিদে ১৯৪০ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং মহীশূর ও ভারত সরকার কর্তৃক সংযুক্তভাবে পরিচালিত "হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফ্‌ট ফ্যাক্টরী" **ব্যাঙ্গালোরে** বিমানপোত নির্মাণ কারখানা স্থাপন করেন। ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে এই কারখানায় প্রস্তুত প্রথম বিমানপোত আকাশে উড্ডীন হয়। বর্তমানে মেরামতী কায এবং বিদেশ হইতে আমদানীকৃত বিভিন্ন যন্ত্রাংশ হইতে বিমানপোত নির্মাণের কার্য এই প্রতিষ্ঠান চালাইয়া থাকে। নিম্নলিখিত কারণে ব্যাঙ্গালোর বিমান কারখানার কেন্দ্ররূপে মনোনীত হইয়াছে—(১) পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্বতের মধ্যস্থলে অবস্থিত থাকায় ব্যাঙ্গালোরের জলবায়ু শুষ্ক এবং সমুদ্রের লবণাক্ত বায়ুর প্রভাব হইতে মুক্ত। এইরূপ জলবায়ু বিমানপোত নির্মাণের সহায়ক। (৩) শিবসমুদ্রম্‌, সিম্‌সা ও যোগপ্রপাত হইতে উৎপাদিত সুলভ জলবিদ্যুতের সরবরাহ এই অঞ্চলে প্রচুর। (৩) ভদ্রাবতীর লৌহ শিল্পাগার ব্যাঙ্গালোরের নিকটেই অবস্থিত থাকায় এই শিল্পের প্রয়োজনীয় লৌহ ও ইস্পাত সহজেই পাওয়া যায়। (৪) কেরালার অ্যালুমিনিয়াম কারখানা হইতে অতি সুলভে প্রয়োজনীয় অ্যালুমিনিয়াম-পাত সংগ্রহ করা হয়। (৫) সমুদ্রতীর হইতে দূরবর্তী এবং দুই পর্বতমালার মধ্যস্থলে অবস্থিত হওয়ায় এই গুরুত্বপূর্ণ শিল্পটির বৈদেশিক আক্রমণ হইতে স্বাভাবিক নিরাপত্তা রহিয়াছে। (৬) ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদ ব্যাঙ্গালোরে অবস্থিত হওয়ায় এই কারখানা প্রয়োজনানুসারে বৈজ্ঞানিকদের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারে। (৭) মহীশূরে দক্ষ ও সুলভ শ্রমিক সরবরাহের প্রাচুর্য রহিয়াছে। **আসানসোল** এবং **জামসেদপুর** অঞ্চলেও বিমানপোত নির্মাণ শিল্প গঠনের বহু সুযোগসুবিধা রহিয়াছে। উভয় অঞ্চলেই ইস্পাত ও কয়লার প্রাচুর্য রহিয়াছে। আসানসোলের নিকটে অনুপনগরে অ্যালুমিনিয়ামের কারখানা রহিয়াছে এবং জামসেদপুরের অনতিদূরে মুরীতে অ্যালুমিনিয়ামের কারখানা স্থাপিত হইতেছে। অতএব প্রয়োজনীয় অ্যালুমিনিয়ামের পাতও উভয় স্থানেই পাওয়া যাইবে। এই দুই অঞ্চলের জলবায়ুও বিমানপোত নির্মাণ শিল্পের অনুকূল। দামোদর পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইলে এই দুই অঞ্চলে প্রচুর জলবিদ্যুৎ পাওয়া যাইবে।

ভারতের বিমানপোত নির্মাণ শিল্প এখনও শৈশবাবস্থায় রহিয়াছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে ভারত সরকারের প্রচেষ্টায় এই গুরুত্বপূর্ণ শিল্পটির ব্যাপক প্রসার ও উন্নতি সাধিত হইবে।

(ঘ) ভারতের রেল ইঞ্জিন নির্মাণ শিল্প
(Locomotive industry of India)

১৯৪৩ সাল পর্যন্ত ভারতে রেল ইঞ্জিন প্রস্তুত হইত না। ১৯৪৩ সালে **জামসেদপুরে** 'টাটা ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাণ্ড লোকোমোটিভ কোম্পানী' নামক

একটি প্রতিষ্ঠান ছোট মাপের রেলপথের ইঞ্জিন তৈয়ারীর জন্য স্থাপিত হয়। এই কারখানায় ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ২০০টি ইঞ্জিন প্রস্তুত হয়। সম্প্রতি এই কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া ৭৫টি ইঞ্জিনে দাঁড় করান হইয়াছে। ১৯৬৪-৬৫ সালে এই কারখানায় ৬৮টি রেল ইঞ্জিন উৎপাদিত হয়। বর্তমানে এই কারখানায় প্রায় ৭ কোটি টাকা মূলধন ও ৪৫০০ শ্রমিক নিযুক্ত রহিয়াছে। ভারত সরকার আসানসোলের নিকটে **চিত্তরঞ্জনে** বড মাপের রেলপথের জন্য একটি ইঞ্জিন নির্মাণের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। রাণীগঞ্জের কয়লার খনি হইতে কয়লা, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যা হইতে কাষ্ঠ এবং কুল্‌টি এবং বার্নপুরের ইস্পাতের কারখানা হইতে ইস্পাতের সরবরাহ চিত্তরঞ্জনের এই শিল্পের উন্নতির বিশেষ সহায়ক। ১৯৫০ সালে এই প্রতিষ্ঠান হইতে প্রথম ইঞ্জিন তৈয়ারী হয়। বর্তমানে এই কারখানাটি বার্ষিক ২০০ খানা পর্যন্ত ইঞ্জিন তৈয়ারী করিতে পারে। ১৯৬৫ সাল নাগাদ এই কারখানায় ৪৮টি বিদ্যুচ্চালিত ইঞ্জিন উৎপাদিত হয়। আশা করা যায় যে এই কারখানাটি বৎসরে ১৫০টি এই শ্রেণীর ইঞ্জিন তৈয়ারী করিতে পারিবে।

বারাণসীর 'ডিজেল লোকোমোটিভ ওয়ার্কস' কারখানাটি বিদেশ হইতে আমদানীকৃত যন্ত্রাংশের সাহায্যে ডিজেল চালিত ইঞ্জিনের উৎপাদন কার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। ১৯৬৫ সাল নাগাদ এই কারখানায় ৪৯টি ডিজেল চালিত ইঞ্জিন উৎপাদিত হয়। আশা করা যায় যে এই কারখানাটি বার্ষিক ২৫০টি এই শ্রেণীর ইঞ্জিন উৎপাদন কার্যে সক্ষম হইবে।

প্রশ্নোত্তর

1. What do you mean by localisation of industries? Give an account of the factors influencing localisation of industries with illustrations. (শ্রমশিল্পের একদেশীভবন বলিতে কি বুঝ? একদেশীভবনের কারণসমূহ দৃষ্টান্ত উল্লেখ পূর্বক লিখ।) (P. U. '69; U. E. '65; H. S. '63) (পৃঃ ২৬০-২৬৩)

2. Account for the localisation and state the present position of the cotton textile industry of Great Britain. (গ্রেট ব্রিটেনের কার্পাস শিল্পের একদেশীভবন এবং বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে যাহা জান লিখ।) (পৃঃ ২৮০-২৮১)

3. Give a brief account of the cotton textile industries of (a) the U. S. A. and (b) Japan. ((ক) যুক্তরাষ্ট্র ও (খ) জাপানের কার্পাস শিল্প সম্পর্কে যাহা জান লিখ।) (পৃঃ ২৭৯-২৮০, ২৮১-২৮২)

4. Give an account of the woollen industry of Great Britain. (গ্রেট ব্রিটেনের পশম বয়ন শিল্প সম্পর্কে যাহা জান লিখ।) (পৃঃ ২৮৬-২৮৭)

5. Indicate the causes that account for the lack of woollen industry in the major wool producing centres of the world. (পৃথিবীর প্রধান প্রধান পশম উৎপাদক অঞ্চল সমূহে পশম শিল্পের অনুন্নত অবস্থার কারণ সমূহ নির্দেশ কর।) (পৃঃ ২৮৬)

6. Write notes on : (a) Iron and & Steel industry in the U. S. A. (b) Iron & Steel industry in the U. K. (c) Iron & Steel industry in the continuefal Europe (H. S. '61) (টীকা লিখ : (ক) যুক্তরাষ্ট্রের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প (খ) যুক্তরাষ্ট্রের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প (গ) মহাদেশীয় ইউরোপের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প।)
(পৃঃ ২৬৩-২৬৫, ২৬৫-২৬৬, ২৬৬-২৬৮)

7. Give a brief account of the manufacture of heavy chemicals in the world. (পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে গুরু রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন সম্পর্কে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ।) (পৃঃ ২৯৫-২৯৬)

8. Discuss the regional distribution, present position and future prospects of the iron and steel industry of India. (ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের আঞ্চলিক বণ্টন, বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা কর।) (P. U. '61, '64, '67 ; U. E. '64 ; H. S. '63, '64) (পৃঃ ২৬৯-২৭৪)

9. Give an account of the location of the new steel plants in India. (U. E. '64 ; '66 ; P. U. 61) (ভারতের নূতন ইস্পাত কারখানাগুলির অবস্থান সম্পর্কে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ।) (পৃঃ ২৭১-২৭৩)

10. Write notes on the present-day development of automobile industry of India. (ভারতের মোটর গাড়ী নির্মাণ শিল্পের সম্প্রতিক সম্প্রসারণ সম্পর্কে যাহা জান লিখ।) (পৃঃ ৩০৫-৩০৬)

11. Examine the development of (a) ship-building, (b) aircraft and locomotive industries of India. (ভারতের (ক) জাহাজ নির্মাণ শিল্প, (খ) বিমানপোত নির্মাণ শিল্প, এবং (গ) রেল ইঞ্জিন নির্মাণ শিল্প সম্পর্কে যাহা জান লিখ।) (পৃঃ ৩০৩-৩০৪, ৩০৬-৭)

12. Discuss the regional distribution, present position and future prospects of Indian cotton textile industry. (H. S. '65 ; P. U. '63 ; U. E. '65 ; N. B. U. '63) (ভারতীয় কার্পাস শিল্পের আঞ্চলিক বণ্টন, বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা কর) (পৃঃ ২৮২-২৮৫)

13. State briefly the regional distribution and the present position of Indian chemical industry. (ভারতীয় রাসায়নিক শিল্পের আঞ্চলিক বণ্টন ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে যাহা জান লিখ।) (পৃঃ ২৯৮-৩০০)

14. Give an account of the development of the fertiliser industry of India. (ভারতীয় সার প্রস্তুত শিল্পের সাম্প্রতিক সম্প্রসারণ সম্পর্কে যাহা জান লিখ।) (পৃঃ ৩০০-৩০১)

15. Examine briefly the present-day development of Indian cement industry. (ভারতীয় সিমেন্ট শিল্পের সাম্প্রতিক সম্প্রসারণ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।) (পৃঃ ৩০১-৩০৩)

16. Account for the localisation and state the present position of jute industry of India. (ভারতীয় পাট শিল্পের একদেশীভবন ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে যাহা জান লিখ।) (P. U. '62, '64, '65 ; H. S. '65) (পৃঃ ২৭৪-২৭৬)

17. State briefly the regional distribution and the present position of Indian paper industry. (ভারতীয় কাগজশিল্পের আঞ্চলিক বণ্টন ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে যাহা জান লিখ।) (পৃঃ ২৯২-২৯৪)

18. Discuss the regional distribution, the present position and the future prospect of the sugur industry of India. (ভারতীয় শর্করা শিল্পের আঞ্চলিক বণ্টন, বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্পর্কে যাহা জান লিখ।) (পৃঃ ২৭৬-২৭৮)

পঞ্চম খণ্ড

ভোগ ও বাণিজ্য

চতুর্দশ অধ্যায়

ভারতের বহির্বাণিজ্য

(Foreign Trade of India)

অর্থনৈতিক ভূগোল অনুশীলনের চারিটি ক্ষেত্রের মধ্যে দ্রব্য-সম্ভারের ভোগ এবং বাণিজ্যই সর্বাপেক্ষা ব্যাপক। পৃথিবীর বহু লোকই হয়ত প্রাথমিক উৎপাদন, গৌণ উৎপাদন এবং পরিবহন ব্যবস্থার সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট নহে ; কিন্তু কোন লোকই প্রত্যক্ষভাবে দ্রব্যাদির ভোগ ও ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারে না। দ্রব্যাদির উৎপাদনে কোন অঞ্চলই স্বয়ংপূর্ণ নহে। সেই কারণে প্রত্যেক অঞ্চলই পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল হইতে ভোগ্য পণ্য অল্পাধিক আহরণ করিয়া আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইবার চেষ্টা করে। পণ্যসম্ভারের এই আমদানী-রপ্তানীকে **বাণিজ্য** বলে। দ্রব্যাদির ব্যাপক ভোগ বা ব্যবহারই বাণিজ্যের সূচক।

ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য (Features of India's foreign trade)—ভারতের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ নিতান্ত সামান্য নহে। পৃথিবীর বাণিজ্য পরায়ণ দেশগুলির মধ্যে ভারত ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে। বর্তমানে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলিই পরিলক্ষিত হইতেছে। (১) মূল্যের দিক হইতে বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে বাহির্বাণিজ্যের মূল্যগত পরিমাণ ছিল ৩১২ কোটি টাকা। ১৯৫০-৫১ ও ১৯৬০-৬১ সালে ইহা দাঁড়ায় যথাক্রমে ১২৭৪.৬২ ও ১৭৬৪.৫৫ কোটি টাকায়।

(২) ভারতীয় বহির্বাণিজ্যে সাধারণতঃ খাদ্যশস্য, ধাতু ও ধাতুদ্রব্য, যান-বাহনের সরঞ্জাম, খনিজ তৈল ও তজ্জাত দ্রব্য, শিল্পে ব্যবহৃত নানাবিধ কাঁচা-মাল আমদানীর এবং পাটজাত দ্রব্য, চা, বস্ত্র, চামড়া, তামাক, মশলা, অভ্র ও ম্যাঙ্গানীজ রপ্তানীর আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। ভারত বিভক্ত হইবার ফলে পাট, কার্পাস, জিপসাম প্রভৃতি কয়েকটি অতি মূল্যবান সামগ্রী পাকিস্তানের ভাগে পড়ায় ভারত হইতে এই সমস্ত দ্রব্যের রপ্তানী গুরুতররূপে হ্রাস পাইয়াছে। অপর পক্ষে ঐ সমস্ত দ্রব্য বহুল পরিমাণে ভারতে আমদানী হইতেছে।

(৩) গত কয়েক বৎসর যাবৎ ভারতের শিল্পোন্নতির ফলে তাহার কাঁচামালের রপ্তানী হ্রাস ও আমদানী বৃদ্ধি পাইতেছে এবং শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানী বৃদ্ধি ও আমদানী হ্রাস পাইতেছে। ১৯৩৯-৪০ সালে মোট রপ্তানী বাণিজ্যের ৩৮% ও ৪৩% এবং মোট আমদানী বাণিজ্যের ৫৬% ও ২২% ছিল যথাক্রমে শিল্পজাত দ্রব্য ও কাঁচামালের অধিকারে। কিন্তু ১৯৫৫-৫৬ সালে মোট রপ্তানী বাণিজ্যের ৪০% ও ২৪% এবং মোট আমদানী বাণিজ্যের ৪৯% ও ২৯% দাঁড়ায় যথাক্রমে শিল্পজাত দ্রব্য ও কাঁচামালের অধিকারে।

(৪) সম্প্রতি পৃথিবীব অন্যান্য দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্কেরও বিশেষ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইতেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পুর্ব পর্যন্ত ভারতের বাণিজ্যসম্বন্ধ যুক্তরাজ্যের সহিত ছিল ঘনিষ্ঠতম। কিন্তু যুদ্ধোত্তরকালে একদিকে যেরূপ ভারতের সহিত যুক্তরাজ্যের বাণিজ্য সম্পর্ক হ্রাস পাইতেছে অন্যদিকে তেমনি যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, মিশর, ক্যানাডা, জাপান, চীন, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি দেশের সহিত উহা ঘনিষ্ঠতর হইতেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে ১৯৩৭-৩৮, ১৯৪৭-৪৮ ও ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতের মোট আমদানী বাণিজ্যের ৩১%, ২৭·৫০% ও ২৬·৩% এবং মোট রপ্তানী বাণিজ্যের ৩৪·৬%, ২২·৫% ও ২৮·৩% ছিল একমাত্র ব্রিটেনের অধিকারে। অপর পক্ষে, ১৯৩৮-৩৯ ও ১৯৫৫-৫৬ সালে মোট আমদানীর ৬% ও ১৪·৬% এবং মোট রপ্তানীর ১০% ও ১৭·১% ছিল যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারে। বিভিন্ন মুদ্রাঞ্চলের সহিতও ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইতেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পুর্ব পর্যন্ত ভারতের বহির্বাণিজ্যের মাত্র ১০% ছিল 'ডলার' মুদ্রাঞ্চলের সহিত, বর্তমানে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ২০-২৫%-এ দাঁড়াইয়াছে। মধ্য ও সুদূর প্রাচ্যের দেশগুলির সহিতও ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে।

(৫) ভারতের বাহির্বাণিজ্যের অধিকাংশই সমুদ্রপথে পরিচালিত হইয়া থাকে। স্থলপথে বাণিজ্যের পরিমাণ অতি সামান্য। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় স্থলপথে পাকিস্তানের সহিত বাণিজ্য অধিক।

(৬) ১৯৫১ সাল হইতেই ভারতীয় বাণিজ্যের গতি ভারতের পক্ষে প্রতিকূল হইয়া চলিতে থাকে। ১৯৫১ সালে এই প্রতিকূল উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ২২৮ কোটি টাকা, ১৯৬১ সালে ইহা দাঁড়ায় ২৮২·৭৯ কোটি টাকায় এবং ১৯৬৬ সালে দাঁড়ায় ৬০১·৯৪ কোটি টাকায়। গত কয়েক বৎসর যাবৎ ভারতে যন্ত্রপাতি, অধিক পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য, পাট, কার্পাস, প্রভৃতির আমদানীই ইহার মূল কারণ।

(৭) ভারতের বহির্বাণিজ্যের অধিকাংশই বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মারফৎ

পরিচালিত হয়। তবে, সম্প্রতি কয়েকটি নির্দিষ্ট পণ্যের ক্ষেত্রে ইহা কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রিত "স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন" কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে।

ভারতের আমদানী ও রপ্তানী পণ্য

ভারতের আমদানী (Imports)—যন্ত্রপাতি, মোটর গাড়ী ও তৎসংক্রান্ত সরঞ্জাম, খনিজ তৈল, কাগজ ও পেস্ট বোর্ড, রেশম ও তজ্জাত দ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য, পাট, কার্পাস ও তজ্জাত দ্রব্য, পশম ও পশমজাত দ্রব্য, ধাতু ও ধাতু আকরিক, লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য, খাদ্যশস্য, ঔষধ প্রভৃতি প্রধান আমদানী দ্রব্য।

যন্ত্রপাতি প্রধানতঃ আমদানী হয় যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানী, বেলজিয়াম, জাপান, ক্যানাডা ও ফ্রান্স হইতে। ১৯৬৪-৬৫ সালে ভারতে মোট ৩১৬·৩২ কোটি টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি আমদানী করা হয়। **যানবাহন** সংক্রান্ত সরঞ্জাম আমদানী হয় যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, জার্মানী, ইতালী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ হইতে। ১৯৬৪-৬৫ সালে ৬৭·৫৯ কোটি টাকা মূল্যের ঐ সমস্ত দ্রব্যাদি এ দেশে আমদানী করা হয়। **খনিজ তৈল** ও তজ্জাত দ্রব্যাদি ইরাণ, চীন, বোর্ণিও, সুমাত্রা, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানী হয়। ১৯৬৪-৬৫ সালে এই আমদানীর মূল্য ছিল ৬৮·৫৬ কোটি টাকা। **কাগজ ও পেস্টবোর্ড** আমদানী হয় প্রধানতঃ যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ক্যানাডা, সুইডেন, নরওয়ে, যুক্তরাষ্ট্র, ফিনল্যাণ্ড ও জাপান হইতে। ১৯৬৪-৬৫ সালে মোট ১২·৮৫ কোটি টাকা মূল্যের কাগজ ও পেস্টবোর্ড আমদানী হয়। **রাসায়নিক দ্রব্য** ও ঔষধপত্র আমদানী হয় প্রধানতঃ যুক্তরাজ্য, পঃ জার্মানী, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র হইতে। ১৯৬৪-৬৫ সালে ৪৩·০৩ কোটি টাকা মূল্যের এই সমস্ত দ্রব্য আমদানী হয়। **পাট** আমদানী হয় পাকিস্তান হইতে। ১৯৬৪-৬৫ সালে ৭·৩৭ কোটি টাকা মূল্যের পাট ভারতে আমদানী হয়। **কার্পাস** আমদানী হয় প্রধানতঃ ব্রিটিশ পূর্ব আফ্রিকা, মিশর, যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান হইতে। ১৯৬৪-৬৫ সালে ৫৮·০৮ কোটি টাকা মূল্যের কার্পাস আমদানী করা হয়। **পশম** আমদানী হয় প্রধানতঃ অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ইতালী, ফ্রান্স ও জাপান হইতে। ১৯৬৪-৬৫ সালে ৯·৬৪ কোটি টাকার পশম আমদানী হয়। **ধাতু আকরিক** প্রধানতঃ যুক্তরাজ্য ফ্রান্স, জার্মানী, যুক্তরাষ্ট্র ও বেলজিয়াম হইতে আমদানী হয়। ১৯৬৪-৬৫ সালে ১১·৮০ কোটি টাকা মূল্যের ধাতু আকরিক আমদানী হয়। **লৌহ ও ইস্পাত** এবং তজ্জাত দ্রব্য আমদানী হয় প্রধানতঃ যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, পঃ জার্মানী, বেলজিয়াম, জাপান ও ফ্রান্স হইতে। ১৯৬৪-৬৫ সালে ১০৭.৩৫ কোটি টাকা মূল্যের লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য এদেশে আমদানী হইয়াছিল।

খাদ্যশস্য আমদানী হয় প্রধানত ক্যানাডা, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রহ্মদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র হইতে। ১৯৬৪-৬৫ সালে ১৭৫·৫৩ কোটি টাকার গম ও ২৬·১২ কোটি টাকার চাউল আমদানী হয়। ১৯৬৪-৬৫ সালে মোট পণ্য আমদানীর মূল্য দাঁড়ায় ১২৬৩·৩১ কোটি টাকায়।

ভারতের রপ্তানী দ্রব্য (Exports)—ভারত হইতে বিদেশে যে সমস্ত দ্রব্য রপ্তানী করা হয় তাহার মধ্যে পাটজাত দ্রব্য, চা, কার্পাস ও তজ্জাত দ্রব্য, চামড়া, তৈলবীজ, ধাতু দ্রব্য ও আকরিক, তামাক প্রভৃতি প্রধান।

পাটজাত দ্রব্য প্রধানতঃ যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, আর্জেন্টিনা, মিশর, বেলজিয়াম, অস্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, ফ্রান্স, জার্মানী, ব্রাজিল, জাপান প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হয়। ১৯৬৪-৬৫ সালে ১৮৪ কোটি টাকার পাটজাত দ্রব্য ভারত হইতে রপ্তানী হয়। যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, মিশর, পঃ জার্মানী, যুক্তরাষ্ট্র, ইরাক, আরব, সিংহল, রুশিয়া প্রভৃতি দেশে ভারতের যত **চা** উৎপন্ন হয় তাহার ৭০% রপ্তানী হয়। ১৯৬৪-৬৫ সালে ১২৪·৬৭ কোটি টাকা মূল্যের চা ভারত হইতে রপ্তানী হয়। কাঁচা ও পাকা **চামড়া** প্রধানতঃ যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, জাপান, ফ্রান্স, ইতালী, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হয়। ১৯৬৪-৬৫ সালে ৩৬·২১ কোটি টাকা মূল্যের কাঁচা ও পাকা চামড়া রপ্তানী হয়। **তৈলবীজ ও উদ্ভিজ্জ তৈল** প্রধানতঃ যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানী, হল্যাণ্ড, ইতালী, বেলজিয়াম, সিংহল প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হয়। ১৯৬৪-৬৫ সালে ৭·০৫ কোটি টাকার তৈলবীজ ও উদ্ভিজ্জ তৈল রপ্তানী হয়। **ধাতুদ্রব্য ও কয়লা** রপ্তানী হয় প্রধানতঃ যুক্তরাজ্য, জাপান, প্রণালী উপনিবেশ, জার্মানী, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, সিংহল, ইতালী প্রভৃতি দেশে। ১৯৬৪-৬৫ সালে ১৪·৫৫ কোটি টাকা মূল্যের অলৌহবর্গীয় ধাতব খনিজ, ৩৭·২১ কোটি টাকার লৌহ আকরিক, ১৩·০২ কোটি টাকার ধাতু আকরিক, ৭·৯১ কোটি টাকার খনিজ তৈলজাত দ্রব্যাদি, ও ৪·৩৬ কোটি টাকা মূল্যের কয়লা রপ্তানী হয়। **কার্পাস বস্ত্র** জাপান, যুক্তরাজ্য, চীন, ফ্রান্স, আমেরিকা, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, প্রণালী উপনিবেশ, মিশর, ইরাণ, ইরাক প্রভৃতি দেশে চালান যায়। ১৯৬৪-৬৫ সালে ৫৮·০৬ কোটি টাকা মূল্যের কার্পাস বস্ত্র রপ্তানী হয়। **কার্পাস** রপ্তানী হয় ১৯৬৪-৬৫ সালে ১৪·২২ কোটি টাকার। ভারতীয় **তামাকের** প্রধান খরিদ্দার যুক্তরাজ্য। ১৯৬৪-৬৫ সালে মোট ২৪·১৩ কোটি টাকা মূল্যের তামাক রপ্তানী হয়। প্রায় ১৩·৪২ কোটি টাকা মূল্যের **কফি** আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, জার্মানী প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হয়। প্রায় ১৮·২১ কোটি টাকা মূল্যের **চিনি ও গুড়** প্রধানতঃ যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, সিংহল, ক্যানাডা ও ইতালীতে রপ্তানী হয়।

১৯৬৪-৬৫ সালে মোট ৮১১'৪১ কোটি টাকা মূল্যের পণ্যসম্ভার রপ্তানী হয় বলিয়া অনুমিত হয়।

কয়েকটি দেশের সহিত ভারতের বহির্বাণিজ্য

(ক) ভারত-যুক্তরাজ্য বাণিজ্য—ভারতের সহিত ব্রিটেনের বাণিজ্য-সম্পর্ক সর্বাপেক্ষা অধিক। ভারত ব্রিটেন হইতে পশম ও কার্পাসজাত দ্রব্য, কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, রঞ্জক দ্রব্য, ইঞ্জিন, কাগজ ও পেস্ট বোর্ড, কাঁচ, সাইকেল, মোটর গাড়ী, রবারজাত দ্রব্য, লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য, মদ্য, ঔষধ প্রভৃতি **আমদানী** করে। সমগ্র আমদানীর প্রায় ⅓ অংশই যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা। ভারত ব্রিটেনে চট ও বস্তা, পাকা ও কাঁচা চামড়া, তৈলবীজ ও উদ্ভিজ্জ তৈল, ধাতু আকরিক, কার্পাস ও তজ্জাত দ্রব্য, পশম, খাদ্যদ্রব্য, চা, তামাক, কফি, রবার, লাক্ষা, দড়ি, ছোবড়া, মশলা প্রভৃতি **রপ্তানী** করে। ১৯৬৪-৬৫ সালে ভারত ১৬২'১২ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য-সম্ভার ব্রিটেন হইতে আমদানী করে এবং ১৬৬'৯৭ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য ব্রিটেনে রপ্তানী করে।

(খ) ভারত-ব্রহ্ম বাণিজ্য—ভারতের সহিত ব্রহ্মদেশের বাণিজ্যসম্বন্ধ ব্যাপক। ভারত ব্রহ্মদেশ হইতে প্রধানতঃ ধান, চাউল, ডাল, খনিজ তৈল, কাষ্ঠ, আলু, ইত্যাদি **আমদানী** করে। ভারত কার্পাস ও পাটজাত দ্রব্য, লৌহ, ইস্পাত, চা, চিনি, কয়লা ইত্যাদি দ্রব্য ব্রহ্মদেশে **রপ্তানী** করে। ভারত হইতে ব্রহ্মদেশে মোট রপ্তানীর শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ দ্রব্যই কার্পাস ও পাটজাত সামগ্রী। ১৯৬৪-৬৫ সালে ভারত ব্রহ্মদেশ হইতে ৮'৭৬ কোটি টাকার পণ্য আমদানী এবং ব্রহ্মদেশে ৬'৪১ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানী করে।

(গ) ভারত-সিংহল বাণিজ্য—ভারত সিংহল হইতে নারিকেলের শাঁস, নারিকেল তৈল, খনিজ দ্রব্য, রবার, চা প্রভৃতি দ্রব্য **আমদানী** করে এবং ধান ও চাউল, বস্ত্র, মৎস্য, কয়লা (প্রচুর), ডাল, ফল, তামাক, তরকারী, লঙ্কা, সার প্রভৃতি দ্রব্য সিংহলে **রপ্তানী** করে। ১৯৬৪-৬৫ সালে ভারত সিংহল হইতে ৭'৬৫ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য আমদানী এবং সিংহলে ১৪'৪৪ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য রপ্তানী করে।

(ঘ) ভারত-জাপান বাণিজ্য—ভারত জাপান হইতে বস্ত্র ও কৃত্রিম রেশম, রেশম ও রেশমজাত দ্রব্য, কাচ ও কাচের দ্রব্য, লৌহ ও ইস্পাত, যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, চীনামাটির বাসন, খেলনা, রাসায়নিক, দ্রব্য, কাগজ ও পেস্টবোর্ড, বিলাস দ্রব্য, রবারজাত দ্রব্য, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, রঞ্জক দ্রব্য, প্রভৃতি **আমদানী** করে। ভারত কার্পাস (প্রচুর), লৌহ (মোট ভারতীয় রপ্তানীর প্রায় ৫৫ ভাগ), ম্যাঙ্গানীজ, চট, বস্তা, অভ্র, চাঁচ প্রভৃতি দ্রব্য

জাপানে **রপ্তানী** করে। সম্প্রতি ভারত হইতে জাপানে রপ্তানী দ্রব্যের পরিমাণ ক্রমাগতই হ্রাস পাইতেছে। ১৯৬৪-৬৫ সালে ভারত জাপান হইতে ৭৭·৩৩ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য আমদানী এবং জাপানে ৬০·১৬ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য রপ্তানী করে।

(ঙ) ভারত-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য—ভারত গম ও অন্যান্য খাদ্যশস্য, রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধপত্র, কার্পাস, যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, মোটর গাড়ী, খনিজ তৈল, রবার ও লৌহজাত দ্রব্য, তামাক, রঞ্জক দ্রব্য, কাগজ ও পেস্ট বোর্ড, কার্পাসজাত দ্রব্য প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্র হইতে **আমদানী** করে। অপর পক্ষে ভারত লাক্ষা, পাটজাত দ্রব্য, পাকা ও কাঁচা চামড়া, ম্যাঙ্গানীজ, ইলমেনাইট, অভ্র, পশম, ফল, তিসি, চা, মশলা, কার্পাস, দড়ি, রেড়ির তৈল প্রভৃতি দ্রব্য যুক্তরাষ্ট্রে **রপ্তানী** করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে এই দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৬৪-৬৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে ৪৩৬·১৪ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি আমদানী এবং ভারত হইতে যুক্তরাষ্ট্রে ১৪৫·০৯ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি রপ্তানী হয়।

(চ) ভারত-পঃ জার্মানী বাণিজ্য—ভারত জার্মানীতে **রপ্তানী** করে প্রধানতঃ কার্পাস, চা, তামাক, লৌহ আকর, মশলা, পাকা ও কাঁচা চামড়া, হরীতকী, ম্যাঙ্গানীজ, অভ্র, পাটজাত দ্রব্য, নারিকেলের দড়ি ও ছোবড়া, পশম, বস্ত্র, লাক্ষা, উদ্ভিজ্জ তৈল ও তৈলবীজ প্রভৃতি। ভারত জার্মানী হইতে লৌহ ও ইস্পাত, রাসায়নিক, দ্রব্যাদি, কাচ ও কাচের দ্রব্য, কলকব্জা, ধাতু-দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, প্লাষ্টিক, রঞ্জক দ্রব্য, কাগজ প্রভৃতি **আমদানী** করে। ১৯৬৪-৬৫ সালে ভারত জার্মানী হইতে ১০৮·৬৯ কোটি টাকার পণ্য আমদানী এবং জার্মানীতে ১৭·৭০ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানী করে।

(ছ) ভারত-অস্ট্রেলিয়া বাণিজ্য—ভারত অস্ট্রেলিয়া হইতে গম, পশম, দুগ্ধজাত দ্রব্য, জ্যাম, কৌটা-বন্দী ফল, মাখন, পনীর, ধাতুদ্রব্য প্রভৃতি **আমদানী** করে। অপর পক্ষে ভারত অস্ট্রেলিয়াতে পাটজাত দ্রব্য, চা, তিসি, নারিকেলের ছোবড়া ইত্যাদি **রপ্তানী** করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতের সহিত অস্ট্রেলিয়ার বাণিজ্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৬৪-৬৫ সালে ভারত অস্ট্রেলিয়া হইতে ২৪·৪৯ কোটি টাকা মূল্যের পণ্যসম্ভার আমদানী এবং অস্ট্রেলিয়ায় ২০·০০ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য রপ্তানী করে।

(জ) ভারত-পাকিস্তান বাণিজ্য—পাকিস্তানের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বাণিজ্য দুইটি দেশের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির. দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় ভারত পাকিস্তান হইতে পাট, কার্পাস, পশম, খাদ্যশস্য, ফল এবং সব্জী **আমদানী** করে এবং পাকিস্তানে কার্পাসবস্ত্র, পাটজাত দ্রব্য, গুড়, চিনি, লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা, চা, সিমেণ্ট,

কাগজ প্রভৃতি দ্রব্য **রপ্তানী** করে। ১৯৬৪-৬৫ সালে ভারত পাকিস্তান হইতে ১৫·৭৫ কোটি টাকার পণ্য আমদানী এবং পাকিস্তানে ৯·৭৬ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানী করে।

(ঝ) ভারত-সোভিয়েট রাষ্ট্র বাণিজ্য—এই দুইটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। ভারত সোভিয়েট রাষ্ট্র হইতে ইস্পাত দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, খনিজ তৈল ও তজ্জাত দ্রব্য **আমদানী** করে এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রে চা, পাটজাতদ্রব্য, জুতা, গালিচা, কার্পাস বস্ত্র, অভ্র, রাসায়নিক দ্রব্য, দড়ি, পশম বস্ত্র, কুটীরশিল্পজাত দ্রব্য প্রভৃতি **রপ্তানী** করে। ১৯৬৫-৬৬ সালে ভারত সোভিয়েট রাষ্ট্র হইতে ৮৩·১৭ কোটি টাকার দ্রব্যাদি আমদানী এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রে ৯২·৯৯ কোটি টাকার দ্রব্যাদি রপ্তানী করে।

ভারতের আড়তদারী বাণিজ্য (**Entrepot trade of India**)—প্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যে ভারত কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করায় ভারতে আড়তদারী বাণিজ্যের বিশেষ সুযোগসুবিধা রহিয়াছে। পশ্চিম গোলার্ধের দেশগুলি হইতে কার্পাস, রাসায়নিক দ্রব্য, কলকব্জা, খনিজ দ্রব্য, ধাতু ও আকরিক প্রভৃতি সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে ভারত আমদানী করিয়া থাকে। ঐ সমস্ত দ্রব্যই পুনরায় কেনিয়া, পূর্ব আফ্রিকা, প্রণালী উপনিবেশ, আফগানিস্তান, প্রভৃতি দেশে ভারত রপ্তানী করে।

সীমান্তপথের বাণিজ্য (**Land frontier trade of India**)—এইরূপ বাণিজ্য কাশ্মীরের মধ্য দিয়া তিব্বত এবং মধ্য এশিয়ার সহিত, নেপাল ও দার্জিলিং-এর মধ্য দিয়া তিব্বতের সহিত, ভামোর মধ্য দিয়া চীন ও ব্রহ্মদেশের সহিত, ব্রহ্মদেশের মধ্য দিয়া শান রাজ্য ও শ্যামের সহিত এবং নানা পথে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সহিত চলিয়া থাকে। এই সমস্ত দেশের সহিত সমুদ্রবাহিত বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা না থাকায় স্থলপথেই বাণিজ্য চলে। সীমান্তপথে নেপাল, ভুটান, সিকিম ও তিব্বত হইতে চাউল, গম, ছোলা, পাট, সরিষা, তিসি, মাখন, পশম, চর্ম, গালিচা, কম্বল, তামাক, সোরা প্রভৃতি দ্রব্য ভারতে আমদানী হয় এবং ভারত হইতে ঐ সমস্ত দেশে বস্ত্র, সূতা, রঞ্জকদ্রব্য, ইস্পাতদ্রব্য, যন্ত্রপাতি, খনিজতৈল, লবণ, চিনি, চা, তামাক, তাম্র, সুপারী ও খাদ্যদ্রব্য রপ্তানী হয়, ইরাণ হইতে নানাবিধ ফল আমদানী হয় এবং ইরাণে বস্ত্র, চা ও পাট রপ্তানী হয়, আফগানিস্তান হইতে নানাবিধ ফল, চর্ম ও পশুলোম আমদানী হয় এবং আফগানিস্তানে বস্ত্র, চিনি, চা, জুতা, রবারজাত দ্রব্য, চর্ম ও ইস্পাত দ্রব্য রপ্তানী হয়।

প্রশ্নোত্তর

1. Indicate briefly the main features of India's foreign trade. (ভারতের বহির্বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর।) (পৃ: ৩১০-৩১২)

2. State the principal imports of India indicating their sources and the chief exports of India indicating their destinations. (ভারতের প্রধান প্রধান আমদানী দ্রব্য ও উহাদের উৎপত্তি স্থান এবং প্রধান প্রধান রপ্তানীদ্রব্য ও উহাদের গন্তব্য স্থান সম্পর্কে লিখ।) (পৃ: ৩১২-৩১৪)

3. Examine the nature of (a) Indo-U. S. trade, (b) Indo-U. K. trade, (c) Indo-USSR trade, and (d) Indo-Pakistan trade. ((ক) ভারত-যুক্তরাষ্ট্র, (খ) ভারত-যুক্তরাজ্য, (গ) ভারত-সোভিয়েট রাষ্ট্র, এবং (ঘ) ভারত-পাকিস্তান বাণিজ্যের প্রকৃতি নির্দেশ কর।) (পৃ: (ক) ৩১৫ (খ) ৩১৪ (গ) ৩১৬ (ঘ) ৩১৫-১৬)

4. Write short notes on ; (a) entrepot trade and (d) land frontier trade of India. (ভারতের (ক) আড়তদারী বাণিজ্য এবং (খ) সীমান্ত পথের বাণিজ্য সম্পর্কে লিখ।) (পৃ: (ক) ৩১৬ (খ) ৩১৬)

5. Write notes on : (a) Indo-Burma trade, (b) Indo-Ceylon trade, (c) Indo-Japan trade and (d) Indo-Australian trade. ((ক) ভারত-ব্রহ্ম, (খ) ভারত-সিংহল, (গ) ভারত-জাপান ও (ঘ) ভারত-অস্ট্রেলিয়া বাণিজ্য সম্পর্কে টিকা লিখ।) (পৃ: ৩১৪, ৩১৪, ৩১৪-১৫, ৩১৫)

ষষ্ঠ খণ্ড

আঞ্চলিক অর্থনৈতিক ভূগোল

পঞ্চদশ অধ্যায়

পশ্চিম বঙ্গ

পরিবেশ—১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর তারিখে প্রাক্তন পঃ বঙ্গের সহিত বিহারের পুর্ণিয়া জেলার কিয়দংশ এবং মানভূম জেলার কিয়দংশ লইয়া **নবগঠিত** পঃ বঙ্গের পত্তন করা হইয়াছে। পুর্ণিমা জেলার অংশটি পঃ বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পঃ দিনাজপুর ও দার্জিলিং জেলার মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপন সম্ভব হইয়াছে।

উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পুবে পাকিস্তান ও পশ্চিমে বিহার ও উড়িষ্যার দ্বারা **আবদ্ধ** এবং দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, পঃ দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, ২৪ পরগণা, কলিকাতা, বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া ও পুরুলিয়া—এই ১৬টি **জেলা** লইয়া গঠিত পঃ বঙ্গের **আয়তন** ৮৭,৬১৭ বঃ কি.-মি., **লোকসংখ্যা** ৩·৫০ কোটি। বসতি-ঘনত্বের দিক হইতে বিচার করিলে (প্রতি বর্গ কি.-মি.-তে ৩৯৮ জন) ভারতের রাজ্যসমূহের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গ কেরালার পরেই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। পশ্চিমে মেদিনীপুর জেলার হিজলী হইতে পুর্বে ২৪ পরগণা জেলার সীমান্তে রায়মঙ্গল নদীর শাখা হাঁড়িভাঙ্গার মোহানা পর্যন্ত পঃ বঙ্গের **উপকূল**ভাগ বিস্তৃত। এখানে নদীমুখে অসংখ্য খাঁড়ি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। ইহার মধ্যে হুগলী নদীর মোহানায় অবস্থিত সাগরদ্বীপ উল্লেখ-যোগ্য।

ভূপ্রকৃতির বিভিন্নতা হিসাবে পঃ বঙ্গকে নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত করা যায়: (১) হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের অন্তর্গত দার্জিলিং জেলার উত্তরাংশ; (২) উহার দক্ষিণে শিলাবহুল ও পাংশু বর্ণের মৃত্তিকাযুক্ত অব-হিমালয় অঞ্চল (৩) জলপাইগুড়ি জেলার দক্ষিণাংশ ও কুচবিহার জেলা লইয়া গঠিত অনুর্বর ও এঁটেল মৃত্তিকাযুক্ত উচ্চভূমি অঞ্চল; (৪) বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম ও মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশ লইয়া গঠিত এবং পশ্চিমে রক্তাভ ও পুর্বে ল্যাটে-রাইট মৃত্তিকাযুক্ত ছোটনাগপুর মালভূমির পুর্ব প্রান্তভাগ; (৫) রূপনারায়ণ-দামোদর-ভাগীরথী-বিধৌত ও উর্বর পলিগঠিত মধ্যভাগের সমভূমি; (৬) ২৪ পরগণার উত্তরাংশ এবং হাওড়া ও হুগলি জেলার পুর্বভাগের কিয়দংশ লইয়া

পলিগঠিত গাঙ্গেয় বদ্বীপাঞ্চল ; এবং (৭) ২৪ পরগণার দক্ষিণ ভাগের সুবিস্তীর্ণ উপকূলীয় নিম্নভূমি অঞ্চল। এ অঞ্চলের মৃত্তিকা লবণাক্ত ও অনুর্বর।
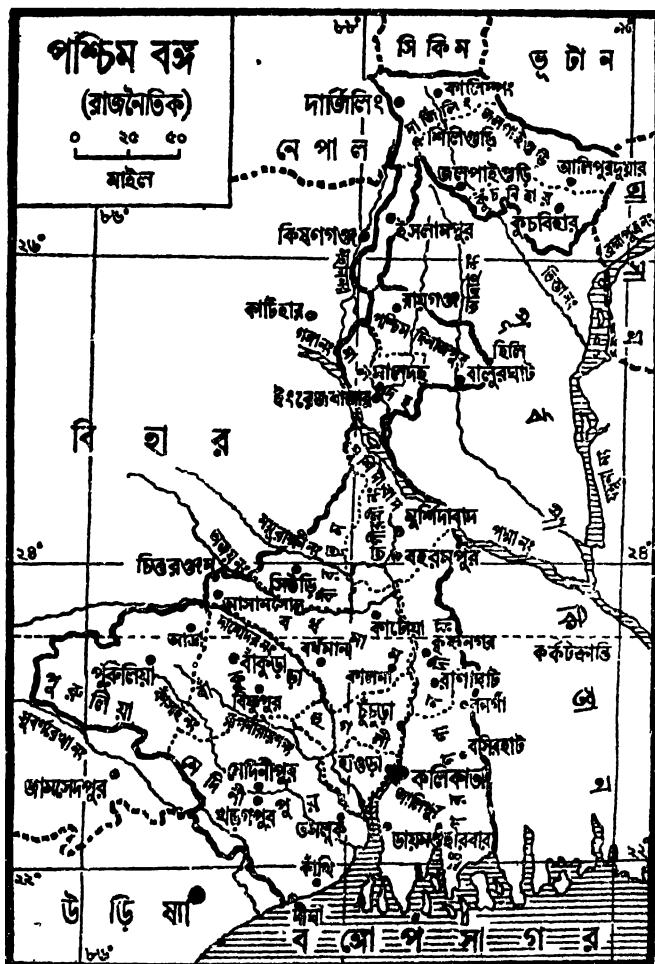
৬১ নং চিত্র—পশ্চিম বঙ্গ (রাজনৈতিক)

জলবায়ুর আঞ্চলিক তারতম্যানুসারে এই দেশকে কয়েকটি জলবায়ু অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়। যথা—(১) উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে গ্রীষ্ম মৃদু, শীত তীব্র ও বৃষ্টিপাত প্রবল (১২০"); (২) অবহিমালয় অঞ্চলে শীত মৃদু, গ্রীষ্ম প্রখর, বৃষ্টিপাত প্রবল (১১৬"); (৩) পশ্চিমের নিম্ন-মালভূমি অঞ্চলে জলবায়ু চরমভাবাপন্ন, বৃষ্টিপাত গড়ে (৫৫"); (৪) মধ্যভাগের সমভূমি অঞ্চলে শীত

মৃদু, গ্রীষ্ম প্রখর এবং বৃষ্টিপাত নাতিপ্রবল (গড়ে ৬০")—জলবায়ু মহাদেশীয় প্রকৃতির ; (৫) উপকূলাঞ্চলে বৃষ্টিপাত উত্তরের সমভূমি অঞ্চল অপেক্ষা অধিক (গড়ে ৭৫')—জলবায়ু মৃদুভাবাপন্ন।

পঃ বঙ্গের অধিকাংশ **নদ-নদীর** উৎস এই রাজ্যের বাহিরে। উত্তরে পার্বত্য অঞ্চলের নদীসমূহ অত্যন্ত খরস্রোতা বলিয়া নাব্য নহে। পঃ বঙ্গের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ নদী গঙ্গা ও ইহার শাখানদী ভাগীরথী-হুগলী। পশ্চিমবঙ্গের নদীসমূহের অধিকাংশই মজা ও বন্যাপীড়িত। সম্প্রতি নদীসমূহের বন্যারোধ ও নাব্যতা-বৃদ্ধিকল্পে দামোদর, ময়ূরাক্ষী ও গঙ্গা বাঁধ পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয়টি সম্পূর্ণ ও প্রথমটি অংশতঃ সম্পূর্ণ হইয়াছে। অন্যান্য নদীসমূহেরও সংস্কারসাধন আশু কর্তব্য।

বর্তমানে এই রাজ্যের প্রায় ২৭% কৃষিজমি **জলসেচে** সিক্ত হইতেছে, তবে পূর্ব অপেক্ষা পশ্চিমাংশেই সেচ কার্যের প্রয়োজন ও প্রসার অধিক। সাধারণতঃ ডোঙ্গার সাহায্যেই জলসেচ কার্য চলে। সম্প্রতি ময়ূরাক্ষী ও দামোদর পরিকল্পনার অন্তর্গত খালের সাহায্যে এবং বিদ্যুৎ-চালিত **নলকূপের সাহায্যেও** জলসেচের ব্যবস্থা বৃদ্ধি পাইতেছে।

পশ্চিম বঙ্গের আর্থিক সঙ্গতি

প্রাথমিক উৎপাদন—কৃষিই অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা ; জনসংখ্যার অর্ধেকেরও অধিক কৃষিজীবী। **ধান** প্রধান খাদ্যশস্য। ইহা সর্বত্রই জন্মে, তবে উত্তর অপেক্ষা দক্ষিণ বঙ্গেই ইহার উৎপাদন অধিক। অবশ্য একর প্রতি উৎপাদন অতি সামান্য। মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার অপেক্ষাকৃত শুষ্ক ও উচ্চভূমি অঞ্চলে সামান্য **গম** ; মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় **যব** ; দার্জিলিং, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও বীরভূম জেলায় **ভুট্টা** এবং প্রায় সর্বত্রই কিছু **ডাল** জন্মে। খাদ্যশস্য উৎপাদনে পশ্চিম বঙ্গ আত্মনির্ভরশীল নহে। উচ্চভূমি অঞ্চলে সরিষা, তিল, তিসি প্রভৃতি **তৈল-বীজ, কার্পাস, তামাক, ইক্ষু** প্রভৃতি অতি সামান্য পরিমাণেই জন্মিয়া থাকে। দামোদরের নিম্ন অববাহিকা এবং পুর্ণিয়া জেলায় প্রচুর **পাট** জন্মে। তবে প্রয়োজনের তুলনায় পাটের উৎপাদন সামান্য ; মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, বীরভূম ও পুরুলিয়া (রঘুনাথপুরে তসর) জেলায় প্রচুর **রেশম** পাওয়া যায়। দার্জিলিং জেলার মংপুতে **সিঙ্কোনা,** কালিম্পং ও পুলবাজার অঞ্চলে **বড়এলাচ** এবং হাওড়া, হুগলী ও ২৪ পরগণা জেলায় প্রচুর **নারিকেল** জন্মে। দার্জিলিং জেলায় প্রচুর **কমলালেবু** এবং মালদহ, হুগলী ও মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রচুর **আম** এবং সর্বত্রই নানাবিধ **ফল** পাওয়া যায়। এদেশে **গবাদি পশু,** মেষ, ছাগল, হাঁস ও মুরগী পালিত হয়, তবে জনসংখ্যার ঘনত্ব ও বিস্তৃত

চারণক্ষেত্রের অভাব হেতু ইহাদের সংখ্যা অতি সামান্য ও ইহারা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর। খাদ্য হিসাবে **মৎস্যের** ব্যবহার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে পশ্চিম বঙ্গেই অধিক। এ অঞ্চলে আভ্যন্তরীণ, উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্য ধৃত হয়, তবে ধৃত মৎস্যের দ্বারা স্থানীয় চাহিদা সম্পূর্ণরূপে মিটান যায় না। পশ্চিম বঙ্গ **খনিজ** সম্পদে সমৃদ্ধ নহে। বর্ধমান জেলার রাণীগঞ্জ ও আসানসোল অঞ্চলে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর **কয়লা** প্রচুর পাওয়া যায়। দার্জিলিং জেলাতেও নিকৃষ্ট শ্রেণীর টার্শিয়ারী কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত বর্ধমান জেলার বিভিন্ন স্থানে মৃৎশিল্পের উপযোগী ফায়ার ক্লে এবং বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ অংশে নানা রং-এর খড়িমাটি পাওয়া যায়। ময়ূরাক্ষী ও দামোদর বিদ্যুৎকেন্দ্র হইতে **জলবিদ্যুৎ** পাওয়া যাইতেছে। আয়তনের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে **বনভূমির** পরিমাণ অতি সামান্য। উপকূলাংশে জলাভূমির অরণ্য (সুন্দরবন), উত্তর বঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলের উচ্চতর অংশে সরলবর্গীয় বৃক্ষের নিম্নতর অংশে মূল্যবান বৃক্ষযুক্ত চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি ও পশ্চিমের মালভূমির স্থানে স্থানে পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি রহিয়াছে। নানাস্থানে বেত এবং পুরুলিয়ার ঝালদা ও বলরামপুরে প্রচুর লাক্ষা পাওয়া যায়।

পরিবহন—স্থল, জল ও আকাশপথে পরিবহন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। নদ-নদী ও বৃষ্টিপাতের প্রাচুর্য ও বর্ষাকালে প্লাবন হেতু উৎকৃষ্ট **রাস্তার** বিশেষ অভাব রহিয়াছে। তথাপি এই রাজ্যের গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, উড়িষ্যা ট্রাঙ্ক রোড প্রভৃতি পথে সারা বৎসরই যানবাহন চলাচল করে। এই দেশের উত্তরাংশের মধ্য দিয়া উঃ পূঃ **রেলপথ** এবং দক্ষিণাংশের মধ্য দিয়া পূর্ব ও দঃ পূর্ব রেলপথ উহাদের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা সহ প্রসারিত থাকায় পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। কলিকাতা ও হাওড়া এই সমস্ত রেলপথের কেন্দ্রস্থল। গঙ্গা, ভাগীরথী, হুগলী, রূপনারায়ণ, দামোদর, কাঁসাই, মাতলা, বিদ্যাধরী প্রভৃতি **নদী** ও নদী সংযোগকারী খালের সাহায্যে জলপথে যাতায়াত ও পণ্য পরিবহনের সুবিধা রহিয়াছে। গঙ্গা বাঁধ পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইলে হুগলী-ভাগীরথী-গঙ্গা নদীপথের নাব্যতা আরও বৃদ্ধি পাইবে। **বিমানপথে** কলিকাতা (দমদম আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর) ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত যুক্ত।

গৌণ উৎপাদন—কৃষিপ্রধান দেশ হইলেও পশ্চিমবঙ্গ অতি প্রাচীনকাল হইতেই শিল্পের জন্য বিখ্যাত। এদেশের শিল্পগুলিকে বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্প ও কুটিরশিল্প এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। বৃহদায়তন শিল্পগুলি প্রধানতঃ দুইটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। (১) **বৃহত্তর কলিকাতা শিল্পাঞ্চল**—কলিকাতা বন্দর, রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়ার কয়লা, রেল ও জলপথে পরিবহনের সুবিধা এবং

কাঁচামালের সুলভতা প্রভৃতি বহু প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধার সমন্বয়ে কলিকাতা-শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে। এ অঞ্চলের সর্বপ্রধান শিল্প পাটশিল্প। ইহা ব্যতীত বস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং, অ্যালুমিনিয়াম, রাসায়নিক, মৃৎশিল্প, প্রসাধন, কাগজ, রবার, চর্ম, মোটর গাড়ী প্রভৃতি সংক্রান্ত নানারূপ শিল্প এ অঞ্চলে গড়িয়া উঠিয়াছে। (২) **আসানসোল শিল্পাঞ্চল**—ছোটনাগপুরের মালভূমি হইতে লৌহ আকর, ম্যাঙ্গানীজ, চুনাপাথর ও বক্সাইট, রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়ার কয়লা, ডি. ভি. সি.-র বিদ্যুৎ, কলিকাতা বন্দরের সান্নিধ্য এবং রেলপথে পরিবহনের সুবিধা হেতু এ অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত (বার্নপুর), রেল ইঞ্জিন (চিত্তরঞ্জন), টেলিফোনের তার (রূপনারায়ণপুর), অ্যালুমিনিয়ম, সাইকেল, কাগজ, মৃৎশিল্প, চুল্লী নির্মাণের ইষ্টক, কোক-কয়লা প্রস্তুত প্রভৃতি বহুবিধ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। দুর্গাপুরে একটি নূতন ইস্পাত কারখানা ও কয়লা হইতে কোক ও গ্যাস প্রস্তুতের কারখানাও স্থাপিত হইতেছে। উপরোক্ত দুইটি শিল্পাঞ্চল ব্যতীতও দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় চা ও তৎসংক্রান্ত শিল্প, মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গায় শর্করা শিল্প খড়্গপুর এলাকায় রেলের যন্ত্রপাতি নির্মাণ উল্লেখযোগ্য।

পশ্চিম বঙ্গের **কুটির শিল্প** অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে তাঁত শিল্প (শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা, বিষ্ণুপুর, রামজীবনপুর, চন্দ্রকোণা, ঘাঁটাল, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, হুগলী, পঃ দিনাজপুর), রেশম শিল্প (মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, মালদহ, পঃ দিনাজপুর), কাঁসা ও পিতলের বাসন (মুর্শিদাবাদ), লৌহদ্রব্য, মৃৎশিল্প, কাঁচ, উদ্ভিজ্জ তৈল, সাবান, কাঠের খেলনা, আসবাবপত্র, নারিকেলের ছোবড়া ও দড়ি, মাদুর, তালাচাবি, বিড়ি, লবণ, গুড়, শঙ্খ, স্বর্ণ-রৌপ্য, বাঁশ-বেত, খাদি প্রভৃতি নানাবিধ শিল্প উল্লেখযোগ্য।

বাণিজ্য—পাটজাত দ্রব্য, চা, তৈলবীজ, লাক্ষা, চামড়া, কয়লা, লৌহ, ম্যাঙ্গানীজ প্রভৃতি এই রাজ্যের প্রধান **রপ্তানী** এবং খাদ্যদ্রব্য, ইস্পাত, ধাতুদ্রব্য, মোটর গাড়ি, কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, ঔষধ, কাঁচদ্রব্য, চিনি, কেরোসিন, বিলাসদ্রব্য প্রভৃতি নানাবিধ শিল্পদ্রব্য প্রধান **আমদানী** দ্রব্য।

বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র—সমুদ্র হইতে ১৩০ কি. মি. দূরে হুগলী নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত **কলিকাতা** এই রাজ্যের রাজধানী, ভারতের শ্রেষ্ঠ নগর ও বন্দর এবং পূর্ব ভারতের প্রধান বাণিজ্য ও রেলকেন্দ্র। কলিকাতার নিকটবর্তী **দমদম** আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর। **ডায়মণ্ড হারবার** কলিকাতার দক্ষিণে হুগলী নদীর মোহানার অনতিদূরে অবস্থিত বন্দর। ইহা রেলপথে কলিকাতার সহিত সংযুক্ত। হুগলী নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত **হাওড়া** পূঃ ও দঃ রেলপথের প্রান্তিক স্টেশন, শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র। ইহা একটি সেতুর দ্বারা কলিকাতা শহরের সহিত সংযুক্ত। **মুর্শিদাবাদ, শিলিগুড়ি, কালিম্পং,**

শ্রীরামপুর, রাণীগঞ্জ, আসানসোল, বাটানগর, বহরমপুর, চিত্তরঞ্জন অন্যান্য শিল্পবাণিজ্যকেন্দ্র। **মালদহ** রেশম ও আমের জন্য বিখ্যাত। হুগলী জেলার **চন্দননগর** হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত একটি বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। **ঝালদা** (তসরশিল্প) ও **বলরামপুর** (লাক্ষাশিল্প) পুরুলিয়ার বিখ্যাত শিল্প-বাণিজ্য-কেন্দ্র। **আদ্রা** দঃ পূঃ রেলপথের অন্যতম প্রধান জংশন স্টেশন। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত **দুর্গাপুর** একটি নবগঠিত শিল্পাঞ্চল। শিল্প সংগঠনে বিরাট সম্ভাবনা-পূর্ণ দুর্গাপুরকে ভারতের ভবিষ্যৎ রূঢ় বলা হয়। রূঢ় পশ্চিম জার্মানীর তথা সমগ্র ইউরোপের একক বৃহত্তম কয়লা খনি ও শিল্পাঞ্চল। রূঢ় অববাহিকায় লৌহ আকরের অসদ্ভাব রহিয়াছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্পেন, সুইডেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানীকৃত লৌহ আকরের সাহায্যে এ অঞ্চলে ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। অবশ্য রাইন নদী ও তৎসংলগ্ন খালসমূহ এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে দুর্গাপুর পশ্চিমবঙ্গের একটি উল্লেখযোগ্য শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। এখানে একটি বিরাট ইস্পাত কারখানা ও একটি কোক চুল্লী স্থাপিত হইয়াছে। পরবর্তীকালে এই দুইটি শিল্পকে ভিত্তি করিয়া আরও নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান এ অঞ্চলে গড়িয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। দুর্গাপুরের নিকটেই রাণীগঞ্জে প্রচুর কয়লা রহিয়াছে, তবে লৌহ আকর আসিবে উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে। দুর্গাপুরের জলাধার হইতে বহু খাল কাটিয়া পরিবহন ব্যবস্থারও সুবিধা করা হইতেছে। রূঢ় ও দুর্গাপুরের শিল্প সংগঠন বিষয়ে সাদৃশ্য আছে বলিয়া দুর্গাপুরকে ভারতের ভবিষ্যৎ রূঢ় বলা হয়।

ভারতের চা-শিল্প (Indian Tea Industry)

ভারতে ৬০০০-এরও অধিক চা-বাগান রহিয়াছে। ইহার ২০% পাঞ্জাবে এবং ১১% আসামে অবস্থিত। পাঞ্জাবের চা-বাগানের গড় আয়তন ৪ একর মাত্র, কিন্তু আসামের চা-বাগানের গড় আয়তন ৪০০ একরেরও অধিক। প্রতি চা-বাগানের নিজস্ব চা-প্রস্তুতের কারখানা রহিয়াছে। চা-পাতা তুলিবার পর অনতিবিলম্বেই চা-প্রস্তুত কার্য আরম্ভ করা প্রয়োজন, নতুবা পাতা শুকাইয়া যায়। এই কারণেই, চা-শিল্পাগারসমূহ, চা-ক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলেই স্থাপিত হয়। ভারতীয় চা-শিল্পে বর্তমানে ৫০ কোটি টাকা পরিমিত মূলধন ও ৯'২ লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত রহিয়াছে। ১৯৫৬ ও ১৯৬১ সালে ভারতে যথাক্রমে ৩০,৮৭ ও ৩৫,৩৫ লক্ষ কে. জি. চা প্রস্তুত হয়। মোট উৎপন্ন চা-এর প্রায় ৮০% পশ্চিম বঙ্গ ও আসাম হইতে আসে। ভারতের সমগ্র চা উৎপাদনের প্রায় ২৫ ভাগ দেশাভ্যন্তরে ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্ট ৭৫ ভাগই বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়। ১৯৫৬ সালে এই রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ২৩,৭৫ লক্ষ

কে. জি। ভারতীয় চা প্রধানতঃ যুক্তরাজ্য, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, মিশর, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, নিউজীল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হইয়া যায়।

বর্তমানে সিংহল, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, চীন, জাপান, ফরমোজা, ভিয়েৎনাম প্রভৃতি দেশ ইউরোপ এবং আমেরিকার বাজারে ভারতীয় চা-এর সহিত তীব্র প্রতিযোগিতা চালাইতেছে। ভারতীয় চা-রপ্তানীর ক্রমক্ষীয়মাণ পরিমাণের দিকে লক্ষ্য রাখিলে ইহাই মনে হয় যে চা-এর উৎকর্ষ বিধান একান্ত প্রয়োজন এবং দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে ভারতীয় চা-এর চাহিদা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। "কেন্দ্রীয় চা বোর্ড" বিজ্ঞাপন এবং প্রচারকার্যের দ্বারা ভারতীয় চা-এর চাহিদা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং এদিকে কিছুদূর সাফল্য-লাভও যে করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

চা-বাগান অঞ্চলে কয়লা প্রেরণ অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ হইয়া ওঠায় চা-এর উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি, শ্রমিক সমস্যা, রাসায়নিক সারের অপ্রাচুর্য হেতু চা-এর উৎপাদন হ্রাস এবং চা-বাক্সের অভাব ও উৎপাদিত চায়ের অপকর্ষ হেতু বৈদেশিক বাজারের ভারতীয় চা-এর চাহিদা হ্রাস পাইতেছে। তবে সম্প্রতি ভারত সরকারের সহায়তায় কারখানাসমূহের সম্প্রসারণ ও উৎপাদন সৌকর্য-সাধন, সারের সরবরাহ বৃদ্ধি, শ্রমিক সমস্যার সমাধান, অর্থসাহায্য, চা বাক্সের সরবরাহ বৃদ্ধি, চা-এর উৎকর্ষসাধন এবং মধ্যপ্রাচ্য, রুশিয়া প্রভৃতি দেশে অধিকতর পরিমাণে চা বিক্রয় প্রভৃতি ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ায় ভারতীয় চা-শিল্প বিশেষ প্রসারলাভ করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

নিম্নের পরিসংখ্যান হইতে ভারতীয় চা এর উৎপাদন ও রপ্তানীর পরিমাণ বুঝা যাইবে।

চা-এর উৎপাদন ও রপ্তানী

সাল	১৯৫৬	১৯৬১	১৯৬২	১৯৬৩	১৯৬৪	১৯৬৫
উৎপাদন (লক্ষ কে. জি.)	৩০,৮৭	৩৫,৩৫	৩৪,৪৯	৩৪,৫৯	৩৭,৩৬	৩৬,৬৪
রপ্তানী (লক্ষ কে. জি.)	২৩,৭৫	২০,৫২	২১,৪০	২২,৩০	২১,১০	১৯,৬৫

প্রশ্নোত্তর

1. Examine briefly the development of tea industry of India. (ভারতীয় চা-শিল্পের সম্প্রসারণ সম্পর্কে যাহা জান লিখ।) (পৃঃ ৩২৩-৩২৪)

2. Write a brief account of the *large scale industries* of West Bengal under the following heads (i) Nature of industries and producing centres ; (ii) Raw materials ; (iii) Production ; (iv) Labour and market. ((i) উৎপাদক অঞ্চল ও শিল্পের প্রকৃতি, (ii) কাঁচামাল, (iii) উৎপাদন, এবং (iv) শ্রমিক ও বাজার উল্লেখপূর্বক পশ্চিমবঙ্গের বৃহদায়তন শিল্প সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখ।) (H. S. '61)

3. Write a brief account of the agricultural resources, mineral resources and industries of West Bengal. (পশ্চিম বঙ্গের কৃষিজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ ও শিল্প সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিখ।) (H. S '63) (পৃঃ ৩২০-৩২২)

4. "Durgapur is the future Ruhr of India." Justify the statement. ("দুর্গাপুর ভারতের ভবিষ্যৎ রূঢ়"—এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণ কর।) (পৃঃ ৩২৩)

সপ্তম খণ্ড

ষোড়শ অধ্যায়

পৃথিবীর লোকসংখ্যা ও বসতিঘনত্ব

অর্থনৈতিক ভূগোলের দৃষ্টিতে পৃথিবী মনুষ্য-নিরপেক্ষ একটি জড়পিণ্ড মাত্র নহে, ইহা হইল মানবজাতির বাসভূমি। মানুষের আবাসস্থল হিসাবে পৃথিবীর উপযোগিতার বিচার-বিশ্লেষণ করাই অর্থনৈতিক ভূগোলের প্রধান বিষয়বস্তু। এই শাস্ত্রের আলোচনায় মানুষ হইল মুখ্য। কারণ, বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে যে সমস্ত বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপ সাধিত হয় তাহার কর্মকর্তা মানুষ নিজেই। মানুষই নিজ প্রয়োজনের তাগিদে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন করে এবং উৎপাদিত সামগ্রীর বণ্টন ও ভোগ করিয়া থাকে। সর্বদাই কর্মতৎপর ও উদ্যমশীল মানুষ আজ পৃথিবীর নানাস্থানে বসতি বিস্তার করিয়া স্থানীয় সম্পদ আহরণ করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে স্থানীয় বসতিঘনত্বের একটি গুরুত্ব-পুর্ণ সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়া পৃথিবীর লোকবসতি সম্পর্কিত আলোচনাও অর্থনৈতিক ভূগোলের অঙ্গীভূত।

১৯৫০ সালে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা কিঞ্চিদধিক ২৪০ কোটি বলিয়া রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক অনুমিত হয়। তবে লোকবসতি পৃথিবীর সকল অংশে সমভাবে বণ্টিত নহে। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক অধিবাসী দঃ পুঃ এশিয়ার অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করে। এই সমস্ত অঞ্চলের মিলিত আয়তন সমগ্র স্থলভাগের প্রায় ১৪%। পৃথিবীর প্রায় ২৫% অধিবাসী ইউরোপ মহাদেশে বসবাস করে—মোট স্থলভাগের মাত্র ৭% অংশে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মিলিত আয়তন এশিয়ার আয়তনের প্রায় সমান হইলেও পূর্বোক্ত অঞ্চল দুইটিতে মিলিতভাবে এশিয়া মহাদেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ২৫% এবং পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৩% বসবাস করে।

বসতি বণ্টন ও ঘনত্ব তারতম্যের কারণ (Causes of the variation of population densities)—আঞ্চলিক জনসংখ্যা বণ্টন যে সমস্ত কারণগুলির উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল তাহাদিগকে আমরা প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। (১) **স্থানীয় অবস্থান, জলবায়ু ও ভূ-প্রকৃতি।** প্রাকৃতিক পরিবেশের এই উপাদানগুলি বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপের পক্ষে অনুকূল (বা প্রতিকূল) হইলে স্থানীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধি (বা হ্রাস) পায়। (২) **খনিজ দ্রব্য, জল, মৃত্তিকা, উদ্ভিদ, জীবজন্তু প্রভৃতি স্থানীয় সম্পদ।**

যে সমস্ত অঞ্চলে প্রাকৃতিক সম্পদের এই সমস্ত উপাদান পর্যাপ্ত (বা সামান্য) পরিমাণে রহিয়াছে সেই সমস্ত অঞ্চলেই লোকবসতি নিবিড় (বা বিরল) হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যে সমস্ত অঞ্চলের মৃত্তিকা উর্বর, জলবায়ু, কৃষিকার্য ও মনুষ্যবাসের উপযোগী, পরিবহনব্যবস্থা উন্নত ধরণের এবং যে সমস্ত অঞ্চলে খনিজ দ্রব্য, জলবিদ্যুৎ শক্তি ও সেচ-ব্যবস্থার পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে সেই সমস্ত অঞ্চলেই লোকবসতি নিবিড় হইয়া উঠে। (৩) মানুষের **সাংস্কৃতিক পরিবেশ**। উন্নত শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞানবিজ্ঞান, রীতিনীতি, ধর্মমত, রাষ্ট্ররূপ প্রভৃতি প্রবর্তনের ফলে যে সমস্ত অঞ্চল স্থানীয় প্রাকৃতিক পরিবেশকে স্বীয় আয়ত্তে আনিয়া পার্থিব সম্পদের পরিপূর্ণ আহরণ ও ব্যবহার করিতে সক্ষম হইয়াছে সেই সমস্ত অঞ্চলের বসতি-ঘনত্ব স্বভাবতই নিবিড় হইয়া থাকে। সাংস্কৃতিক পরিবেশের যে সমস্ত উপাদান অঞ্চলিক বসতিবণ্টনের উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে তাহাদিগকে আমরা নিম্নলিখিতভাবে নির্দেশ করিতে পারি। (ক) শিল্প সংগঠনে **কারিগরী বিদ্যার প্রয়োগ**—যে দেশ শিল্প সংগঠনে যত উন্নত কারিগরী বিদ্যার প্রয়োগ করিতে সক্ষম হইয়াছে সেই দেশের লোকবসতি তত নিবিড় হইয়াছে। (খ) **জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ**—জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণে যে দেশ যত অগ্রণী সেই দেশে সাধারণতঃ মৃত্যুহারের স্বল্পতা হেতু লোকবসতিও তত নিবিড় হইয়া থাকে। (গ) **পরিবারের আয়তন সম্পর্কিত মতামত**—এক একটি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত সভ্য সংখ্যার পরিমাণ সম্পর্কিত মতবাদও জন-সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির সহায়তা করে। (ঘ) **বহিরাগত আয়ের পরিমাণ**—ইহা সাধারণতঃ অদৃশ্য রপ্তানী, নিজদেশে বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের ব্যয়, বিদেশে নিযুক্ত লগ্নী হইতে আয় এবং বিদেশাগত ঋণ ও দানের উপর বিশেষ-ভাবে নির্ভর করে। এইরূপ বহিরাগত আয়ের সাহায্যে দেশগত বর্ধিত জনসাধারণের চাহিদা মিটান সম্ভব বলিয়া যে দেশের বহিরাগত আয়ের ক্ষমতা ও পরিমাণ অধিক (বা অল্প), অন্যান্য ব্যবস্থা অনুকূল হইলে সেই দেশের জনসংখ্যাও অধিক (বা অল্প) হইয়া থাকে। (ঙ) **ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের সংকীর্ণতা বা প্রসার** বিভিন্ন উপনিবেশ অঞ্চল হইতে খাদ্য-সামগ্রী ও অন্যান্য দ্রব্যের আমদানীর পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া মূল দেশের জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি নিরূপণ করিয়া থাকে। বসতিঘনত্ব-তারতম্যের উপরোক্ত কারণগুলি কখনও বা ব্যষ্টিগতভাবে আবার কখনও বা সমষ্টিগতভাবে স্থানীয় আঞ্চলিক বসতিঘনত্ব নির্ধারণ করিয়া থাকে।

পৃথিবীর জনসংখ্যা বণ্টন (World Distribution of Population)—বসতিঘনত্বের তারতম্য অনুসারে পৃথিবীকে প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা যায়—

(১) **প্রায় বসতিহীন অঞ্চলসমূহ** (বসতিঘনত্ব প্রতি বর্গ মাইলে ২ জনের অনধিক)—পৃথিবীর স্থলভাগের অর্ধাংশই পরিবেশের প্রতিকূল প্রভাব হেতু প্রায় বসতিহীন। চারিটি প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল এই অঞ্চলসমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। (ক) শীতল মেরুদেশীয় জলবায়ু প্রভাবিত সাইবেরিয়া, উঃ স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া, উঃ আমেরিকার উত্তরাঞ্চল এবং অ্যান্টার্কটিকা প্রায় বসতিহীন অঞ্চল। শস্যোৎপাদন কালের স্বল্পতাহেতু এই সমস্ত অঞ্চলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন নিতান্তই অসম্ভব। আবার পশুপালনের উপযোগী চারণযোগ্য তৃণভূমিরও বিশেষ অভাব রহিয়াছে। এই কারণে এই সমস্ত অঞ্চল প্রায় বসতিহীন। (খ) মরু ও মরুপ্রায় জলবায়ু সেবিত আফ্রিকার সাহারা ও কালাহারী, এশিয়ার আরব, তুর্কীস্তান, পারস্যের অংশবিশেষ ও তৎসন্নিহিত স্থানসমূহ, অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিমাঞ্চল, যুক্তরাষ্ট্রের গ্রেটবেসিন ও পর্বতান্তর্গত মালভূমিসমূহ এবং দক্ষিণ আমেরিকার আটাকামা ও প্যাটাগোনিয়া প্রায় বসতিহীন অঞ্চল। অস্ট্রেলিয়ার উত্তরাঞ্চলে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত অধিক হইলেও এই অঞ্চল প্রায় বসতিহীন। (গ) নিরক্ষীয় অঞ্চলের অন্তর্গত দঃ আমেরিকার আমাজন অববাহিকা এবং নিউগিনি দ্বীপও প্রায় বসতিহীন। প্রবল বৃষ্টিপাত, পর্যাপ্ত
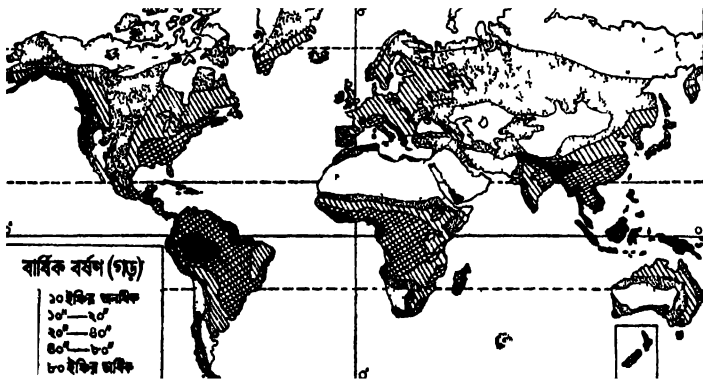
৬২নং চিত্র—পৃথিবীর বসতি-বণ্টন

উত্তাপ, অনুর্বর মৃত্তিকা, নিবিড় বনভূমি ও অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু এই সমস্ত অঞ্চলে বসতি বিস্তারের অন্তরায় স্বরূপ। (ঘ) পার্বত্য জলবায়ু সেবিত উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চল এবং মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল ভূপ্রকৃতির বন্ধুরতা, শস্যোৎপাদন কালের স্বল্পতা ও বিরল বৃষ্টিপাত হেতু প্রায় বসতিহীন।

(২) **বিরলবসতিযুক্ত অঞ্চলসমূহ** (বসতিঘনত্ব প্রতি বর্গ মাইলে

২-২৫ জন)—উঃ ও দঃ আমেরিকার বিরলবসতিযুক্ত অঞ্চলসমূহের মধ্যে 'প্রেয়রী' ও 'পম্পা' তৃণভূমি অঞ্চলসমূহই প্রধান। এই সমস্ত অঞ্চলে বর্তমানে সংঘবদ্ধভাবে চারণশিল্প ও কৃষিকার্য পরিচালিত হইতেছে। উঃ ইউরোপের শীতল ও বনাকীর্ণ অংশ এবং এশিয়ার অভ্যন্তরস্থ পার্বত্য বা শুষ্ক অঞ্চলও বৃষ্টিপাতের স্বল্পতা ও অনিশ্চয়তা হেতু বিরলবসতিযুক্ত। মালভূমি অংশে অবস্থান হেতু মধ্য আফ্রিকার অধিকাংশ অঞ্চলও ইহার অন্তভুক্ত। তবে, অনুরূপ অক্ষাংশে অবস্থিত আমাজনীয় নিম্নভূমি অঞ্চল অপেক্ষা এই স্থানের লোকবসতি নিবিড়। ইউরোপ ও দঃ পূঃ এশিয়ার কয়েকটি পার্বত্য অঞ্চল, ক্রান্তীয় আমেরিকা, আফ্রিকা ও ইন্দোনেশিয়ার পর্বত ও মালভূমি অঞ্চলসমূহেও লোকবসতি বিরল। তবে সন্নিহিত নিবিড় বসতিপূর্ণ অঞ্চলসমূহের খাদ্যদ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা মিটাইবার জন্য অনুরূপ অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চল অপেক্ষা এই সমস্ত অঞ্চলের লোকবসতি নিবিড়।

(৩) **নাতিনিবিড়বসতিযুক্ত অঞ্চলসমূহ** (বসতিঘনত্ব প্রতি বর্গ মাইলে ২৫-১২৫ জন)—দঃ পূঃ এশিয়ার অন্তর্গত ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশের অপেক্ষাকৃত শুষ্ক ও পার্বত্য অঞ্চল, পশ্চিম এশিয়ার উপত্যকা ও মালভূমি অঞ্চলসমূহ; প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত ফিলিপিন, সুমাত্রা ও টিমোর দ্বীপ, ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু-সেবিত দঃ ও পূঃ ইউরোপীয় সমভূমির অন্তর্গত দঃ পূঃ রুশিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস, স্পেন ও ইতালী, সুইডেনের দক্ষিণার্ধ, উঃ আলজেরিয়া এবং মরক্কো প্রভৃতি দেশের বসতিঘনত্ব নাতিনিবিড়। এই দেশগুলি মূলতঃ কৃষিপ্রধান, তবে ইহাদের মধ্যে কোন কোনটি উৎপাদিত কৃষিজ দ্রব্যের উদ্বৃত্তাংশ রপ্তানী করিয়া থাকে আবার কোন কোনটি কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদনে কেবলমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অন্তর্গত কৃষিসমৃদ্ধ অঞ্চলসমূহ এবং উষ্ণ মণ্ডলের অন্তর্গত ঈষৎ আন্দোলিত মালভূমি অঞ্চলসমূহের বসতিঘনত্বও নাতিনিবিড়। এই সমস্ত অঞ্চলে কৃষিকার্য ব্যতীতও খনিজ দ্রব্যের উত্তোলন, যন্ত্রশিল্প ও অন্যান্য নানাবিধ বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপ পরিচালিত হইয়া থাকে।

দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, এবং অস্ট্রেলিয়ার স্থানে স্থানে বিশেষতঃ উপকূল-সন্নিহিত অঞ্চলসমূহের বসতিঘনত্বও নাতিনিবিড়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে দঃ আমেরিকার সান্টোস্, বুয়েনশ আয়ার্স, ভ্যাল-প্যারাইজো, ক্যালাও ও ক্যারাকাস, আফ্রিকার দক্ষিণাংশ, নাইজেরিয়া, ঘানা ও লাইবেরিয়া; অস্ট্রেলিয়ার পার্থ, সিডনী ও মেলবোর্ন এবং নিউজীল্যাণ্ডের বসতিঘনত্ব প্রতি বর্গ মাইলে ২৫-১২৫ জন।

(৪) **নিবিড়বসতিযুক্ত অঞ্চলসমূহ** (বসতিঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে

১২৫ জনের অধিক)—মৌসুমী ও চৈনিক জলবায়ু সেবিত দঃ পূঃ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল, বিশেষতঃ ভারত, চীন, জাপান ও জাভা; ব্রিটিশ জলবায়ু সেবিত উঃ পঃ ও মধ্য ইউরোপের দেশসমূহ, বিশেষতঃ, ইংল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ড, জার্মানী, ইতালী, সুইজারল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরী এবং লরেন্সীয় জলবায়ু সেবিত উঃ পূঃ যুক্তরাষ্ট্রের লোকবসতি অতিশয় নিবিড়। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬৭% এই তিনটি অঞ্চলেই বসবাস করে।

দঃ পূঃ এশিয়াতেই পৃথিবীর অর্ধেক লোক বাস করে। তবে এই অঞ্চলের দেশগত সামগ্রিক বসতিঘনত্বের সংখ্যাসমূহ ভ্রান্ত ধারণামূলক, কারণ, এই দেশগুলির উর্বর ভূমিভাগের স্থানে স্থানে বসতিঘনত্ব ১০০০ জনেরও অধিক হইয়া থাকে।

উপরোক্ত তিনটি প্রধান প্রধান অঞ্চল ব্যতীতও বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলেও নিবিড় বসতিঘনত্ব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে বারমুডা (১,৭৫৯), বারবাডোস (১,২৬৬), ও পোর্টোরিকো (৫৪৪) দ্বীপপুঞ্জ; বৃহদায়তন শহরসমূহের নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহ এবং নীলনদের অববাহিকার ন্যায় উর্বর, সেচসমন্বিত ও কৃষিসমৃদ্ধ অঞ্চলসমূহই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উপরোক্ত অঞ্চলসমূহে **নিবিড় লোকবসতির কারণগুলি** আমরা নিম্নলিখিত রূপে নির্দেশ করিতে পারি:—(১) **অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ ও পার্থিব সম্পদের প্রাচুর্য। দঃ পূঃ এশিয়ার** অন্তর্গত দেশগুলির জনসমৃদ্ধি নির্ভর করে প্রধানতঃ উহাদের অনুকূল জলবায়ুযুক্ত উর্বর মৃত্তিকার উপর। জাভার উর্বর আগ্নেয় মৃত্তিকা, উষ্ণ জলবায়ু ও প্রচুর বৃষ্টিপাত এই দেশটিকে একটি সমৃদ্ধ কৃষি অঞ্চলে পরিণত করিয়াছে। চীনের ইয়াংসি ও সিকিয়াং অববাহিকা এবং ভারতের গাঙ্গেয় সমভূমি অতিশয় উর্বর এবং জলবায়ু কৃষিকার্য ও মনুষ্যবাসের অনুকূল হওয়ায় এই সমস্ত অঞ্চল নিবিড বসতিপূর্ণ। জাপানে লোকবসতি নিবিড় হইবার কারণ দেশটির নাতিশীতল ও স্বাস্থ্যকর জলবায়ু, ভগ্ন তটরেখা এবং শিল্পসমৃদ্ধি। এই দেশগুলি খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এতদঞ্চলে খনিজ দ্রব্যের উত্তোলন অতি সামান্য এবং ইহাদের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণও নাম মাত্র।

উঃ পঃ ইউরোপের জনবহুল দেশসমূহের জলবায়ু ও মৃত্তিকা কৃষিকার্যের পক্ষে তাদৃশ উপযোগী না হইলেও খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য, যন্ত্রশিল্প সংগঠনের সুযোগ-সুবিধা, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে এই দেশগুলির অনুকূল অবস্থান ও স্বাভাবিক বন্দরের প্রাচুর্য এই সমস্ত দেশের জনসমৃদ্ধির পক্ষে সহায়তা করিয়াছে।

উঃ পূঃ যুক্তরাষ্ট্রের নিবিড় বসতিঘনত্ব প্রধানতঃ এই অঞ্চলের খনিজ সম্পদ, শিল্প সংগঠনের সুযোগ সুবিধা, ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে অঞ্চলটির অনুকূল অবস্থান ও উর্বর কৃষিভূমির উপর নির্ভরশীল।

(২) **অনুকূল সাংস্কৃতিক পরিবেশ** ঃ সাংস্কৃতিক পরিবেশের যে সমস্ত প্রধান প্রধান উপাদান এতদঞ্চলে নিবিড় বসতিঘনত্বের সহায়তা করিয়াছে তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান :—(ক) যন্ত্রশিল্পে উন্নতি এবং **কারিগরী বিদ্যার প্রয়োগ** ও প্রসারহেতু উঃ পূঃ যুক্তরাষ্ট্র ও উঃ পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন অংশ জনসমৃদ্ধ। (খ) উঃ পূঃ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ও উঃ পূঃ যুক্তরাষ্ট্রে এবং ঐ সমস্ত দেশ কর্তৃক শাসিত পৃথিবীর অন্যান্য দেশসমূহেও উন্নত **জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রসারহেতু** মৃত্যুহারের স্বল্পতা ও তজ্জনিত জনসংখ্যার আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। (গ) উঃ পঃ ইউরোপের দেশগুলির পক্ষে **বহিরাগত আয়ের পরিমাণ** অধিক হওয়ায় এবং এইরূপ আয়ের সাহায্যে দেশগত বর্ধিত জনসাধারণের চাহিদা মিটান সম্ভব বলিয়া এই সমস্ত দেশে জনসংখ্যার চাপও অধিক। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে পঃ ইউরোপের দেশগুলির ক্ষেত্রে এইরূপ আয়ের উৎস বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে উহা দিনদিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। (ঘ) **ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের প্রসার** হেতু গ্রেটব্রিটেন, বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডে জনসংখ্যার চাপ অধিক। কারণ উপনিবেশসমূহ হইতে দ্রব্য-সামগ্রীর আমদানীর দ্বারা মূল দেশের বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা মিটান সম্ভব। তবে, সম্প্রতি এই সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হইয়া যাইতেছে বলিয়া নিবিড় বসতিপূর্ণ সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের জীবনযাত্রার মানও নিম্নমুখী হইতে চলিয়াছে।

ভারতের জনসংখ্যা বণ্টন (**Distribution of population in India**)—১৯৬১ সালের আদম সুমারী অনুসারে ভারতের জনসংখ্যা ৪৩.৯১ কোটি, আয়তন ৩২,৭৬,১৪১ কি. মি. এবং প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব গড়ে ১৩৮। কিন্তু বহুবিস্তৃত ভারতের জনসংখ্যার ঘনত্ব সর্বত্র সমান নহে। রাজ্যসমূহের মধ্যে কেরালায় প্রতি বর্গ কিলোমিটারে লোকবসতি ৪৩৫ জন। কিন্তু জম্মু ও কাশ্মীরে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে লোকবসতি অতি অল্প—মাত্র ২৬ জন (অনুমিত)। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও পঃ বঙ্গে যথাক্রমে গড় ঘনত্ব ১২৯, ১১০, ২৫১, ৭৩, ২৬৭, ৩৯৮। বসতি বণ্টনের তারতম্য অনুসারে ভারতকে নিবিড় বসতিযুক্ত অঞ্চল, নাতি-নিবিড় বসতিযুক্ত অঞ্চল এবং বিরল বসতিযুক্ত অঞ্চল—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) গাঙ্গেয় সমভূমি, মালাবার ও কঙ্কণ উপ-কূলাঞ্চল, তামিলনাড়ুর উত্তরাংশ এবং উড়িষ্যার উপকূলভূমি নিবিড় বসতি-যুক্ত

অঞ্চল (বসতি-ঘনত্ব প্রতি বর্গ মাইলে প্রায় ৬৬০)। (২) গুজরাট, সৌরাষ্ট্র, দাক্ষিণাত্য, এবং পূর্বপাঞ্জাবের সমভূমি—নাতিনিবিড় বসতিযুক্ত অঞ্চল (বসতি-ঘনত্ব প্রতি বর্গ মাইলে প্রায় ২৬৬)। (৩) মরু অঞ্চল, হিমালয়ের পার্বত্যভূমি, ছোটনাগপুর এবং মধ্য ভারতের মালভূমি ও উচ্চভূমি অঞ্চলসমূহ বিরল বসতিযুক্ত (বসতি ঘনত্ব প্রতি বর্গ মাইলে প্রায় ১২৯)। নিম্নলিখিত কারণসমূহের জন্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নিবিড় বা বিরল লোকবসতি পরিলক্ষিত হয়।

নিবিড় লোকবসতির কারণ—ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে লোকবসতি অত্যন্ত নিবিড়। ইহার কারণ—(১) **কৃষিকার্যের সুযোগসুবিধা** ও উন্নতি—সমতল ভূপ্রকৃতি, পরিমিত উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত, কৃত্রিম জলসেচ ব্যবস্থা ও জমির উর্বরা শক্তির উপর কৃষিশিল্পের উন্নতি নির্ভর করে। পশ্চিমবঙ্গ ও মালাবার উপকূলে কৃষিকার্যের এই সমস্ত সুযোগসুবিধা থাকায় লোকবসতি অত্যন্ত ঘন। গাঙ্গেয় সমভূমির পশ্চিমাঞ্চলে, বিশেষতঃ বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে (১৬৬) এবং তামিলনাড়ুর (২৫৯) বদ্বীপাঞ্চল ও উড়িষ্যার (১১৩) সমতলভূমিতে বৃষ্টিপাত অল্প। কিন্তু এই সমস্ত অঞ্চলে কৃত্রিম জলসেচ ব্যবস্থার সুযোগ থাকায় কৃষিকার্য সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হয়। সেই কারণে এই সমস্ত অঞ্চলে লোকবসতি ঘন, তবে গাঙ্গেয় সমভূমির পূর্বাঞ্চল অপেক্ষা পশ্চিমাঞ্চলে লোকবসতি অল্প। (২) **খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য**—খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চলেও লোকবসতি নিবিড় হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে ঝরিয়ার কয়লাখনি অঞ্চলে লোকবসতি অত্যন্ত ঘন। (৩) **শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি**—লোকসংখ্যার ঘনত্ব আঞ্চলিক শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির উপর নির্ভর করে। শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি হেতু বোম্বাই, আমেদাবাদ, আসানসোল এবং কলিকাতা অঞ্চলের লোকবসতি নিবিড়। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র গ্রাম জামসেদপুর জনসমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত হইয়াছে। (৪) **সমতল ভূপ্রকৃতি**—ভূপ্রকৃতি সমতল হইলে কৃষিকার্যের ও যানবাহন চলাচলের সুবিধা হয়। এই কারণে সমতল ভূপ্রকৃতিযুক্ত অঞ্চলে লোকবসতি ঘন। গাঙ্গেয় সমভূমি এই কারণেই নিবিড় লোকবসতিপূর্ণ অঞ্চল।

ভারতের **গাঙ্গেয় সমভূমিতে** লোকবসতি অত্যন্ত ঘন। ইহার **কারণ**—(১) কৃষিকার্যের সুযোগসুবিধা ও উন্নতি—গাঙ্গেয় সমভূমি পলিগঠিত হওয়ায় মৃত্তিকা অতিশয় উর্বর। এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাত পরিমিত এবং কৃষিকার্যের উপযোগী। এই সমভূমি অঞ্চলে কৃত্রিম জলসেচের সুযোগসুবিধা রহিয়াছে। এই স্থানের ভূপ্রকৃতি সমতল। এই সমস্ত কারণে এই অঞ্চলে কৃষিকার্য বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। বস্তুতঃ এই সমভূমিই ভারতের

শ্রেষ্ঠ কৃষি অঞ্চল। কৃষিকার্যের সাহায্যে জীবনযাত্রা নির্বাহ খুব সহজ হওয়ায় এই অঞ্চলের লোকবসতি অত্যন্ত নিবিড়। আবার এই অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি সমতল হওয়ায় নদীসমূহ সুনাব্য এবং জলপথে পণ্য ও যাত্রী চলাচল ও রাস্তাঘাট নির্মাণ অত্যন্ত সহজসাধ্য ও অল্পব্যয়সাপেক্ষ। (২) পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম প্রান্ত হইতে প্রচুর কয়লা এবং উহার সন্নিহিত অঞ্চলে লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। এ অঞ্চলে জলবিদ্যুতের উৎপাদনও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। (৩) কাঁচামাল ও বিদ্যুৎ শক্তিসম্পদের প্রাচুর্য এবং যানবাহনের সুবিধা হেতু এই অঞ্চল শিল্পবাণিজ্যে বিশেষ উন্নত। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চল শিল্প-সম্পদে উন্নত হওয়ায় এই সমস্ত শিল্পের উপর নির্ভরশীল অগণিত লোক এই অঞ্চলে বাস করে। (৪) বহু প্রাচীনকাল হইতেই আর্যগণ এই সমভূমি অঞ্চলে বসবাস করিতেছেন, এবং সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে এই অঞ্চল পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন অঞ্চল। এই কারণেও এ অঞ্চলের লোকবসতি ঘন।

বিরল লোকবসতির কারণ—ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে লোকবসতি বিরল। ইহার কারণ—(১) **বন্ধুর ভূপ্রকৃতি**—বন্ধুর ভূপ্রকৃতিযুক্ত অঞ্চলে কৃষিকার্য ও যানবাহন চলাচল সহজসাধ্য নহে। সেই কারণে ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে লোকবসতি বিরল। হিমালয় ও কাশ্মীরের ভূপ্রকৃতি বন্ধুর হওয়ায় এই সমস্ত অঞ্চলে লোকবসতি অতি সামান্য। (২) **নিবিড় অরণ্য**—অরণ্যাকীর্ণ অঞ্চলে লোকবসতি বিরল হয়। আসাম (৬০) ও সুন্দরবন অরণ্যাকীর্ণ এবং অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় ঐ সমস্ত স্থানে লোকবসতি অল্প। (৩) **স্বল্প বৃষ্টিপাত ও মরুপ্রায় জলবায়ু**—রাজস্থান (৫৯), দক্ষিণ পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে বৃষ্টিপাত অতিসামান্য এবং জলবায়ুও চরমভাবাপন্ন। সেই কারণে এই সমস্ত অঞ্চলে লোকবসতি অল্প। কিন্তু ভারতের মরুপ্রায় অঞ্চলের যে সমস্ত স্থানে কৃত্রিম জলসেচ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইতেছে সেই সমস্ত স্থানে লোকবসতিও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। (৪) **কৃষিকার্যের অসুবিধা ও অনুন্নত অবস্থা**—মধ্যপ্রদেশের ভূমি বন্ধুর ও অরণ্যাকীর্ণ। এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয় প্রচুর,
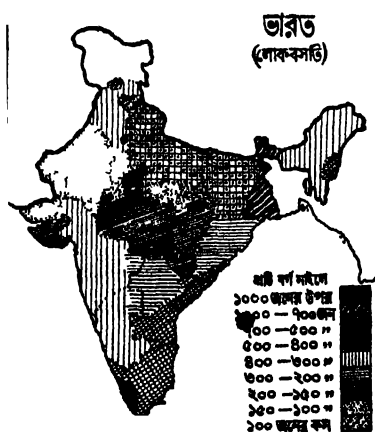
৬৩নং চিত্র—ভারতের লোকবসতি

কিন্তু ভূমি উর্বর না [illegible] অরণ্য ও পর্বতের জন্য কৃষিকার্যের সুবিধা না থাকায় লো[illegible]ংখ্যা অল্প। আবার অন্ধ্র (১৩১) ও মধ্যপ্রদেশের কতকাংশে বৃষ্টিপাত অল্প এবং কৃত্রিম সেচব্যবস্থা প্রবর্তনের সুযোগও অল্প। সেই কারণে এই সকল অংশে লোকবসতিও অল্প।

প্রশ্নোত্তর

1. Give an account of the factors determining the world distribution of population. (পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি বণ্টন ও ঘনত্ব তারতম্যের কারণ সমূহ লিখ।) (পৃঃ ৩২৬-৩২৭)

2. Where do the great masses of population live in the world ? How do you account for their concentration ? (পৃথিবীর কোন্ কোন্ অঞ্চলে বসতি-ঘনত্ব নিবিড় ? ঐ সমস্ত অঞ্চলে নিবিড় বসতির কারণসমূহ লিখ।) (পৃঃ ৩২৯-৩৩১)

3. Account for the irregular distribution of population in India. (ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি বণ্টনের বিভিন্নতার কারণসমূহ লিখ।) (পৃঃ ৩৩১-৩৩৪)

4. Give an account of the world distribution of population. (পৃথিবীর জনসংখ্যা বণ্টন প্রসঙ্গে যাহা জান লিখ।) (পৃঃ ৩২৭-৩৩১)